চরিত্রের চালচিত্র

বিমল মিত্র

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার পাঠক-পাঠিকাবর্গের সতর্কতার জন্যে জানাই যে, গত পঁচিশ বছর যাবৎ অসংখ্য উপন্যাস 'বিমল মিত্র' নামযুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়ে আসছে। ওগুলি এক অসাধু জুয়াচোরের কাণ্ড। আমার লেখার জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে বহুলোক এই নামে পুস্তক প্রকাশ করে আমার পাঠক-পাঠিকা-বর্গকে প্রতারণা করে আসছে। পাঠক-পাঠিকা-বর্গের প্রতি আমার বিনীত বিজ্ঞপ্তি এই যে, সেগুলি আমার রচনা নয়। একমাত্র 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' ছাড়া আমার লেখা প্রত্যেকটি গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় আমার স্বাক্ষর মুদ্রিত আছে।

ঃ লেখকের অন্যান্য বই ঃ

কেউ নায়ক কেউ নায়িকা
সাহেব বিবি গোলাম
ও হেনরীর শ্রেষ্ঠ গল্প
কড়ি দিয়ে কিনলাম
বেগম মেরী বিশ্বাস
যা ইতিহাসে নেই
এক দশক শতক
আসামী হাজির
পতি পরম গুরু
চলো কলকাতা
বিষয় বিষ নয়
নিবেদন ইতি
রাণী সাহেবা
জন-গণ-মন
এই নরদেহ
মিথুন লগ্ন
লজ্জাহরণ

কন্যাপক্ষ

লেখক জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি এই যে, তাকে সারা জীবন ধরে লিখতে হবে এবং আজীবন ভালো লেখাই লিখতে হবে। একখানা ভালো বই লিখে থেমে গেলে চলবে না। একখানা ভালো বই লিখেছে বলে, পরের বইটা খারাপ লিখলেও কেউ তাকে ক্ষমা করবে না। শুধু ভালো লিখতে হবে তাই-ই নয়। আরো ভালো। আরো, আরো ভালো। উত্তরোত্তর ভালো।

এ-সব কথা আমার নয়। এত কথা আমি বুঝতাম না। এ-সব কথা আমাকে যে শিখিয়েছিল, তাকে আমার গল্পের মধ্যে কখনও টেনে আনিনি। আমার জীবনের শেষ গল্প আমি লিখবো হয়ত তাকে নিয়েই। কিন্তু সে-কথা এখন থাক্।

কিন্তু কাকে নিয়ে 'কন্যাপক্ষ' সুরু করি!

অলকা পাল, সুধা সেন, মিষ্টিদিদি, মিছরি-বৌদি, আমার মাসিমা, কালোজামদিদি, মিলি মল্লিক—কার কথা ভালো করে জানি। কাকে ভালো করে চিনেছি। আমার জীবনের সঙ্গে কে জড়িয়ে গিয়েছিল সবচেয়ে বেশি করে। ছোটবেলা থেকে কত জায়গায় তো ঘুরেছি। কত কিছু দেখেছি। সকলকে কি মনে রাখা সহজ। জব্বলপুরের সেই নেপিয়ার টাউন, বিলাস-পুরের শনিচরী বাজার, কলকাতার সেই হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে মিষ্টিদিদির বাড়ি, পলাশপুরের মিলি মল্লিক—কত জায়গায় কত লোককে দেখলাম, আমার নোট-বইতে সকলের সব গল্প লিখে রাখিনি। শুধু দু'একটা টুকরো-টাকরা টুকি-টাকি স্কেচ্ সব, তাই নিয়েই এই 'কন্যাপক্ষ'।

সোনাদি বলতো, 'যা-কিছু দেখছিস টুকে রাখ্। আর্টিস্টরা যেমন স্কেচ্ করে খাতায়, তেমনি করে, তারপর যখন উপন্যাস লিখবি তখন কাজে লাগবে তোর।'

উপন্যাসের কাজে কোনদিন লাগবে কিনা জানি না, তবু অনেকদিন ধরে যেখানে যা-কিছু দেখেছি, তার কিছু কিছু লিখে রেখেছি। এক-একটা মানুষ দেখেছি, আর যেন এক-একটা মহাদেশ আবিষ্কারের আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছি। এক-একজন মানুষ যেন এক-একটা তাজমহল। তেমনি সুন্দর, তেমনি বিস্ময়-মুখর, তেমনি অশ্রু-করুণ।

ইচ্ছে ছিল, একদিন একখানা উপন্যাস লিখবো। এমন উপন্যাস যে, পৃথিবীর সব মানুষ তাদের নিজের ছায়া দেখতে পাবে তাতে। অসংখ্য চরিত্রের শোভাযাত্রা। হাজার হাজার মানুষের মর্মকথা মুখর হয়ে উঠবে সে-উপন্যাসে। সে হবে দ্বিতীয় মহাভারত। সে আশা আমার সার্থক হয়নি জানি। হবেও না। তবু সোনাদি আশা দিতো, 'কেন পারবি না তুই, নিশ্চয় পারবি—নগদ পাওনার লোভ যদি ত্যাগ করতে পারিস, পুরুত হয়ে পুজোর নৈবিদ্য যদি

চুরি না করিস তো, একদিন দেবতার প্রসাদ পাবি তুই নিশ্চয়ই।'

মনে আছে, ছোটবেলায় একমাত্র সোনাদির কাছে যা-কিছু উৎসাহ পেয়েছি। যখন লুকিয়ে লিখে পাতা ভরিয়ে ফেলেছি, বাবা দেখতে পেয়ে রাগ করেছেন, বন্ধু-বান্ধবরাও ঠাট্টা করেছে—তখনও কিন্তু সোনাদি হাসেনি।

সোনাদি বলতো, 'মেয়েদের নিয়ে লেখাই শক্ত, মেয়েদেরই ভালো করে লক্ষ্য করবি। মেয়েরা যেন ঠিক মঙ্গলগ্রহের মতো, এত দূরে থাকে তবু তার সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকের কৌতূহলের আর শেষ নেই। মঙ্গলগ্রহে পেঁছুবার জন্যে কি মানুষের কম চেষ্টা, কম অধ্যবসায়। কিন্তু যদি কখনও পেঁছুতে পারে সেখানে—'

জিগ্যেস করতাম, 'পেঁছুলে কী দেখবে, সোনাদি?'

'তা কি বলতে পারি। কেউ হয়তো ঠকবে, কেউ জিতবে। হারজিত নিয়েই তো জগৎ। কিন্তু যে-মানুষের দূরত্ব নেই, তার সম্বন্ধে কোনো মানুষের কোনো কৌতূহলও আর নেই। মেয়েদের রহস্যময়ী করে সৃষ্টি করার কারণই তো তাই—'

কিন্তু সুধা সেনকে যখন প্রথম দেখি তখন সত্যিই কোনো কৌতূহল, কোনো রহস্য আমাকে আকর্ষণ করতে পারেনি। তাই পরে যখন একদিন সুধা সেনের চিঠি পেলাম, সেদিন সত্যিই চমকে উঠেছিলাম।

মনে আছে সুধা সেনকে নিয়ে যেদিন প্রথম রাস্তায় বেরিয়েছিলাম নিজেরই কেমন লজ্জা হয়েছিল যেন। সুধা সেন এমন মেয়ে নয় যাকে নিয়ে রাস্তায় বেরোনো চলে।

ট্রাম-রাস্তার মোড়ে কারো সঙ্গে দেখা হয়, এটা ইচ্ছে ছিল না আমার সেদিন। সুধা সেন তেমন মেয়ে নয়, যাকে সঙ্গে করে বেরালে লোকের ঈর্ষার উদ্রেক করা যায়। বরং উল্টো। বছর বাইশ বয়সের মেয়ে এমন রোগা স্বাস্থ্যহীন কেমন করে হল? কাঁধ-ঢাকা ব্লাউজের বাইরে হাত দুটোর যে অংশ নজরে পড়ে, সেখানে সৌন্দর্যের আভা কি যৌবনের মাধুর্য এতটুকু খুঁজে পাওয়া যায় না। গলার দু'পাশে কণ্ঠার হাড় দুটো স্পষ্ট উচ্চারিত উদ্ধত ভঙ্গিতে আত্মঘোষণা করে। চোখের যে-দৃষ্টি থাকলে অন্তত যুবতী বলে মনের নিভৃতেও একটু চাঞ্চল্য জাগে, তাও নেই তার।

সে-দৃশ্যটা আজো আমার মনে আছে। সুধা সেন আমারই পাশে দাঁড়িয়ে আছে। নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হয়েই দাঁড়িয়েছে আমার বাঁ-পাশে। হাতে একটা ভ্যানিটি-ব্যাগও আছে, পায়ে মাঝারি দামের স্যাণ্ডেলও আছে, হাতে চুড়িও আছে দু'গাছা করে। সিঁদুরের একটা টিপও দিয়েছে সুধা সেন দুটো ভুরুর মধ্যে। একটা জমকালো রঙিন শাড়িও পড়েছে। অর্থাৎ সাজবার দুর্দম স্পৃহা না থাক্, তবু অস্বীকার করবার উপায় নেই যে সুধা সেন সেজেছে।

সুতরাং এমন একটি মেয়েকে পাশে নিয়ে চলতে সেদিন লজ্জাই হচ্ছিল মনে আছে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই অবস্থাতেই কি মোহিতের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে হয়।

এড়ানো সম্ভব হলে হয়ত এড়িয়েই যেতাম। কিন্তু মোহিতই আমায় দেখে ফেলেছে। এগিয়ে এসে বললে, 'কী রে, কোথায় ?'

বললাম, 'একটা উপকার করতে পারো হে ?'

তারপর সুধা সেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললাম, 'আমার বৌদির বিশেষ জানাশোনা, বড় মুশকিলে পড়েছেন। থাকবার একটা ঘরের বিশেষ দরকার। মেয়েদের বোর্ডিং, না হয় মেস, যেখানে হোক। একবারে যাকে বলে নিরাশ্রয়। একটা বাসার খবর দিতে পারো ?'

মোহিত নানা কাজের মানুষ। নানা দরকারে নানা জায়গায় যেতে হয় তাকে। বার দুই সিগারেটে টান দিলে। কপাল কুঁচকে একবার ভাবলেও যেন। তারপর বললে, 'আপাতত তো কিছু মনে পড়ছে না ভাই, তবে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বোর্ডিং-এ একবার চেষ্টা করে দ্যাখো না—'

চেষ্টা করে দেখতে আপত্তি নেই। মোট কথা আজকের মধ্যে যেখানে হোক একটা আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করতেই হবে। সুধা সেনকে আমারই হাতে ছেড়ে দিয়েছে বৌদি। সুধা সেনের একটা থাকবার ব্যবস্থা আজ না করলেই নয়। এই বিরাট কলকাতা শহরে সুধা সেন নাকি একেবারে সহায়হীনা। আজ রাতটুকুর জন্যেও মাথা গোঁজবার আশ্রয় নেই তার কোথাও।

সুধা সেনের মুখের দিকে চাইলাম। ভারি অসহায় মনে হল তাকে। কে জানে এতদিন এই স্বাস্থ্য দিয়ে বি. এ পাস করেছে কেমন করে, কেমন করে সাপ্লাই অফিসের অ্যাকাউন্টস্ সেক্সনে আশি টাকা মাইনের চাকরি করছে। পাড়াগাঁয়ে নাকি ছোটবেলায় মানুষ। ছোটবেলায় মানে, ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে দেশেই। বৌদি বলে, 'ভীষণ কিপ্‌টে মেয়েটা, কিছুতেই পয়সা খরচ করবে না, দিন ভোর শুধু সাত-আট বার চা খেয়েই কাটায়।'

ট্রাম এসে গিয়েছিল।

মোহিত বললে, 'হ্যাঁ, আর একটা জায়গা মনে পড়েছে, গোয়াবাগানে মেয়েদের একটা বোর্ডিং আছে, সেখানে একবার চেষ্টা করতে পারো, বোধ হয় জায়গা পেতেও পারো—'

ট্রামে উঠে পকেট থেকে নোট-বইটা বার করে ঠিকানাটা লিখে রাখলাম। কোথায় বালিগঞ্জ, কোথায় গোয়াবাগান, কোথায় হ্যারিসন রোড। শেষে যদি কোথাও জায়গা না মেলে তখন আমার কী কর্তব্য ভেবে পেলাম না। কিন্তু সুধা সেনের মুখের দিকে চাইলে সত্যিই মায়া হয়।

বৌদি বলে, 'অফিসে একদিনও কিছু খাবে না, নেহাত যখন খুব খিদে পাবে তখন খালি এককাপ চা—তাই তো ওইরকম স্বাস্থ্য।'

একটা বসবার জায়গা পেয়েছিলাম। জানলার দিক ঘেঁষে সুধা সেন বসেছিল।

বললাম, 'বৌদি বলছিল, আপনার এক ভাই থাকে কলকাতায়—'

সুধা সেন বললে, 'এক ভাই নয়, দু'ভাই—দু'জনে দু'বাসায় থাকে।'

'আপনার আপন ভাই? তা সেখানে তাদের কাছে কোনরকমে—'

সুধা সেন বাইরের দিকে চোখ রেখেই বললে, 'আমার টিউশানিটা যাবার পর থেকে তো ভায়েদের কাছেই আছি।'

'আপনি টিউশানি করতেন নাকি?'

সুধা সেন বললে, 'সেইখানেই তো এ ক'বছর কাটিয়েছি, আমার স্যুটকেসটা এখনও সেখানে সেই বাসাতেই পড়ে আছে। একটা ছোট ছেলেকে পড়াতে হত। তাঁরা নোটিশ দিলেন। ছেলে বড় হয়েছে, এবার পুরুষ টিচারের কাছে পড়বে। লোক তাঁরা খুব ভালো। আমাকে এক মাসের নোটিশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন,—এক মাসের মধ্যে কোথাও একটা বাসা-টাসা খুঁজে নিতে।'

'তারপর?'

'একটা মাস তো দেখতে দেখতে কেটে গেল। একখানা ঘর পাওয়া গেল না যে, তা নয়। কিন্তু মেয়েদের থাকার মতো সে-ঘর নয়। আর, এক-একজন যা ভাড়া চেয়ে বসলো! আমি তো আশি টাকা মাইনে পাই, তা থেকে দেশে মাকেই বা কী পাঠাই, আর নিজের খরচই বা কিসে চালাই!'

কল্পনা করলুম, সুধা সেন সারাদিন অফিসের চাকরি করে সকালে-সন্ধ্যেয় ছাত্র পড়িয়ে বাসা খুঁজতে বেরিয়েছে। শ্যামবাজার, বউবাজার, টালা আর টালিগঞ্জ। যেখানে এতটুকু পরিচয়ের সূত্র আছে সেখানেই সন্ধান নেওয়া। তারপর ট্রামের ভিড়। সে-ভিড়ে পুরুষ মানুষেরাই উঠতে পারে না তো সুধা সেন তো চেপটে যাবে! একটা আচমকা ধাক্কা খেয়েই তো উল্টে পড়বে রাস্তায়। হয়তো ধাক্কাও খেয়েছে অনেকদিন। সৌন্দর্যের আভিজাত্য থাকলে লোকে তবু একটু সম্ভ্রম সমীহ করে। খাতির করে। সুধা সেনের সে সুবিধেও নেই। এই তো সেদিন দেখলাম, ভিড়ের মধ্যে বাসে উঠতে যাবার সময় একজনের চোখের সান-গ্লাসটা ছিটকে রাস্তায় পড়ে চুরমার হয়ে গেল। কতবার রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে যে-সব অত্যাচার অপমান সইতে হয়েছে, সে-সব কি আর সুধা সেন মুখ ফুটে বলবে?

বললাম, 'ধরুন, আজ যদি কোনো ব্যবস্থা না হয়, তাহলে কী উপায়?'

'তা হলে?—' বলে ভাবতে লাগলো সুধা সেন।

'আপনি একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিন আমার। আপনি নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করতে পারবেন, আপনার বৌদির কাছে শুনেছি আপনার অনেক লোকের সঙ্গে জানাশোনা আছে।'—সুধা সেন আমার চোখের ওপর চোখ রেখে বললে।

লেডিস্ সীটে বসেছিলাম। ইতিমধ্যে একজন মহিলা ওঠায় জায়গা ছেড়ে দাঁড়াতে হল। আমি যেন বাঁচলাম।

বৌদি বলেছিল, 'ভারি ছট্‌ফটে মেয়েটা। কেবল এ-অফিস থেকে সে অফিস করবে। কেবল কিসে উন্নতি করবে, বেশি টাকা জমাবে সেই ইচ্ছে—মোটে খাবে না কিছু, পয়সা যেন ওর গায়ের রক্ত।'

সুধা সেনের পাশে যে মেয়েটি এসে বসলো সে পাঞ্জাবী। সুধা সেন তার পাশে যেন এতটুকু বিন্দুবৎ হয়ে গেছে। সত্যি সত্যি সুধা সেনকে দেখে মায়া হয় না, দুঃখ হয় না। হাসি পায়। সাপ্লাই অফিসের অন্য মেয়েদেরও তো দেখেছি। অনেক বিবাহিতা মহিলা, পাঁচ-ছ' ছেলের মা, অনেকেই তো চাকরি করে। আবার কারোর চাকরি করবার প্রয়োজন নেই, শুধু শখ, তাও দেখেছি। সাজগোজ পোশাক-পরিচ্ছদ, সেই পয়সায় সিনেমা থিয়েটার রেস্টুরেণ্ট সবই চলে। ধর্মতলার খাবারের দোকানটাতে দুপুরবেলা মেয়েদের ভিড়ে ঢোকাই যায় না। কিন্তু সুধা সেনের মতো মেয়ে সত্যিই দেখা যায়নি এর আগে। এত রোগা মেয়ে আগে নজরেও পড়েনি আমার। বছর বাইশ বয়সের মেয়ে এমন স্বাস্থ্যহীন কেমন করে হল। সুধা সেন যখন হাঁটে, তখন মনে হয় সে যেন তার কানের পাতলা দুটো দুলের মত টিকটিক করে দুলছে। হাঁটছে তাকে বলা চলে না ঠিক।

দু'জনের দুটো টিকিট আমিই কিনেছিলাম। কিন্তু সুধা সেনের সে সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তার কারণ নেই। টিকিট কেনা হয়েছে কিনা, সে প্রশ্ন তার মনে উঠতে পারে না।

ধর্মতলার মোড়ে ট্রাম থেকে নামতে হল। আর একটা ট্রামে উঠতে হবে এখানে।

শ্যামবাজারের ট্রামে উঠে বললাম, 'কোথায় আগে যাবেন? গোয়াবাগানে, না পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বোর্ডিং-এ?'

সুধা সেন বললে, 'চলুন আগে শেয়ালদ'য়। আমার ছোড়দা ওখানে থাকে শুনেছি।'

বললাম, 'আর আপনার বড়দা? তিনি কোথায় থাকেন?'

সুধা সেন বললে, 'সেই বড়দার বাড়িতেই তো রাত্রে শুই, কিন্তু সেখানেও রাত বারটার আগে ঢোকবার হুকুম নেই, তারপর ভোরবেলা অন্ধকার থাকতে-থাকতে সকলের ঘুম থেকে ওঠার আগেই বেরিয়ে চলে আসতে হয়।'

'কেন?' সুধা সেনের কথা শুনে অবাক্ হবারই কথা।

সুধা সেন যা বললে, তা শুনে আরো অবাক্ হয়ে গেলাম। সুধার বড়দা ফড়েপুকুরে বিয়ে করে বউ নিয়ে সংসার পেতেছে। সেখানে থাকবার জায়গাও আছে বেশ। একখানা ঘর খালি পড়েই থাকে। ভারি ভালমানুষ কিন্তু বড়দা। কারো মুখের ওপর কথা বলতে পারে না। কতদিন বড়দা সুধা সেনের অফিসে এসে আগে আগে খবর নিয়ে যেত। টাকার সাহায্য অবশ্য সুধা সেনের প্রয়োজন হয় না। তবু বৌদি কিছুতেই সুধা সেনকে সেখানে ঢুকতে দেবে না। কিন্তু বড়দা খুব ভালোবাসে ছোট বোনকে। যখন বৌদি ঘুমিয়ে পড়ে, রাত বারটার পড় বড়দা চুপি চুপি দরজা খুলে দিয়ে যায়। নিঃশব্দে, আলো না জেবলে সুধা সেন তার নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। আবার সকালবেলাই সকলের আগে নিঃশব্দে বেরিয়ে আসতে হয় রাস্তায়।

বললাম, 'তারপর স্নান খাওয়া, এসব ?'

সুধা সেন বললে, 'স্নানটা এতদিন ছোড়দার ওখানেই করতুম। বউবাজারে একটা মেস করে আছে ছোড়দারা কয়েকজন বন্ধু মিলে···ওরা এতদিন আপত্তি করে আসছিল। সকালবেলা সবাই অফিস যাবে, আর আমি তখন কলঘর জোড়া করে থাকি—সকলের বড় অসুবিধে হয়।'

বললাম, 'শোয়া, স্নান করা তো হল—এরপর খাওয়া ?'

'খাওয়ার আর ভাবনা কি ? না খেলেই হয়।' সুধা সেন হাসলে।

বৌদি ঠিকই বলেছে,—মেয়েটা ভারি কিপ্‌টে। কিছু খাবে না, খাবে কেবল চা। কারের পর কাপ চা। নইলে খুব খিদে আছে। যদি খায় তো বড় জোড় সিঙ্গাড়া, কচুরি, নয় তো বেগুনি, ফুলুরি তেলেভাজা। এই তেলেভাজা খেয়েই এক-একদিন কাটিয়ে দেয় সুধা সেন। এক-একদিন স্রেফ কিছুই খায় না। প্রথম প্রথম নাকি কষ্ট হত সুধা সেনের, কিন্তু আজকাল অভ্যেস হয়ে গেছে। বড়দার বাড়িতে রাত বারটার আগে ঢোকবার হুকুম নেই, অথচ অফিস ছুটি পাঁচটায়। এই সাত ঘণ্টা কাটাতেই বড় কষ্ট হয়। কার্জন পার্কের জনবহুল অংশটায় কাটানোই সবচেয়ে নিরাপদ। কিংবা ট্রামে চড়ে একবার ডালহৌসি আর একবার বালিগঞ্জ স্টেশনও করা যায়, কিন্তু অকারণে অনেকগুলো পয়সা খরচ। কার্জন পার্কের খোলা হাওয়ায় ঘাসের ওপর বসে দু'পয়সার চিনেবাদাম চিবিয়ে চিবিয়ে খেলে পেটটাও ভরে, খোলা হাওয়া খাওয়াও হয়, আবার সময়টাও বিনা খরচে কাটানো যায়।

সুধা সেন বললে, 'বড়দা ছোড়দা কেউ মাকে টাকা পাঠায় না। সেখানে আমার একটা ছোট ভাই আছে, আমাকেই তার খরচ দিতে হয়।'

বড়দা নাকি বিয়ের আগে টাকা পাঠাতো। কিন্তু ইদানীং বৌদি বারণ করে দিয়েছে। শ্বশুরবাড়ির কোন লোককে দেখতে পারে না বৌদি। ছোড়দা তো দাদার সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেছে—সুধা সেন বাধ্য হয়েই রাত্রে যায় শুতে, নইলে বৌদি দেখতে পেলে বড়দাকে তো আর আস্ত রাখবে না।

সুধা সেন বললে, 'ছোড়দার মেসটা ছিল এতদিন, তবু সকালবেলা কাপড়-কাচা, স্নান করাটা হচ্ছিল। কিন্তু দু'দিন থেকে তাও হয়নি—আজ দু'দিন স্নান করাও হয়নি আমার।'

'কেন ?'

'ছোড়দা ও-মেস ছেড়ে দিয়ে শেয়ালদায় একটা বড় হোটেলে উঠেছে। সেই জন্যেই বলেছিলুম, আগে শেয়ালদ'য় গিয়ে ছোড়দার খোঁজটা করি—'

শেষ পর্যন্ত শেয়ালদ'র মোড়েই ট্রাম থেকে নামলাম। সুধা সেনকে নিয়ে এখানে ঢুকতে কেমন যেন লজ্জা ও সংকোচ বোধ হল।

ম্যানেজার কিন্তু চিনতে পারলেন না। বললেন, 'অমলেন্দু সেন ? না মশাই, এখানে ও-নামে কেউ থাকে না।'

সুধা সেন যেন বিমর্ষ হয়ে গেল। অথচ সে ছোড়দার মেসে গিয়ে শুনেছে,

এখানেই উঠেছে ছোড়দা।

আমি বললাম, 'এখানে কোনো ঘর পাওয়া যাবে, মানে আলাদা ঘর একটা, ইনি থাকবেন।'

ম্যানেজার সুধা সেনের দিকে চাইলেন। কেমন যেন বক্র-দৃষ্টি। অন্তত সুধা সেনকে কেউ বক্র-দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারে, এ ধারণা আমার ছিল না। ইতিমধ্যে দু'একজন ওয়েটার, চাপরাসী, ক্যাশিয়ার তারাও এসে দাঁড়িয়েছে চারপাশে। সুধা যেন আর আমাকে জড়িয়ে সবাই মিলে যেন একটা সম্পর্ক কল্পনা করে নিয়েছে। জিনিসটা আমার ভালো লাগলো না।

ক্যাশিয়ার বললে, 'কী বললেন স্যার, অমলেন্দু সেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, ছিলেন এখানে তিনি, কিন্তু তিনি তো···আচ্ছা, ওইখানে দেখুন তো, পাশেই যে গলিটা, ওর শেষে একেবারে লাল রঙের দোতলা বাড়িটায় বোধহয় তিনি আছেন—এই হোটেলে একবার চেষ্টা করে দেখুন তো—'

সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি পার হয়ে সুধা সেনকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে যেন বাঁচলাম। আমার সম্বন্ধে কী ভাবলে ওরা কে জানে! ব্যাপারটা সুধা সেন বুঝতে পেরেছে নাকি? কিন্তু ওর মুখ দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। তেমনি ভাষাহীন বিবর্ণ মুখ ওর। হাতের ভ্যানিটি-ব্যাগটি নিয়ে বেশ চঞ্চল পায়ে আমার পাশে পাশে চলতে লাগলো সুধা সেন।

লাল রঙের দোতলা বাড়িটায় ঢোকা গেল।

একটু নির্জন মনে হল বাড়িটা। ঘরগুলো তালাচাবি দেওয়া। ছুটির দিন। সবাই বোধহয় যে-যার দেশে চলে গেছে। রান্নাঘরের কোণে ঠাকুর থালায় ভাত বেড়ে খাবার আয়োজন করছে।

বললে, 'অমলেন্দুবাবু? ওই সাত নম্বর ঘরে দেখুন।'

সাত নম্বর ঘর খুঁজতে অগ্রসর হচ্ছিলাম। ঠিকানা বদলালো, অথচ বোনকে একটা খবর দেওয়াও প্রয়োজন বোধ করেনি—এ যেন কেমন। সুধা সেন কি এখানে থাকতে পারবে? এ যেন হেটো মেস বলে মনে হল।

এক ভদ্রলোক ভিজে গামছা পরে এক বালতি জল বয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকছিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, এই ঘরেই থাকেন, কিন্তু এখন তো তিনি নেই। সকালবেলা বেরিয়ে গেছেন, আসবেন সেই রাত্রে, আবার না-ও আসতে পারেন। বলে গেছেন, ওবেলা খাবেন না।'

সুধা সেনের দিকে তাকালাম। সুধা সেনও আমার দিকে তাকালে। বুঝলাম—ছোড়দাকে পাবার আশা যেন সে করেনি। শুধু ছোড়দার আস্তানাটা চিনে রাখতেই এসেছিল। সুধা সেন নির্বিকারভাবে বেরিয়ে এল বাইরে। আমিও এলাম পেছনে পেছনে।

সুধা সেন বললে, 'ছোড়দার দেখা পাওয়া যাবে না জানতাম—ও ছোটবেলা থেকেই ওমনি। দশ বছর বয়সে দেশ থেকে পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়, মাকে একটা চিঠি পর্যন্ত দেয় না।'

শুনে আমি চুপ করে রইলাম।

সুধা সেন আবার বলতে লাগলো, 'বড়দার ওপরেই মার বেশি ভরসা ছিল। জমি-জায়গা বেচে বড়দাকে বাবা পড়িয়েছিলেন। আর বলতেন—'কমলটাই মানুষ হবে।'

বললাম, 'মানুষ তো যা হয়েছে, বুঝতে পারছি।'

সুধা সেন বললে, 'বড়দাই তো আমার পড়ার খরচ সব দিত, মাকেও টাকা পাঠাতো, কিন্তু বৌদি আসার পর থেকেই সব বন্ধ করে দিয়েছে। আমাকেও বৌদি মোটে দেখতে পারে না। বড়দা এই ব্যাগটা আমায় কিনে দিয়েছিল আমার জন্মদিনে।'

বললাম, 'এবার তাহলে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বোর্ডিংটা দেখা যাক—'

সুধা সেনকে নিয়েই আজ সমস্ত দিন কাটবে মনে হল। অথচ রাস্তার মধ্যে ফেলে চলে যাওয়াও যায় না। কোথাও একরাত্রির জন্যেও যদি থাকবার একটা বন্দোবস্ত করা যেত আমি নিশ্চিন্ত হতাম। অফিসে যে-সব মেয়েরা সুধা সেনের সঙ্গে কাজ করে তারাও কী আশ্রয় দেন না একে। কে জানে সুধা সেনের কোথায় গোলযোগ। নিশ্চয় একটা খুঁত আছে কোথাও সুধা সেনের চরিত্রে, যা তাকে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়দের কাছে থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

বৌদিকে জিগ্যেস করেছিলাম। বৌদি বলেছিল, 'বড় কিপ্‌টে মেয়েটা, না-খেয়ে ওর মতো থাকতে আর কাউকে দেখিনি।'

কিন্তু কৃপণতা কি এতবড় একটা অপরাধ নাকি যে কারো সহানুভূতি ভালোবাসা বন্ধুত্ব পাবে না। যে কৃপণতা করে সে তো নিজেকেই কষ্ট দেয়, নিজেরই স্বাস্থ্য নষ্ট করে। তাতে আর কার কী এসে গেল। নাকি একসঙ্গে এক ঘরে বাস করতে গেলে কুড়িয়ে ছড়িয়ে না থাকলে কারোর সহানুভূতি আকর্ষণ করা যায় না। কমলেন্দুকে মানুষ করতে সুধা সেনের মা যে-পরিমাণ অর্থ আর সম্পত্তি ব্যয় করেছেন, সেটা থাকলে আজ বোধহয় সুধা সেন অন্যরকম হত। বোধহয় সুধা সেন পেট ভরে খেত। বোধহয় তার স্বাস্থ্য এমন নির্জীব হত না। হয়ত সুধা সেনকে বি. এ. পাস করতেও হত না, চাকরি করতেও হত না। বিয়ে করে দেশের আর পাঁচজন মেয়ের মতো সংসার পাততে পারতো।

পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বোর্ডিং-এ বড্ড কড়াকড়ি।

দোতলার ভিজিটার্স রুমে অনেক টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ। সেখানেই বসলাম দু'জনে। ঘরে আরো অনেক ছেলেমেয়ে গল্প করছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর নাকি অসুখ, তিনি নিচে নামবেন না। আমি বসে রইলাম, সুধা সেনই ওপরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

সুধা সেন খানিক পরে আবার সেই নির্বিকার মুখ নিয়েই ফিরে এল।

বললে, 'হল না।'

চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। তার পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম আবার।

তারপর ? তারপর কী ? ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম। কাঁটা ঘুরে একেবারে তিনটের ঘরে চলে এসেছে। এখনও কিন্তু সুধা সেনের খিদে পাবে না। অন্তত খাবার কথার উল্লেখ না করলে আর খাবার কথা বলবে না সুধা সেন। ট্রাম-রাস্তায় এসে পড়েছি। আমার যেন আর নড়তে ইচ্ছে করছে না। সুধা সেন কিন্তু অক্লান্ত। মনে হল এখনও গভীর রাত্রি পর্যন্ত এমনি অনির্দিষ্ট ঘোরাঘুরি চালিয়ে যেতে পারবে। সুধা সেনের দিকে চাইলাম। বললাম, 'তারপর ?'

সুধা সেনও আমার দিকে চেয়ে বললে, 'তারপর কী বলুন ?'

তারপর যেন আর সত্যিই কিছু করবার নেই। যেন এখানেই, এসে পূর্ণচ্ছেদে পরিসমাপ্তি। আর চলবে না চাকা। এখানেই নামতে হবে শেষবারের মতো। এরপর শুধু ধূসর হতাশা।

বৌদি বলেছিল, 'ভারি ছটফটে মেয়ে, আর বড্ড একগুঁয়ে, যা নিয়ে লাগবে তা শেষ পর্যন্ত করে ছাড়বে, খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, অদ্ভুত গোঁ ওর !'

শেষ পর্যন্ত বললাম, 'আসুন, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।'

আপত্তি করলে না সুধা সেন। বললে, 'চলুন।'

একটা ভালো রেস্তোরাঁ দেখে ঢোকা হল। ঘরময় লোক। সুধা সেনকে নিয়ে ঢুকতেই চারিদিক থেকে দৃষ্টি পড়লো আমাদের ওপর। কোনও পরিচিত লোকের দৃষ্টিকেই ভয় ছিল, নইলে আর অসুবিধে কিসের। সুধা সেনকে নিয়ে যে-কোনো লোকের বিব্রত হবারই কথা। সুধা সেনের চেহারাই এমন, তার ওপর নজর না পড়ে উপায় নেই।

কোন রকমে সুধা সেনকে নিয়ে একটা কেবিনের মধ্যে ঢুকেছি। পর্দাটা অর্ধেক টেনে দিলাম।

কোনো মেয়ে যে একজন পুরুষের সামনে অমন গোগ্রাসে খেতে পারে, সুধা সেনকে সেদিন কেবিনের মধ্যে খেতে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না সত্যি। নাকি সকালে ঘুম থেকে ওঠা পর্যন্ত কিছুই খায়নি। হয়তো হাতে পয়সা নেই। সেই কোন্ সকালে বড়দার বাড়ি থেকে বৌদি জাগবার আগেই বেরিয়ে এসেছে, তারপর দোকান থেকে কি আর এক কাপ চা-ও খায়নি। আমাদের বাড়িতে যখন সুধা সেন এল তখন সাড়ে দশটা সকাল। তারপর এখন তিনটে বিকেল। সত্যি সুধা সেনের ক্ষমতা আছে। সুধা সেন নিজের মনেই খাচ্ছে, আর আমি অপাঙ্গে তাই দেখছি। দুর্ভিক্ষের সময় ক্ষুধার্ত মুমূর্ষু ভিখিরির আহার দেখেছি, সে এক রকম। কিন্তু এই সুধা সেনের খাওয়া! বি. এ পাস, প্রাইভেটে এম. এ. দেবে, শিক্ষিতা মেয়ের এই আহার যেমন কদর্য তেমনি কুৎসিত। সমস্ত মন আমার বিষাক্ত হয়ে উঠলো। তিন টাকা বিলের দাম চুকিয়ে দিলাম নিঃশব্দে।

বললাম, 'উঠুন।'

আরো বোধহয় খেতে পারতো সুধা সেন। সুধা সেন যেন আজ সাত দিনের খাওয়া একদিনে খাবে বলে মনস্থ করেছে। রাস্তায় বেরিয়েই কিন্তু

করুণা হল। পরিমাণে যে খুব বেশি খেয়েছে সুধা সেন, তা নয়, কিন্তু তার খাওয়ার ভঙ্গিটাই যেন বড় বিশ্রী লেগেছিল সেদিন।

যেন খানিকটা শক্তি পেয়েছে সুধা সেন। বললে, 'চলুন, একবার গোয়াবাগানে শেষ চেষ্টা করে দেখি।'

মোহিতের দেওয়া ঠিকানাটার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। নোট-বুকে লেখা ছিল। এবার শেষ চেষ্টা। হাতে আর আশ্রয়ের সন্ধান নেই। এবারেও যদি ফিরে আসতে হয় তাহলে নিরুপায়। সুধা সেনকে বললাম, 'ট্রামে উঠুন তাহলে—'

কলেজ স্ট্রীটের মোড় থেকে গোয়াবাগান দশ মিনিটের রাস্তা। ট্রামে খুব ভিড়। কিন্তু কেন জানি না লোকজন সুধা সেনকে দেখেই রাস্তা করে দিলে। লেডীজ্ সীট ভর্তি ছিল। একজন পুরুষ যাত্রী সুধা সেনের জন্যে জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সুধা সেনের কৃশ শরীর দেখে দয়া হওয়াই স্বাভাবিক। মনে হল, ভিড়ের মধ্যে সুধা সেনকে ছেড়ে দিয়ে যাব নাকি পালিয়ে। না হয় খুঁজে মরুক নিজের আশ্রয়। গোটাকতক পয়সা খরচ হোক সুধা সেনের। তারপর, লেখাপড়া জানা মেয়ে—রাস্তায় আর রাত কাটাতে হবে না। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত কোন রকমে রাস্তায় কাটিয়ে তারপর আশ্রয় নিক গিয়ে বড়দার বাড়িতে নিত্যকার মতো। সুধা সেনের বড়দা লোক ভালো, তিনি ঠিক রাত বারোটার সময় স্ত্রীর অজ্ঞাতে দরজার খিল খুলে দেবেন। আমার কিসের মাথাব্যথা! আমার সমস্ত কাজকর্ম ফেলে আমি কেন মিছেমিছি ঘুরে বেড়াচ্ছি সুধা সেনের পেছনে পেছনে। আমার কিসের দায়! সুধা সেন আমার কে! অমন কত অসংখ্য মেয়ে কলকাতার রাস্তা-ঘাটে ছড়িয়ে আছে। আর অভাব? অভাব কার নেই! বি. এ পাস করেছে, প্রাইভেটে এম. এ দেবে, তারপর হয়তো একদিন টি-বি হবে—হয়তো তখন হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবে কেউ দয়া করে। একটা ফ্রি-বেড যোগাড় হলেও হতে পারে। তারপর কে মনে রাখবে সুধা সেনের কথা। দেশে মা হয়তো মনি-অর্ডারের আশায় মাসের পর মাস বসে থাকবে—ভাই-এর স্কুলে পড়া বন্ধ হয়ে যাবে টাকার অভাবে। বড়দাকে মাঝরাতে উঠে আর দরজা খুলে দিতে হবে না। ছোড়দাকে বিরক্ত করতে আসবে না কেউ।...

সুধা সেন নিজেই উঠে এসেছে।

'নেমে পড়ুন, গোয়াবাগানে এসে পড়েছি যে—'

গলির ভেতর বাড়িটা খুঁজে নিতে একটু কষ্ট হল। তা হোক, পাওয়া গেল তা-ই ভালো। একটা আধপুরোনো বাড়ির অর্ধাংশ। সেই অর্ধাংশ নিয়েই মেয়েদের বোর্ডিং।

রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে বাড়িটার প্রবেশপথের একটা নিশানা খুঁজছিলাম।

'সুধাদি!'

পেছন ফিরে দেখি একটা ছোট ছেলে সুধা সেনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'কিরে বিজু, তুই! এখানে কোথায়?'

ছোট হাফ্ প্যাণ্ট-পরা ছেলেটা চেনে সুধা সেনকে। আমার কাছে যেন হঠাৎ সুধা সেনের মর্যাদা বেড়ে গেল। সুধা সেনকে কেউ চিনবে, কেউ তাকে চিনে নাম ধরে ডাকবে, তা সে হোক না ছোট ছেলে—এটা যেন আমার কাছে অবিশ্বাস্য ছিল। তাহলে নিতান্ত অসহায় নয় সুধা সেন। তারও এই কলকাতা শহরে পরিচয়ের স্বর্ণসূত্র আছে। সেই সূত্র ধরে সে আশ্রয়ের সপ্তম স্বর্গে পেঁছিতেও পারে।

'তোরা কবে এলি রে কলকাতায়?'

'এই তো সাতদিন এসেছি মামার বাড়িতে। আমি কিন্তু তোমায় দেখেই চিনতে পেরেছি সুধাদি'—বিলু বললে।

'মা কেমন আছে রে?'

তারপর আবশ্যক-অনাবশ্যক অনেক কথা। সুধা সেন যেন হঠাৎ খুব খুশি হয়ে উঠলো। সুধা সেনের দেশের ছেলে। অনেকদিন পরে দেখা হয়ে গেছে। আমি তো আকাশের চাঁদ হাতে পেলাম। এখন কোনো রকমে সুধা সেনকে ছেলেটির হাতে গছিয়ে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারি। সুধা সেনের সঙ্গে পরিচয় থাকার কলঙ্ক থেকে মুক্ত হতে পারি।

সুধা সেন বললে, 'তুই দাঁড়া বিলু, এখানে যদি ঘর না পাই, তাহলে তোর মামার বাড়িতেই উঠবো একটা রাত্তিরের জন্যে।'

যাক, এতক্ষণে যেন আশার একটা ক্ষীণতম সূত্র পাওয়া গেল। তারপর সুধা সেনকে নিয়ে বোর্ডিং-এর গলির ভেতর ঢুকলাম। গলির পেছন দিকে ছোট দরজা। সুধা সেনই সামনে এগিয়ে গেল।

'আপনাদের বোর্ডিং-এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টে-এর সঙ্গে দেখা করতে পারি?'

'তিনি তো এখন নেই। কি বলবেন আমাকে বলুন?'

বেশ বর্ষীয়সী মহিলা একজন। বিধবার বেশ। সরু চুলপাড় ধুতি পরনে। মাথায় একটু ঘোমটা। আমি এগিয়ে গেলাম। বুঝিয়ে বললাম সব। বললাম সুধা সেনের সত্যিকারের সবিস্তার দুর্দশার কাহিনী। আশ্রয় এখানে না পেলে আজ রাত্রে কোথায় কাটাতে হবে, তার কোনো ঠিকই নেই। সুধা সেনের কৃশ চেহারা দেখে মহিলাটির যেটুকু সন্দেহ ছিল, তাও যেন দূর হয়ে গেল। সুধা সেন বিধবা নয়—কুমারী, তবু মহিলাটির বোধহয় মনে হল—বিধবার চেয়েও সহায়হীন সে। যে সুধা সেনের কৃশ, রুগ্ন চেহারা আমার মনে বিতৃষ্ণার উদ্রেক করেছে, তাই-ই মহিলাটির মনে সহানুভূতির সৃষ্টি করতে পেরেছে যেন।

মহিলাটি বললেন, 'এখন তো আমাদের কোনো সীট খালি নেই, তবে কয়েকদিন পরেই খালি হবে…'

তারপর খানিক থেমে আবার বললেন, 'তবে নেহাত যদি কোথাও থাকবার জায়গা না থাকে, তাহলে আমার সঙ্গে একঘরে থাকতে দিতে পারি কয়েকদিনের জন্যে।'

একটা নিশ্চিন্ত আরামের নিশ্বাস ত্যাগ করলাম। মনে হল ঘাড় থেকে যেন একটা ভারি বোঝা নেমে গেল। সুধা সেনও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। বিছানা সঙ্গে আনেনি সুধা সেন। তা সে কাল সকালে আনলেই চলবে। স্যুটকেসটা ছাত্রের বাড়িতে পড়ে আছে, সেটাও কাল সকালে আনলেই চলবে। ইতিমধ্যে একটা মাদুর বা ছেঁড়া শতরঞ্জি কি আজকের রাতটার জন্যে কারোর কাছে ধার পাওয়া যাবে না? বালিশ সুধা সেনের দরকার হয় না। মাথার ওপর একটা ছাদ, চারিদিকে চারটে দেওয়াল, আর ছেঁড়া একটা মাদুর—এর বেশি কোনোদিন কিছু চায়নি সুধা সেন। সুধা সেনকে সেইখানে রেখে আমি আর সুধা সেনদের দেশের সেই ছেলেটি চলে এলাম। গলির বাইরে এসে একটা মুক্তির নিশ্বাস পড়লো। সারা দিনটার এমন অপব্যয় আর কখনও করিনি এর আগে। সুধা সেন আমার কাঁধ থেকে নামলো শেষ পর্যন্ত সেই-ই আমার সৌভাগ্য।

শুধু এইটুকু ঘটনা হলে এ গল্প লেখবার প্রয়োজন হত না। কিন্তু ঘটনাচক্রে যে বিপরীত চরিত্রের আর একটি মেয়েকে আর একদিন অন্য পটভূমিকায় দেখতে পাব, সে কথা কি আমিই জানতুম।

সুবোধ এসেছিল কলকাতায়। নতুন-দিল্লীর বড় কন্‌ট্রাক্‌টার সুবোধ রায় আবার বহুদিন পর কলকাতায় এল।

সুধা সেনকে ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে রাখবার মতো মেয়ে তো সুধা সেন নয়। বহুদিন পরে বৌদিকে জিগ্যেস করেছিলাম, 'তোমাদের সুধা সেনের খবর কি বৌদি?'

বৌদি বলেছিল, 'তোমায় তো বলেছি, সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ধানবাদে চলে গেছে, সেখানে পাঁচ টাকা মাইনে বেশি পাবে নাকি। আমরা অফিসের সব মেয়েরা অনেক করে বললাম, কিছুতেই থাকলো না। বললে,—এ মাইনেতে আর কুলোতে পারছি নে।'

সুধা সেনকে অনেক কষ্টে বাসা যোগাড় করে দিয়েছিলাম, ওইটুকুই শুধু মনে ছিল। কিন্তু পাঁচ টাকা বেশি মাইনের লোভে কলকাতার বাসা সে ত্যাগ করবে, তা আগে জানলে সেদিন অত কষ্ট স্বীকার করতাম বিনা সন্দেহ।

কিন্তু আমার বন্ধু সুবোধ রায়ের ও-সমস্যা নেই। বছরের মধ্যে বার দুই-তিন কলকাতায় আসতে হয় সুবোধ রায়কে এবং বরাবর কলকাতার নাম-করা হোটেলেই এসে ওঠে। সেখানে রুমের যত অভাবই হোক, সুবোধ রায়ের জন্যে সবচেয়ে ভালো ঘরটাই ব্যবস্থা করা হয়—তেতলার সবচেয়ে দামী দক্ষিণমুখো একটা ঘর। আলো হাওয়া প্রচুর। ঘরের দক্ষিণমুখো ব্যাল্‌কনি থেকে সামনের পার্কটা দেখা যায়; হু হু করে হাওয়া আসে দিন-রাত। দুটো ফ্যান। বাথরুম পাশেই। বাথরুমে গরম কলের জলের ব্যবস্থা। শাওয়ার বাথ্‌। মোজেয়িক করা মেঝে। দুটো চাকর অনবরত অ্যাটেন্ড করে। হোটেলের সর্বোত্তম সুখসুবিধা ওই ঘরটাতেই আছে। তার জন্যে

চার্জ যা করা হয়, কনট্রাক্টার সুবোধ রায়ের পক্ষে তা কিছুই না। ও-ঘরটার বিশেষ ঘরের জন্যে ও-টা এমনিতে সাধারণতঃ খালি পড়েই থাকে।

নিয়মমতো সিঁড়ি দিয়ে উঠে একেবারে তেতলায় চলে গেছি। ছুটির দিন দেখেই গেছি। কিন্তু নির্দিষ্ট ঘরটিতে এসে হঠাৎ বাধা পেতে হল।

'কাকে চাই, সাব্?'—একটা চাপরাসী উঠে দাঁড়াল।

'সুবোধ রায়? দিল্লী থেকে এসেছেন।'

'তিনি দোতলার কামরায় আছেন, ওখেনে খোঁজ করুন।' চাপরাসীটা বললে।

'এখানে তবে কে আছেন?' আবার প্রশ্ন করলাম।

'মেমসাহেব।'

মেমসাহেব! যেন বিতাড়িত, অপমানিত বোধ করলুম। মনে হল—সুবোধ রায়কে তার চির-অধিকৃত ঘর থেকে যেন গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া হয়েছে।

নিচে গিয়েই দেখা হল। বললাম, 'একি? কী হল? এ ঘরে?'

সুবোধ রায়ের মুখের চেহারা দেখে বুঝলাম সে-ও কম বিরক্ত হয়নি।

সুবোধ বললে, 'কে একটা খুব বড়লোক মেয়ে এসেছে—ওই ঘরেই আছে।'

'বাঙালী নাকি?' জিগ্যেস করলাম।

'হ্যাঁ, বাঙালীই তো শুনেছি। দু'হাতে পয়সা খরচ করছে। চাকর-বাকর, চাপরাসী, আয়া সকলকে বকশিশ দিয়ে এরই মধ্যে হাত করে ফেলেছে। ভালো ভালো ডিশ্ যা-কিছু সব অর্ডার দিচ্ছে। সকালে ব্রেকফাস্টে ডিম একদিন বাসী ছিল বলে কমপ্লেন করেছে। শুধু তাই নয়, ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার কোন কিছুতে একটুকু ত্রুটি ঘটলে নাকি অনর্থ ঘটাবে মেয়েটি। দু'চারজনের ইতিমধ্যে ফাইনও হয়ে গেছে। ম্যানেজার থেকে শুরু করে জমাদার পর্যন্ত সবাই সন্ত্রস্ত। এতটুকু ত্রুটি যাতে না ঘটে সেই দিকেই সকলের লক্ষ্য। গেটে দারোয়ান একদিন সেলাম করতে ভুলে গিয়েছিল বলে শাস্তিও নাকি হয়েছে তার। এখন হোটেলের মালিকের কানে যাতে না যায় সেই চেষ্টাই করছে ম্যানেজার। নইলে যে-সব ত্রুটি এ-পর্যন্ত ঘটে গেছে তা তার কানে গেলে ম্যানেজারের চাকরি নিয়ে টানাটানি পর্যন্ত হতে পারে।'

কেউ কেউ বলছে, 'কোনো এক দেশীয় রাজ্যের ছোটরানী লুকিয়ে এসে এখানে রয়েছে।'

সুবোধ বললে, 'মেয়েটাকে দেখিনি কখনও। বিয়ে হয়েছে কি হয়নি জানিনে—তবে খায় খুব—সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পাই সিঁড়ি দিয়ে ওয়েটাররা ডিশের পর ডিশ্ নিয়ে যাচ্ছে। ডিনারেও তিনটে কোর্স কুলোয় না।'

অনেকদিন আগেকার সুধা সেনকে মনে পড়লো। সুধা সেন খেত না। খাবার জায়গাও ছিল না বটে, তা ছাড়া পয়সাও ছিল না সুধা সেনের। তারপর সেই রেস্তোরাঁর কেবিনে ঢুকে গোগ্রাসে খাওয়া। সেদিন সুধা সেনের খাওয়া বড় বিশ্রী লেগেছিল মনে আছে।

দেখলাম হোটেলের চাকর-বাকররা যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বেশি গোলমাল না হয় কোথাও। ওপর থেকে নিচে পর্যন্ত সিঁড়ি ধোয়ামোছা—পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্‌ তক্‌তক্‌ করছে। কয়েকটা পাম, অর্কিড আর ফুলগাছের টব দিয়ে সাজিয়েছে সারা বাড়িটা। কে এসেছে যে তার জন্যে এত ব্যস্ততা, এত আয়োজন!

সুবোধ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে দু'চারদিন গিয়েছি, কিন্তু সেইদিনই প্রথম দেখা হয়ে গেল। দেখে অবাক্‌ হলাম। দারার কাটা মুণ্ড দেখে সাজাহানও এত বিস্মিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ!

সুধা সেন!

পেছনে পেছনে দুটো ওয়েটার চলেছে সুধা সেনের। সিঁড়ির আশেপাশে যারা ছিল তারা উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করতে ব্যস্ত।

এক নিমেষে নিজেকে আড়াল করে নিয়েছি। বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না আমার। সেই সুধা সেন! সেই কৃশ মেয়ে! উপোস করে না-খেয়ে-খেয়ে পয়সা বাঁচায়! সারা শহর খুঁজে বেড়ায় একটু আশ্রয়ের জন্যে। বড়দার বাড়িতে রাত বারোটার পর গিয়ে লুকিয়ে শুয়ে পড়ে, আর স্নান করতে যায় ছোড়দার মেসবাড়িতে। একবার মনে হল ভুল দেখছি না তো! সমস্ত যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে গোলমাল হয়ে গেল।

পরদিনই বৌদির বাড়িতে গেলাম।

এ-কথা সে-কথার পর বললাম, 'তোমার সেই সুধা সেনের খবর কি বৌদি?'

বৌদি বললে, 'হঠাৎ সুধা সেনের কথা জিগ্যেস করছো যে?'

বললাম, 'না, এমনি আজ ট্রামে সুধা সেনের মতো একটা মেয়েকে দেখলাম কিনা, সেবার বলেছিলে তো যে ধানবাদে গেছে সুধা সেন। পশ্চিমে গিয়ে মোটা-সোটা হল? খবর পেয়েছ কিছু?'

বৌদি খবর দিতে পারলে না। বুঝলাম সুধা সেন কাউকেই খবর দেয়নি কিছু।

দিন সাত-আট পরে একদিন সন্ধ্যেবেলা সেই হোটেলে ঢুকছি এমন সময়ে সামনেই দেখি সুধা সেন। কিন্তু আমি এড়িয়ে যাবার আগেই সুধা সেন আমায় দেখে ফেলেছে।

আমাকে দেখে সুধা সেন যেন আকাশ থেকে পড়লো। চারদিকে চাকর-বাকর চাপরাসীর ভিড়। সবাই বকশিশ পাবার জন্যে ব্যস্ত। সুধা সেনকে দেখে মনে হল যেন সে হোটেল ছেড়ে আজ চলে যাচ্ছে। স্যুটকেস বিছানা বাক্স সব সামনে নামিয়েছে। ট্যাক্সি হাজির।

সুধা সেন সকলকে বকশিশ দিয়ে একপাশে সরে এসে চুপি চুপি বললে, 'আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, ভালোই হল। আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা দরকার আছে।'

তারপর সুধা সেন মালপত্র ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে বললে, 'আসুন।'

সুধা সেন গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলো। আমিও পেছন পেছন গিয়ে উঠলাম। কে জানে কোথায় আবার যাবে সুধা সেন! বৌদির কথাটা মনে পড়লো। সুধা সেন সত্যিই কি ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলেছে, না, যুদ্ধের কল্যাণে কোনো অজ্ঞাত কারণে অনেক টাকা তার হাতে এসে পড়েছে, কে বলতে পারে!

ট্যাক্সি চলতে শুরু করতেই সুধা সেন আমার দিকে চেয়ে বললে, 'আমাকে আপনি বাঁচান।'

আমি বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চাইলাম। কিছু বুঝতে পারলাম না কী সে চাইছে।

সুধা সেন আবার বললে, 'একটা রাতের জন্যে আমার একটা থাকবার ব্যবস্থা করে দিন, আমি একেবারে নিরাশ্রয়।'

তবুও যেন কিছু বুঝতে পারছিলাম না। তবে এই ঐশ্বর্য, এই বকশিশ দেওয়ার বহর, এই হোটেলের সবচেয়ে সেরা ঘর নিয়ে থাকা, এই ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার···

সুধা সেন বললে, 'আপনাকে আমি সব খুলেই বলছি, আমায় বিশ্বাস করুন। আমার কাছে আর একটা টাকাও নাই। এতদিন না-খেয়ে-খেয়ে যা কিছু টাকা জমিয়েছিলাম, সব নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমি আবার আজ নিরাশ্রয়। এই ট্যাক্সি ভাড়া করেছি বটে, কিন্তু কোথায় যাব কিছুরই ঠিক নেই।'

আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়েছে। আমি প্রাণশূন্য দৃষ্টি দিয়ে সুধা সেনের দিকে চেয়ে রয়েছি। আমি কি আবার সুধা সেনের জন্যে আশ্রয় খুঁজতে চলেছি! আবার সেই হোস্টেল, মেস আর বোর্ডিং-এর দরজায় দরজায় বে-হিসেবী সুধা সেনের জন্যে ধর্না দিতে চলেছি! তারপর এই ট্যাক্সি-ভাড়া, তা-ও কি আবার আমাকেই দিতে হবে!

সুধা সেন তার কাঠির মত আঙুল দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরলে, 'আপনাকে একটা জায়গা খুঁজে দিতেই হবে আমার জন্যে। আপনি যে সেই বলেছিলেন আপনার কোন্ এক বন্ধু আছে—চলুন না এখন তার ওখানে—যদি থাকতে দেয়।'

সেদিন বলেছিলাম বটে। কিন্তু সুখেন্দুর বাড়ি তো এখানে নয়। বেলগাছিয়ার একেবারে শেষপ্রান্তে সে-বাড়ি। তা ছাড়া তার এক দিদির একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে আসবার কথা ছিল। যদি তারা এসে থাকে, তাহলে কি আর জায়গা পাওয়া যাবে সেখানে! রাগে দুঃখে ধিক্কারে আমার সমস্ত মন বিষিয়ে উঠলো।

সুধা সেনের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'আচ্ছা চলুন, দেখি—'

ট্যাক্সি চললো। হাওয়ার মতো উড়িয়ে চললো। সুধা সেনের চুলগুলো উড়ে পড়ছে তার কালো মুখের ওপর। কে জানে কোথায় এ-যাত্রার শেষ! শেষ পর্যন্ত আশ্রয় আজ মিলবে কিনা ঠিক কী। কলেজ স্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ

স্ট্রীট পেরিয়ে ডান দিকে চলল ট্যাক্সি। বেলগাছিয়ার পুল পেরিয়ে আরো ভেতরে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াল এক গলির সামনে।

গাড়ি থেকে নেমে বললাম, 'আপনি বসুন, আমি দেখে আসছি।'

অন্ধকার গলি। গলির শেষ প্রান্তে বাড়িটা। রাত তখন বেশি হয়নি। নির্দিষ্ট বাড়িটার সামনে আসতেই বাড়ির ভেতর থেকে ছোট ছেলেমেয়েদের কলরোল কানে এলো। এ বাড়িতে তো ছোট ছেলেমেয়েদের বালাই ছিল না। তবে কি সুখেন্দুর দিদি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে নাকি! ডাকবো কিনা ভাবছি। যদি সুধা সেনের উপকার হয়। কিন্তু মনটা আমার বিষিয়ে উঠলো। বে-হিসেবী সুধা সেনের পরিচয় তো আমি ভালো করেই পেয়েছি। বন্ধুকে আর ডাকলাম না। গলির এ প্রান্তে ট্যাক্সির কাছে আর ফিরেও এলাম না। এ প্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পড়লাম আর একটা সমান্তরাল বড় রাস্তায়। তারপর কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করে ওদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে উঠে পড়লাম ধর্মতলার ট্রামে। তারপর চলন্ত ট্রামের জনবহুল একটি কোণে নিজেকে আড়ালে রেখে নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে রইলাম। থাক্ সুধা সেন ট্যাক্সিতে বসে। ট্যাক্সির ভাড়া যদি না দিতে পারে তাতে আমার কি আসে যায়! সুধা সেন প্রতীক্ষমাণ ট্যাক্সিতে বসে মুহূর্তের পদধ্বনি শুনতে থাক্, আমি ততক্ষণ বাড়িতে পৌঁছে গিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নিবিড় ঘুমের মধ্যে গা গড়িয়ে দেব। আমার এত কিসের ভাবনা সুধা সেনের জন্যে!

কয়েক দিন পরে বৌদিকে সুধা সেনের কথা জিগ্যেস করতেই বৌদি বলল,—একদিন নাকি হঠাৎ রাত বারোটার সময় সুধা সেন ট্যাক্সি করে বৌদির বাড়িতে এসে হাজির। সে রাতটা বৌদির বাড়ির সিঁড়ির ঘরের ভিতর কাটিয়ে সকালবেলাই চলে গেছে আবার—কোথায় চলে গেছে বলে যায়নি। সুধা সেনের চাকরিও চলে গেছে অফিস থেকে।

সুধা সেন! ভাবলেই সুধা সেনের চেহারাটার কথা মনে পড়ে। সেই কৃশ স্বাস্থ্যহীন চেহারা, নিষ্প্রভ দৃষ্টি, হয়তো কলকাতা শহরের জনতার ভিড়ে মিশে গেছে আবার। নয়তো ফিরে চলে গেছে দেশে—মা'র নিশ্চিন্ত নির্ভর আশ্রয়ের নীড়ে। শহরের অশান্ত প্রতিযোগিতার ক্লান্তি থেকে অনেক দূরে—যেখানে অবারিত মাঠ, দিগন্ত-বিসারী আকাশ, আর স্নেহকোমল ছায়া-নিবিড় নীড়। চারটে দেয়াল আর একটা ছাদের আবরণে সেখানে শরীর কৃশ আর আয়ু ক্ষীণ হয়ে আসে না। সুধা সেন সত্যি সত্যি আবার সেইখানেই ফিরে গেছে কিনা কে বলতে পারে!

আমার জীবনে সুধা সেন তারপর চিরকালের মত হারিয়েই গিয়েছিল মনে করেছিলাম। মনে করেছিলাম ও-পরিচ্ছেদের বুঝি ওখানেই পূর্ণচ্ছেদ হয়েছিল।

গল্পটা সোনাদিকে বলেছিলাম। সোনাদি বললে, 'সুধা সেনকে নিয়ে উপন্যাস

হবে না তোর, ও তো এক চোখে দেখা, আর একটা দিকও আছে সুধা সেনের, সেটা তুই দেখতে পাসনি—'

কিন্তু হারিয়ে সেদিন যায়নি সুধা সেন। মনে আছে তার কত বছর পরে সুধা সেন হঠাৎ একটা চিঠি দিয়েছিল। লিখেছিল, 'আসছে সতেরোই ফাল্গুনে আমার বিয়ে, আপনার কিন্তু আসা চাই-ই—'

চিঠিটা পড়ে কিছুকালের জন্যে আমি যেন হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। এর চেয়ে আমাকে ধরে চাবুক মারলেও যেন আমি এত স্তম্ভিত হতাম না। এমন করে আমার জীবনে আর কোনও মেয়ে আমাকে এমন অপমান করেনি, এইটুকুই শুধু আজ মনে আছে।

মনে আছে তারপরে একটা গল্প সোনাদিকে না-শুনিয়ে একেবারে লিখে ফেলেছিলাম। আমার বাড়ির পাশের অলকা পাল। অলকা পালকে দেখতাম কেবল টিউশানি করতে আর স্কুলের চাকরি করতে। দেখে মায়া হত আমার। মনে হত অলকা পালের জীবনে কোনোদিন কোনো আগন্তুক ভুল করেও বুঝি আসতে পারে না। নেহাত সুধা সেন-এর মতোই বুঝি সে সংসারে একেবারে নিরর্থক। কিন্তু সেই অলকা পালের বাসার সামনেও দেখেছিলাম একদিন একটা মস্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আর ভেতরে বসে আছে আমার দাদার বয়সী একটা ছেলে। কেমন যেন অবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বোধহয় দু'দিনই দেখেছিলাম গাড়িটা। তারপর আর কোনোদিন কোনো রহস্য আমার মনে জাগেনি অলকা পালকে নিয়ে। সুধা সেন-এর জীবনে যৌবন এসেছিল কিনা কে জানে। অন্তত আমার চোখে তা কোনোদিন ধরা পড়েনি। কিন্তু অলকা পালের জীবনে হয়তো এসেছিল। এবং তা-ও বুঝি কেবল এক মুহূর্তের জন্যে! তাই-ই বা ক'জনের আসে। গল্পটা যেমন লিখেছিলাম তেমনিই বলে যাই—

রোজ রাত্রে যে শব্দটায় অলকার ঘুম ভেঙে যায়—সেই শব্দটা সেদিনও শুরু হল। অলকা বিছানা ছেড়ে উঠলো। ঘুম যদি তার আবার আসে তবে সে তার সৌভাগ্যই বলতে হবে। এ পাড়ায় এ-বাড়িটা নতুন ভাড়া নেওয়া হয়েছে। চারপাশের অধিবাসীদের সঙ্গে এখনও ভালো করে পরিচয় হয়নি। অপরিচয়ের আবরণ ঠেলে তারা কেউ আত্মপ্রকাশ করেনি আজো। কিন্তু ছাদে উঠলে দেখা যায় পাশের বাড়ির একতলার রোয়াকে বসে বউরা সংসারের কাজে ব্যস্ত—অলকাকে দেখে তারা ঘোমটা বড় করে টেনে দেয়। স্বাধীন মেয়েদের ওরা পুরুষেরই সামিল বলে ধরে নেয় বোধহয়।

শীতের রাত। খুব বেশি শীত নয়, তবু গায়ে চাদর ঢাকা দিতে হয়। জানলাটা খোলা ছিল। খোলা জানলার ওপাশে রাস্তার পারের চিলে-কোঠা, তার ওপর আকাশ—ফিকে নীল। কতদিন রাত জেগে অলকা নীল ভোর দেখেছে। কিন্তু শব্দটা কিসের। অলকা জানলার কাছে এল।

পাশের বাড়িতে আওয়াজটা হচ্ছে মনে হল। স্টোভের আওয়াজ; এত রাত্রে স্টোভ জ্বাললে কে? কারোর অসুখ?

'অলক!'

অলকা চমকে উঠেছে। নিঃশব্দে প্রীতি জেগেছে। অলকা বললে, 'ঘুম ভেঙ্গে গেল তোর?'

'কাল কখন এলি?'

কাল রাত্রে অলকার ফিরতে অনেক দেরি হয়েছিল। সেই টালিগঞ্জ···ছাড়তে কি চায়! ক্লাস ফাইভের মেয়ে—লেখাপড়ায় অত ঝোঁক কে জানে। তারপর পড়িয়ে আসার পর ক্লান্তিতে অবসন্ন দেহ নিয়ে যখন অলকা ফিরে এসেছিল, তখন এখানকার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বিছানার পাশে মেঝেতে খাবার ঢাকা ছিল। শীতকালে ঠাণ্ডা ভাত খেতে অলকার কষ্টই হয় একটু। মা দেশ থেকে চিঠি লিখেছিল স্বাস্থ্যের ওপর নজর রাখতে। অলকা আবার হাসলে—স্বাস্থ্য দিয়ে তার কী হবে! যে-স্বাস্থ্য নিজেরই কোনো কাজে লাগলো না, তা দিয়ে কী কাজ হবে তার!

আস্তে আস্তে ভোর হচ্ছে। নীল ভোর। আজ কুয়াশা কম। অলকা গায়ের ওপর একটা আলোয়ান চাপিয়ে দিলে। এখনি আরম্ভ হবে দিনের কাজ। ছুটতে হবে পড়াতে। পড়িয়ে এসে স্কুলে যেতে হবে। স্কুল সেই অনেক দূরে—হাঁটতে হাঁটতে প্রাণান্ত। প্রাণান্তকর পরিশ্রম না করলে কি চলে! মা দেশ থেকে চিঠি লিখেছিল স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখতে। অলকা আবার হাসলে। তার আবার স্বাস্থ্য!

প্রীতি বললে, 'কাল তোকে কে খুঁজতে এসেছিল, জানিস অলক?'

'কে রে?'

অলকার বিস্ময়ের আর সীমা নেই। পরিচিত আর স্বল্প পরিচিতের ভিড় ঠেলে অলকার দৃষ্টি অনেকদূরে প্রসারিত হল—কে কাকে ডাকতে এসেছিল।

প্রীতি বললে, 'তোর নাম করলে আবার—'

অলকা অবাক্ হল—এ-বাড়ির ঠিকানা তো কেউ এখনো জানে না। 'কী রকম চেহারা রে!'

'চেহারা কি আমি দেখেছি? অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। আজ সকালে আবার আসবে বলেছে। রাস্তায় গাড়ি দাঁড়িয়েছিল—বিরাট একটা মোটর, মোটরে সে একলা শুধু—'

অলকা বিস্ময়ে আরো অবাক্। তার কাছে কে আসবে গাড়ি চালিয়ে! জানাশোনার মধ্যে কারই বা গাড়ি আছে। আবার বিরাট গাড়ি। চেহারাটা কেমন জানতে পারলে ভালো হত। যার গাড়ি আছে—তার চেহারা ভালো হওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু—কে সে! অলকা কৌতূহলে আচ্ছন্ন হয়ে রইল। আজই আসবে, আজ সকালেই, সকাল হতে আর কতই বা দেরি। তার ঠিকানাই বা জানে কে? সুব্রত চৌধুরী নয় তো; সে কেন হতে যাবে!

গাড়ি সে পাবে কোথায়! মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী সে—লটারীতে টাকা পেয়ে ছাড়া গাড়ি কেনা তার পক্ষে অসাধ্য। সুব্রতর বাড়িতে পোষ্য অনেক —তাকে বিয়ে করলে অলকার অশান্তির অন্ত থাকবে না।

প্রীতি বললে, 'কে রে, অলক?'

অলকা বললে, 'নাম বললে না তোকে?'

'নাম কি জিগ্যেস করা যায়?'

পৃথিবীর কক্ষাবর্তনের মতো অলকার মন গতি-মুখর হয়ে উঠলো। অনেক দিন আগে বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে একজনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বটে। শুধু পরিচয়। তার বেশি কিছু নয়। শেষ গন্তব্য স্থানে আসবার আগেই বাসের কণ্ডাক্টার নেমে গিয়েছিল। তখনও টিকিট কাটা হয়নি। কাকে টিকিটের পয়সা দিতে হবে, ভেবে পেলে না। মাত্র তারা দুজনই ছিল বাসের আরোহী। ছেলেটি বলেছিল, 'পয়সা দেব কাকে বলুন তো!'

অলকা বলেছিল, 'আমিও তো তাই ভাবছি—'

কিন্তু বাসের ড্রাইভার এসে পয়সা নেওয়াতে শেষে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। তারপর বাস থেকে নেমে পরস্পরের পরিচয় আদান-প্রদান। অলকা ঠিকানা দিয়েছিল কিনা মনে নেই। কিংবা যদি দিয়েই থাকে তো এ-বাড়ির ঠিকানা সে জানবে কেমন করে! চেহারা দেখে মনে হয়েছিল সেদিন, অবস্থা তার ভালোই—কিন্তু ঠিকানা খোঁজ করে সে কি আসতে যাবে এখানে?

চারদিকে সাদা আবহাওয়া। অলকা আলোয়ানটা গায়ে নিবিড় করে জড়ালে। প্রীতি এখনও ঘুমের ঝোঁকে বিছানা জড়িয়ে পড়ে আছে। স্কুলের শিক্ষয়িত্রী সে-ও। দুজনে একসঙ্গে ভাড়া নিয়েছে এ বাড়িটা। এদের জীবনের কোন স্তরে কোনও বসন্তের পদক্ষেপ কোনোদিন পড়েনি। রুটিনের বাঁধা-ছকে তাদের দুজনের গতি আবদ্ধ। অবসরের আমেজ এদের জীবনে অস্তমিত। তবু অলকা আবার হাসলে। দেশ থেকে তার মা চিঠি লিখেছে —স্বাস্থ্যের ওপর যেন সে নজর রাখে। স্বাস্থ্য নিয়ে সে কি করবে! তার স্বাস্থ্য নিজের উপকারেই যদি না আসে—কার উপকারে আসবে?

ঝি এখনও ওঠেনি। এখনও ভাল করে সকাল হয়নি। চা খেলে হত।

দূর হোক ছাই—কে আসবে কে জানে! প্রীতি আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। অলকা ছাদে উঠে এল। বেশ সকাল হয়েছে। নীল ভোর নয়—এখন প্রাত্যহিক কাজকর্ম শুরু হয়েছে। পাশের বাড়ির কলতলায় বাসন-মাজার শব্দ। দূর থেকে স্টীমারের হুইশ্‌ল কানে এল। এধার থেকে ওধার পর্যন্ত পায়চারি করতে অলকার বেশ লাগছে। ছাদের চারপাশে বুক পর্যন্ত উঁচু প্যারাপেট,—আচ্ছা, অলকা যদি ছাদ থেকে এখন পড়ে যায়। অবশ্য পড়ে যাবে না। কিন্তু কল্পনা করতে দোষ কী। ধরো সে পড়ে গেল। পড়ে যাওয়া মানে তো মৃত্যু! অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর পর তার জন্যে কেউ কাঁদছে, কিংবা তার মৃত্যুতে কেউ শোকাচ্ছন্ন হয়ে সত্যিকারের বিরহের কবিতা

লিখলে—এ-কথা ভাবতে বেশ লাগে। সুব্রত চৌধুরীকে বিয়ে করতে অবশ্য অলকার আপত্তি, কিন্তু অলকার মৃত্যুতে সে চিরকুমার হয়ে জীবন কাটিয়ে দিলে—এ কল্পনাতেও যেন আনন্দ! সুব্রতর কথা মনে পড়তেই মনে পড়লো আর একটা কথা। সুব্রত একদিন বলেছিল, 'আমার টাকা নেই, তাই প্রমাণ দিতে পারিনে তোমায় কত ভালবাসি—'

সুব্রতর কথাগুলো ভালো। কিন্তু কেন তার টাকা নেই? সুব্রতর টাকা নেই—সে কি অলকার দোষ! সারাজীবন তার দেশের সংসার প্রতিপালন করে এসেছে অলকা—এখন বেশ এমন একজন ছেলে আসে: প্রচুর অর্থ, অদম্য স্বাস্থ্য, অখণ্ড আরামের আর অপরিমিত প্রেমের প্রাচুর্য—যার সঙ্গে সে নিশ্চিন্তে দিন কাটিয়ে দেবে! এ-জীবনে কোনও বৈচিত্র্য নেই—আছে কেবল কল্লোল-ফেনিল সমুদ্রস্বাদের তিক্ততা। তা বলে সেই ভেবে অলকা কাঁদতে বসবে নাকি—কাঁদাটা কিন্তু ন্যাকামি। সে কি অত দুর্বল। নাই বা এল প্রেম, নাই বা এল শান্তি, নাই বা এল স্বাস্থ্য—রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা? কেউ যদি না আসে, একলা যেতে হবে। একলাই যেতে হবে তাকে। তা বলে সুব্রতকে বিয়ে করে জীবনটা ব্যর্থ করে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়।

মাঝে মাঝে ছুটির দিনে ও-বাড়ির বউ ছাদে ওঠে। তারই মুখে শোনা: এ-বাড়িতে নাকি আগেও মেয়েদের একটা মেস ছিল। তাদের এক-একজনের এক-এক রকম নাম।

বউটি বলে,—'একজন আবার নাচত ভাই, জানেন, জানলা দিয়ে কদ্দিন উঁকি মেরে দেখছি, কিন্তু ভাই, এতটুকু দেমাক ছিল না তাদের। কতদিন রান্না তরকারি পাঠিয়ে দিয়েছি, বেশ ছিল তারা—তারপর—'

বউটি খুব গল্প করতে পারে। গল্প বেশিক্ষণ জমে না। গল্প করলে কি অলকার চলে! অলকার তিন-তিনটে টিউশানি, তারপর আবার দুপুরবেলা স্কুল। দেশে মা, দুটি নাবালক ভাই, ছোট একটা বোন। তাদের ভরণ-পোষণ তাকেই তো করতে হয়। মাসের প্রথম দিকে তারা টাকার আশায় পিয়নের পথ চেয়ে বসে থাকে। এমনি তো দেখতে বেশ, রিক্‌শা করে স্কুলে যায়—কারোর সাতেও নেই পাঁচেও নেই। কিন্তু দু'পকেটের মধ্যে যার সংসার, পেছন বলতে কিছু নেই, তার বাঁচা-মরা দুই-ই তো সমান। অলকা পায়চারি করতে করতে ভাবলে—জীবনে তার পরম বন্ধুও কেউ নেই, পরম শত্রুও কেউ নেই। অলকার ইচ্ছে হয় প্রাণভরে কাউকে ভালোবাসে। কারোর জন্যে সে জীবনপাত করে। সুব্রত চৌধুরীর কথা মনে পড়লো। সুব্রত একবার চিঠিতে লিখেছিল: যে দিন আমাকেও ভুলে যাবে, সেদিন শুধু মনে রেখ আমার এই কথাটা—ভালোবাসা জীবনে এক নিদারুণ অভিশাপ! তুমি যদি সুব্রত হতে আর আমি হতেম অলকা—তা হলে বুঝতে কথাটা কত বড় সত্যি!

সুব্রত সত্যি কথা ছাড়া বলে না। অলকা ভাবলে—তত্ত্বকথা সবাই জানে, সবাই বলে, তার কোনও মূল্য নেই। অলকা তো উপবাস করতে

পৃথিবীতে আসেনি। তুমি কিছু দেবে, আমি কিছু নেব—তবেই না প্রেম! অলকা হেসে উঠলো। প্রেম কথাটা ভাবলেই হাসি আসে যেন অলকার। ভারি তো জীবন—এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়। কোথা দিয়ে এই কুড়িটা বছর কেটে গেল। যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তারা থাকেনি কেউ। ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদ্‌ সব। কিন্তু সুব্রত তাকে যে কী চোখে দেখেছে কে জানে। তার মুখের ওপর অলকা রূঢ় কথা কিছু বলে না সত্যি—কিন্তু সুব্রত তো বোকা নয়, বোঝে সব। তবু অলকাকে ভুলে যাবার ক্ষমতাও তার নেই। হাজার বার সে আঘাত পাবে, তবুও আঘাত করবে না একবারও। সত্যি, সুব্রতর মেয়ে হওয়াই উচিত ছিল যেন।

একটা কথা ভেবেই অলকা হেসে উঠলো—দূর, তা কখনও হয়।

অনেকদিন আগের সেই সতীজীবনকে তার মনে পড়লো। ইউনিভার্সিটিতে পড়তো। রোজ ক্লাসের ছুটির সময় এসে দাঁড়ালো কলেজের সামনে। বড়লোকের ছেলে—এক সঙ্গে গল্প করতে করতে আসতো তার হোস্টেল পর্যন্ত। মাত্র মাস দুই-এর পরিচয়। সে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হবার সুযোগ হয়নি। একদিন হঠাৎ আর সে আসেনি। শুনেছিল বিলেত চলে গেছে—। কিন্তু এতদিন পরে সতীজীবন কি তার খোঁজ করতে এসেছিল। একখানা কেন, সে অবশ্য দশখানা মোটর কিনতে পারে। কিন্তু সেই যদি এসে থাকে আজ!

যেমন অনেকেই বলেছে, সতীজীবন তেমনি ধরনের কথাই বলতো তাকে। পুরাতন বাঁধা-ধরা সব কথা। বড়লোকদের মুখ থেকে যে-সব কথা শুনলে আনন্দ হয়—রোমাঞ্চ হয়। অলকা তার চেহারাটা একবার মনে করবার চেষ্টা করলে। কতদূর পর্যন্ত তারা এগিয়েছিল তাও আজ মনে নেই। সামান্য একজন কলেজের মেয়ে সে তখন, আর কলেজে-পড়া বড়লোকের ছেলে সে। সে-তো প্রায় চার-পাঁচ বছর আগেকার কথা। এতদিন পরেও তাকে মনে রেখেছে নাকি সে! দূর—তাও কখনো হয়!

'দিদিমণি!'

অলকা পিছনে ফিরলো। ফিরেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।—কেউ এসেছে নাকি।

'কেউ এসেছে?'

'চা চড়িয়েছি, ডাকতে এলুম, হাতমুখ ধুয়ে নাও—'

তবু যা হোক কেউ আসেনি। মঙ্গলা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল বইকি।

মঙ্গলা বললে, 'কাল একজন বাবু তোমায় খুঁজতে এসেছিল—দু'বার। আমি বললাম, রাত্তিরে তো দিদিমণি থাকে না, পড়াতে যায়—'

অলকা উদ্‌গ্রীব হয়ে বললে, 'আমার নাম বললে নাকি রে?'

মঙ্গলা বললে, 'তোমার নাম করেই তো বললে। আজ সকালেই আবার আসবেন বলে গেছেন।'

অলকার বিস্ময়ের সীমা নেই। বললে, 'কি রকম চেহারা দেখলি—ফরসা, লম্বা, আর কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, না?'

অলকার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল যেন। মঙ্গলা বললে 'গাড়ি দাঁড়িয়েছিল রাস্তায়—মস্ত গাড়ি, সাহেবের পোশাক পরা—কোথায় আর বসতে বলি, তাই সকালে আসতে বললাম।'

অলকা বললে, 'ভালোই করেছিস।'

ভালো করেছে কি মন্দ করেছে তা কে জানে। কিন্তু অলকার মনে হল—এ কেমন করে হয়! সতীজীবন ঠিকানা কেমন করে সংগ্রহ করলে এ-বাড়ির! পাঁচ বছর—পাঁচ বছরের দীর্ঘ ব্যবচ্ছেদে মানুষের এত কথা মনে থাকে! আশেপাশের বাড়িগুলো কলমুখর হয়ে উঠলো। পৃথিবীতে ব্যস্ততা নেমেছে।

মঙ্গলা বললে, 'তুমি এসো দিদিমণি, আমি চায়ের কেট্‌লি নামাইগে—'

হঠাৎ কী যেন হল, অলকা সেই প্রাতঃসূর্যের দিকে চেয়ে—যা কখনও করেনি—লজ্জায়, আনন্দে, বিস্ময়ে, প্রত্যাশায় কাকে জানি না উদ্দেশ্য করে বললে, 'শান্তি দেওয়ার কথা তোমার নয়, আনন্দ দেওয়ার কথা তোমার নয়, তবু এই মুহূর্তের প্রশান্তিকে উপলক্ষ্য করে আমি তোমায় আমার প্রণাম জানাই।' তারপর নিজের ছেলেমানুষিতে অলকা নিজেই যেন লজ্জিত হয়ে উঠলো। ভাগ্যিস কেউ দেখেনি। বাজে কথা—সব বাজে কথা! সবচেয়ে তাকে প্রথম ভাবতে হবে—কেমন করে তার আরো বেশি টাকা রোজগার হয়। তিনটে টিউশানি থেকে তার উপায় হয় পঁয়তাল্লিশ টাকা, আর স্কুলের ষাট টাকা। একশো পাঁচকে বাড়িয়ে একশো দশ করতে হবে—দশ থেকে বিশ, বিশ থেকে ত্রিশ—ত্রিশের অঙ্ক তারপর ধীর গতিতে বাড়তে থাকে। কিন্তু সে এত ভাবে কেন! কাউকে যদি সমস্ত মনের কথা বলা যেত! সমস্ত—সমস্ত! এখন এই সকালবেলা টেলিফোনেও কাউকে সব বলা যেত যদি! বন্ধু তার কেউ নেই! এখনি প্রীতি ছুটবে টিউশানিতে। দেখা হবে খাবার সময়। কথা বলবারও সময় নেই তার।

নিচে থেকে মঙ্গলা ডাকলে, 'দিদিমণি!'

অলকা শঙ্কিত হয়ে উঠলো, এসেছে নাকি?

মঙ্গলা বললে, 'চা যে ঠান্ডা হয়ে গেল এদিকে—'

তবু যা হোক—অলকা খানিকটা স্বস্তি পেল। আসেনি এখনও। কিন্তু এই সকাল হয়েছে! এখনি যে-কোনো সময়ে হাজির হতে পারে। অলকা দ্রুত পায়ে নিচে নেমে এল।

ছোড়দিমণি চলে গেছে। দৈনন্দিন কার্যতালিকার ঘূর্ণাবর্তে তার মতোই প্রীতির চলাফেরা আবদ্ধ।

আজ সকালে অলকা পড়াতে যাবে না। কাল যে দু'বার এসে তাকে খুঁজে ফিরে গেছে—আজ তাকে আর ফিরতে না হয়। হয়তো তাতে অলকারই লাভ।

বিছানা দুটো পরিষ্কার করে অলকা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখলে। দেওয়ালের আলনায় শাড়ি আর সেমিজের ভিড়, সেগুলোও গোছাতে হল। অপরিষ্কার

আর অপরিচ্ছন্নতার পাহাড় হয়েছিল। যদি এই ঘরেই তাকে আনতে হয়! অলকা নিজের হাতেই ঝাঁটা ধরলো। পালিশ-ওঠা টেব্‌লটার ওপর চায়ের দাগ। হঠাৎ ঘরের আর আসবাবপত্রের অপরিচ্ছন্নতা যেন অলকার চোখ নতুন করে নির্লজ্জ হয়ে উঠলো। আগে তো অমন মনে হয়নি কোনোদিন। মোটরে করে যারা আসে তাদের পরিচ্ছন্নতা-বোধ সম্বন্ধে আতিশয্য থাকাই স্বাভাবিক। মা'র দেওয়া ঘিয়ের ময়লা জারটা পাশের ভাঁড়ার ঘরে লুকিয়ে ফেলতে হল। তারপর দেওয়ালের যতগুলো পেরেক আর দড়ি সব নিজের হাতে খুলতে হল। আগাগোড়া ঘরখানায় পারিপাট্যের ত্রুটি কোথাও না থাকে। পাঁচ বছর পর বিলেতের শিক্ষা নিয়ে ফিরে এসেছে! সতীজীবনের আকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে অলকা তার সৌন্দর্য-বোধ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে নিলে। অর্থাৎ সব কিছু নিয়ে এই ঘরে সতীজীবনকে তার পাশে মানায় কিনা তাই ভেবে অলকা ব্যস্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু সকাল তো অনেকক্ষণ হয়েছে—অনেকক্ষণ!

একটা রোমাঞ্চকর পরিস্থিতিতে নিজেকে বসিয়ে ভাবতে বেশ লাগে। নিতান্ত নিরিবিলি ঘর—এখন বাইরের কেউ আসছে না। প্রীতি ঘন্টা দু'য়েক পরে আসবে। বেশি ভাবতে অলকার লজ্জা হল। নিজের শাড়িটাও অলকা বদলে নিল এক ফাঁকে।

আচ্ছা, যদি এমন হয়—এমন যদি হয়ে ··কিন্তু পরমুহূর্তেই অলকার সমস্ত গোলমাল হয়ে গেল। মোটরের আওয়াজ যেন কানে এসেছে হঠাৎ?

অলকার মনে হল যেন সুনিয়ন্ত্রিত মৃত্যু তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। এ যেন সুব্রত চৌধুরীর অলকা নয়, স্কুলের মেয়েদের অঙ্ক-দিদিমণি নয়—নিতান্ত সাধারণ-অসাধারণত্বের গণ্ডির বাইরে ত্রস্তা ভয়-সচকিতা অলকা একান্তভাবে···

আর ভাবা গেল না।

মঙ্গলা ডাকলে, 'দিদিমণি—'

মঙ্গলার ডাক শুনে অলকা নিচে নেমে এল।

'—এই যে অলকা দিদিমণি—' মঙ্গলা এগিয়ে এল।

ভদ্রলোকও এগিয়ে এলেন—

'আপনি?···'

ভদ্রলোকের কণ্ঠে বিস্ময় ও লজ্জা। বললেন, 'আমি অলকাদেবীকে খুঁজছিলাম—'

অলকা বললে, 'আমার নামই অলকা—'

ভদ্রলোক বললেন, 'মাপ করবেন, এটা কি বারোর সি? আপনারা কি এ-বাড়িতে নতুন এসেছেন?'

অলকা বললে, 'হ্যাঁ'—

ভদ্রলোক বললেন, 'এখানে আগে যারা ছিল তাদের ঠিকানা বলতে পারেন?'

তারপর হঠাৎ একটা ছোট নমস্কার করে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

অলকার মনে হল—মৃত্তিকা যেন সেই মুহূর্তে দ্বিধা হল, আর অলকা অকুণ্ঠিত চিত্তে তার মধ্যে প্রবেশ করলো। অলকা স্পষ্ট দেখতে পেলে তার মাইনে সত্তর থেকে আশি, আশি থেকে নব্বুই, নব্বুই থেকে একশো—তারপর একশো'র অঙ্ক ধীরগতিতে বাড়ছে...তারপর একদিন অলকাকে আরো বড় বাড়ি ভাড়া নিতে হবে, আরো ভালো শাড়ি, আরো গয়না। মাকে আনতে হবে। এখানে এই শহরের একটা নিরিবিলি পাড়ায় আরো ঐশ্বর্যবান হয়ে দিন কাটাতে হবে। আর কিছু নয়, আর কিছু নয়, শুধু এইটুকু মাত্র। এর বেশি চাওয়া তার পক্ষে যেন অন্যায়, যেন অনধিকারচর্চা।

একটি মুহূর্ত! কেবল একটি মুহূর্তের জন্যে অলকা পালের জীবনে যৌবন এসেও অপমানিত হয়ে ফিরে গেল সেদিন।

গল্পটা কী জানি কেন সোনাদিকে দেখাইনি। দেখাতে লজ্জা হয়েছিল বুঝি! কিংবা হয়তো তখন সোনাদির অসুখ বেড়ে উঠেছিল। সোনাদির ছিল অদ্ভুত অসুখ। খাওয়া-দাওয়া সবই ছিল স্বাভাবিক মানুষের মতো। সবই খায়. সবই করে, কিন্তু সারাদিন শুধু শুয়েই থাকে। শুয়ে শুয়ে শুধু বই পড়ে কিংবা জানালা দিয়ে চোখ মেলে থাকে আকাশের দিকে। কিংবা আমার সঙ্গে গল্প করে, কিংবা চিঠি লেখে। আমার এই যে বই লেখার নেশা, এর পেছনেও ছিল সোনাদির আগ্রহ। সেদিন যে মানুষটা উৎসাহ দিয়ে, শিক্ষা দিয়ে, ভালো মন্দ বুঝিয়ে দিয়ে আজকের আমিকে চিনিয়ে দিয়েছিল, সে তো আমার সোনাদি। কবে একদিন একটি নিঃসঙ্গ ছেলে নিজেকে প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজেছিল পৃথিবীর বিচিত্র মানুষের মধ্যে দিয়ে, সে নিজেও বুঝি তা এতদিন জানতো না। নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্যেই মাঝে মাঝে গল্প লেখার চেষ্টা করতো। মুখ-চোরা সেই ছেলেটি অবাক হয়ে ভাবতো যেন সে বড় অনাবশ্যক এখানে! ভয় হত—মানুষের প্রতিযোগিতার ভিড়ে সে বুঝি হারিয়ে যাবে একদিন! কেউ তার কথা ভাববেও না, বুঝবেও না, মনেও রাখবে না। বেদনার বুঝি শেষ ছিল না তার তাই। তাই রাস্তার একপাশে সকলের ভিড় বাঁচিয়ে সে চলেছে। সকলের চোখ এড়িয়ে সে বেঁচেছে! পরীক্ষার বই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে রাস্তার লোক চলাচলের দিকে চেয়ে সে অন্যমনস্ক হয়ে গেছে বার বার। মাস্টারের সহানুভূতি সে পায়নি। বাপ-মায়ের অনাদৃত অপোগণ্ড সেই সন্তান। ইস্কুলের আর পাড়ার ছেলেদের বিদ্রূপের পাত্র হয়ে দিন কাটিয়েছে সে একলা। এমনি সময় একদিন সোনাদির সঙ্গে দেখা।

সেদিন সোনাদিকে পেয়ে যেন সত্যিই বেঁচে গেলাম আমি!

কিন্তু দিদি সম্পর্ক তো পাতানো। কবে একদিন সোনাদির বংশের কেউ আমাদের দেশে বুঝি থাকতেন। সেও তিন পুরুষ আগের কথা। সোনাদির বংশের কে বুঝি একদিন ছিটকে বেরিয়ে পড়েছিলেন গ্রাম থেকে। তারপর যশ, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি কিছুরই অভাব হয়নি সেখানে। বাংলাদেশ

থেকে দূরে পরিবারের শাখা-প্রশাখা বেড়েছে। আত্মীয়-স্বজন সকলের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ করে দিয়েছেন। সোনাদি সেই বংশের মেয়ে। তারও বিয়ে হয়েছিল একদিন জব্বলপুরে। স্বামী নিয়ে সুখে ঘর করতে পারতো সোনাদি। কিন্তু তা হয়নি। কেন হয়নি সে-কথা এখন থাক।

সোনাদিকে দেখে আমার কিন্তু আর একজনের কথা মনে পড়তো প্রায়ই। সে আমার মিষ্টিদিদি। মিষ্টিদিদিও সোনাদির মতো শুয়ে থাকতো সারাদিন। কিন্তু মিষ্টিদিদির অসুখটা ছিল একটা প্রকাণ্ড রহস্য। শুধু আমার কাছেই যে রহস্য তা নয়, সকলের কাছেই।

সেই মিষ্টিদিদির কথা এবার বলি—

মিষ্টিদিদি আমার আপন দিদিও নয়, দূরসম্পর্কের দিদিও নয়।

তবু মিষ্টিদিদি ছিল বুঝি আমার আপন দিদির চেয়েও বড়। বলতো, যে-কটা দিন বেঁচে আছি, তুই আমার কাছে থাক্, জানিস।'

মিষ্টিদিদি সময় পেলেই চুপচাপ শুয়ে থাকতো। পাতলা হালকা শরীর, ধবধবে রং। ফিন্‌ফিনে সিল্কের শাড়ি গায়ের ওপর থেকে খসে খসে পড়তো। ইজি-চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে স্প্রিং-এর খাটে শুতো একবার, তারপর হয়ত তখনি আবার উঠে গিয়ে বসতো বাগানের দোলনায়। তারপরেই হয়ত খেয়াল হল—তখুনি গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল গঙ্গার ধারে।

জামাইবাবু আমাকে দেখিয়ে বলতো, 'ওকে সঙ্গে নিয়ো মিষ্টি—কোথাও যদি হঠাৎ টলে পড়ে যাও, তখন—'

মিষ্টিদিদিও মাঝে মাঝে বলতো, 'তোদের সবাইকে খুব কষ্ট দিচ্ছি রে আমি—'

আমি বলতাম, 'বাঃ, কষ্ট কিসের!'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'না, তোর জামাইবাবুর দেখ্ তো, কখনও কোনো অসুখ হতে দেখিনি। আমার জন্যেই তো কোথাও যেতে পারে না, আমার জন্যেই তো এত চাকর-বাকর রাখা। শঙ্করকেও দূরে পাঠাতে হল তো শুধু আমার শরীরের জন্যেই।'

মিষ্টিদিদির ঝি অবশ্য থাকতো সঙ্গে। মিষ্টিদিদির সঙ্গে দিনরাত পালা করে একটা-না-একটা ঝি থাকেই। রাত্রে যদি মিষ্টিদিদির ঘুম না আসে, ওই একজন ঝি পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ঘুম পাড়াবে। শাড়ি যদি কাঁধ থেকে হঠাৎ খসে যায় মিষ্টিদিদির, তো একজন ঝি কাপড়টা তুলে দেবে যথাস্থানে। খেয়ালের তো অন্ত নেই মিষ্টিদিদির। কখন কী খেয়াল হবে মিষ্টিদিদি নিজেও বলতে পারে না আগে থেকে। হয়ত রাত্তির দশটার সময়েই মিষ্টিদিদির তপ্‌সে মাছ ভাজা খেতে ইচ্ছে হতে পারে। আশ্বিন মাসের দুপুরবেলাতেই ল্যাংড়া আম খেতে ইচ্ছে হতে পারে। জামাইবাবু হয়ত তখন অফিসে যাচ্ছে, মিষ্টিদিদি বললে, 'আমার বুকটা কেমন করছে, তুমি আজ যেয়ো না কোথাও!'

জামাইবাবু তখন কোটপ্যাণ্ট পরে তৈরি। নিচে গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে। বললে, 'আমার যে আজ একটা জরুরী কাজ ছিল।'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'তা বলে কাজটাই তোমার বড় হল?'

জামাইবাবু কেমন যেন অপ্রস্তুত ব্যস্ততায় বলতো, 'আমি বরং গিয়ে ডাক্তার সান্যালকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

মিষ্টিদিদির পাতলা শরীর যেন কান্নায় ফুলে ফুলে উঠতো। বলতো, 'আমি আর ক'দিন! আমি মরে গেলে তুমি যত খুশি কাজে বেরিয়ো না, কাজ তো তোমার পালিয়ে যাচ্ছে না।'

সত্যিই তো তখন আমাদেরও মনে হত মিষ্টিদিদি আর ক'দিনই বা বাঁচবে। কলকাতার হার্ট-স্পেশালিস্টরা কেউ রোগ ধরতে পারতো না মিষ্টিদিদির। কতবার কলকাতার বাইরে থেকে ডাক্তার এসেছে। ভিয়েনা থেকে এসেছে। আমেরিকা থেকে এসেছে। জামাইবাবু মোটা মোটা টাকা দিয়ে সব রকম চিকিৎসা করিয়েছে। কেউ রোগ ধরতে পারেনি। কিন্তু একটা বিষয়ে সবাই একমত হয়ে বলে গেছে, রোগীর মনে কোনো রকম উত্তেজনা হতে দেওয়া উচিত নয়। একটু উত্তেজনা হলেই আর বাঁচানো যাবে না রোগীকে।

মিষ্টিদিদি বলতো, 'আমি মরে গেলে তুমি যেমন খুশি যেখানে ইচ্ছে ঘুরে বেড়িয়ো, আমি দেখতেও আসবো না। কিন্তু যে দু'টো দিন বেঁচে আছি, আমাকে দয়া করে শান্তিতে বাঁচতে দাও।'

তা মিষ্টিদিদিকে শান্তিতে বাঁচতে দেবার জন্যে জামাইবাবুও কি কসুর করতো কিছু!

দু'টো দিন—

অথচ 'দুটো দিন' 'দুটো দিন' করে কতদিন যে বেঁচে থাকবে মিষ্টিদিদি, আমি কেবল তাই ভাবতাম। তবে অপূর্ব স্বাস্থ্য বটে জামাইবাবুর। একটা দিনের জন্য অসুখ করেনি, একদিন সর্দি হল না। চল্লিশ বছরের জামাইবাবুকে যেন পঁচিশ বছরের ছোকরা মনে হত দেখে। ভোরবেলা উঠতো। উঠে সামনের সমস্ত বাগানটা জোরে জোরে হেঁটে নিত দশ-পঁচিশ বার। একদিনও শুনিনি যে জামাইবাবুর মাথা ধরেছে। কখনও ডাক্তারের কাছে সঁপে দিতে হয়নি নিজেকে। কবে যে ওষুধ খেয়েছে তা মনেই পড়ে না জামাইবাবুর। এমনি অটুট স্বাস্থ্য। এমনি আঁট শরীর।

কিন্তু তবু জামাইবাবুকে গঞ্জনা শুনতে হত মিষ্টিদিদির কাছে।

রবিবার। খাবার টেবিলে হয়ত সবাই খেতে বসেছি। জামাইবাবুও খাচ্ছে একমনে।

মিষ্টিদিদি বললে, 'ওমা, ওই অতগুলো মাংস তুমি সত্যি সত্যি খাবে নাকি?'

কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল জামাইবাবু। কী বলবে যেন ভেবে পেলে না। তারপর মাংসের প্লেটটা পাশে ঠেলে দিয়ে বললে, 'তাইতো, আমাকে বড্ড

বেশি মাংস দিয়েছে দেখছি ঠাকুর।'

মিষ্টিদিদিকে আমি লক্ষ্য করেছি তখন। ঝাল ডাঁটা-চচ্চড়ি একরাশ নিয়েছে পাতে। বার বার চেয়ে-চেয়ে ভাতও নিয়েছে এক হাঁড়ি। পোনা মাছের কালিয়ার সবটাও শেষ করে ফেলেছে। কাঁটাগুলো পর্যন্ত চিবিয়ে চিবিয়ে গুঁড়ো করে ফেলেছে মিষ্টিদিদি। তারপর নিঃশব্দে কখন মাংসের প্লেটটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর আরো মাংস দিয়ে গেছে সেদিকে খেয়াল নেই। আমাদের দু'জনের ডবল খেয়ে কখন শেষ করে হাত গুটিয়ে বসে বসে ডাঁটা চিবোচ্ছে মিষ্টিদিদি। জামাইবাবু লক্ষ্য না করুক, আমি তা করেছি।

তবু মিষ্টিদিদি ডাঁটা চিবোতে চিবোতে বললে, 'বেশি খেয়ো না বলে দিলাম, ওতে মানুষের স্বাস্থ্য ভালো থাকে না।'

জামাইবাবু বললে, 'কই, আমি তো বেশি খাইনি।'

মিষ্টিদিদি বললে, 'এক একজনের ধারণা, একগাদা খেলেই বুঝি শরীর ভালো থাকে। ওটা ভুল।'

জামাইবাবু বললে, 'নিশ্চয়।'

এমন সময় ঠাকুর বললে, 'মা, আমড়াব চাটনি করেছিলুম, দিতে ভুলেগেছি।'

মিষ্টিদিদি বললে 'ভুলে গেছ ভালোই হয়েছে—ওঁকে আর দিয়ো না। আমার এই প্লেটে বরং একটুখানি দাও, কেমন রেঁধেছ চেখে দেখি।' তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, 'তুই নিবি নাকি একটু ?'

বললাম, 'তা দিক্ একটুখানি।'

মিষ্টিদিদি বললে, 'না না, থাক্ তোকে আর নিতে হবে না। এই বয়েস থেকে বেশি খাওয়া অভ্যেস করিস নে তোর জামাইবাবুর মতো। পেট ভরে খাবি না কখনও, এই বলে রাখলুম। একটু খালি রেখে খেতে হয়।'

তা ঠাকুর শুধু আমড়ার অম্বলই দিলে না। পুরনো ঠাকুর জানে সব! শুধু অম্বল মিষ্টিদিদি খেতে পারে না। সঙ্গে দুটি ভাত চাই। ঠাকুর ভাতও এনে দিলে মিষ্টিদিদিকে।

ঠাকুর বললে, 'আর দু'টো ভাত দেবো, মা ?'

তখন সব ভাত নিঃশেষ হয়ে গেছে। মিষ্টিদিদি বললে, 'না না, পাগল হয়েছ ঠাকুর। একে দেখছ আমার শরীর খারাপ—আমাকে কি তুমি খাইয়ে খাইয়ে মেরে ফেলতে চাও নাকি!'

কী জানি আমার কেমন জামাইবাবুকে দেখে মনে হত তার যেন পেট ভরেনি। এক গ্লাস জল ঢকঢক করে খেয়ে উঠে পড়তো জামাইবাবু।

মিষ্টিদিদি বলতো, 'খেয়ে উঠে যেন এখনি আবার শুয়ো না গিয়ে ঘরে।'

'না না, শোব কেন, এখন আমার কত কাজ।'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'না, তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, খেয়ে উঠে শুলেই যত অম্বল আর চোঁয়া ঢেকুরের উৎপাত।'

জামাইবাবু তারপর নিজের ঘরে চলে যেত। আর মিষ্টিদিদির তখন

নিজের স্প্রিং-এর খাটে শুয়ে থাকবার পালা। বলতো, 'আমার যে কী কপাল। ইচ্ছে না হলেও মটকা মেরে পড়ে থাকতে হবে বিছানায়।'

সেবার জামাইবাবুর একটা মস্ত প্রমোশন হল আপিসে। শুধু প্রমোশন নয়। সমাজে, পাড়ায়, আপিসে সর্বত্র সেটা হিংসে উদ্রেক করার মতো প্রমোশন। অর্থবান মানুষ জামাইবাবু। একসঙ্গে দু'তিনখানা গাড়ি রাখবার মতন অবস্থা। ব্যাঙ্কের আর্থিক স্ফীতিটাও উল্লেখযোগ্য। অথচ সমস্ত নিজের চেষ্টায়। অল্প অবস্থা থেকে শুধু কর্তব্যনিষ্ঠা আর পুরুষকারের জোরে বাড়ি গাড়ি আর মিষ্টিদিদির মালিক হতে পেরেছে।

বিয়ের আগে মিষ্টিদিদিকে চিনতাম না। তবে শুনেছি মিষ্টিদিদির কথা।

মা বলতো, 'সে রীতিমত লড়াই বেধে গিয়েছিল মিষ্টির বিয়ের সময়ে। পটল বলে, আমি বিয়ে করবো, চাইবাসার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অরুণ বললে, আমি বিয়ে করবো—দিনরাত মনোহরদার বাড়ি দশ-বিশটা ছেলের ভিড়—টেনিস খেলা চলে ওদের, আর মিষ্টি বাগানে একটা বেতের চেয়ারে বসে বসে খেলা দেখতো।'

আমি জিগ্যেস করতাম, 'মিষ্টিদিদি খেলতো না, মা।'

'হ্যাঁ, ও আবার খেলবে কী। ও তো কেবল ওর শরীর নিয়েই ব্যস্ত। ওর জন্যে মনোহরদা পর্যন্ত ফতুর হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত, কেবল ডাক্তার আর ওষুধ—কী যে রোগ কেউ বলতে পারে না, শুধু বলে বিশ্রাম নিতে হবে। ওই মেয়েকে নিয়ে মনোহরদাকে কি কম ভুগতে হয়েছে। শেষে মনোহরদা সকলকে ডেকে বললে—আমার মেয়েকে যে বিয়ে করবে তাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, মেয়েকে কখনও খাটাবে না, কখনও কাজ করাতে পারবে না। ভালো ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে যেমন আমি করছি। শুনে সবাই রাজী, বড় বড় লোকের ছেলে সব—বড় বড় চাকরি করে, হাজার দেড় দুই টাকা করে সব মাইনে পায়। শুনে আমরা তো চাইবাসার মেয়েরা সব হেসে বাঁচিনে। ওই তো পাতলা হাড়-জিরজিরে চেহারা, কদিন আর বাঁচবে, একটা ছেলে হলেই হাড্ডিসার হয়ে যাবে—তা কী সব আজকালকার ছেলেদের পছন্দ জানিনে মা, সবাই বলে রাজী।'

বাবা বলতেন, 'তা রোগা হওয়াই তো ভালো, খাবে কম।'

মা বলতো, 'হ্যাঁ, খাবে নাকি কম, কথা শোনো, দিনরাতই যে খাচ্ছে কেবল, কী করে হজম করে মা, কে জানে। মনোহরদা তো ওই মেয়ের জন্যেই দেউলে হয়ে গেল শেষকালে, কাঠের ব্যবসা ছিল মনোহরদার। তা মেয়ের খাওয়ার জ্বালায় দেনা হল চারিদিকে। সকাল থেকে উঠেই মেয়ের খাওয়া; মুখে একটা-না-একটা কিছু লেগেই আছে। চকোলেট, বিস্কুট, লজেন্স, মাংস, মাছ, শাক, খাদ্য-অখাদ্য কিছু তো আর বাদ নেই।'

বাবা বলতেন, 'তা যদি হজম করতে পারে, ক্ষতি কী?'

মা বলতো, 'তুমি আর ঠেসু দিয়ে কথা বোলো না বাপু, এই তো এতদিন

এসেছি তোমার সংসারে, কেউ বলুক দিকিনি আমার জন্যে ক'টা পয়সা তোমার খরচ হয়েছে ডাক্তারের পেছনে ?'

বাবা হেসে উঠতেন হো হো করে। আর মা থেমে যেতো গম্ভীর হয়ে।

আমি বাধা দিয়ে বলতাম, 'মা, তারপর কী হল ?'

মা বললে, 'তারপই বাধলো গোল। সবাই যখন রাজী তখন মনোহরদা উপায় না দেখে বললে,—মিণ্টি যাকে বেছে নেবে তার সঙ্গেই ওর বিয়ে দেব। তা ওদের মধ্যে পটলই ছিল সবচেয়ে মজবুত, দৌড়তে পারতো, কম বয়েস, নিজের চেষ্টায় মানুষ হয়েছে, কুস্তি করা চেহারা। মিণ্টির বরাবর রাগ ছিল পটলের ওপরে—'

জিগ্যেস করলাম, 'রাগ ছিল কেন, মা ?'

'তা, রাগ থাকবে না ? মিণ্টি নিজে হাওয়ায় উড়ে যায়, একটু কাজ করলে মাথা ঘোরে, ঘুম না পাড়ালে ঘুম আসে না, তার চোখের সামনে অত মজবুত চেহারার মানুষকে ভালো লাগবে কেন ? তা মিণ্টি শেষ পর্যন্ত পটলকেই বিয়ে করতে রাজী হল।'

এসব ছোটবেলায় মা'র কাছে গল্প শুনেছিলাম। তারপর যখন ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতায় পড়বার কথা হল, তখন পটল-জামাইবাবুই লিখলে, 'ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন, এখানে থেকেই লেখাপড়া করবে ও' কোনো অসুবিধে হবে না।'

আসবার সময় মা বলে দিয়েছিল, 'বাড়িতে যেন বেশি গোলমাল কোরো না বাবা—একটি মাত্র ছেলে শঙ্কর, তাকে পর্যন্ত কাছে রাখেনি পটল, পাছে মিণ্টির শরীর খারাপ হয়—'

আমি যখন মিণ্টিদিদির বাড়িতে প্রথম এলাম, তখন শঙ্কর থাকতো দেরাদুনে। হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে বাড়ি করার পেছনেও ওই সেই একই কারণ। এ পাড়ার অধিকাংশ অধিবাসী সাহেব-সুবা। বিরাট দশ বিঘে জমির ওপর বাড়ি। ঘন গাছপালা। বাড়ি থেকে রাস্তা বা পাশের বাড়ি পর্যন্ত দেখা যায় না। কোন রকম শব্দ আসে না এখানে। নিঝুম নির্জন আবহাওয়া। শুধু এক-একবার এক-একটা পাখির ডাক দুপুরবেলার শান্তি ভঙ্গ করে। শঙ্কর যখন জন্মাল, সেই প্রথম দিনটি থেকে তার ভার নিয়েছিল নার্স। দিনের মধ্যে এক একবার মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে মিণ্টি-দিদির কোলে রাখা হত। কিন্তু জামাইবাবুর হুকুম ছিল—শঙ্কর কাঁদলেই দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, একেবারে মিণ্টিদিদির কানের এলাকার বাইরে। ভয় ছিল, ছেলের কান্না শুনলেই মিণ্টিদিদির হার্ট-ফেল হতে পারে। মিণ্টি-দিদি যদি থাকতো দক্ষিণের ঘরে, শঙ্করকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে একেবারে সুদূর উত্তরে। হয়ত একেবারে বাগান পেরিয়ে ওদিকের মালীদের ঘরে। যেখানে ছেলে কঁকিয়ে কাঁদলেও মিণ্টিদিদির স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা নেই। সেই ছেলে ক্রমে এক বছর বয়সের হল। দু'বছরের হল। বড় জ্বালাতন

করতে লাগলো তখন। হুড়মুড় করে দৌড়ে বেড়ায়, কান ঝালাপালা হয়ে যেত। সেই গোলমালে একদিন মিষ্টিদিদি হার্ট-ফেল করে আর কি। ভীষণ অবস্থা। ডাক্তার এল। নার্স এল। অক্সিজেন গ্যাস এল। জামাইবাবু দু'রাত ঘুমোলো না।

অনেক কষ্টে, অনেক অর্থব্যয়ে, ডাক্তার সান্যালের অনেক চেষ্টায় সে-যাত্রা টিকে গেল মিষ্টিদিদি। কিন্তু জামাইবাবু আর দায়িত্ব নিলে না। শেষকালে কী হতে কী সর্বনাশ হয়ে যাবে!

মিষ্টিদিদি সেরে ওঠার পর জামাইবাবু বললে, 'শঙ্করকে আমি দেরাদুনে পাঠিয়ে দিই, কী বলো? ওখানে ওরা ট্রেনিংটা ভালো দেয়। আর ওরা যত্নও করে খুব ছোট ছোট ছেলেপিলেদের।'

মিষ্টিদিদি ছলছল চোখের জলে বললে, 'কী কপাল দেখো আমার, নিজের ছেলেকে পর্যন্ত কাছে রাখতে পারবো না, আদর করতে পারবো না!'

'তাতে কী হয়েছে, তুমি সেরে উঠলেই—'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'আর সেরেছি, বেশি দিন আর নেই আমার বুঝতে পারছি, বড় জোর দিন পনরো—তারপর আমি মরে গেলে…, ওকে কিন্তু তুমি বাড়িতে নিয়ে এসে তোমার কাছে কাছেই রেখো।'

তারপর কত পনরো দিন কেটে গেছে, পনরো বছর কাটতে চললো, কিন্তু কিছুই হয়নি মিষ্টিদিদির। প্লেট-প্লেট মাংস খেয়েছে, বাটি-বাটি আমড়ার অম্বল খেয়েছে, ঝাল ডাঁটা-চচ্চড়ি খেয়েছে, পোনা মাছের কালিয়া খেয়েছে। দামী দামী বিস্কুট কেক্ লজেন্স খেয়েছে, দামী দামী গাড়ি চড়েছে। মিষ্টিদিদির শোবার ঘর এয়ার-কণ্ডিশন্ড করা হয়েছে। ওষুধ, বিশ্রাম, আরাম, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব যুগিয়েছে জামাইবাবু। তবু অসুখ সারেনি মিষ্টিদিদির।

অথচ কত সাবধানতা, কত সতর্কতা মিষ্টিদিদির জীবনের জন্যে। পাশের গাছের ডালে একটা কাক পর্যন্ত ডাকলে বুক ধড়ফড় করতো মিষ্টিদিদির। হাঁ-হাঁ করে তাড়িয়ে দিতে হত। ঝড়বৃষ্টির দিনে যদি জোরে মেঘ ডেকে উঠতো তো আপিস থেকে টেলিফোনে খবর নিতো জামাইবাবু—মিষ্টি কেমন আছে। খবরের কাগজটা আগে নিজে পড়ে তবে জামাইবাবু পড়তে দিতো মিষ্টিদিদিকে। অনেক খুন জখমের খবর থাকে ওতে। সে-সব পড়ে যে-কোন মুহূর্তে হার্ট-ফেল হতে পারে। কতবার কত প্রমোশনের সুযোগ এল জামাইবাবুর। এমন সচরাচর আসে না কারোর। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জে গেলে মাইনে হত পাঁচ হাজার টাকা। ওখানকার মাটির তলায় খনির সম্বন্ধে গবেষণা করতে জামাইবাবুকেই পাঠানো ঠিক করলো ইণ্ডিয়া গবর্নমেণ্ট। মাইনে ছাড়া টি-এ আছে অনেক।

কিন্তু প্রত্যেকবার মিষ্টিদিদি বলেছে, 'আর দু'টো দিন আমার জন্যে সবুর করো, আর বেশিদিন কষ্ট দেব না তোমাদের।'

অপ্রস্তুত হয়ে গেছে জামাইবাবু।

'আর দু'টো দিন, শুধু দু'দিন, তার পর তোমাকে মুক্তি দিয়ে যাব—তখন তুমি যেখানে খুশি যেয়ো।'

এ সব আজ থেকে প্রায় পনেরো বিশ বছর আগেকার ঘটনা। কিন্তু সেই অল্প বয়সে আমার যেন কেমন সন্দেহ হয়েছে, এ ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছু নয়। বড় স্বার্থপর মনে হয়েছে মিষ্টিদিদিকে। এই আরাম, এই বিশ্রাম, এই অর্থ-অপচয়, বিলাসিতা থেকে পাছে বঞ্চিত হয়, পাছে পরিশ্রম করতে হয় মিষ্টিদিদিকে—তাই যেন এই ছলনা।

শঙ্কর যখন পুজোর আর গরমের ছুটিতে আসতো বাড়িতে, জামাইবাবু যেন কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠতো। বলতো, 'ওদিকে যেয়ো না শঙ্কর, তোমার মার শরীর খারাপ, জানো তো—'

শঙ্করও যেন কেমন বিব্রত হত। ও-বয়সের ছেলেদের স্বাভাবিক ধর্ম হৈ-চৈ করা, খেলা, চিৎকার করা। কিন্তু পদে পদে বাধা পেয়ে পেয়ে কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়েছিল শেষকালে। যেন কলকাতায় আসতে ভাল লাগত না তার। আবার স্কুলে ফিরে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতো। কেবল বলতো, 'কবে যে ছুটি ফুরোবে।'

মনে আছে একবার বলেছিল, 'এখানে আমার বড় মন-মরা লাগে, ভালো লাগে না মোটে।'

'কেন।'

শঙ্কর বলেছিল, 'কী জানি।'

আপন যারা, তারা এত কম বয়সে পর হয়ে যায় কেমন করে তা ভেবে আমারও অবাক্ লাগতো। আমারও মা ছিল। যখন ছুটিতে বাড়ি গেছি, সে অন্যরকম। আমাকে আদর করবার জন্যে কতরকম আয়োজন—কত রান্না, কত কী উৎসব আনন্দ হত। আর এ-ও তো মিষ্টিদিদির ছেলে। বড়লোকের ছেলে। আরো আনন্দ হওয়া উচিত বৈকি।

কিন্তু হঠাৎ যদি কখনও ভুলে হো হো করে হেসে উঠতো, কোথা থেকে ঝি এসে বলতো, 'চুপ করো খোকাবাবু, মার বুকে কেমন করছে।'

মায়ের ঘরের দিকে অন্যমনস্ক হয়ে যদি শঙ্কর কোনোদিন ঢুকে পড়তো, অমনি দশজন ঝি-চাকর হাঁ হাঁ করে উঠতো, 'এদিকে না—এদিকে না—'

বাড়িটা যেন হাসপাতাল। অথচ যে রোগী সে দিব্যি ঘুরে বেড়ায় খায়-দায়, সাজ পোশাক করে। মিষ্টিদিদি বিকেলবেলা স্নান করে। স্নানের শেষে এসে বসে আয়নার সামনে। দু'জন ঝি আসে এগিয়ে। তখন বেরোয় রুজ, লিপস্টিক, তেল, সেণ্ট, পাউডার—আরো কত কি! ভালো ভালো পোশাকী শাড়ি বেরোয়। ব্লাউজ বেরোয়। আলতা বেরোয়। একঘণ্টা ধরে সাজিয়ে-গুজিয়ে ফিটফাট করে দেয়। তারপর ইজি-চেয়ারটা বারান্দার সামনে রেলিং-এর গা ঘেঁষে রাখা হয়। সেই সাজ, সেই পোশাক ক'রে

মিষ্টিদিদি গিয়ে তখন আস্তে আস্তে বসে ইজি-চেয়ারে। কোনো কথা নেই, কোনো কাজ নেই—শুধু বসে থাকা, আলস্যের ঢেউ-এ গা এলিয়ে দেওয়া। এত আলস্য যে কী করে সহ্য করে মিষ্টিদিদি, কে জানে। কিন্তু সবাই ভাবতুম—আর তো মাত্র দু'টো দিন, হয়ত আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা,—তারপরেই তো শেষ।

ছুটির সময় দেশে গেলে মা সব শুনে বলতো, 'ও মেয়ে মনোহরদাকেও অমনি করে জ্বালিয়েছে, ও পটলকেও জ্বালিয়ে ছাড়বে, দেখিস।'

কিন্তু জামাইবাবুর অদ্ভুত ধৈর্য। স্ত্রীর জন্যে হাসিমুখে এমন আর্থিক, শারীরিক, মানসিক ক্ষতি স্বীকার করতে আর কাউকে দেখিনি আমি। অথচ স্ত্রৈণ বলবো কেমন করে। কোথায় যেন মিষ্টিদিদির ব্যবহারে কিংবা চেহারায় একটা যাদু ছিল।

রোজই সকালবেলা জামাইবাবু একবার করে মিষ্টিদিদিকে জিগ্যেস করতো, 'আজ কী খাবে তুমি? কী খেতে ইচ্ছে করছে তোমার?'

মিষ্টিদিদি কোনোদিন বলতো, 'আজকে ফাউল আনতে বলে দাও ঠাকুরকে—'

কোনোদিন বলতো, 'আজ মাটন্—'

আবার কোনোদিন বলতো, 'আজ টোস্ট আর ফাউল কাট্‌লেট করতে বলো ঠাকুরকে।'

কোনো-কোনো দিন আবার বলতো, 'চলো আজ হোটেলে গিয়ে খেয়ে আসি, বাড়ির রান্না আর ভালো লাগছে না।'

এমন কোনোদিন হল না যেদিন মিষ্টিদিদি বলেছে,—'আজ শরীরটা খারাপ, কিছু খাবো না।'

জামাইবাবু যদি কোনোদিন বলতো, 'এত শীতে আর না-ই বা বেরোলে, যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়?'

মিষ্টিদিদি বলতো, 'আর তো মাত্র ক'টা দিন—যে ক'দিন বাঁচি করে নিই।'

তা এসব হলো পনরো বিশ বছর আগের ঘটনা।

মিষ্টিদিদির বাড়িতে থেকে আই. এ. পাশ করেছি, বি. এ. পাস করেছি—এম. এ. পাস করেছি। করে চাকরি-সূত্রে তখন বিলাসপুরে আছি। খবর পেয়েছিলাম, মিষ্টিদিদি তখন বেঁচে আছে। একদিনের জন্যেও কখনও জ্বর হতে শুনিনি, একাদনও উপোস করতে শুনিনি। আর শুনেছি মিষ্টি-দিদির জন্যে জামাইবাবু নিজের প্রমোশন, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত ত্যাগ করে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতেই আছে।

কিন্তু হঠাৎ মা'র চিঠিতে সেবার জামাইবাবুর মৃত্যুর খবর শুনে চম্‌কে উঠেছিলাম।

জামাইবাবুর তো কখনও অসুখ হতে দেখিনি। সে-মানুষ এমন হঠাৎ মারা গেল। জ্বর নয়, রোগশয্যায় দীর্ঘদিন পড়ে থাকা নয়, হঠাৎ নাকি হার্ট-ফেল করেছে।

কিন্তু ভয়ও হয়েছিল মিষ্টিদিদির জন্যে।

মিষ্টিদিদি এ-শোক কেমন করে সহ্য করবে কে জানে। জামাইবাবুর মৃত্যুর খবর শোনা মাত্রই তো মিষ্টিদিদির হার্ট-ফেল করাব কথা।

সমবেদনা জানিয়ে মিষ্টিদিদিকে একখানা চিঠিও দিয়েছিলাম মনে আছে। কিন্তু সে চিঠির কোনো উত্তর পাইনি বহুদিন।

সেবার যখন কলকাতায় এলাম, দেখা করলাম গিয়ে।

ঠিক সেইরকম ইজি-চেয়ারে মিষ্টিদিদি বসে। রুজ, পাউডার, লিপস্টিক, সিল্ক, সেণ্ট, সাবান, ওষুধ—কোনো কিছুরই ব্যতিক্রম নেই। পাশেই ঘনিষ্ঠ হয়ে ডাক্তার সান্যাল বসেছিলেন।

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'অনেক কষ্টে তোমাব মিষ্টিদিদিকে বাঁচিয়ে রেখেছি। খুব শক্ পেয়েছিলেন, তিনদিন সেন্স ছিল না একেবারে।'

বললাম, 'শঙ্কর কোথায়? শুনলাম সে নাকি কলকাতায় ফিরে এসেছে?'

ডাক্তার সান্যাল বললেন, 'এই তো বেরোল যেন কোথায়, তাকেও বারণ করেছি বেশি কাছে আসতে—এত উইক হার্ট, কোনো এক্সাইটমেণ্ট সহ্য হবে না—কনস্টাণ্ট কেয়াব নিতে হচ্ছে।'

মিষ্টিদিদি বলেছিল, 'চলো একটু গঙ্গার ধারে হাওয়া খেয়ে আসি। গাড়িটা বার করতে বলো।'

ডাক্তার সান্যাল আপত্তি করলেন, 'এ অবস্থায় যাওয়া ঠিক নয় আপনার—উইক হার্ট নিয়ে—'

মিষ্টিদিদি উঠলো। বললে, 'আর তো দু'টো দিন—দু'টো দিন হয়ত মোটে বাঁচবো—সারা জীবনই তো ভুগছি, এখন আর ভালো লাগে না—যা হয় হবে—'

মনে আছে, যে দু'দিন ছিলাম হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে, ডাক্তার সান্যাল দিনরাত মিষ্টিদিদির পাশে পাশে থাকতেন! কিন্তু আমার যেন কেমন ভাল লাগত না। মিষ্টিদিদির পোশাক পরিচ্ছদেও তখন কোনো পরিবর্তন দেখিনি। শাড়ি, গয়না, সিল্ক, সেণ্ট—তা-ও পুরোমাত্রায় রয়েছে। একবার মনে হল, হয়ত স্বাস্থ্যের জন্যেই ও-সব পরেছে। হঠাৎ বৈধব্যের সাজ পরলে হয়ত জামাইবাবুর কথা বেশি মনে পড়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে শক্ লাগবে হার্টে। হয়ত সেইজন্যেই। হয়ত সেইজন্যেই জামাইবাবুর মস্ত অয়েল পেণ্টিংখানাও হল্ থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

সে রাত্রে মিষ্টিদিদির বাড়িতেই ছিলাম। শঙ্কর এল সন্ধ্যের পর।

আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে। বললে, 'ছোট-মামা, তুমি—'

বললাম, 'কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

'কোথাও না—'

'সেই দুপুরবেলা বেরিয়েছিলি, আর এলি এখন—এতক্ষণ কী করছিলি?'

শঙ্কর যেন আগের চেয়ে অনেক গম্ভীর হয়ে গেছে দেখেছিলাম। বলেছিল,

'কিছু ভালো লাগছিল না, চৌরঙ্গীর ধারে মাঠে গিয়ে একটা বেঞ্চির ওপর শুয়ে ছিলাম একলা-একলা।'

এ বয়সের ছেলের পক্ষে এমন করে সময় কাটানো কেমন যেন অস্বাভাবিক।

বললাম, 'আজকাল খেলাধুলো করিস তুই? সেই টেনিস খেলা কেমন চলছে তোর?'

'এখানে এসে পর্যন্ত ও-সব ছুঁইনি, ছোট-মামা।'

সেদিন খাবার টেবিলে ডাক্তার সান্যালও আমাদের সঙ্গে বসেছিলেন মনে আছে। মিষ্টিদিদির পাশেই তাঁর চেয়ার। ডাক্তার পাশে বসা দরকার। কখন মিষ্টিদিদির কি বিপদ হয়!

শঙ্কর চুপচাপ বসে খাচ্ছিল।

মিষ্টিদিদি এবার বললে, 'ঠাকুর, তোমার বুদ্ধি তো বেশ, খোকাকে অত গুচ্ছের মাংস দিয়েছ কেন শুনি?'

শঙ্কর অন্যমনস্ক হয়ে খাচ্ছিল। হঠাৎ মুখ তুলে বললে, 'আমাকে বলছ, মা?'

'হ্যাঁ, তোমাকেই তো বলছি। অত খাও কেন, খাওয়াটা হবে লাইট্‌, পেটে চাপ যেন না পড়ে—ঠাকুর না হয় ইডিয়ট্‌, কিন্তু তুমি তো লেখাপড়া শিখেছ—তোমাদের স্কুলে এতসব শেখায়, হাইজিন শেখায় না?'

ডাক্তার সান্যাল বললেন, 'আপনি অত উত্তেজিত হবেন না, মিসেস সেন।'

মাছের একটা মুড়ো চুষতে চুষতে মিষ্টিদিদি বললে, 'আমি আর ক'দিন ডাক্তার সান্যাল। কিন্তু ছোট ছেলেরা যদি এই বয়সেই স্বাস্থ্যের গোড়ার কথাগুলো না শেখে তো কবে শিখবে?'

ডাক্তার সান্যাল বললেন, 'আমি আপনাকে বার বার তো বলেছি মিসেস সেন, এই সব সাংসারিক খুঁটিনাটি সম্বন্ধে মোটে ভাববেন না, ওতে আপনার হার্ট আরও উইক হয়ে যাবে।'

মিষ্টিদিদি ডাঁটা-চচ্চড়ি চিবোতে চিবোতে বললেন, 'ঠাকুর, আজকে চচ্চড়িতে ঝাল দিতে ভুলে গেছ তুমি।'

ঠাকুর দাঁড়িয়েছিল পেছনে। বললে, 'কই, ঝাল তো দিয়েছি, মা!'

'ছাই ঝাল দিয়েছ। ডাঁটা-চচ্চড়ি ঝাল না হলে খাওয়া যায়?'

তারপর আমাকে সাক্ষী মেনে মিষ্টিদিদি বললে, 'হ্যাঁ রে, তুই-ই বল তো,—ঝাল হয়েছে চচ্চড়িতে?'

বললাম, 'আমি তো চচ্চড়ি খাইনি।'

'কেন? তুই চচ্চড়ি খাস না?'

ঠাকুর বললে, 'ওটা শুধু আপনার জন্যেই করেছিলাম, মা।'

মিষ্টিদিদির গলা একটু চড়ে উঠলো, 'কেন? শুধু আমার জন্যে কেন? তুমি বুঝি আমাকে খাইয়ে খাইয়ে মেরে ফেলতে চাও। আমি মরে গেলেই তোমরা সবাই বাঁচো, না?'

ঠাকুর রীতিমতো অপ্রস্তুত। শঙ্করও দেখলাম খাওয়া বন্ধ করে মুখ নিচু করে আছে। আমিও কম অপ্রস্তুত হলাম না। আমাকে চচ্চড়ি না দেওয়াতেই এই কাণ্ড।

মিষ্টিদিদি বললে, 'আমার যেমন কপাল—যার হার্ট দুর্বল তার যে কেন বেঁচে থাকা।'

তারপর মাংসের বাটিটা শেষ করে বললেন, 'অথচ যার থাকবার কথা তিনি কেমন টপ্ করে চলে গেলেন, আর আমিই কেবল মরতে পড়ে রইলুম।'

ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদির মুখের কাছে মুখ এনে বললেন, 'আঃ আমি বারবার আপনাকে বলছি না মিসেস সেন, ও সব কথা মোটেই মনে আনবেন না, ওতে মিছিমিছি দুর্বল হার্টটাকে আরো দুর্বল করা—'

তারপর ঠাকুরকে বললেন, 'তুমি এখান থেকে যাও তো ঠাকুর, আর আমাদের কিছু দরকার নেই। তোমরা সবাই মিলে দেখছি ওঁর রোগটাকে বাড়িয়ে দেবে কেবল।'

খানিক পরে আমার কানে কানে বললেন, 'শঙ্করকে নিয়ে তুমি চুপি চুপি টেবিল থেকে উঠে যাও তো, দেখছি তোমার মিষ্টিদিদি এক্সাইটেড হতে শুরু করেছে—যাও শিগগির—'

তখনও খাওয়া শেষ হয়নি আমার। শঙ্করেরও খাওয়া শেষ হয়নি। কিন্তু মিষ্টিদিদির মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম তার পাতলা শরীরে যেন আগুন জ্বলছে, কান দুটো ঠিক যেন করমচার মতন লাল হয়ে উঠেছে। সত্যিই বোধহয় হার্টের প্যালপিটেশন হলে ওই রকম হয়।

সেদিন নিঃশব্দে শঙ্করকে নিয়ে উঠে এসেছিলাম খাবার টেবিল থেকে, মনে আছে।

মনে আছে, পরে ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'মিস্টার সেন-এর শোকটা উনি এখনও ভুলতে পারছেন না কিনা—ওইটেই দিনরাত ভোলাবার চেষ্টা করছি—দেখছ না, মিস্টার সেন-এর অয়েল পেণ্টিংখানা পর্যন্ত তাই সরিয়ে ফেলেছি ঘর থেকে।'

আর একদিন বলেছিলেন, 'ওঁরা তো ছিলেন আইডিয়াল হাসব্যাণ্ড-ওয়াইফ্, তাই শোকটা অত লেগেছে মিসেস সেন-এর। উনি তো মাছ-মাংস খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি দেখলুম এই স্বাস্থ্যের ওপর যদি আবার খাওয়া-দাওয়ার অত্যাচার চলে তাহলে তো আর বাঁচাতে পারবো না আমি। শেষে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে তবে—'

যে-ক'দিন হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে ছিলাম, সে ক'দিন কেবল মনে পড়তো জামাইবাবুর কথা। সত্যিই তো, তাঁর তো যাবার কথা নয় এত শিগ্গির। কিন্তু এক-একবার মনে হত জামাইবাবু মরে গিয়ে বোধহয় বেঁচেছেন।

শঙ্কর আর আমি এক ঘরে, এক বিছানায় শুতাম। অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে মনে হত যেন পাশে উসখুস করছে শঙ্কর।

ডাকতাম, 'শঙ্কর !'

'উঁ !'

'ঘুমোসনি এখনও ?'

'ঘুম আসছে না যে, ছোট-মামা !'

'কেন ঘুম আসছে না রে, দুপুরবেলা ঘুমিয়েছিলি বুঝি ?'

'না, কোনও দিন রাত্তিরে ঘুম আসে না আমার।'

'কেন ?'

'কী জানি।'

বারো বছরের শঙ্কর সেদিন তার ঘুম না-আসার কোনো কারণ বলতে পারেনি। আমিও যেন কারণটা পুরোপুরি বুঝতে পারিনি সেদিন।

একবার ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদির জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করেছিলেন মনে আছে।

মিষ্টিদিদি বলেছিল, 'আমার আবার জন্মদিন কেন? আর ক'দিনই বা বাঁচবো!'

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, আপনার জন্মদিনটা তো একটা উপলক্ষ্য, মিসেস সেন। লক্ষ্য, আপনাকে একটু আশা দেওয়া, আপনার জীবনটা যে মূল্যবান এইটে মনে করিয়ে দেওয়া।' আপনি যেন এতে আপত্তি করবেন না, মিসেস সেন।'

মিষ্টিদিদি বলেছিল, 'কিন্তু আমি কি অত হৈ-চৈ গোলমাল উত্তেজনা সহ্য করতে পারবো? আমার হার্টের যা—'

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'আমি তো আছি, মিসেস সেন, ভয় কি? আপনার দীর্ঘ-জীবনের কামনা নিয়েই তো এই উৎসব। সংসারের খুঁটিনাটি থেকে মনকে কিছুক্ষণের জন্যে দূরে সরিয়ে রাখা—এতে হার্ট বরং ভালোই হবে, আমি বলছি। আপনি কোনো 'কিন্তু' করবেন না, আপনি যেমন রোজ ইজি-চেয়ারটায় বসে থাকেন তেমনি বসে থাকবেন শুধু, আমরা পাঁচজনে আপনার দীর্ঘ পরমায়ু কামনা করবো।'

তা হলও তাই। ফুলের তোড়া দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হল মিষ্টিদিদির ঘর। বিছানা, ফার্নিচার, ড্রেসিং টেবিল—যেদিকে মিষ্টিদিদির চোখ পড়তে পারে সবদিকে শুধু ফুল আর ফুল। শান্ত গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে পালিত হয়েছিল মিষ্টিদিদির সেই প্রথম জন্মোৎসব। মিষ্টিদিদি যেমন করে সেজে-গুজে বসে থাকতো সেদিনও তেমনি করেই বসেছিল। সন্ধ্যেবেলা শুধু আমরা তিনজন—আমি, শঙ্কর আর ডাক্তার সান্যাল আমাদের উপহারগুলো সামনের তেপায়া টেবিলের ওপর গিয়ে রেখেছিলাম। ডাক্তার সান্যাল দিয়েছিলেন দামী হীরে সেট্-করা একটা ব্রোচ্। এখন মনে হয়, সে-জিনিসের দাম তখন ছিল খুব কম করেও আট ন'শো টাকা।

মিষ্টিদিদি দেখে বলেছিল, 'এত দামী জিনিস কেন দিলেন আমাকে—আমি

আর ক'দিন বা পরতে পারবো এ-সব !'

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'ওইসব কথা দয়া করে আজকের দিনে আর মুখে আনবেন না, মিসেস সেন !'

আমি আর শঙ্কর দিয়েছিলাম নিউমার্কেট থেকে কেনা রজনীগন্ধার দুটো ঝাড় ।

মিষ্টিদিদি দেখে বলেছিল, 'ফুলই আমার পক্ষে ভালো রে—ফুলের মতোই দু'দিন শুধু আমার পরমায়ু ।'

বলতে বলতে কেমন করুণ হয়ে উঠেছিল মিষ্টিদিদির চোখ । পাতলা শরীর যেন থরথর করে কেঁপে উঠেছিল একটু । কিন্তু ডাক্তার সান্যাল ছিলেন, তাই খুব সামলে নিয়েছিলেন সেদিন ।

তাড়াতাড়ি স্মেলিং সল্ট এর শিশিটা মিষ্টিদিদির নাকের কাছে দিয়ে আমাদের বলেছিলেন, যাও শঙ্কর—তোমরা এখান থেকে শিগগির চলে যাও ! মিসেস সেনের অবস্থা যা দেখছি—'

মিষ্টিদিদির সেই প্রথম জন্মদিনের অনুষ্ঠানটা সেখানেই শেষ হয়ে গিয়েছিল । তারপর প্রতি বছর যেখানেই থাকি, মিষ্টিদিদির জন্মদিনে কখনও চিঠি, কখনও টেলিগ্রাম গেছে আমার কাছে । আর প্রত্যেকবারই আমি এসেছি । কিন্তু ভুলেও কখনো ফুল উপহার দিইনি । ফুল মিষ্টিদিদির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারতো না । ফুল দেখলেই নাকি তার মনে পড়তো, ফুলের মতোই তার ক্ষণস্থায়ী জীবন—ফুলের মতোই তার পরমায়ু ক্ষণিক । ও কথাটা মনে পড়া হার্ট-ডিজিজের রোগীদের পক্ষে তো মারাত্মক ।

মিষ্টিদিদির জন্মোৎসব প্রত্যেক বছরেই হত । শুধু মাঝখানে বছর দুই বন্ধ ছিল । সে-সময় ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদিকে নিয়ে ভিয়েনা গিয়েছিলেন চিকিৎসা করাতে ।

মিষ্টিদিদি নাকি প্রথমে রাজী হয়নি । বলেছিল, 'আর তো ক'টা দিন —তার জন্যে কেন মিছিমিছি কষ্ট করা ।'

ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবো আমি ।'

আমি তখন স্থান থেকে স্থানান্তরে বদলি হয়ে চলেছি । কোনো খবর রাখতে পারিনি মিষ্টিদিদির । বিলাসপুর থেকে যাচ্ছি জব্বলপুরে । জব্বলপুর থেকে নাইনিতে । নাইনি থেকে এলাহাবাদে । শুনেছিলাম হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে শঙ্কর থাকতো একলা । কেমন যেন মায়া হত ওর কথা ভেবে । জন্মের পর থেকে বাপমায়ের প্রত্যক্ষ স্নেহ ভোগ করবার অবকাশ হয়নি জীবনে। নিঃসঙ্গ নির্ভরহীন শৈশব-কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে তখন সবে পা দিয়েছে শঙ্কর । মনে হত, এবার শঙ্করের একটা বিয়ে দিলে ভালো হয় । কিন্তু কে দেবে ?

সেবারে কথাটা পেড়েছিলাম মিষ্টিদিদির কাছে ।

বলেছিলাম, 'এবার শঙ্করের একটা বিয়ে দিয়ে দাও, মিষ্টিদিদি ।'

মিষ্টিদিদি বলেছিল, 'আর ক'টা দিন, তারপরেই তো আমার ইহলীলা

শেষ। তখন সবাইকে ছুটি দিয়ে যাবো আমি, শঙ্করও বিয়ে থা করে সুখে থাকতে পারবে। আর দুটো দিন আমার জন্যে ও সবুর করতে পারবে না—'

ভিয়েনা থেকে ফিরে আসার পর যেবার মিষ্টিদিদির জন্মদিনে আবার নিমন্ত্রণ হল, সেবার ভেবেছিলাম স্বাস্থ্য বোধহয় ফিরেছে মিষ্টিদিদির। কিন্তু গিয়ে দেখলাম, সেই একই অবস্থা। তেমনি ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে আগেকার মতো।

আমার আনা উপহারটা সামনের টেবিলে রেখে জিগ্যেস করেছিলাম, 'কেমন আছ, মিষ্টিদিদি ?'

মিষ্টিদিদি তেমনি সিল্ক, সাটিন, জর্জেট, স্নো, পাউডারে মুড়ে বসে ছিল।

বললে, 'আমার আর থাকা—আর বোধহয় বেশিদিন নয়—।' বললাম, 'বাইরে গিয়েও সারলো না শরীর ?'

মিষ্টিদিদি বললে, 'এ মরবার আগে আর সারছে না রে !'

বলে চকোলেট চুষতে লাগলো।

কিন্তু শরীর সারাবার জন্যে মিষ্টিদিদির চেষ্টারও তা বলে অন্ত ছিল না। ডাক্তার সান্যাল মিষ্টিদিদিকে নানা জায়গায় ঘুরিয়ে আনতেন। কখনও পুরী, কখনও চিল্‌কা, কখনও অন্য কোথাও। ডাক্তার সান্যাল কবে একদিন চিকিৎসা করতে এসেছিলেন মিষ্টিদিদিকে। সে কোন্ যুগে। জামাইবাবু তখন বেঁচে। তারপর কতদিন কেটে গেল। রোগও সারলো না মিষ্টিদিদির, আর ডাক্তার সান্যালও গুরু দায়িত্ব থেকে বুঝি মুক্তি পেলেন না।

হঠাৎ সেবার শঙ্করের আত্মহত্যার খবর পেয়ে মনে আছে দৌড়ে এসেছিলাম কলকাতায়।

এমন আকস্মিকভাবে ঘটনাটা ঘটলো, যেন বিশ্বাসই করতে পারিনি প্রথমে।

ভয় হয়েছিল এবার আর মিষ্টিদিদিকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। শঙ্করের এমন শোকে নিশ্চয়ই মিষ্টিদিদি হার্ট-ফেল করবে। সেবার জামাইবাবুর শোক মিষ্টিদিদি যদিও বা ভুলতে পেরেছে ডাক্তার সান্যালের চেষ্টায়, শঙ্করের অপ-মৃত্যুর আঘাত নিশ্চয়ই অসহ্য হয়ে উঠবে। হয়ত গিয়ে দেখবো শঙ্কর তো নেই-ই, মিষ্টিদিদিও বেঁচে নেই আর।

অত্যন্ত ভয়ে হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে এসে পেঁছিলাম। শঙ্করের এমন পরিণতি হবে ভাবতেই পারিনি। একবার ভেবেছিলাম শঙ্কর হয়ত মিষ্টিদিদিকে আঘাত দেবার জন্যেই এই পথ বেছে নিয়েছে। হয়ত শঙ্কর ভেবেছিল, এই ভাবেই একমাত্র মিষ্টিদিদির ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যায়।

কিন্তু শঙ্কর তো জানতো না মিষ্টিদিদির লোহার হার্ট।

ভেতরে ঢোকবার রাস্তাতেই বাইরের ঘরে ডাক্তার সান্যাল বসেছিলেন।

বললেন, 'এসেছ তুমি—শুনেছ বোধহয় খবরটা—?'

বললাম, 'শঙ্কর কেন এমন করলো ? কী হয়েছিল ?'

ডাক্তার সান্যাল সে-বৃত্তান্ত বললেন। বরাবর নির্বাক নির্বিরোধ শঙ্কর,

মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল নাকি। মনে আছে ডাক্তার সান্যাল বলেছিলেন, 'যদি সুইসাইড না করতো শঙ্কর তো নিশ্চয় পাগল হয়ে যেত শেষকালে—দেখতে—'

বললাম, 'মাথা-খারাপই বা হল কেন ?'

ডাক্তার সান্যাল বললেন, 'ডাক্তারী শাস্ত্রে একে বলে 'মেনিয়া'। বেশি ব্রুডিং নেচারের লোক হলে এ-রকম হয়। হয় সুইসাইড করে, নয়তো পাগল হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত।'

তারপর বললেন, 'তোমার মিষ্টিদিদিকে যেন এ খবরটা বোলো না আবার। ওঁকে জানানো হয়নি এখনও।'

'মিষ্টিদিদি জানে না ?'

'না, জানানো হয়নি, জানালে এ-যাত্রা আর বাঁচাতে পারতুম না। মিস্টার সেন এর বেলায় জানি কিনা—হাজার হোক মায়ের প্রাণ তো, ছেলের মৃত্যু কোনো মা-ই সহ্য করতে পারে না, তার ওপর মিসেস সেন-এর হার্ট-এর অবস্থা এখনও খারাপ, যে-কোনো দিন যে-কোনো বিপদ ঘটতে পারে।'

সেদিন সিঁড়ি দিয়ে মিষ্টিদিদির ঘরে ওঠবার সময় মনে আছে আমার যেন খুন চেপে গিয়েছিল।

মনে হয়েছিল শঙ্করের অপমৃত্যুর খবরটা আমিই শোনাবো মিষ্টিদিদিকে। দেখি পরখ করে মিষ্টিদিদির হার্ট-ফেল হয় কিনা। যদি হয়, তাতেও আমার দুঃখ নেই। মনে হয়েছিল—মিষ্টিদিদির নাম কে রেখেছিল জানি না, কিন্তু মিষ্টিদিদির কোনখানটাই যেন আর মিষ্টি নয়।

কিন্তু সমস্ত সঙ্কল্প আমার মিষ্টিদিদির সামনে গিয়ে ভেসে গেল।

সেই সিল্ক, সেণ্ট, জর্জেট, স্নো, পাউডার। সেই ইজি-চেয়ার, সেই শরীর-খারাপের অভিযোগ। সেই চকোলেট চোষা। সেই ঝি-এর বসে বসে পায়ে হাত বুলোনো।

সত্যিই, কিছু বলতে পারলাম না সামনে গিয়ে।

মিষ্টিদিদি বললে, 'আর ক'টা দিন, তারপর তোদের সবাইকে মুক্তি দেব।' বলে চকোলেট চুষতে লাগলো মিষ্টিদিদি।

হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীট থেকে তার পরদিন দেশে গিয়েছিলাম। মা বললে, 'শঙ্কর আমাদের সোনার টুকরো ছেলে তাই অপঘাতী হল, নইলে অন্য ছেলে হলে মাকেই খুন করতো। মনোহরদা বেঁচে থাকলে ও-মেয়েকে গুলি করে মারতো, দেখতিস।'

বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'কেন ?'

'তা না তো কি, কোথায় ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ আনবে, তা নয়, বিধবা মাগী বিয়ে করে বসলো। শঙ্কর কি সাধ করে অপঘাতী হয়েছে ভাবিস।'

বললাম, 'কে বিয়ে করেছে ?'

'ওই মিষ্টি, ডাক্তারকে বিয়ে করে বসলো অত বড় ছেলে থাকতে।'

তা এসব ঘটনাও প্রায় পনরো বিশ পঁচিশ বছর আগেকার। তারপর প্রতি বছরেই মিষ্টিদিদির জন্মদিনটিতে কলকাতায় গেছি। উপহার দিয়ে এসেছি যথারীতি। ডাক্তার সান্যাল প্রতিবারের মতো মিষ্টিদিদির স্বাস্থ্যের জন্যে সতর্কতা নিয়েছেন—কোনো উত্তেজনা না হয় কোনো অশান্তি না হয় মনে। তাহলেই মিষ্টিদিদিকে আর বাঁচানো যাবে না। ডাক্তার সান্যাল বার বার বলেছেন, মিষ্টিদিদির হার্টের যা অবস্থা তাতে যে-কোনো দিন যে কোনো মুহূর্তে যে-কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু গত পনরো বিশ পঁচিশ বছরে কত কোটি কোটি মুহূর্ত নিঃশব্দে মহাকালে গিয়ে লয় হয়েছে, কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। তারপর যেবার ডাক্তার সান্যালেরও মৃত্যু-সংবাদ পেলাম, সবারও ভালো করে জানতাম কিছুই ঘটবে না মিষ্টিদিদির। বেশ জানতাম, মিষ্টিদিদির লোহার হার্ট। ভালো করে জানতাম, মিষ্টিদিদি আর যা-ই হোক—মিষ্টি নয় মোটেই। তবু গেছি মিষ্টিদিদির বাড়িতে। মিষ্টিদিদির জন্মদিনের নিমন্ত্রণ আমি এড়াতে পারিনি কখনও।

এই গত বছরেও আবার মিষ্টিদিদির জন্মদিনে কলকাতায় এসেছিলাম।

ভালো করেই জানতাম—মিষ্টিদিদি তেমনি ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। পায়ে সুড়সুড়ি দেবে ঝি। সিল্ক, সেন্ট, জর্জেট, স্নো, পাউডারে মুড়ে সেজেগুজে চুপ করে থাকবে। তেমনি প্রতিবারের মতোই উপহার দেব গিয়ে। রাখবো গিয়ে তেপায়া টেবিলের উপর। বলবো, কেমন আছো মিষ্টিদিদি?'

মিষ্টিদিদি তেমনি করেই বলবে, 'আমার আর থাকা, আর তো দুটো দিন পরেই তোদের ছুটি দিয়ে যাবো রে!'

বলে মিষ্টিদিদি তেমনি করেই ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে চকোলেট চুষবে আর আরামে গা এলিয়ে দেবে প্রতিবারের মতো। সত্যি, সৃষ্টিকর্তা যেন মিষ্টিদিদিকে অক্ষয় পরমায়ু দিয়ে পাঠিয়েছিল এ সংসারে।

কিন্তু গতবারের জন্মদিনে মিষ্টিদিদি সত্যি সত্যিই আমায় অবাক্ করে দিয়েছিল।

হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের বাড়িতে গিয়েও প্রথমে টের পাইনি।

তেমনি চাকর-বাকর-ঝি-মালী সবই ছিল। কিন্তু সেই পরিচিত ইজি-চেয়ারটা খালি।

একজন ঝিকে দেখতে পেয়ে জিগ্যেস করেছিলাম, 'মিষ্টিদিদি কোথায়?'

ঝি বললে, 'ঘরে শুয়ে আছেন—অসুখ করেছে।'

জিগ্যেস করলাম, 'অসুখ কবে হল?'

ঝি বললে 'কাল থেকে। হঠাৎ পড়ে গেছেন কাল।'

তা সত্যি অসুখ হয়েছিল মিষ্টিদিদির। ঘরে গিয়ে দেখি চিত হয়ে শুয়ে আছে খাটের উপর। সমস্ত দেহটা অসাড়। অনড়। ধরে পাশ ফেরাতে হয়। মুখ তুলে খাইয়ে দিতে হয়। সমস্ত অঙ্গ শিথিল হয়ে গেছে। প্যারালিসিসে

একেবারে পঙ্গু করে দিয়েছে মিষ্টিদিদিকে। তবু তারই মধ্যে কেউ বুঝি পাউডার, স্নো, রুজ, লিপস্টিক মাখিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে রেখেছে। পায়ে কোনো সাড় নেই। তবু একজন ঝি পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে নিচেয় বসে বসে।

বরাবরের অভ্যাস মতো বলেছিলাম, 'কেমন আছ মিষ্টিদিদি?'

মিষ্টিদিদি আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল, কিছু কথা বলতে পারেনি। শুধু ঠোঁট দুটো যেন ঈষৎ নড়তে লাগলো। মনে হল যেন বলতে চাইছে,—আমার আর থাকা-থাকি···আমার আর ক'টা দিন ··ক'টা দিন পরেই তোদের ছুটি দিয়ে যাবো···এবার সত্যি আর বেশিদিন নয়···

মিষ্টিদিদির চোখ দিয়ে জল পড়ে পাউডার-স্নো ধুয়ে গেল। মিষ্টিদিদির চোখে সেই প্রথম জল দেখলাম জীবনে। কিন্তু তবু আমার মনে হয়েছিল—মিষ্টিদিদি যেন এখনও মিথ্যে কথা বলছে, ধাপ্পা দিচ্ছে আমাদের—এ-ও যেন ভান, এ-ও যেন মিষ্টিদিদির নতুন একরকমের ছল। একেবারে না মরলে আর মিষ্টিদিদিকে যেন বিশ্বাস নেই।

আজ ভাবি কোথায় গেল সেই মিষ্টিদিদি। আর কোথায় গেল সেই সোনাদি।

লিখতে লিখতে আজকাল অনেক সময় অন্যমনস্ক হয়ে যাই। অনেক সময় তলিয়ে যাই নিজের ভাবনার সমুদ্রে। একদিন লেখক হতে পারবো এ-কথা কি সেদিন ভাবতে পারতাম। লোলুপ নয়নে চেয়ে দেখেছি শুধু পরের বই-এর দিকে। ছাপা হয়েছে কত লোকের গল্প কত মাসিক-সাপ্তাহিকের পাতায়। কত লেখা পড়ে কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলে উঠেছে। আর ক্ষোভ হয়েছে, ঈর্ষা হয়েছে মনে মনে কবে আমি এমন লেখা লিখতে পারবো। আমার লেখা পড়ে কবে এমনি করে অন্য পাঠকরা কাঁদবে, হাসবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলে যাবে। কিন্তু কোথায় গেল সে সব লেখা আর সে-সব লেখক। নিজে ভুলঠিকানার চিঠির মতন শুধু এক দেশ থেকে আর-এক দেশে ঘুরেছি। এক ঘাট থেকে জীবনের আর এক ঘাটে। দশটা স্কুল ছুঁয়ে তবে স্কুলজীবনের শেষ পরীক্ষাটাই উৎরোতে পেরেছি। তখনো কি জানি শুধু স্কুলের পরীক্ষাটা শেষ পরীক্ষা নয়। জীবনের শেষ পরীক্ষার চৌকাঠ পার হতে অক্লান্ত সাধনা চাই। কিন্তু সোনাদি না জানালে সে-কথা কি আমিই জানতাম কোনোদিন। তখনো শুধু জানি সম্পাদকের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকলেই লেখা ছাপানো যায়। প্রকাশকের আত্মীয় হলেই বই ছাপা হয়। অর্থবান হলেই পরমার্থ লাভ হয়। কিন্তু সোনাদি আমায় শেখালে জীবনের আর একটা দিকের কথা। সোনাদি-ই আমাকে প্রথম স্বীকার করলো বলা যায়।

অথচ সোনাদির সঙ্গে পরিচয় সে-ও এক আকস্মিক ব্যাপার বৈকি।

অমরেশ-ই তো আমায় প্রথম পরিচয় করিয়ে দিলে। সেই অমরেশ! অমরেশের গল্প বলার ক্ষেত্র এটা নয়। 'কন্যাপক্ষ'তে শুধু নারী-চরিত্রের দিকটাই বলবো ভেবেছি। কিন্তু অমরেশের কথা যেদিন লিখবো সেদিন

আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতা উজাড় করে ঢেলে দিতে হবে। অমরেশ নিজেও কোনোদিন জানতে পারেনি আমার কী পরম উপকার সে করেছে।

অমরেশই একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, 'সোনাদি জানো, এ কবি—'

সোনাদিও ঠাট্টা হিসাবে ধরেছিল প্রথমে। বলেছিল, 'পদ্য লিখিস বুঝি ?'

বললাম, 'পদ্য নয়, গল্প।'

'গল্প ?' শুনে সোনাদি কিন্তু হাসেনি। অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। আর কিছু বলেনি।

কোথায় গেল সেই অমরেশ। কোথায় গেল অমরেশের ক্লাবের অন্য সব বন্ধুরা। সোনাদির বাড়ির সামনে বাগানের এককোণে ছিল অমরেশের আখড়া। আমরা ছিলাম অমরেশের সাকরেদ। ডাম্বেল ভাঁজতুম, মুগুর ঘোরাতুম। তারপর যথানিয়মে যখন ক্লাব ভেঙে গেল, সবাই ছিটকে গেল যে যার দিকে, আমিই শুধু রয়ে গেলাম টিঁকে। সোনাদির সঙ্গে আমার যোগাযোগ রয়েই গেল বরাবর।

সত্যি যদি কোনোদিন আমার লেখক-জীবনের জন্মকথা লিখি তো সেদিন সোনাদির কথা আগে লিখতে হবে। সোনাদি না হলে আমার লেখক-জীবনের অনেকখানিই যে বাদ পড়ে যেত। মফস্বলের একটা গরীব ছেলেকে সোনাদি যে কী দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিল কে জানে। অথচ সোনাদি আসলে আমার কে। কেউ না। আমার সমসাময়িক যারা তাদের এক-একখানা করে চোখের ওপর দশ-বারোখানা বই বেরিয়ে গেল। নাম-ধাম হল তাদের। আমার একখানাও বই নেই।

সোনাদি বলতো, 'তা না থাক্, আগে হাতটা ভালো করে পাকুক—তারপর...'

এক একটা গল্প লিখে নিয়ে পড়িয়ে শোনাতে যেতুম সোনাদিকে। বলতাম, 'এবার হাত পেকেছে ?'

সোনাদি বলতো, 'না, এখনও ঢের দেরি—জাত-উপন্যাস লিখতে এখনো অনেক দেরি হবে তোর।'

মনে আছে সেইসব দুপুরগুলোর কথা। চারিদিকে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। সমস্ত কলকাতা খালি। রাস্তায় একটা ফেরিওয়ালা নেই। একলা-একলা একটা সাইকেল নিয়ে চলেছি পত্রিকার অফিসে। গল্পটা কি তাদের পছন্দ হয়েছে। এ-পত্রিকার অফিস থেকে সে-অফিস। তারপর আর একটা অফিস। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে। অশান্ত একটি ছেলে সারা কলকাতা সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। একটা লেখা ছাপা হোক, দশজনে ভালো বলুক। আমার খ্যাতি হোক। আমার খ্যাতিতে আমার বংশের মুখ উজ্জ্বল হোক। এইটুকু শুধু। আর কিছু কামনা নয়।

সে-সব দুপুরে সোনাদি ঠাণ্ডা ঘরের ভেতর বসে ইজি-চেয়ারে ভিজে চুল এলিয়ে দিয়েছে। হাতের বই-এর পাতাগুলো পাখার বাতাসে ফর ফর্ করে

উড়ছে। আর বাইরের বাগানে আমগাছটার ডালে একটা কাদের ঘুড়ি এসে আটকে গেছে। বাগানের সবুজ পরিবেশে লাল-নীল রঙের ঘুড়িটা যেন একটা বেখাপ্পা ছন্দপতনের মতন আটকে আছে। সোনাদির পাড়াটার জাতই আলাদা। সকাল-বিকেলেও নিরিবিলি। হাটে বাজারের থলি নিয়ে পথচারীর আনাগোনা বড় নেই। যা-কিছু শব্দ তা মোটরের। ওটা বিশেষ করে মোটর-বিহারীদেরই পাড়া। আর আমি? আমি ওই আমগাছটার দোদুল্যমান ঘুড়িটার মতোই ও-বাড়িতে একমাত্র অতিথি। ক্ষণে অ-ক্ষণে ওখানে আমার গতি অবারিত।

শব্দ পেয়ে সোনাদি জিগ্যেস করছে, 'কি রে—'

'আমি—'

'ও, আয়—' বলে সোনাদি আবার ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়েছে।

আবার ফিরে বলেছে, 'আর কী লিখলি—

সোনাদি জানতো লেখার কথা বলতে পেলে আমি আর কিছুই চাই না। লেখাই তখন আমার জপ তপ নিদিধ্যাসন। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি কাগজ বেরিয়ে আসে তখুনি। পাঁচ-সাতটা গল্প আমার পকেটে আছেই। একটা বসবার জায়গা, একজন মনোযোগী শ্রোতা পেলেই আমি খুশি। আমি জীবন দেখবো। জীবন দেখাবো। যে-কথা লাজুক মুখচোরা মন কাউকে বলতে পারে না, যে কথা একা ঘরের চার-দেওয়ালের মধ্যে মাথা কোটে—আড্ডায়, সমাজে, সভায় বেরোতে আড়ষ্ট হয়ে যায়, সেইসব কথা সস্তা তিনটাকা দামের ব্লাকবার্ড ফাউন্টেন পেনের ডগায় কেমন অবলীলায় বেরিয়ে আসে। বলতে চায়,—আমি লাজুক হলেও সব বুঝি। আমাকে যতটা বোকা ভাবো আমি তা নই। আমি তোমাদেরও চিনি। যারা নিজেদের চেনো না, তাদের আমি চিনিয়ে দেব। যারা বোবা, তাদের আমি কথা ফোটাবো। আমি শিল্পী। আমি সাহিত্যিক।

সোনাদি-ই আমাকে একমাত্র ভালো করে বুঝতে পারতো।

বললাম, 'ওরা ও-গল্পটা ছাপবে বলেছে, সোনাদি—'

সোনাদি অবাক্ হয়ে যেত। বলতো, 'ছাপবে?'

'বা রে, কেন ছাপবে না, ওদের কাগজে যে-সব লেখা বেরোয় তার থেকে তো ভালো গল্প হয়েছে—'

'তা হোকগে ভালো, সেই তারাই কি তোর আদর্শ'। একদিন তোকে মহাভারত লিখতে হবে না? একদিন পৃথিবীর মানুষ আর পৃথিবীর জীবন নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না? কে কী ছাপলো কী ছাপলো না, কার চেয়ে ভালো হল, এ-কথা তুই ভাববি নাকি?'

বললাম, 'আমি থাকি সেই কোথায়, গিয়ে খোঁজ-খবর না নিলে ওরা যে ফেলে রাখবে—জানা-শোনা লোকদের লেখাই ছাপবে আগে—'

সোনাদি বলবে, 'একদিন তোর কাছে সবাই ছুটে আসবে এমনি লেখা

'লিখতে চেষ্টা করিস দিদিকিন—যা কিছু দেখেছিস্, দেখছিস্, সব লিখে রাখ ; যা কিছু ভাবছিস্, পড়ছিস্, সব টুকে রাখ—সেদিন কাজে লাগবে।'

তারপর হাতের বইটাকে পাশের টেবিলের ওপরে রেখে দিয়ে সোজা হয়ে বসতো।

বলতো, 'মানুষকে আগে ভালো করে চিনতে শেখ, ক'টা মানুষকে দেখেছিস তুই, আব বয়েসই বা তোর্ কত—যাদের সঙ্গে পাশাপাশি কাটিয়েছিস, একসঙ্গে দিনরাত একঘরে কাটাস, তাদেরই কি ভালো করে চিনিস বলে গর্ব করতে পারিস—এই যে এতদিন আমার সঙ্গে আলাপ তোর, কতদিন দুপুরবেলা আমার কাছে গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিস—আমাকেই কি চিনতে পেরেছিস তুই ?'

হঠাৎ আমাকে ভাবিয়ে তুলতো সোনাদি। সোনাদিকে কি চিনি! সোনাদিব সবটুকুকে! যে মানুষটা এই দুপুরবেলা চুল এলো করে দিয়ে ইজি-চেয়ারে বসে আছে। যে-মানুষটা ধৈর্য ধরে আমার লেখাগুলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা শোনে। উৎসাহ দেয়, নিরুৎসাহ করে। কাছে টেনে নেয়, দূরে সরাতে দ্বিধা ববে না। যে-মানুষটা বাইরে এত স্থির, ভেতরে এত অশান্ত। যে-মানুষটা বুদ্ধি, বিদ্যে, ফ্যাশন, সমস্ত নিঃশেষ করে দিয়েছে একটা জীবনে। যে সংসাব করে, এ গৃহের গৃহিণী, অথচ এ বাড়ির কাবো স্ত্রী নয়! যে-মানুষ একদিন নিজের সংসার, স্বামী পরিত্যাগ করে এসেছে এক সামান্য কারণে! যে মানুষটা এতগুলো সন্তান মানুষ করেছে, অথচ আইন-মাফিক মা নয় এদের। যে-মানুষ পার্টি দেয়, সে-পার্টিতে নিমন্ত্রিত হবার গৌরবে যে-কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোক গৌরবান্বিত বোধ করে!

দাশসাহেব বলতেন, 'আমাকে বলা মিথ্যে, ওসব সোনা-ই জানে—

অভিলাষ ছিল দাশসাহেবের চাকর। চা নিয়ে এলে বলতেন, 'এই তো চা খেলাম, আবার কেন—'

অভিলাষ বলতো, 'চা তো আপনি খাননি আজ—'

চটে উঠতেন দাশসাহেব, 'আলবত খেয়েছি। জিগ্যেস কর তোর মাকে—'

সোনাদি এসে বলতো, 'কী হল আবার—'

'দেখো তো সোনা, অভিলাষ বার বার আমাকে চা খাইয়ে মারতে চায়, ব্লাডপ্রেসারটা কত করে কমাবার চেষ্টা করেছি—'

ছুটিতে ছেলেমেয়েরা বাড়িতে এসে কোনোদিন বায়না ধরলে বলতেন, 'আমাকে না—ওসব তোমরা মা-কে বলো গিয়ে!'

অফিসে গিয়ে দুপুরবেলা টেলিফোন করতেন, 'আজকে কী খাবো সোনা—'

সোনাদি একদিক থেকে বলতো, 'কেন রোজ যা খাও, টোম্যাটোর সুপ আর দু'স্লাইস ব্রেড—'

'না, আজকে চিকেন-রোস্ট করেছিল এখানে, খাবো একটু—'

'না, ডাক্তারকে প্রেসারটা দেখিয়ে তারপর খেয়ো যত পারো।'

জব্বলপুর থেকে স্বামীনাথবাবু লিখতেন, 'তুমি কিছু ভেবো না, পুটুর জ্বর ছেড়েছে। কালকে নিরানব্বুই ছিল, আজ আটানব্বুইতে নেমেছে। ডাক্তার ভাদুড়ি বলছেন,—টাইফয়েড রোগ সেরে ওঠার পর কোথাও চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া ভালো। ভাবচি অফিসে ছুটি নিয়ে কিছুদিন কোথাও ওকে নিয়ে যাবো—একেবারে রোগা হয়ে গেছে, তুমি দেখলে আর চিনতে পারবে না—'

খাবার টেবিলে সোনাদি একঘন্টা ধরে বসে বসে খেতো। তখন সবাই বাড়ির বাইরে। দাশসাহেব মাঝে মাঝে অফিস থেকে টেলিফোন করতেন। আর আমি তখন আমার গল্প-লেখার খাতা নিয়ে পড়িয়ে শোনাচ্ছি। একটা গল্প শেষ হলে আর একটা। এ একদিন নয়। সোনাদির সঙ্গে আলাপ হওয়ার প্রথম দিন থেকে কেমন যেন ভালো লাগতো। যখন কলকাতায় কেউ আমাকে চিনতো না, তখন একমাত্র সোনাদির কাছ থেকে কী সাহায্যই না পেয়েছি। তবু সত্যিই কি সোনাদিকে চিনতে পেরেছি। কিম্বা চিনতে চেষ্টা করেছি। শুধু জানতাম, সোনাদি দাশসাহেবের বিয়ে-করা স্ত্রী নয়। সে-কথা দুজনকে দেখে কিন্তু বোঝা যেত না। তিনটি মেয়েকে দেখেও বোঝা যেত না। সোনাদির আচার ব্যবহারে সমাজে-সভায় মেলামেশাতেও কেউ ধরতে পারতো না। বাড়ির চাকরঠাকুরের ব্যবহারেও সেজন্যে কিছু তারতম্য ছিল না। তেমনি সহজে স্বাভাবিক সুস্থ সম্পর্ক, যেমন আমার নিজের বাড়িতে দেখেছি। মাথার সিঁথিতে সিঁদুর। পায়েও আলতা। সাহেবী খানা ছিল বটে, কিন্তু সোনাদির জন্যে কুলের অম্বল কিম্বা ডাঁটা-চচ্চড়ি রান্না হত মাঝে মাঝে।

আর ওদিকে স্বামীনাথবাবু মাঝে মাঝে চিঠি লিখতেন সোনাদিকে। আমার কাছে সোনাদির কিছুই গোপন ছিল না। সে সব চিঠি বাইরেই পড়ে থাকতো। কোনোটাতে লিখতেন, 'একজন লাইফ-ইন্সিওরের এজেন্ট এসেছিল —আর কি লাইফ-ইন্সিওর করবো?'

সোনাদি লিখতো, 'লাইফ ইন্সিওব না করে বরং বাড়িটা সারাও, কিম্বা কলকাতায় একটা বাড়ি করো। চাকরি থেকে রিটায়ার করে তখন কী করবে—'

তিনি লিখতেন, 'তোমার কথামতো দুধ খাওয়া সুরু করেছি এবার।'

সোনাদি লিখতো, 'আসছে মাস থেকে দুধ খাওয়া আরো বাড়াবে—আধসের নিজের জন্যে রাখবে।'

এমনি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর!

যখন সোনাদির সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল তখন এ-সব কৌতূহল ছিল না। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকেও যে এক-বাড়িতে একঘরে বাস করতে হয়, এ-সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা ছিল না। একবার মনে হয়নি সোনাদির স্বামী কেন জব্বলপুরে থাকেন। তিনিও কেন একবার আসেন না এখানে। কিম্বা সোনাদিই বা একবার জব্বলপুরে যায় না কেন? স্বামীনাথবাবুই যদি

সোনাদির স্বামী তো দাশসাহেব কে? দাশসাহেব এ বাড়ির কে? সোনাদির সঙ্গে দাশসাহেবের সম্পর্কটা কিসের? বেশিদিন যাতায়াত করতে করতে, বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এ-সব সম্বন্ধে যখন কৌতূহল হবার কথা তখন সোনাদির ব্যবহারে এত মুগ্ধ হয়ে গেছি যে, ও সব কথা আর ভাববার অবসর পাইনি। সোনাদি যে কাকে বেশি ভালোবাসতো ধরা শক্ত। একবার মনে হত তার নিজের স্বামীকে, আর একবার মনে হত দাশসাহেবকে। আবার কখনও মনে হত—আমাকে!

সেই স্বামীনাথবাবুর সেবার হঠাৎ অসুখের খবর এল। এখন যায়, তখন যায়। সোনাদির কাছে গিয়ে বসে থাকি। ওদিক থেকে টেলিগ্রাম আসে আর এদিক থেকে টেলিগ্রাম যায়। আমি চুপচাপ শুধু বসে থাকার বেশি আর কি করতে পারি!

স্বামীনাথবাবু চাকরি করতেন জব্বলপুরে। জব্বলপুরের পোস্টাপিসের ছাপমারা চিঠি এলেই আমি জব্বলপুরের কথা ভাবতে বসে যেতুম। জব্বল-পুরেও কতদিন ছোটবেলায় কাটিয়েছি। জব্বলপুরের কালোজামদিদির কথা, মিছরি বৌদির কথা মনে পড়তো আমার। মনে পড়তো নেপিয়ার টাউনে কালোজামদিদির বাড়িতে আমাদের সেই ফুটবল খেলার কথা! সেই 'মনোহর-দি-মাকালফলে'র কথা! সব মনে পড়ে যেন। সেই মনোহরের সঙ্গে সেদিন এতদিন পরে হঠাৎ দেখাও হয়ে গিয়েছিল।

সোনাদির কথা পরে বলবো। তার আগে জব্বলপুরের গল্পটা বলে নিই। জব্বলপুরের মনোহর। মনোহর মানেই আমাদের নেপিয়ার টাউনের কালোজামদিদি।

প্রথম প্রথম কলকাতায় এসে সোনাদিকে দেখে আমার কেবল কালোজাম-দিদিকেই মনে পড়তো। মনে হত কালোজামদিদি আর সোনাদির সঙ্গে যেন কোনও তফাত নেই। যেন দুইজনেই একরকম। কিন্তু আরো ভালো করে চেনবার পর বুঝলাম, আমারই ভুল। সোনাদিকে বাইরে থেকে যা মনে হত, আসলে তা নয়। আর কালোজামদিদি?

ছোটবেলাটা আমার জব্বলপুরেই কেটেছে। কলকাতায় এসে যেমন আমার সোনাদি হয়েছে, জব্বলপুরে তেমনি ছিল আমার কালোজামদিদি। সেদিন হঠাৎ রাস্তায় মনোহরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় কালোজামদিদিকে আবার বেশি করে মনে পড়লো।

আমার চরিত্রের একটা মুদ্রাদোষ আছে। হ্যাঁ, মুদ্রাদোষ ছাড়া আর কী বলবো! রাত্রে ঘুম আসবার আগে সারাদিনের ঘটনাগুলো একবার ভেবে নিই। কোন্ লোকের সঙ্গে দেখা হল, কার সঙ্গে কী কী কথা হল, কোন্ নতুন বই পড়লাম, নতুন কী শিখলাম—সমস্ত দিনের লাভ-লোকসানের হিসেবটা এই বিছানায় শুয়ে শুয়ে একবার খতিয়ে নি রোজ। কিন্তু প্রতিদিন এই ধারণা নিয়েই ঘুমোই যে মনে রাখবার মতো কিছুই ঘটেনি, কিছুই করিনি বা শেখবার

মতো কিছুই পাইনি। প্রতিদিন একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি হয়। তবু চরিত্রের এই মুদ্রাদোষ আজও ছাড়তে পারিনি আমি।

সেদিন কিন্তু এর ব্যতিক্রম হল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়লো, আজ তো সকালবেলা মনোহরের সঙ্গে দেখা হয়েছে। মনোহর-দি-মাকালফল! স্কুলে কী আকাট ছিল মনোহর। এখনও কিন্তু মনোহর চেহারাটা সেইরকমই রেখেছে। নিখুঁত নিভাঁজ স্যুট সদ্য দাড়িকামানো মুখের সেই গ্রীসিয়ান কাট্, একটা পাকও ধরেনি চুলে, দামী সিগ্রেট মুখে। গরীবের ছেলে মনোহর—কিন্তু ছোটবেলা থেকেই ওকে দেখে তা বোঝবার উপায় ছিল না।

চৌরঙ্গীর একটা হোটেল থেকে বেরুচ্ছিল। প্রথমটায় না চিনতে পারারই কথা। অনেক দিন দেখিনি। আমাকে দেখে থেমে গেল, 'আরে! চিনতে পারিস—?'

ভালো করে চেয়ে দেখলাম। মনোহর-দি মাকালফল! কিন্তু হয়ত এখন একটা-কিছু করছে নিশ্চয়ই। এতবড় হোটেলে থাকবার মতো সামর্থ্য তা না হলে হল কী করে! যুদ্ধে অমন কত রত্নই তো তরে গেছে—মনোহরও হয়ত তেমনি একটা কিছু বাগিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যেই। বলা যায় না।

আমার হাত দুটো ধরে একটা ভীষণ ঝাঁকুনি দিলে মনোহর। বললে, 'ছাড়বো না তোকে আজ—তুই তো রীতিমতো ফেমাস্ হয়ে উঠেছিস রে।'

বললাম, 'কী করছিস আজকাল?'

মনোহর দুটো হাতের পাতা চিত করে কাঁধ দুটো নাচিয়ে বললে, 'কিচ্ছু না।'

তারপর একটা চল্তি ট্যাক্সিকে থামিয়ে বললে, 'আয়—চলে আয়'।

অবাক্ হয়ে গেলাম। বললাম 'কোথায়?'

মনোহর বললে, 'আয় না, কোনও কাজ নেই তো তোর—গল্প করবো।'

আরো অবাক্ হয়ে গেলাম। মনে আছে, আমাদের সকলের দাতব্যের ওপর নির্ভর করেই মনোহরের চলতো। ইস্কুলের জলখাবারটার জন্যে আমাদের ওপরেই নির্ভর করতে হয়েছে ওকে। জামা কিনে দিত ওর কোন্ মামা, জুতো কিনে দিত ওর কোন্ পিসেমশাই, স্কুলের মাইনেও দিত কোন্ জামাইবাবু। কিন্তু দাতব্যের ওপর নির্ভর করে বাবুয়ানি করা একমাত্র বোধহয় ওই মনোহরকেই দেখেছি। কিম্বা হয়ত ওর চেহারার গুণে সাদাসিধে পোশাকও জমকালো হয়ে উঠতো ওর গায়ে।

পকেট থেকে পার্স বা'র করে মনোহর ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিলে। তারপর একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়লো আমাকে নিয়ে। লম্বা লম্বা দামী অর্ডারও দিয়ে বসলো। খেতে খেতে আবার বললাম, 'কী করছিস আজকাল?'

একটা সিগ্রেট ধরিয়ে লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে মনোহর বললো, 'কিচ্ছু না।' তারপর আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'দেখে অবাক্ হচ্ছিস বুঝি,

এসব কোত্থেকে আসছে ? তোরা তো বলতিস, মনোহর-দি-মাকালফল ! এখন মাকালফলের কদর বেড়েছে রে।'

তবু কৌতূহল মিটলো না। বললাম, 'এসব কার টাকা ? কোত্থেকে পেলি ? কে দিচ্ছে ?'

মনোহর বললে, 'কালোজামদিদি।'

কালোজামদিদি ! কালোজামদিদি বেঁচে আছে এখনও ! সে কত দিনকার কথা।

মনোহর বললে, দাঁড়া, পেটে খানিকটা ঢালি আগে, চুমুক দিতে দিতে বলব সব তোকে—সেই গল্প বলতেই তো তোকে ডেকে এনেছি এখানে। তুই খাস তো, না সেইরকম সাধু হয়ে আছিস এখনও ?'

সেদিন রাত্রে একা বিছানায় শুয়ে শুয়ে কালোজামদিদির চেহারাটা ভাবতে চেষ্টা করলাম। সেই কালোজামদিদি। এখন বয়স নিশ্চয়ই ষাটের কাছাকাছি। ছোটবেলায় বার বার আমার মনে হত—কালোজামদিদির নামটা কে রেখেছে ! কিন্তু যে-ই রাখুক, তার রসজ্ঞান আছে বলতে হবে। কালোজামদিদিকে দেখতাম বারান্দার ওপর একটা দোলনায় পা ঝুলিয়ে বসে দুলছে। ফরসা ধবধব করছে মুখটা। সামনের বাগানের ওপর আমরা খেলতে খেলতে দেখেছি কালোজামদিদি দোলনায় দুলতে-দুলতে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। ফুটবলটা যদি কখনও গড়াতে গড়াতে গিয়ে কালোজামদিদির কাছাকাছি গিয়ে পড়তো, আমি ছুটে যেতাম বলটা কুড়োতে। তার কাছে গেলেই কেমন একটা সুন্দর গন্ধ আসতো নাকে। আজ পর্যন্ত অন্য কারো শরীরে সে-গন্ধ পাইনি। সিল্কের শাড়ির খসখস শব্দের সঙ্গে সেই সুন্দর সুস্পষ্ট গন্ধ আর কোথাও পাইনি কখনও। বলটা যদি তার পায়ে গিয়ে ঠেকতো কোনোদিন তো সমস্ত শরীরে কেমন রোমাঞ্চ হ'ত। ময়লা ধুলোমাখা ফুটবলটাকে বুকে করে বাড়ি ফিরতাম সেদিন !

এক এক দিন কালোজামদিদির মেজাজ কী জানি কেন খুব ভালো হত। আমাদের ডেকে বলতো, 'যে দৌড়ে ফার্স্ট হতে পারবে, তাকে এই কমলালেবুটা দেব।'

আমরা পনেরো-ষোলজন ছেলে লাইন বেধে দাঁড়াতাম। কালোজামদিদি সংকেত করলেই সবাই একসঙ্গে দৌড়ুবো। আমার স্বাস্থ্য বরাবরই খারাপ। দৌড়-ঝাঁপের মধ্যে আমি বিশেষ যেতে পারি না। আমি জানতাম আমি হেরে যাবো। কিন্তু কেন জানি না, ঐ কমলালেবুটার লোভে কিনা, কিংবা কালোজামদিদির হাতের ছোঁয়া পাবো বলে কিনা, সমস্ত শরীরে একটা উত্তেজনা অনুভব করতাম।

সত্যি সত্যিই যখন সকলকে হারিয়ে ফার্স্ট হতাম—সে যে কী অনুভূতি ! আমার ফার্স্ট হওয়াটা কেউ আশা করেনি। কালোজামদিদিও না। তাই মুখটা তত প্রসন্ন নয় তার। তবু মনে আছে, প্রথমবার কালোজামদিদির হাত

থেকে কমলালেবুটা নিতে গিয়ে যেন সামলাতে পারিনি। সেই ইজি-চেয়ারে-বসা কালোজামদিদির গায়ের ওপরেই পড়ে গিয়েছিলাম।

কালোজামদিদি হঠাৎ আমাকে ধরে ফেলেছিল। বললে, 'কি রে, এত হাঁপাচ্ছিস কেন?'

আমার তখন বয়েস দশ এগারো বছর আর কালোজামদিদির হয়ত প'য়ত্রিশ। আমি মুখটা তখনও কালোজামদিদির শাড়ির মধ্যে গুঁজে পড়ে আছি। অত-গুলো ছেলের সামনে কালোজামদিদি আমাকে দুই হাতে ছাড়িয়ে নিয়ে জোরে গাল টিপে দিয়েছিল; বলেছিল, 'কী হাবা ছেলে রে, দিলি তো আমার শাড়ি ময়লা করে?'

সেইদিন থেকে সুবিধে পেলেই কালোজামদিদির কাছে-কাছে ঘোরাফেরা করতাম। তারপর একদিন আবার কালোজামদিদি চলে যেত শ্বশুরবাড়ি। এলাহাবাদে না কোথায় ছিল শ্বশুরবাড়ি। কালোজামদিদির স্বামীকে কখনও দেখিনি। কিন্তু লীলাকে দেখতাম। কালোজামদিদির একমাত্র মেয়ে লীলা। ঠিক যেন কালোজামদিদির ছোট সংস্করণ। আমাদের বয়সী। যখন কালো-জামদিদি চলে যেত, কিছুতেই ভালো লাগতো না।

বাড়ির চাকর-বাকরদের জিগ্যেস করতাম, 'কালোজামদিদি কবে আসবে রে?'

জ্যাঠামশাই নিচে নামতেন না। তাঁর কাছে যেতে ভয় করতাম। বিরাট মার্বেল পাথরের বাড়ি। কালোজামদিদি চলে যাবার পর অতবড় বাড়িটা যেন একেবারে জনশূন্য হয়ে যেত। আমরা পাড়ার ছেলেরা জ্যাঠামশাই-এর বাগানে গিয়ে খেলতাম। ওইটেই ছিল খেলার জায়গা। ও-বাড়ির সঙ্গে পাড়ার ছেলেদের যে কিসের সম্পর্ক তা বোঝা যেত না। তবু জব্বলপুরের নেপিয়ার টাউনের সেই মার্বেল পাথরের বাড়িটার সামনে বাগানটাই ছিল আমাদের সমবয়সী ছেলেদের একমাত্র খেলার জায়গা।

একদিন মনোহর বললে, 'এই, কাল কালোজামদিদি আসছে।'

বললাম, 'কি করে জানলি?'

কিন্তু আর কিছু ভাঙলো না মনোহর। সে-রাতটা যে কী করে কাটলো। কালোজামদিদি আসা মানে আবার সেই রোমাঞ্চ। বাগানের গাছগুলো আবার ছাঁটা হল। ঘর-দোর সাফ করা চলতে লাগলো। জ্যাঠামশাই-এর গলা শোনা গেল দু-একবার। আর পাখি? পাখিও দেখি যেন সেজে-গুজে বেড়াতে বেরুচ্ছে চাকরের সঙ্গে। কালোজামদিদির নিজেরই ভাই পাখি। আমাদেরই বয়সী। হাবা গোবা, কথা বলতে পারে না, হাসলে মনে হয় যেন ভেঙচি কাটছে। জ্যাঠামশাই-এর একমাত্র মেয়ে কালোজামদিদি আর একমাত্র ছেলে পাখি। চাকরের সঙ্গে দিনরাত থাকে পাখি। ঐ বিকলাঙ্গ ছেলেটার জন্মের পরেই নাকি কালোজামদিদির মা মারা যায়।

বম্বে-মেল আসবার সময় একলা চুপি চুপি গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি স্টেশনের-

কাছে। কালোজামদিদিএই ট্রেনেই আসবে। কেমন যেন থরথর করে কাঁপছিলাম।

কালোজামদিদি একলা ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কামরা থেকে নামলো। আমাকে দেখে বললে, 'কী রে, চিনতে পারিস?'

তারপর পাশে চেয়ে বললে, 'আরে, মনোহর এসেছে যে—আর ফটিক, তুইও?'

চারদিকে চেয়ে দেখি, আমাদের দলের সবাই এসেছে। কেউ কাউকে বলিনি।

কালোজামদিদি আবার বললে, 'বল খেলা আছে বুঝি এদিকে?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

ফটিক বললে, 'না কালোজামদিদি, তোমাকে দেখতে এসেছি।'

'তাই নাকি' বলে ফটিকের গালটা জোরে টিপে দিয়ে একগাল হেসে উঠলো কালোজামদিদি।

পাখিকে নিয়ে জ্যাঠামশাই-এর গাড়ি এসেছিল স্টেশনে। কালোজামদিদি তাইতে চড়ে চলে গেল। কিন্তু আমি যেন তখনও কালোজামদিদির গায়ের সেই অদ্ভুত গন্ধ বুক ভরে টানছি।

এক এক বার কালোজামদিদির সঙ্গে লীলাও আসতো। তারপর আমাদের বল খেলা চলতো দ্বিগুণ উৎসাহে। লীলা বুঝি দার্জিলিং না কার্শিয়াং-এ কোন্ মিশনারী স্কুলে পড়তো। ছুটিতে আসতো এলাহাবাদে মায়ের কাছে। যে ক'দিন কালোজামদিদি থাকতো নেপিয়ার টাউনের বাড়িতে, ক'দিন আবার পেতাম সেই গন্ধ। সারা বাড়িটাতে সেই গন্ধ ভুরভুর করতো।

নানা ছুতো করে সকালবেলাও গেছি কালোজামদিদির কাছে। সকালবেলাটা বড় ব্যস্ত থাকতো কালোজামদিদি। জ্যাঠামশাই-এর চাকর দুখ্-মোচন একটা শিলের ওপর অনেকগুলো কমলালেবু বাটছে। খোলাসুদ্ধ সেই কমলালেবুর রস গরম জলে সেদ্ধ হবে, আর তাই দিয়ে কালোজামদিদি স্নান করবে। অলিভ-অয়েল থাকতো বোতল ভরা। সেই অলিভ-অয়েল মাখা চলতো সকালবেলা দু'ঘণ্টা ধরে, তারপর সেই কমলালেবুর রস মাখানো গরম জলে স্নান। বাথরুমে যে কত রকমের সাবান! স্নান করতে যাবার মুখে তোয়ালে নিয়ে কালোজামদিদির আয়া দাঁড়িয়ে থাকতো বাথরুমের দরজায়। তারপর সেই স্নান চলতো বেলা দশটা পর্যন্ত। যখন বেরুত কালোজামদিদি, সে এক অন্য মানুষ।

বাড়ির মধ্যে আমাকে দেখে কালোজামদিদি জোরে গাল টিপে দিত, 'হাঁ করে কী দেখছিস রে হাবা ছেলে—লেখাপড়া নেই? স্কুলে যাবি না?'

'বা রে, আজ যে রোববার।'

তখনকার সেই অল্পবয়েসে মনে আছে—আমাদের সকলের কাছে কালো-জামদিদি ছিল একটা স্বপ্ন, একটা বিস্ময়! লেখাপড়া, ঘুম, খেলা সমস্তর মধ্যে কালোজামদিদি কেমন আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল।

কালোজামদিদিকে ঘিরেই আমাদের কল্পনা, তাকে নিয়েই আমাদের স্বপ্ন। বাড়িতে পড়তে বসেও হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যেতাম। মনে হত, কালোজাম-দিদির সেই ফরসা, টোপা কুলের মতো ফোলা-ফোলা হাতের আঙুল দেখছি যেন। কালোজামদিদির সেই ঢেউ-খেলানো চুলের রাশ, সেই সিল্কের শাড়ির খসখস শব্দ, সেই অদ্ভুত গায়ের গন্ধ—সারা দিন, সারা রাত আমাদের মনকে মুখর করে রাখতো।

কালোজামদিদির আঙুলে বোধহয় খুব জোর ছিল, নইলে আমাদের গাল টিপলে অত লাগতো কেন? তবু কালোজামদিদি যেদিন গম্ভীর হয়ে থাকতো, সেদিন চেয়েও দেখতো না আমাদের বল খেলা। যেদিন গাল টিপতে ভুলে যেত, সেদিন ভারি খারাপ লাগতো আমাদের। কিছুতেই কিছু ভালো লাগতো না আর যেন।

কিন্তু একদিন খেলতে গিয়ে কেমন যেন অবাক্ লাগলো। পাখি চাকরের সঙ্গে আর বেড়াতে বেরোল না সেদিন। বাড়ির দরজা-জানলাগুলোও খোলা হয়নি। সমস্ত বাড়িটা যেন খাঁ-খাঁ করছে। চাকরবাকরদের গলাও যেন শোনা যাচ্ছে না।

মনোহর বললে, 'শুনেছিস, কালোজামদিদির বর মরে গেছে।'

'সে কি!'

মনোহর বললে, 'হ্যাঁ, শুনেছি আমি। টেলিগ্রাম এসেছে, হঠাৎ হার্টফেল করে মরে গেছে। কালকে এখানে চলে আসছে কালোজামদিদি।'

সেদিন নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে কী কান্নাটাই না কাঁদলাম। কেন কাঁদলাম জানি না। মনে হল, পিসীমা যেমন পিসেমশাই মারা যাবার পর সাদা কাপড় পরেছিল, মাছ-মাংস খায় না, কালোজামদিদিও যদি সেই রকম করে! পিসীমাকে বিধবা হওয়ার পর যেমন কাঁদতে দেখেছিলাম, কালোজাম-দিদিকেও যেন কল্পনায় সেইরকম কাঁদতে দেখলাম।

আমি আর মনোহর সেদিন আবার স্টেশনে গিয়ে দাঁড়ালাম। চোখ ছলছল করছিল আমার। বিধবার পোশাক-পরা কালোজামদিদিকে প্রথম দেখে কী করে যে কথা বলবো তাই ভাবছিলাম।

বম্বে-মেল এল।

বুক দুরদুর করে কাঁপছিল। কী দৃশ্য দেখবো কে জানে!

দেখলাম, কালোজামদিদি নামছে। চোখদুটো বুজে ফেললাম আমি। আমি যেন আর সহ্য করতে পারছিলাম না।

কিন্তু কালোজামদিদি আমায় দেখতে পেয়েছে ঠিক। সামনে এসে আমার আর মনোহরের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। বললে, 'আমাকে দেখছি ভুলিসনি তোরা? ওঠ, গাড়িতে ওঠ।' বলে কালোজামদিদি আমাদের পাশে বসিয়ে নিলে। মুখ উঁচু করে দেখতে সাহস হচ্ছিল না। তবু কালোজাম-দিদির সিল্কের শাড়ির খসখস শব্দ আর সেই অদ্ভুত গন্ধের মধ্যে বিভোর

হয়েছিলাম। কালোজামদিদির একেবারে গা ঘেঁষে বসেছি। আমাদের দুজনকে দু'হাত দিয়ে ধরে আছে। গাড়িটা পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে শাঁ-শাঁ করে চলেছে। মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি দেয়, আর আমরা তিনজনেই একসঙ্গে দুলে উঠি। কালোজামদিদির হাতের সোনার চুড়িগুলো আমার বুকের ওপর ফুটছে, লাগছেও খুব, তবু নড়তে সাহস হল না। যদি কালোজামদিদি হাত ছাড়িয়ে নেয়। মনে হল, এমনি করে যদি মাইলের পর মাইল দুলতে দুলতে যাওয়া যেত, বেশ লাগতো। আমি এক সময়ে সেইভাবে থাকতে-থাকতে হঠাৎ কালো-জামদিদির কোলের উপর সিল্কের শাড়িটার মধ্যে মুখ গুঁজে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলাম।

কালোজামদিদি আরো জোরে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে আমায়।

বললে, 'এ কী হাবা ছেলে দেখো—ছি, কাঁদতে নেই অমন করে!'

দিদির সান্ত্বনাতে আমার কান্না আরো বেড়ে গেল।

সেদিন মনে আছে বাড়ি আসার পথে খুব কাঁদছিলাম দেখে মনোহর বলেছিল, 'কাঁদছিস কেন রে, ভালোই তো হল।'

বললাম, 'কেন?'

মনোহর বললে, 'এবার থেকে আর কালোজামদিদি কোথাও যাবে না, এইখানেই থাকবে!'

মনোহরের কথায় আমারও যেন কেমন আনন্দ হল। স্বার্থপরের মতো ভাবলাম ঃ বেশ হল, ভালোই তো হল! বরাবর কালোজামদিদি এই নেপিয়ার টাউনের বাড়িতেই থাকবে, রোজ দেখতে পাবো তাকে, রোজ আমাদের গাল টিপে দেবে কালোজামদিদি।

সত্যি যা ভেবেছিলাম তাই হল। কালোজামদিদি বিধবা হবার পর যেন আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো আমাদের। কালোজামদিদিকে আরো সুন্দর দেখাতে লাগলো। আরো মিষ্টি। আরো নিজেদের জিনিস! ও-বাড়িতে যাওয়া আরো বেড়ে গেল আমাদের। সকালবেলা আরো বেশি করে কমলালেবু আসে। দুখমোচন আরো কমলালেবু বাটে, দুধের সর দিয়ে কমলালেবু বেটে গায়ে মাখে কালোজামদিদি। তারপর দুধ দিয়ে ধুয়ে ফেলে সবটা। আর তারপর গরম জলে স্নান। বাথরুমের বাইরে দাঁড়ালে কেমন ভুরভুর করে গন্ধ আসে নাকে। তারপর স্নান সারা হবার পর ভিজে চুল এলিয়ে দিয়ে সিল্কের রঙিন শাড়ি পরে দোলনায় বসে দোলা খায়।

আমাদের দল ক্রমেই ভারী হয়ে আসছে। আগে পনরো-ষোলজন ছিলাম, এখন আমাদের ক্লাসের অন্য ছেলেরাও আসতে আরম্ভ করল। মধু, মানুকে, দীপচাঁদ—ওরাও আসতে সুরু করেছে। ছুটির দিন দল আরও ভারী হয়। গোলবাজার থেকে সাইকেলে করে আসে হাবুল। এতোয়ারী বাজার থেকে আসে পণ্ডা। কালোজামদিদি সকলেরই গাল টিপে দেয়। সকলকেই সমান আদর করে। কার ওপর যে বেশি পক্ষপাতিত্ব বোঝা যায় না। দিন-রাত্তির চেষ্টা

করি কেমন করে বেশি প্রিয়পাত্র হতে পারি কালোজামদিদির।

ভোরবেলা কালোজামদিদির ঘুম ভাঙবার আগেই ও বাড়িতে গিয়ে তার শোবার ঘরের দরজার সামনে বসে থাকি। ঘুম থেকে উঠলেই দেখতে পাবে আমাকে। একলা আমাকে। এত সকালে আর কেউ আসতে পারে না। কতদিন মা বকেছে, দাদারা মেরেছে—কিছুতেই কেউ বশে আনতে পারেনি আমাকে। আমাদের দলের সব ছেলেরা একই আকর্ষণে আসে এখানে। এত ছেলে যে, বাগানে ধরে না। নেপিয়ার টাউনের মার্বেলের বাড়িটা আমাদেরই মতো বাচ্চা ছেলেদের ভিড়ে দিন-রাত উচ্চকিত থাকে।

কালোজামদিদির সদ্য ঘুম-ভাঙা চোখ। কোঁকড়ান চুলের রাশ। ভারি ভালো লাগল দেখতে। হাসতে হাসতে কালোজামদিদি বললে, 'কী রে, এত সকালে যে? রাত্রে বুঝি স্বপ্ন দেখেছিলি দিদিকে?'

লজ্জায় আমার মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। বললাম, 'তুমি দুলবে না?'

কালোজামদিদি হেসে আমার গাল টিপে দিলে। বললে, 'তুই দোলাবি বুঝি?'

বললাম 'হ্যাঁ।'

কালোজামদিদি বললে, 'আচ্ছা এখন দোলা তুই, কিন্তু দুপুরবেলা আজ হাবুল দোলাবে। ওকে আমি কথা দিয়েছি, ও অনেক দূর থেকে আসে।'

'আর বিকেলবেলা আমি দোলাবো তোমায়?'

'বিকেলবেলা আজ পণ্টা দোলাবে, ও সেই এতোয়ারী বাজার থেকে আসে।'

শেষকালে কালোজামদিদিকে নিয়ে আমাদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা হতে আরম্ভ হল। ঝগড়া সুরু হল, কে কালোজামদিদিকে দোলাবে তাই নিয়ে। ফুটবল খেলা আমাদের উঠে গেল।

কালোজামদিদি বলতো, 'আমি সকলের দিদি, কারো একলার নয়।'

শেষে দিদিই ঠিক করে দিলে, 'সকলে চার দান করে দোলাতে পাবে। মধুর পরে মনোহর, মনোহরের পর মানুকে, মানুকের পর হাবুল, হাবুলের পর পণ্টা, পণ্টার পর...'

আমি সকলের শেষ। ঘুরে-ঘুরে এমনি সকলের দান আসবে। দুলতে দুলতে অনেকদিন কালোজামদিদি ঘুমিয়ে পড়তো। তবু কিন্তু আমাদের দোলানোর কামাই নেই। আমরা নিজেদের নিজেদের দানের জন্যে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকতাম। কালোজামদিদি আরাম করে ঘুমোত। সমস্ত বারান্দাটা দিদির সেই অদ্ভুত গন্ধে বিভোর হয়ে আছে। আর আমি দেখছি সেইদিকে চেয়ে অপলক চোখে।

হাবুল একদিন একটা ফুল নিয়ে এসে দিলে কালোজামদিদিকে। একটা গন্ধরাজ ফুল। বললে,—ওদের বাগানের গাছের ফুল।

কালোজামদিদি ফুলটা নিয়ে বললে, 'বাঃ!'

মধু একদিন নিয়ে এল চাঁপাফুলের তোড়া। বললে,—সে নিজের হাতে গেঁথেছে ওটা।

ফুল উপহারে দেওয়ার হিড়িক পড়ে গেল।

আমিও পিসীমার বাক্স থেকে চারটে পয়সা চুরি করে গোলবাজার থেকে একটা গোলাপফুল কিনে দিলাম কালোজামদিদিকে। বললাম, 'আমাদের বাগানের ফুল!'

মনোহর ধরে ফেলেছিল আমার মিথ্যে কথা। বললে, 'আমি বলে দেব কালোজামদিদিকে—তোদের বাড়িতে আবার বাগান কোত্থেকে এল? যাচ্ছি আমি, বলে দিচ্ছি গিয়ে—'

মনে আছে সেদিন খুব ভয় পেয়েছিলাম। কতদিন ধরে মনোহরকে বিস্কুট আর লজেন্স ঘুষ দিয়েও আমার সে ভয় যায়নি। যদি সত্যিই মনোহর কালো-জামদিদিকে বলে দেয় কোনদিন। একদিন কালোজামদিদি বললো, 'আসছে শনিবার আমার জন্মদিন, তোরা সবাই আমাকে কী-কী দিবি বল?'

শনিবার। হাতে আর মাত্র চারটি দিন। সবাই উঠে-পড়ে লেগে গেল। কালোজামদিদির জন্মদিনে উপহার দিতে হবে। সকলকে টেক্কা দেওয়া চাই। সবাই তোড়জোড় করছে। অথচ কেউ কাউকে কিছু বলছি না।

আমি অনেক কান্নাকাটি করে মার কাছ থেকে একটা টাকা আদায় করে-ছিলাম। সেই টাকাটা দিয়ে অনেক খুঁজে-খুঁজে শেষে এক বাক্স সাবান কিনে-ছিলাম মনে আছে। বিলিতী সাবান। বাক্সর ওপর ছবি আঁকা।

জন্মদিনের সন্ধ্যেবেলা ও-বাড়িতে গিয়ে কিন্তু অবাক্ হয়ে গেলাম। অনেক গাড়ি জমেছে বাড়ির সামনে। বাইরে আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। জ্যাঠা-মশাই আজ নিচে নেমেছেন। পাখিও কুঁজো শরীরটা নিয়ে একটা চেয়ারে সেজে-গুজে চুপ করে বসে আছে। জব্বলপুরের কেউ আর বাদ পড়েনি। আর কালোজামদিদি? সে যে কি চমৎকার দেখাচ্ছে তাকে। মনে হল ছবির বইতে যেমন জগদ্ধাত্রীর ছবি দেখেছি এ-ও তেমনি। একটা টেবিলের ওপর স্তূপাকার হয়ে রয়েছে উপহারের জিনিস। রুপোর, সোনার দামী-দামী জিনিস। সেদিকে চাইলে চোখ ঝলসে যায়। লীলাও এসেছে দার্জিলিং না কার্শিয়াং থেকে। এতদিন পরে লীলা ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরেছে এবার।

কালোজামদিদির কোনদিকে পক্ষপাতিত্ব নেই। আমাদের দেখেই ছুটে এল ঝলমল করতে-করতে। বললে, 'এসেছিস তোরা? ভালো হয়েছে, আমার জন্যে কী-কী এনেছিস দেখি?'

যার-যার উপহার লুকিয়ে রেখেছিলাম।

আমি লজ্জায় জড়সড় হয়ে কোঁচার খুঁট থেকে সাবানের বাক্সটা বা'র করে দিলাম।

কালোজামদিদি হাতে নিয়ে বললে, 'বাঃ, চমৎকার তো!'

প্রত্যেকেরই সামান্য জিনিস। কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস হাতে নিয়েই কালো-

জামদিদি বললে, 'বাঃ, চমৎকার তো !' তারপর বললে, 'মনোহর কোথায় রে, মনোহরটাকে দেখছি নে যে ?'

সত্যিই মনোহর আসেনি।

কালোজামদিদি বললে, 'মনোহরটা তো ভারি ফাঁকিবাজ—মনোহর-দি মাকালফল !'

তারপর থেকেই কালোজামদিদির-দেওয়া নামটা ধরেই আমরা ডাকতাম মনোহরকে বরাবর।

পরের দিন স্কুলে গিয়ে বললাম, 'কাল যাসনি কেন রে কালোজামদিদির বাড়িতে ?'

মনোহরের বেশ মন খারাপ দেখলাম। বললে, 'ভাই, একটা পয়সাও যোগাড় করতে পারলাম না কোথাও। মামার কাছে গিয়েছিলাম, পিসেমশাই-এর বাড়ি গিয়েছিলাম, জামাইবাবুর কাছেও গেলাম—জানিস সকলেরই মাসের শেষ দিক। শুধু-হাতে যেতে কেমন লাগলো আমার।'

বললাম, 'কালোজামদিদি কালকে তোকে মনোহর-দি-মাকালফল বলেছে।'

মনোহর বললে, 'শুনেছি আমি। কিন্তু কালোজামদিদিরই তো দোষ, বেছে বেছে মাসের শেষের দিকে ওর জন্মদিন পড়ে কেন ?'

এমনি করে বেশ দিন কাটছিল। কিন্তু বাধা পড়লো একদিন।

লীলা লেখাপড়া শেষ করে নেপিয়ার টাউনের বাড়িতে এসে উঠলো। আর কোথা থেকে এক দৈব-দুর্বিপাকে কী হয়ে গেল সব, আজও ভাবলে শিউরে উঠতে হয়।

রোজকার নিয়মমতো সেদিনও আমরা গেছি কালোজামদিদির বাড়ি। বাইরে দেখলাম, বিরাট একটা মোটর। নতুন ঝকঝকে মোটর। ড্রাইভার নেই।

সামনেই দুখ্মোচনের সঙ্গে দেখা হল। বললাম, 'কে এসেছে রে ?'

দুখ্মোচন বললে, 'বাজোরিয়া সাহেব।'

কে বাজোরিয়া সাহেব। কেন এসেছে। এই সব প্রশ্ন করছিলাম নিজেদের মধ্যে। আমাদের কালোজামদিদিকে কেড়ে নেবে নাকি। নিয়মমতো বাড়ির ভেতরে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি কালোজামদিদি লীলাকে সঙ্গে করে আসছে। সঙ্গে একজন স্যুট-পরা লোক। লম্বা-চওড়া, হোমরা-চোমরা চেহারা। ছোকরা মানুষ। বেশি বয়েস নয়। কালোজামদিদি এক হাতে লীলার একটা হাত ধরেছে, আর একটা হাত সেই লোকটার কাঁধের ওপর।

তিনজন মিলে মোটরে উঠতে যাচ্ছিল। আমাদের দেখে কালোজামদিদি এগিয়ে এল। বললে, 'তোরা এসে গেছিস, বোস একটু, আমি মিস্টার বাজোরিয়ার সঙ্গে একটু ঘুরে আসি। চলে যাসনে যেন, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আসবো।'

তারপর তিনজনে গিয়ে উঠলো মোটরে। মোটরটা একবার একটু মৃদু আর্তনাদ করে ছেড়ে দিলে।

আমরা কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেলাম। কোথাকার কে এসে আবার

ভাগ বসালে আমাদের কালোজামদিদির ওপর। কে ও। কী চায়। মন খারাপ হয়ে গেল সকলের। সবাই রয়েছি, কিন্তু কালোজামদিদির অবর্তমানে যেন সব অর্থহীন হয়ে গেল।

আধঘণ্টা কেটে গেল। একঘণ্টাও কেটে গেল। রাত আটটা বাজতে চললো, তবু কালোজামদিদির দেখা নেই। পোলবাজারের হাবুল সাইকেলে চড়ে চলে গেল। এতোয়ারী বাজারের পঞ্চাও আর থাকতে পারলো না। একে একে সবাই চলে গেল। সবারই মনের ভাবঃ কাল কালোজামদিদির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ফেলতে হবে। কালোজামদিদি সত্যিই আমাদের চায়, না, ওই বাজোরিয়া সাহেবকে চায়। স্পষ্ট জবাব চাই।

আমি বাড়ি যাবার পথে পা দিয়েও বাড়ি ঢুকতে পারলাম না। অনেকক্ষণ ধরে রাস্তায় ঘুরে প্রায় দু'ঘণ্টা পরে আবার কালোজামদিদির বাড়ির সামনে এসে হাজির। মোটরটা নেই আর তখন। তাহলে কি তারা এখনও ফেরেনি?

কালোজামদিদি খবর পেয়েই দৌড়ে এসেছে। তখনও ঘুমোতে যায়নি। বললে, 'কি রে এত রাত্তিরে?'

কালোজামদিদিকে দেখে আমি আর সামলাতে পারলাম না। দিদির শাড়ির আঁচলটা নিয়ে মুখ ঢেকে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলাম।

দিদি বললে, 'কী হাবা ছেলে রে, আমার দেরি হয়েছে বলে বুঝি দুঃখু হয়েছে? ওরা সব কোথায়?'

দিদি আবার বললে, 'তোরাই তো আমার প্রাণের বন্ধু রে, ও লোকটা তো নতুন এসেছে—লীলার সঙ্গে বিয়ে হবে কিনা ওর—তাই ওর সঙ্গে একটু ভাব করছিলাম।'

আশ্চর্য আমার মন। কালোজামদিদির ওইটুকু কথাতেই মন একেবারে ভিজে গেল। এত যে অভিমান অভিযোগ, সব মুছে গেল। এক মুহূর্তে ক্ষমা করে ফেললাম কালোজামদিদিকে। নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে আমার চোখ-মুখ মুছিয়ে দিয়ে বললে, 'যা, অনেক রাত হল, এবার বাড়ি যা লক্ষ্মীটি—কাল সকাল-সকাল আসিস।'

কিছুদিনের মতো এ ব্যাপারটা মিটে গেল বটে, কিন্তু সাতদিন পরেই আবার ওই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। আবার বাজোরিয়া সাহেব এল। আবার মোটরে করে বেরিয়ে গেল তিনজনে। বাজোরিয়া সাহেবের সঙ্গে লীলার বিয়ে হবে তো হোক্ না, কিন্তু কালোজামদিদি ওদের সঙ্গে যাবে কেন? শেষে মাসের মধ্যে ছ'দিন সাতদিন আসতে লাগলো বাজোরিয়া সাহেব। নিজে মোটর চালিয়ে আসে। আবার কালোজামদিদিকে আর লীলাকে বেড়িয়ে নিয়ে এসে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে, ধোঁয়া উড়িয়ে চলে যায়।

মনোহর বললে, 'খবর পেয়েছি, ও লোকটা সাতনার ম্যাজিস্ট্রেট, নতুন আই. সি. এস—

ফটিক সেদিন স্পষ্টাপষ্টি বললে, 'তোমাকে সত্যি করে বলতে হবে কালো-

জামদি, তুমি আমাদের, না, ও লোকটার ?'

কালোজামদিদি দোলনায় দুলতে-দুলতে ফটিকের গাল টিপে দিলে। বললে, 'দূর্ বোকা ছেলে, ও-কথা বলতে আছে ? আমি হলুম তোদের দিদি আর ও-লোকটার শাশুড়ী। কিচ্ছু বুঝিস না, ও যে আমার জামাই হবে রে।'

কিন্তু দিন দিন বাজোরিয়া সাহেবের আসা বাড়তে লাগলো। কোথায় সেই সাতনা! সেই একশো মাইল দূর থেকে লীলার জন্যে মোটর চালিয়ে আসে, আবার সেই রাত্রেই ফিরে যায়। রবিবার দিন সকালবেলাই চলে আসে। সমস্ত দিনটা কাটায় এখানে। খাওয়-দাওয়া করে। মার্বেল রক্স্ দেখতে যায় দুইজনকে নিয়ে। আস্তে আস্তে সত্যিই আমরা যেন পর হয়ে যাচ্ছি বুঝতে পারি।

কালোজামদিদি কিন্তু মুখে বলে, 'এই দ্যাখ না, সামনের বোশেখ মাসে লীলার বিয়েটা হয়ে যাক্, তখন আবার সারাদিন তোদের সঙ্গে কাটাবো—আবার তোরা আমাকে দোলাবি আগের মতন।'

আমরা কেবল দিন গুনি। কবে বোশেখ মাস আসবে। কবে বিয়েটা হয়ে যাবে ওদের। বাঁচা যায় তা হলে। তখন আবার কালোজামদিদি আমাদের।

কালোজামদিদি একদিন বললে, 'আচ্ছা, এত যে তোরা আমাকে ভালবাসিস তোদের যখন বিয়ে হবে আমাকে ভুলে যাবি তো ?'

আমরা সবাই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠি, 'কখ্খনো না, কালোজামদিদি—কখ্খনো না।'

সত্যিই তো, কালোজামদিদিকে কি ভোলা যায় ? তুমি আমাদের ভালবাসো আর না-বাসো, তোমাকে ভাল না-বেসে কি থাকতে পারি ? কালোজামদিদিকে না দেখে যে বাঁচতে পারা যায়, এ কথা তখন কল্পনা করতেও ভয় হয়। এখন মনে পড়লে হাসি পায় অবশ্য। কিন্তু তখন কি ছেলেমানুষই যে ছিলাম আমরা!

দেখতে দেখতে একদিন সেই বোশেখ মাস এলো। বিয়ের তোড়জোড় চলেছে। রোজই দেখি বাজোরিয়া সাহেব আসে। খাওয়া-দাওয়া করে, তারপর বাজারে যায় জিনিসপত্র কেনা-কাটা করতে।

বোশেখ মাস পড়তেই কালোজামদিদি একদিন লীলাকে নিয়ে চলে গেল সাতনায়। যাবার আগের দিন বলে গেল, 'লীলার বিয়েটা দিয়েই চলে আসবো। তোরা আমায় ভুলে যাবি না তো ?'

তা এতদিন যখন সহ্য হল, এ ক'টা দিনও সহ্য হবে। কালোজামদিদি মেয়েকে নিয়ে সাতনায় চলে গেল। বিয়েটা বিলিতী মতে হবে কিনা, তাই বরের বাড়িতেই গেল কালোজামদিদি।

সাতনায় কী ঘটলো আমরা জানতে পারিনি। বোশেখ মাসটা কেটে গেল, তবু কালোজামদিদি আসে না। জ্যৈষ্ঠ মাসটাও কাটতে চললো, তবু আসে না কালোজামদিদি। আমরা মন-মরা হয়ে থাকি। কালোজামদিদির বাড়িতে

যাই, সব ফাঁকা লাগে। খালি দোলনাটা ঝোলে, সেটাই খানিকটা দোলাই।

ফটিক বললে, 'কালোজামদিদিকে একটা চিঠি দেব।'

'ভালো কথা। কিন্তু ঠিকানা কোথায় পাবি?'

ঠিকানাও যোগাড় হল। কিন্তু কী লিখবো। খাতার পাতায় কেবল লিখতে লাগলাম, 'কালোজামদিদি, তোমার জন্যে আমার মন কেমন করছে।' পাতা ভর্তি করে লিখি আর ছিঁড়ে ফেলি। লজ্জা হয়, পাছে কেউ দেখে ফেলে।

কালোজামদিদির ওপর ভীষণ রাগ হল আমার। বাজোরিয়া সাহেবের বাড়ি গিয়ে আমাদের একেবারে ভুলে গেছে। দরকার নেই। আমরাও রাগ করতে জানি। লিখবোই না চিঠি। এখানে এলে কথাই বলবো না। এবার মিষ্টি কথায় আর ভুলছি না আমরা।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ মনোহর আমাদের বাড়িতে দৌড়ে এসেছে। বাইরের ঘরের দরজায় এসে আস্তে আস্তে টোকা মারলে।

বললাম, 'কে রে?'

'একবার বাইরে আয় তো, কথা আছে।'

বাইরে আসতে মনোহরের মুখখানার ভাব দেখে চমকে উঠলাম।

মনোহর প্রথমেই বললে, 'ভাই, আমাদের সর্বনাশ হয়েছে।'

'কী সর্বনাশ?'

'কালোজামদিদি বিয়ে করেছে।'

'কাকে?'

'বাজোরিয়া সাহেবকে।'

মনোহরের কথাগুলো কাঁপছিল। হতাশ হয়ে আমাদের বাড়ির সদর দরজার ওপরই বসে পড়লো সে। বললে, 'কী হবে আমাদের?'

আমিও যেন কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। সত্যিই, কী হবে আমাদের।

মনোহর বললে, 'চল, হাবুলকে গিয়ে ডাকি—সে হয়ত কিছু বুদ্ধি দিতে পারে।'

সেই রাত্রেই হাবুলের কাছে গেলাম। সে সব শুনে বললে, 'জ্যাঠামশাই খবর পেয়েছে?'

মনোহর বললে, 'নিশ্চয় পেয়েছে।'

'আর লীলা? কালোজামদিদির মেয়ে—সে?'

প্রথমে টের পাওয়া যায়নি। ক'দিন থেকেই পাখিকে নাকি পাওয়া যাচ্ছিল না। হাবা-গোবা ছেলে, কোথায় গেল সে। রাস্তা-ঘাট চেনে না। চারিদিকে খোঁজ-খবর নেওয়া হল। পুলিশে খবর দেওয়া হল। শেষে বাগানের মালিই দেখতে পেলে, পাখিটা বাড়ির মজা কুয়োর মধ্যে মরে পড়ে আছে। আমরাও আশ্চর্য হলাম বৈকি। কালোজামদিদির কাণ্ড দেখে সে-ও বুঝি

লজ্জা ঢাকবার আর জায়গা পায়নি। খবরটা শুনে পঙ্খা বললে, 'বেশ হয়েছে—খুব হয়েছে—'

আরো ভীষণ খবরটা দু-তিনদিন পরে এল।

লীলা, মিশনারী স্কুলে পড়া মেয়ে লীলাও, মার কাণ্ড দেখে নাকি গলায় দড়ি দিয়েছে।

আমাদের বাক্‌রোধ হয়ে গেল। আমার মনে হতে লাগলো, কেন কালোজামদিদি বিয়ে করতে গেল বাজোরিয়া সাহেবকে। আমাদের নিয়ে কি কালোজামদিদির সুখে দিন কাটছিল না। কালোজামদিদির জন্যে আমার যেন কেমন মায়া হতে লাগলো।

মনোহর কিন্তু বললে, 'বেশ হয়েছে—খুব হয়েছে—যেমনি আমাদের মনে কষ্ট দেওয়া!'

আমি কিন্তু তবু কাউকে না বলে চুপি-চুপি এক এক দিন কালোজামদিদির ফাঁকা বাড়িটায় যাই। বাথরুমটা থেকে সে-রকম গন্ধ আর আসে না। আর দুধের সর দিয়ে কমলালেবু বাটে না দুখ্‌মোচন। দোলনাটা বারান্দার মাঝখানে স্থির হয়ে আছে। সব যেন কেমন হতবাক্‌ হয়ে গেছে। শুধু উঁকি মেরে দেখি, জ্যাঠামশাই তাঁর ঘরে খাটের ওপর চিতপাত হয়ে শুয়ে আছেন। ওইসব দুর্ঘটনার পর আর ওঠবার শক্তি নেই যেন তাঁর।

কালোজামদিদির অন্তর্ধান হওয়ার সঙ্গে আমাদের দলটাও যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আমরাও আস্তে আস্তে বড় হলাম। মনও আমাদের বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। সমস্যা বাড়তে লাগলো। কেউ কেউ ফেল্‌ করলাম জীবনে, কেউ মাথা উঁচু করে দাঁড়ালাম সংসারে। ছোটবেলাকার ছোট ছোট শখ, ছোট ছোট সাধ কোনোদিন পূর্ণ হয়নি বলে আর কোনো ক্ষোভই রইল না পরবর্তী জীবনে। বাস্তব পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম সব। মানে বদলে গেল সব জিনিসের। মূল্যমানের পরিবর্তন হল। আমাদের দল ছিল এক, হল বহু। কারোর সঙ্গে অন্য কারোর মতে মেলে না আর। কলকাতায় এসে আবার নতুন বন্ধুর দল জুটে গেল।

সেই হট্টগোলের মধ্যে ছোটবেলাকার স্বপ্ন 'কালোজামদিদি' যে তলিয়ে যাবে তা আর বিচিত্র কী!

আমি ছিট্‌কে এসেছিলাম কলকাতায়। একবার যেন খবরও পেয়েছিলাম—বাজোরিয়া সাহেব মারা গেছে, কালোজামদিদি আবার বিধবা হয়েছে, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময়ও ছিল না, ইচ্ছেও ছিল না তখন। সে-ও প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর হয়ে গেল।

কিন্তু এতদিন পরে, যখন স্মৃতি থেকে কালোজামদিদি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে এসেছে, মনোহরের সঙ্গে দেখা হতেই আবার সব মনে পড়ে গেল।

হাব-ভাব দেখে মনে হল, মনোহর বেশ সুখেই আছে। কোনো ভাবনা-

চিন্তা নেই। একটার পর একটা জিনিস আসতে লাগলো। মনোহর খেয়েই চলেছে। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, 'কেন খাচ্ছিস না বল তো— কালোজামদিদির টাকা ব'লে?'

আমি এর কী উত্তর দেব। বললাম, 'না, তা নয়—'

মনোহর বললে, 'এ টাকা এক রকম আমারই বলতে পারিস—কালো-জামদিদি যে উপকার পায় আমার কাছ থেকে, তো একটা দাম আছে?'

'কিসের উপকার?' জিগ্যেস করলাম।

মনোহর যেন নিজের মনেই বলতে লাগল, 'তা ছাড়া, কালোজামদিদির অত টাকা খাবে কে। ছেলে আছে, না মেয়ে আছে? বাবার সমস্ত সম্পত্তি আর বাজোরিয়া সাহেবের সম্পত্তি, সব সে পেয়েছে। জব্বলপুরে নেপিয়ার টাউনে যদি যাস কোনোদিন তো সে-বাড়ি দেখে চিনতে পারবি না—সে এক বিরাট মার্বেল প্যালেস।'

এতক্ষণে খাওয়া সেরে মনোহর গেলাস নিয়ে বসলো। বললে, 'তা ভগবান সত্যি সত্যি আছে ভাই, সেই ছোটবেলায় আমাদের যেমন কষ্ট দেওয়া, তেমনি এখন ভুগছে খুব।'

বললাম, 'সে কী? কালোজামদিদির অসুখ নাকি?'

'সে এক অদ্ভুত অসুখ ভাই, আজ সাড়ে চার বচ্ছর কালোজামদিদি ঘুমোয়নি। কোনও ডাক্তার আর কোনও ওষুধ বাকি নেই। গেল বছরে সুইজারল্যাণ্ডে গিয়েছিল, কিন্তু যে-কে সেই। মোটে ঘুম আসে না—ডাক্তাররা বলে, এ-রোগ সারবে না। তবে একটা কাজ করলে অনেক দিন বাঁচবে আরো —দিন-রাত কমবয়েসী ছেলেদের সঙ্গে মিশতে হবে। কিন্তু সারাদিন-রাত ওই ছেষট্টি বছরের বুড়ীর সঙ্গে কে মিশবে বল্—কুড়ি-বাইশ বছরের বেশি হলে চলবে না আবার।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বললাম, 'সত্যি?'

মনোহর বললে, 'হ্যাঁ, এর একবর্ণও মিথ্যে নয়—তাই কালোজামদিদি আমাকে রেখেছে, পাঁচশো টাকা মাইনে দেয়, আর আমারও চাকরি-বাকরি ছিল না, একটা হিল্লে হ'য়ে গেল। আমি ছোকরাদের যোগাড় করে আনি, তারা দিন-রাত কালোজামদিদিকে ঘিরে থাকে সব সময়, কালোজামদিদি বুঝতে পারে সব, তাই রেট বেঁধে দিয়েছে, দিনের বেলা পাঁচ টাকা করে আর রাত্রের জন্যে দশ টাকা—রাত্তির বেলাতেই কষ্ট কি না। কালোজামদিদি দোলনায় বসে থাকবে আর সবাই দোলাবে, কিংবা তাস খেলবে, গল্প করবে—তবে কুড়ি বাইশ বছরের কম বয়স হওয়া চাই ছেলেদের!

'এরকম কত ছেলে আছে?'

'তা জন কুড়ি-পঁচিশ হবে, সবাই কি থাকতে চায়,—বুড়ীর সঙ্গে সারা-দিন থাকা, এও একটা পাপ বৈকি। আমি-ব্যাচ-সিস্টেম করে দিয়েছি—রাত্রের ব্যাচ, দিনের ব্যাচ আলাদা আলাদা।'

মনোহরের দিকে নির্বাক্ হয়ে চেয়ে রইলাম। কী প্রচণ্ড শাস্তি কালো-জামদিদির! ভাবতে গিয়ে কালোজামদিদির ওপর কেমন মায়া হচ্ছিল।

রাত হয়ে আসছে। যাবার সময় মনোহর বললে, 'আসছে শনিবার কালো-জামদিদির জন্মদিন, কী উপহার দেওয়া যায় বল্ তো? উপহারটা কিনতেই কলকাতায় আসা।'

'কত দামের মধ্যে?'

'ধর, হাজার টাকার মধ্যে।'

চমকে উঠলাম! এত টাকার উপহার দেবে মনোহর!

মনোহর হো-হো করে হেসে উঠলো, 'আরে, টাকা কি আমার নাকি? উপহার দেবার জন্যে কালোজামদিদিই যে টাকা দিয়েছে। বলে দিয়েছে,—এমন জিনিস দিবি যেন দশজনে ভালো বলে। আর শুধু কি আমাকে একলা? কালোজামদিদি সকলকে টাকা দেয়—গাঁটের পয়সা খরচ করে কে আর ওই বুড়ীকে উপহার দিতে যাবে বল্—কেউ তো আর পাগল নয়?

আর একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠতে যাচ্ছিল মনোহর।

বললাম, 'আর একটা কথা, বিয়ে-থা করেছিস তুই?'

মনোহর সাপ দেখে আঁতকে ওঠার মতো ভঙ্গী করে বললে, 'ওরে বাবা, তা হলে চাকরি চলে যাবে আমার!'

গল্পটা শুনে সোনাদি সেদিন কিছু বলেনি প্রথমে।

জিগ্যেস করলাম, 'কেমন লাগলো, সোনাদি?'

সোনাদি বললে, 'এত অল্প বয়সে বিকৃতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস, কিন্তু বিকৃতিটাই তো মানুষের প্রকৃতি নয়। বিকৃতি হল প্রকৃতির বিকার। লেখকের যখন দৃষ্টি খণ্ডিত থাকে তখনই সে এইরকম বিকৃতি নিয়ে মাথা ঘামায়। একে বৈচিত্র্য বলে না—। একে বলে পশ্বাচার। বড় হয়ে তন্ত্র পড়লে বুঝবি শক্তি-উপাসনা মোটামুটি দু'রকমের। এক বীরাচার আর দুই পশ্বাচার। লেখকদের মধ্যে এই দুই রকমের জাত আছে। কিন্তু তুই বীরসাধক হতে চেষ্টা কর। তবেই নাম হবে। বড় বড় লেখকদের লেখা পড়তে হবে। শুধু নিজের চরিত্র দেখে বেড়ালেই চলবে না। ষট্‌চক্রভেদ শিখতে গেলে যে গুরু চাই।...'

এমনি কত উপদেশ দিত সোনাদি। চুল এলিয়ে দিয়ে ইজিচেয়ারে বসে বসে আপন-মনে বলে যেত সোনাদি আর আমি চেয়ে দেখতাম আর শুনতাম।

বলতো, নজর রাখবি বৃহতের দিকে, ভূমার দিকে। সাধকের সঙ্গে লেখকের কোন তফাত নেই। যে-লেখকরা সাধক হতে পেরেছে তারাই ঋষি। মুণ্ড-কোপনিষদে আছে—

> ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
> ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

যে ব্রহ্ম দেখতে পেয়েছে তার অবিদ্যা চলে যায়, তখন আর কোনও মায়া থাকে না তার। তখন রামপ্রসাদের মতো সে বলতে পারে—

ইহ জন্ম পর জন্ম বহু জন্ম পরে
রামপ্রসাদ বলে আমার জন্ম হবে না জঠরে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায় শ্বেতকেতু পিতাকে জিগ্যেস করেছিলেন—

যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি—

হে ভগবান, কী সে জিনিস যা জানলে আর কিছু অজ্ঞাত থাকে না?···

সোনাদি দর্শন-শাস্ত্র পড়েছিল বাবার কাছে কত বছর ধরে। স্বামীনাথ-বাবুর সঙ্গে বিয়ে হবার আগে সোনাদি কেবল পড়াশোনা নিয়েই মেতেছিল। বিশ্বেশ্বরবাবু নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলেছিলেন একমাত্র মেয়েকে। আজমীরের শুকনো হাওয়ার সঙ্গে তাল রেখে গড়ে উঠেছিল সোনাদি। কিন্তু তা বলে মনের রসকষ শুকিয়ে যায়নি একেবারে। বেদ-উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় এক বিচিত্র বিশ্বাস মনের সমস্ত ভিত্তিমূলকে একেবারে সুদৃঢ় করে তুলেছিল। সেখান থেকে যেন নড়চড়ের কোনো ভয় ছিল না আর। ছোট-বেলাকার সেই শিক্ষা, অপরিণত মনের সেই গ্রহণ, সারা-জীবনের সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে গিয়েছিল। বিয়ে হল, তবু সে-বিশ্বাস বদলালো না কোনোদিন।

বিশ্বেশ্বরবাবু মারা যাবার আগে বলে গিয়েছিলেন, 'অভেদে ভেদ না-দেখে ভেদের মধ্যে অভেদকে দেখবে মা, কেবল বাদীর দর্শন ভেদেই তার যা ভিন্ন ভিন্ন রূপ—

বিয়ের পর স্বামীনাথবাবু একদিন বললেন, 'এখানে কি তোমার অসুবিধে হচ্ছে?'

নতুন বধূ বললে, 'অসুবিধে হবে কেন?'

'কাল রাত্রে দেখলাম তুমি ঘরে শুতে আসোনি।'

'পড়তে পড়তে অনেক রাত হয়ে গেল, তারপর ওখানেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম —তুমি কি রাগ করেছিলে?'

'না, প্রথমে খেয়ালই হয়নি, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে নজরে পড়লো আমি একলা শুয়ে আছি ঘরে।'

'একলা শুতে যদি তোমার সুবিধে হয় তো, আমি না-হয় দক্ষিণের ঘরেই শোব এবার থেকে।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'দক্ষিণের ঘরে যদি শোও তো মশারিটা ভালো করে গুঁজে দিয়ো চারদিকে, ও-ঘরে একটু মশা আছে।'

'ঘুমোব আর কতটুকুই বা, বই পড়তে-পড়তেই তো রাত তিনটে বেজে যায়।'

'রাত জেগে পড়া কি ভালো?'

'আমার যে রাত জেগে পড়াই অভ্যেস।'

'অভ্যেসটা ত্যাগ করতে চেষ্টা করো, ওতে শরীর খারাপ হয়।'

এমনি করেই সূত্রপাত হয়েছিল। খুব সহজ স্বাভাবিক আরম্ভ। ঠিক বিরোধ নয়! আবার যেন ঠিক অনুরাগও নয়। বাইরের লোক যে দেখতো সে-ই অবাক্ হয়ে যেত।

ননদরা বলতো, 'হ্যাঁ বৌদি, দাদা না-হয় মাটির মানুষ, কিন্তু তোমার আক্কেলখানা কী?'

সোনাদি বই থেকে মুখ তুলে বলতো, 'কিসের আক্কেল, ঠাকুর-ঝি?'

'তোমার বই পড়তে এত ভালোও লাগে! আমাদেরও তো বিয়ে হয়েছে, আমরাও তো বই পড়ি, কিন্তু বিয়ে হবার পর....'

সোনাদি বলে, 'কিন্তু এ-সব বই তো তোমার দাদারই কিনে দেওয়া।'

'তুমি বই পড়তে ভালোবাসো দাদা জানতে পেরেছে, তাই·· কিন্তু তা বলে সারাদিন বই মুখে দিয়েই থাকবে?'

'এ-বইটা যদি পড়ো ঠাকুর-ঝি তো তুমিও নাওয়া-খাওয়া ভুলে যাবে, এমন বই।'

'আমাদের সংসার-ধর্ম আছে বৌদি, আমাদের বই নিয়ে থাকলে চলে না।'

সোনাদি হেসে উঠলো, 'আর আমার বুঝি সংসার-ধর্ম নেই?'

'সংসার-ধর্ম থাকলে আর এমন বই নিয়ে মেতে উঠতে পারতে না,···তা দাদার সঙ্গে তোমার ক'দিন কথাবার্তা নেই শুনি?

'ওমা, সে কী কথা, এই তো পরশুদিন কথা বললাম?'

স্বামীনাথবাবু সেদিন অফিস থেকে আসতেই সোনাদি বললে, 'ঠাকুর-ঝি কি বলছিল জানো, তোমার সঙ্গে নাকি আমার ঝগড়া হয়েছে, কথা না বললেই যেন ঝগড়া হতে হবে—'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'ওদের কথায় কান দিয়ো না।'

'কিন্তু তুমিই বলো না, তুমি কি এতে রাগ করো?'

স্বামীনাথবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'আমাকে দেখে বুঝতে পারো না, আমি রাগ করি কিনা?'

সোনাদি বললে, 'তুমি ওদের সকলকে তাহলে বলে দিয়ো যে তুমি এতো রাগ করো না—ওরা কেন বোঝে না, ওদের বোঝাতে পারো না যে তোমার এতে অমত নেই?'

'আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে বলবো ওদের, কিন্তু ওরা কি বুঝবে?'

সেইদিন থেকে জব্বলপুরের একটি সংসারে স্বামী-স্ত্রীর এক অদ্ভুত দাম্পত্য-জীবন সুরু হল। সোনাদি স্বামীনাথবাবুর স্ত্রী। তবু এক শয্যায় শয়ন না করলেও কিছু আসে যায় না ওদের। স্বামীনাথবাবুর সঙ্গে যেদিন দেখা হয়, বলে, 'তোমাকে যেন বড় রোগা দেখাচ্ছে আজ—'

স্বামীনাথবাবু সংক্ষেপে বলেন, 'অফিসে বড় খাটুনি পড়েছে কিনা আজকাল।'

'অত না-ই বা খাটলে ?'

'না খাটলে কি চলে ?'

'রাত্রে ঘুম হয় ভালো ?'

'ঘুমের ব্যাঘাত হবার তো কোনও কারণ নেই, একবার শুলে কখন যে আমার রাত পুইয়ে যায় টেরও পাইনে।'

'তাহলে খাওয়া-দাওয়া ভালো করে করো, দুধটা তোমার আরো বেশি করে খাওয়া উচিত।'

'দুধ তো খাই।'

'তবে কিছুদিন ছুটি নিয়ে কোথাও চেঞ্জে যাও দিনকতক।'

'আর তুমি ?'

'তুমি যদি বলো আমিও সঙ্গে যেতে পারি!'

'আমি না বললে যাবে না সঙ্গে ?

'সেকি, আমার তো যাওয়াই উচিত, কিন্তু যদি না-ই যাই তো একলা যেয়ো না তা ব'লে। তাহলে অফিস থেকে একজন চাপরাসী সঙ্গে নিয়ো বরং, তোমার দেখাশোনা করবে।'

একদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরলো সোনাদি। নেপিয়ার টাউনে দাশ-সাহেবের বাড়িতে গীতাপাঠ হচ্ছিল। ভাষ্যকার কথা-প্রসঙ্গে বলছিলেন, 'জীব কী অণু, না বিভু ? জীব কি ব্রহ্মের অংশ, না ছায়া ? জীব কী ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন, না অভিন্ন ? আমাদের দর্শনশাস্ত্রের এ এক মূল সমস্যা, মৈনাককে যদি লেখনী করি আর সমুদ্র-জলকে মসিরূপে ব্যবহার করি তবু এর মীমাংসা হয় না—

ব্রহ্মসূত্র বলছেন—অংশো নানাব্যপদেশাৎ…

অথচ গীতা বলছেন,—অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্…

আবার উপনিষদ বলছেন,—একই ভূতাত্মা ভূতে ভূতে অবস্থিত রয়েছেন। জলে চন্দ্রের ছায়ার মতো একই তিনি বহুরূপে দৃষ্ট হচ্ছেন…।'

ননদরা শুনছিল। এক সময়ে বললে, 'চলো বৌদি, সংস্কৃতের কিছু মাথামুণ্ডু বুঝছিনে, বাড়ি গিয়ে বরং ঘুমোলে কাজ হবে।' কিন্তু সোনাদির খুব ভালো লাগছিল। বললে, আর একটু শোনো না ঠাকুর-ঝি, বড় ভালো লাগছে।' সোনাদির মনে হচ্ছিল যেন সে বাবার কাছে বসে গীতার ব্যাখ্যা শুনছে। এমনি করে বাবার কথা শুনতে শুনতে কতদিন বিভোর হয়ে গেছে! কতদিন সংসার, সমাজ, খাওয়া-দাওয়া ভুলে গেছে বাবার পড়া শুনতে শুনতে।

ননদরা বললে, 'তবে তুমি থাকো বৌদি, আমরা আসি—'

কখন ননদরা চলে গেছে। সভার সব লোক চলে গেছে। শেষ পর্যন্ত বুঝি দাশসাহেব একলা বসে ছিলেন। তা দাশসাহেব নিজের গাড়ি করেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেদিন। বাড়িতে এসে যখন পৌঁছুলো সোনাদি, তখন রাত প্রায় বারোটা। সমস্ত আবহাওয়া নিঝুম। বাগানের গেট খুলে যখন

ঢুকলো তখনও সোনাদির খেয়াল নেই রাত ক'টা বেজেছে।

দরজা খুলে দিয়ে ননদ বললে, 'হ্যাঁ বৌদি, এত রাত্তির করতে হয়!'

'রাত ক'টা?'

'দেখো না ঘড়ির দিকে চেয়ে—'

স্বামীনাথবাবু ঘুম থেকে জেগে বললেন, 'ঠাণ্ডা লাগেনি তো তোমার?'

সোনাদি বললে, 'না।'

পুটুর তখন এক বছর বয়েস। সোনাদি বললে, 'পুটু তাহলে তোমার কাছেই থাক্।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'থাক্ না আমার কাছেই, তুমি শুয়ে পড়োগে যাও—'

দাশসাহেবের বাড়িতে আজ গীতাপাঠ, কাল কথকতা, পরশু রামায়ণ পাঠ। দাশসাহেব অবশ্য ও-সব ধর্ম-কর্মের ধার ধারেন না। দাশসাহেবের স্ত্রীর অনুরোধেই এই সব অনুষ্ঠান হত। কিন্তু সেই স্ত্রী-ই একদিন মারা গেল হঠাৎ দু'টি ছেলে-মেয়ে রেখে সংসারকে একেবারে অনাথ করে দিয়ে। সেই অনাথ সংসারের হাল ধরতে এল সোনাদি।

রতি বলে, 'আজ তোমার কাছে শোব মা আমি।'

শিশু বলে, 'আমাকে বেড়াতে নিয়ে চলো না মা তোমার সঙ্গে।'

প্রথম প্রথম পালিয়েই আসতো সোনাদি। রতি আর শিশু দেখতে না পায়। অভিলাষ তখন থেকেই ছিল। ভুলিয়ে-ভালিয়ে সে-ই আড়ালে নিয়ে যেত। দাশসাহেবের গাড়ি নিঃশব্দে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিত সোনাদিকে।

দাশসাহেব বলতেন, 'তোমার তো দেখছি ভারি অসুবিধে হল।'

'না, অসুবিধে আর কী?'

'কিন্তু তোমাকে 'মা' বলে ডাকতে শেখালে ওদের কে?'

'ছেলে-মেয়েদের মা বলতে শেখাতে হয় না—আমি তিনজনেরই মা যে—'

'কিন্তু রাত্তির বেলা তোমাকে যে এখানে থাকতে বলে ওরা, স্বামীনাথবাবু কী ভাবছেন কে জানে—'

'ওঁকে তাহলে তুমি খুব চিনেছ!'

'এই যে এ বাড়িতে এতক্ষণ কাটাও, উনি কিছু বলেন না?'

'বাড়িতে থাকলেই কি আমার সঙ্গে চব্বিশ প্রহর দেখা হয়?'

সেদিন স্বামীনাথবাবু বললেন, 'কদিন তোমাকে দেখিনি মনে হচ্ছে?'

সোনাদি বললে, 'আমি তো বাড়িতে তিনদিন আসতেই পারিনি।'

'ও'!

তবু স্বামীনাথবাবু জিগ্যেস করলেন না, এ-তিনদিন কোথায় ছিল সোনাদি। কী এমন রাজকার্য!

সোনাদি নিজেই বললে, 'রতির বড় অসুখ করেছিল জানো?'

স্বামীনাথবাবু শুধু জিগ্যেস করলেন, 'এখন কেমন আছে?'

খানিক পরে স্বামীনাথবাবু বললেন, 'এমাসে প্রিমিয়ামের টাকাটা এখনও পাঠানো হয়নি, চিঠি এসেছে একটা।'

সোনাদি বললে, 'আমি আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আমি আজকে কী খাবো?

'তোমার শরীর খারাপ নাকি?'

'মাথাটা ধরেছে সকাল থেকে, ছাড়ছে না মোটে।'

ওদিকে দাশসাহেবের লোকও চিঠি নিয়ে আসে : 'রতি তোমাকে দেখবার জন্যে বায়না ধরেছে বড়, একবার এলে আমি অফিস যেতে পারি—'

সংসারের সম্বন্ধে কয়েকটা খুঁটিনাটি বিষয়ে উপদেশ দিয়ে তখনি সোনাদি চলে আসে দাশসাহেবের বাড়িতে।

দাশসাহেব বলেন, 'আজ আমার অফিস যাওয়াই হল না।'

'এখন তো আমি এসে গেছি, এখন যাও।'

'এত দেরি করে আর যাবো না—'

'অফিস কামাই কোরো না মিছিমিছি, যাও গাড়ি বার করতে বলছি আমি।'

'না-ই বা গেলাম।'

'না, তোমায় অফিস যেতেই হবে।'

এমনি করে এক অদ্ভুত সম্পর্ক গড়ে উঠলো জব্বলপুরের নেপিয়ার টাউনের দু'টো বাড়ির সঙ্গে। সাতদিন দাশসাহেবের বাড়িতে কাটলেও স্বামীনাথ-বাবুর কোনও অস্বস্তি হবার কথা নয়। সোনাদি স্বামীনাথবাবুরই স্ত্রী, তা সে নিজের বাড়িতে থাকুক আর পৃথিবীর যেখানেই থাকুক। আর দাশসাহেব? কাছে পেলেই কি সম্পূর্ণ পাওয়া হয়। এক ছাদের তলাতে থাকলেই কি একাত্ম হওয়া যায়? সোনাদি দূরে গেলেও যেন কাছে থাকে, কাছে রেখেও দুর্লভ মনে হয় সোনাদিকে! সত্যিই তো অখণ্ডকে যে জানতে পেরেছে, খণ্ড দেখে তো ভয় পাবার কথা নয় তার।

সোনাদি বলতো, 'উর্বশীর মতো একটা চরিত্র আঁকবার চেষ্টা কর তো দেখি, যে কারোও মাতা নয়, কন্যা নয়, বধূ নয়—কিছু নয়! বিক্রমোর্বশী পড়েছিস? পুরূরবার সঙ্গে উর্বশীর সেই সম্পর্ক—মনে আছে?'

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখায় পড়েছিলাম : 'উর্বশী কল্পনার সঙ্গিনী মানসের রঙ্গিণী, কবিরা যাকে রস বলেন সেই রসের খর-প্রস্রবণ।' মনে হত সোনাদি যেন নিজের কথাই বলতে চাইছে। আমি যাদের দেখেছি, যাদের কথা লিখেছি—সব যেন সাধারণ মেয়ে সব। ওই সুধা সেন, অলকা পাল, মিষ্টিদিদি, মিছরি বৌদি, মিলি মল্লিক—সবাই তুচ্ছ। সোনাদি আমার একটা গল্পও তাই ভালো বলেনি কোনোদিন। কিছু পছন্দ হয়নি সোনাদির কখনো। বলতো, 'বৃহতের দিকে নজর রাখ্, দৃষ্টি রাখ্ ভূমার দিকে, দৃষ্টি রাখ্ মহাভারতের দিকে। উপন্যাস যদি লিখতেই হয় তো মহাউপন্যাস লিখবি—অখণ্ড যার পরমায়ু। নইলে বছরে দু'টো করে বই লিখবি আর বছর না

কাটতেই সব ভুলে যাবে লোকে, তবে আর কিসের জীবন-শিল্পী।'

আমিও ভাবতাম—এত চরিত্র দেখেছি বলে আমার মিথ্যেই গর্ব। সত্যিই যে উর্বশীকে দেখতে পেয়েছে তার কাছে সব নারী-চরিত্র তো ম্লান।

তাই মিছরি-বৌদির গল্পটা লিখবো-লিখবো করেও আর লিখিনি। অথচ মিছরি-বৌদিকেই একদিন মনে হত কত বিচিত্র। অমরেশের বউ—সেই মিছরি-বৌদি।

মিষ্টিদিদির গল্প তো আপনারা শুনেছেন। এবার আর-একজনের গল্প বলি—সে আমার মিছরি-বৌদির গল্প। মিছরি-বৌদি কিন্তু আমার সাত কুলের কেউ নয়। আপন বৌদি তো দূরের কথা, দূর সম্পর্কে'রও বৌদি নয়। মোট কথা মিছরি-বৌদিকে আমি জীবনে দু'বারের বেশি দেখিওনি। তবুও মিষ্টিদিদির কথায় মিছরি-বৌদির কথা আমার প্রায়ই মনে পড়তো। কোথায় যেন মিষ্টিদিদির সঙ্গে মিছরি-বৌদির একটা মিলও ছিল। হয়ত সে-মিল তাদের চেহারায়। মিষ্টিদিদির মত মিছরি-বৌদিও ছিল পাতলা ছিপছিপে রোগা। মনে হত ফু' দিলে উড়ে যাবে বুঝি। মনে হত দু'পা হাঁটলেই বুঝি হার্ট-ফেল্ করবে। মনে হত—আর ক'দিনই-বা বাঁচবে···একদিন একটু জ্বর হলেই মিছরি-বৌদি মারা যাবে হঠাৎ।

অন্তত অমরেশ মিছরি-বৌদিকে নিয়ে যা করতো—আমার তো রীতিমতো ভয় হয়েছিল।

অমরেশ ছিল গুণ্ডা চেহারার মানুষ। বলতো, 'এই দেখ, মিছরিকে নিয়ে কেমন লোফালুফি খেলি। এই দেখ—এক—দুই—তিন—'

আমার অন্তরাত্মা তখন শুকিয়ে গেছে। মিছরি-বৌদিও কম ভয় পায়নি। মিছরি-বৌদিকে টপ্ করে চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে লোফালুফি সুরু করে দিত অমরেশ। একটু যদি হাত ফস্কে যায় তো, মিছরি-বৌদির ওই শুকনো হাড় ক'খানা আর আস্ত থাকবে না তাহলে।

বলতাম্ 'থাম্—থাম্—করিস কি অমরেশ। থাম্।'

মিছরে বৌদিও তখন বেশ ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।

কাপড়চোপড় নিয়ে ব্যস্ত। মাথার ঘোমটা খসে গেছে। খোঁপা খুলে গেছে। অমরেশের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে বাঁচে যেন।

বললে, 'দেখলেন তো ঠাকুরপো—দিনরাত এই রকম। যদি পড়ে যেতুম—'

অমরেশ তখন হাতের মাস্‌ল্ দুটো ফোলাচ্ছে।

বললে, পড়তেই যদি যাবে তো, চেহারাটা বাগিয়েছিলাম কেন? এতদিন মাখন, ডিম, ছোলা খেয়েছি কি শুধু মিছিমিছি?'

তাই এই মিছরি-বৌদিকেই বহুদিন পরে একদিন দেখলাম জব্বলপুর স্টেশনে।

জব্বলপুর স্টেশনে বম্বে মেল থেকে নেমে ছোট লাইনের গাড়িতে উঠবো। তাড়াতাড়ি করছি। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে বললে, 'ঠাকুরপো না?'

ফিরে চাইলাম। কিন্তু সামনে যাকে দেখলাম তাকে আমার চিনতে পারার কথা নয়। বেশ মোটাসোটা মেয়ে। মাথায় আধঘোমটা। হাতে একটা এম্ব্রয়ডারি-করা ব্যাগ। ফরসা, মাজাঘষা রঙ। আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে।

আমার মুখ-চোখের ভঙ্গী দেখে বললে, 'এরি মধ্যেই ভুলে গেলেন নাকি মিছরি-বৌদিকে?'

মিছরি-বৌদি!

আমি সবিস্ময়ে আর একবার চেয়ে দেখলাম। কিন্তু আমার চেনা মিছরি-বৌদির সঙ্গে এ চেহারার মিল নেই কোনখানে। কেমন যেন হতবাক্ হয়ে গেলাম। এমন তো হবার কথা নয়। এমন পরিবর্তন তো হয় না মানুষের।

মিছরি-বৌদি তখন হাসছিল। বললে, 'আমার বাড়িতে চলুন, আজকে আর কোথাও যেতে পাবেন না।'

মিছরি-বৌদি কাদের বুঝি ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল।

বললাম, 'আমার যে জরুরী কাজ ছিল একটা।'

'তা থাকুক কাজ'—ব'লে আমাকে টেনে নিয়ে চললো।

আমি কিন্তু তখন অন্য কথা ভাবছি। অমরেশ অবশ্য চিকিৎসা করাতো মিছরি-বৌদির। দেখেছিলাম মিছরি-বৌদির টেবিলে অনেক রকম ওষুধের শিশি। অনেক রকম লিভার এক্সট্রাক্ট।

অমরেশ বলতো, 'মনটা খুশি রাখতে পারলেই মিছরির শরীরটা চড় চড় করে সেরে উঠবে।'

তা মিছরি-বৌদির মন প্রফুল্ল রাখবারই কি অমরেশ কম চেষ্টা করছে! বাগানে দোলনা টাঙিয়ে দিয়েছে। সে দোলনাও আমি দেখেছি। কিন্তু অমরেশের তো কাণ্ড। দোল দিতে দিতে অমরেশ এমন জোরে দোল দিত যে, মিছরি-বৌদির বুক তখন কাঁপছে থরথর করে। নামতে পারলে বাঁচে।

মিছরি-বৌদি বলেছিল, 'দেখছেন তো ঠাকুরপো, আপনি না থাকলে আমি আজ মরেই যেতাম।'

আমি সেবার বলে এসেছিলাম, 'খুব সাবধানে থাকবেন বৌদি—অমরেশ সব পারে!'

অমরেশকে আমি চিনতাম ছোটবেলা থেকে। মিত্র ইনষ্টিটিউশন্ থেকে এক ক্লাসে পড়ে একসঙ্গে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম দুজনে। অমরেশকে চিনতে আমাদের আর বাকি নেই। কতদিন কতবার অমরেশের কত ঘুষি, কত কিল খেয়েছি তার আর হিসেব-পত্তোর নেই। অথচ আদর করেই করতো সে-সব। অমরেশের আদরের অত্যাচারে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠতাম ছোটবেলায়।

হঠাৎ হয়তো আদর করেই পিঠে একটা ঘুষি মেরে বললে, 'কিরে, কোথায় যাচ্ছিস?'

কিংবা হয়তো হাসির গল্প করতে করতে খুব ফুর্তি হয়েছে অমরেশের,

হঠাৎ ফুর্তির আবেগে দু'দিকে দু'জনের পিঠে দুই কিল মেরে হেসে গড়িয়ে পড়লো। বললো, 'আর হাসাস্‌ নে ভাই, দম ফেটে যাবে এবার।'

অমরেশের পক্ষে যা ছিল খেলা, আমাদের পক্ষে তা-ই ছিল মৃত্যু-যন্ত্রণা। আমরা তখন হয়তো কিল খেয়ে আর শিরদাঁড়া সোজা করতে পারছি না। যন্ত্রণায় পিঠ কন্‌কন্‌ করছে।

অমরেশ বলতো, 'আমার মতো ছোলা খা, দুধ খা, ডিম খা, মুগুর ভাঁজ্‌—তোদেরও আমার মতো চেহারা হবে। ও রকম দশটা কিলেও কিছু হবে না।'

অমরেশের ঘরে গিয়ে দেখেছি—চারিদিকে কেবল স্যাণ্ডো, হারকিউলিস, এ্যাপোলোর ছবি। নানারকমের চার্ট। শরীর সারাবার কৌশল লেখা সব বই। বারবেল, মুগুর, ডাম্বেল—এই সব! যত রকমের কলা-কৌশল আছে, সব শিখে নিত অমরেশ। ভারী ভারী লোহার বল ছুঁড়তো। দেড় মণ দু'মণ ওজনের বারবেল অনায়াসে তুলতো মাথার ওপর।

বলতো, 'জানিস, কাল হঠাৎ স্যাণ্ডোকে স্বপ্ন দেখেছি।'

বললাম, 'স্যাণ্ডো!'

হ্যাঁরে, দেখলুম স্যাণ্ডো যেন আমার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। আমি স্যাণ্ডোকে দেখেই বাইসেপস্‌ দু'টো ফুলিয়ে দিলুম। স্যাণ্ডো বললে, 'সাবাস্‌ বেটা, জীতা রহো।'

আমাদের কুস্তির আখড়াতে একলা অমরেশই শুধু শেষ পর্যন্ত টিঁকে ছিল। চাঁদা করে কুস্তির আখড়া করেছিলুম সোনাদির বাগানের এক কোণে। নিমপাতা দিয়ে আখড়ার মাটি মেখেছিলুম। ভোরবেলা উঠে গিয়ে আখড়ার মাটিতে গড়াগড়ি দিতুম। প্যারালাল বার, হোরাইজেন্টাল বার, রিং—সব রকমের ব্যবস্থাই ছিল। তারপর বাড়িতে এসে কল্‌-বেরোন ছোলা আর আদা-নুন খেয়ে স্নান করে ফেলতুম। সে-সব কতদিন আগেকার কথা। আমরা অমরেশের মতো চেহারা করবার চেষ্টা করতুম। অমরেশ ছিল আমাদের পাণ্ডা। অমরেশের উৎসাহেই আমাদের উৎসাহ, অমরেশই আমাদের আদর্শ। মাসে একদিন হনুমানজির পুজো হতো। আখড়ার এক কোণে হনুমানজির মূর্তি তৈরি করেছিল আমাদের আর্টিস্ট জয়ন্ত। সেদিনটা আমাদের উৎসব। সকাল থেকে সিঁদুর মাখানো হচ্ছে হনুমানজির গায়ে। চাঁদার পয়সায় ছোলা খাওয়া হত, মাখন আসতো, মর্তমান কলা আসতো। অমরেশ বলতো, 'খুব করে ভিটামিন খাবি, তাতে শরীরের জোর হয়।'

মনে আছে ভিটামিন কথাটা অমরেশের মুখেই প্রথম শুনি। সেই ভিটামিন খেয়ে কিনা জানি না, অমরেশের চেহারা দিন দিন দৈত্যের মত হয়ে উঠলো। আমরা যে-যার দিকে ছিট্‌কে পড়লাম। কেউ চাকরিতে, কেউ ব্যবসায়, কেউ বা দালালিতে। ভুলে গেলাম আখড়ার কথা।

কিন্তু অমরেশ স্বাস্থ্যচর্চা ছাড়লে না। ক্লাবের বারবেল, ডাম্বেল, মুগুর সব কিছু নিয়ে একদিন ছাদের উপর তুললো, বললে, 'ওটা কি ছাড়তে পারি

রে—তাতে যে বাত হবে।'

বললে, 'তোরাও ছাড়িস্‌নি। এখন ছেড়ে দিলে বাতে পঙ্গু হয়ে যাবি সব।'

মনে আছে আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা ইনসিওরের দালালি করতো। একবার এসেছিল কিছু কেস যোগাড় করে নিতে। বললে, 'তোর বন্ধু-বান্ধবরা তো চাকরি-বাকরি করছে এখন, দে না দু'একটা কেস্‌ করিয়ে।' দু' একটা পলিসি করিয়েও দিয়েছিলাম। কেউ বা স্বার্থের তাগিদে করেছিল, কেউ বা উপরোধে পড়ে। কিন্তু অমরেশের কাছে কথাটা পাড়তেই রেগে গেল।

বললে, 'ইনসিওর করবো কেন?'

দাদা বুঝিয়ে বলতে গেল, 'এই তো জীবন আমাদের! কখন আছি, কখন নেই···আপনার অবর্তমানে···'

কথাটা শেষ হল না। অমরেশ বললে, 'মরবো কি মশাই, মরে ওমনি গেলেই হল!'

বলে গেঞ্জিটা খপ্‌ করে খুলে ফেলে আবার বললে, স্বাস্থ্যটা দেখেছেন? অনেক বারবেল, মুগুর ভেঁজে গড়েছি চেহারাটা।'

তারপর গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে বললে, 'অত সহজে মরছি না আমি মশাই।'

তা সেই অমরেশ শেষকালে একদিন কলকাতা ছেড়ে চলে গেল হঠাৎ। আর তার খবর পাইনি। পরে শুনলাম, সে নাকি মোরাদাবাদের এক পালোয়ানের কাছে কুস্তি শিখতে গেছে। তারপর আরো কয়েক বছর পরে যখন আমি বাইরে চাকরি করছি, তখন একবার কলকাতায় এসে শুনলাম—বক্সিং-এ ট্রফি জিতেছে অমরেশ সেবার। এমনি করে কয়েক বছর পর পর একটু একটু সংবাদ পাই অমরেশের। কখনও খবরের কাগজে খেলাধুলোর পাতায় ছবি বেরোয়, কখনও শুনি, সে লক্ষ্ণৌতে ড্রিল-মাস্টারি করছে কোন সরকারি ইস্কুলে। আবার কখনও শুনি, বোম্বেতে মিউনিসিপ্যালিটির চাকরি নিয়ে গেছে ফিজিক্যাল ইন্সট্রাকটার হয়ে। এই রকম ছাড়াছাড়া খবর সব। কিন্তু মনে মনে বরাবর একটা শ্রদ্ধা ছিল অমরেশের ওপর। একমাত্র আমাদের মধ্যে ও-ই কেবল স্বাস্থ্যচর্চা নিয়ে রইল। মনে হত বাঙালীর বদনাম ঘোচাতে পারবে বটে অমরেশ!

তারপর যেবার জব্বলপুরে গেলাম আপিসের কাজে, সেইবার হঠাৎ রাস্তায় অমরেশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

নেপিয়ার টাউনে লেভেল-ক্রসিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে আছি। গেট বন্ধ। ট্রেন আসছিল।

হঠাৎ পিঠের ওপর এক ভীষণ মর্মান্তিক ঘুষি!

মনে হল পিঠটা যেন আর নেই আমার! সমস্ত চোখে তখন আমি সরষের ফুল দেখছি। কোন রকমে চোখের জল সামলে সামনে চেয়ে দেখি, হো হো করে বিকট হাসছে আর কেউ নয়, আমাদের অমরেশ! এক হাতে সাইকেলটা ধরা।

বললে, 'তুই এখানে?'

আমারও ও-ই ছিল প্রশ্ন। প্রশ্ন না করে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে অমরেশের দিকে চেয়ে রইলাম শুধু। অমরেশ এক হাত দিয়ে আমার কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'তুই এখানে কেন রে?'

আমিও বললাম, 'তুই?'

কিন্তু এবার সরে এলাম। কাছে থাকলেই, গায়ে হাত দিয়ে কথা বলা অমরেশের স্বভাব।

গেট্ তখন খুলে দিয়েছে। একটা ট্রেন ডানদিক থেকে বাঁদিকে চলে গেল। অনেকগুলো গরুর গাড়ি, সাইকেল-রিক্‌শা, ঘোড়ার গাড়ি আটকে ছিল এতক্ষণ। তারাও চলতে লাগলো।

অমরেশ বললে, 'আমার বাঙলোয় চল্।'

বললাম, 'তুই এখানে কেন? কবে থেকে?'

অমরেশ বললে, 'সে সব কথা পরে হবে, তুই আমার সাইকেলের পেছনে ওঠ্।

বললাম, 'কতদূর?'

'বেশী না, মাইল ছয়েক।'

ছ'মাইল সাইকেলের পেছনে চড়াও যেমন বিপদ, আমার মতো ভার নিয়ে এতখানি চালানোও শক্ত। বললাম, 'না থাক। তোর কষ্ট হবে।'

'কষ্ট। তোকে কাঁধে করে দশ মাইল নিয়ে যেতে পারি জানিস্, মুগুর ভাঁজি কি মিছিমিছি নাকি?'

তারপর বললে, 'তুই আমায় লজ্জা দিলি সত্যি।'

বললাম, 'এখনও মুগুর ভাঁজিস্ তুই?'

যাহোক, সেদিন শেষ পর্যন্ত সাইকেল-রিক্‌শাতে চড়ে অমরেশের বাঙলোয় গিয়েছিলাম। নেপিয়ার টাউন থেকে গান্-ক্যারেজ ফ্যাক্টরি। রাস্তা অনেকখানি। মাঝে অনেক চড়াই উতরাই। কিন্তু সারা রাস্তা অমরেশ আমার পাশে পাশে গল্প করতে করতে চলেছিল।

বলেছিল, 'জব্বলপুরে এলি, আর আমার বাঙলোয় উঠবি না—শুনলে মিছরি রাগ করবে যে।'

বুঝেছিলাম, মিছরি অমরেশের বউ-এর নাম। মিছরির কথা বলতেই অমরেশ পঞ্চমুখ। মিছরি বড় রোগা। মিছরি যা খায় হজম হয় না। মিছরির শরীরের ওজন। এই সব।

বললে, 'দ্যাখ্ আজ পর্যন্ত কত ছেলেকে মানুষ করলুম, কত হাড়জির-জিরেকে মাস্‌ল্ ফুলিয়ে দিলুম; কত ছেলে আগে ভাত হজম করতে পারতো না, তাদের দিয়ে লোহা হজম করিয়ে দিলুম তার গোনাগুনতি নেই। কিন্তু মিছরিকে পারছি না। কেবল আজ অম্বল, কাল চোঁয়াঢেকুর।'

বললাম, 'ডাক্তারে কী বলে?'

তারপর অমরেশ আরো অনেক কথা বলেছিল। বলেছিল, 'তা ছাড়া ও-মেয়েকে বিয়ে না করলে অমন চাকরিটা প্রায় তখন হাত-ছাড়াই হয়ে যায়—

শ্বশুর নিজে হল তখন ওয়ার্কস্ ম্যানেজার—'

অমরেশ রাস্তায় যেতে যেতে অনেক গল্প করেছিল সেদিন। কিন্তু অমরেশের কথা শুনে আমার যেন সেদিন খুব আনন্দ হয়েছিল মনে মনে। রোগা চেহারার ওপর অমরেশের বরাবর রাগ ছিল। আশেপাশে ক্ষীণস্বাস্থ্য লোক দেখতে পারতো না মোটে। দুর্বল লোক দেখলে কিল-ঘুষি আবার বেশি চালাতো। দুম্ দুম্ করে ঘুষি মারতো তার বুকের পাঁজরার ওপরে। বুক ফুলিয়ে বলতো, 'স্বাস্থ্য হবে এই এইরকম, এই দ্যাখ'—বলে নিজের বুকটা ফুলিয়ে ডাবল্ করতো অমরেশ।

সেই অমরেশ এবার সত্যিই জব্দ হয়েছে ভেবে খুব আনন্দ পেলাম। মিছরিকে নিশ্চয়ই ঘুষি মারতে পারবে না। মিছরির জন্যেই তার চাকরি। শুধু চাকরি নয়, ভালো চাকরি। নইলে বাঙলো পায়!

কিন্তু অমরেশের বাঙলোয় গিয়ে সে-ভুল আমার ভাঙলো।

বাঙলোর সামনে সাইকেল থেকে নেমেই কিন্তু অমরেশ চীৎকার জুড়ে দিলে, 'মিছরি, মিছরি—'

চাকর-বাকর দৌড়ে এল অমরেশের সাড়া পেয়ে, কিন্তু যাকে ডাকা সে কিন্তু এল না।

একজন চাকরকে অমরেশ জিগ্যেস করলে, 'মেম-সাহেব কোথায়?'

সে বললে, 'বিছানায় শুয়ে আছে।'

আমাকে ঘরে বসিয়ে অমরেশ দৌড়ে ভেতরে গেল। বললে, 'তুই বোস্। আমি মিছরিকে ডেকে আনি।'

ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখলাম। সাহেবী কেতায় সাজানো ঘর, একপাশে দেয়ালের গায়ে ম্যাণ্টেলপিসও রয়েছে। তার নিচে আগুন জ্বালাবার জায়গা। ওপরে অমরেশের নানা বয়সের ফোটোগ্রাফ। কোনোটা খালি গায়ে। শরীরের নানা অংশের মাস্‌ল্ দেখাচ্ছে অমরেশ। অনেক মেডেল ঝোলানো গলায়। সার্টিফিকেটগুলো ফ্রেমে বাঁধিয়ে টাঙিয়ে দিয়েছে। আর দেয়ালের চারদিকে বড় বড় পালোয়ান, কুস্তিগীরদের ছবি। অমরেশের সব দেবতামণ্ডলী।

খানিক পরে যেন মেয়েমানুষের গলার আওয়াজ পেলাম, 'ওমা, করো কী —ছি ছি, করো কী...'

দেখি, অমরেশ বউকে একেবারে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এসে হাজির।

বললে, 'দেখলি, এই হল মিছরি।—আর, ও হল ...'

আমি যতটা না অপ্রস্তুত হলাম, মিছরি-বৌদি আরো অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে অমরেশ ঘরের ভেতর ঘুরতে লাগলো।

মিছরি-বৌদি বললে, 'কী লজ্জা বলো তো! ছাড়ো!'

কিন্তু মনে আছে, অমরেশ সেদিন, সেই প্রথম দিন, কী কাণ্ডই যে করেছিল!

বললে, 'এই দ্যাখ্ মিছরিকে লুফবো দেখবি।'

কিন্তু আমি ঘটনাটা হৃদয়ঙ্গম করবার আগেই অমরেশ মিছরি-বৌদিকে সত্যি

সত্যি লুফতে আরম্ভ করেছে।

বললে, 'এই দ্যাখ্—এক, দুই, তিন…'

আমি আর দেখতে পারলুম না। আমার বুকটা তখন ধড়াস ধড়াস করছে।

মিছরি বৌদিও তখন অনুনয় বিনয় করে বলছে, 'ছাড়ো, ছাড়ো, পড়ে যাবো যে। ছি ছি, কী তুমি।'

মিছরি-বৌদির মাথার খোঁপা তখন খসে গেছে। শাড়ি অবিন্যস্ত। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই অমরেশের। সে তখন গুনছে, 'তিন, চার, পাঁচ,…

আমি আর পারলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'ছাড় না অমরেশ, ওকি—ছাড়—'

প্রথম দিনেই অমরেশ এমন কাণ্ড করবে ভাবতে পারিনি আমি। তাহলে আসতামই না এখানে। দেখলাম, অমরেশ এতদিন পরেও এতটুকু বদলায়নি। গুণ্ডামির ভাবটা তার চরিত্র থেকে এখনও যায়নি। নিজের স্ত্রীর ওপরেও সে তেমনি নিষ্ঠুর।

মিছরি-বৌদি তখন হাঁপাচ্ছে। চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে। নামিয়ে দেবার অনেকক্ষণ পরেও সেদিন মুখে কথা বেরোয়নি মিছরি-বৌদির। চেয়ারে বসে পাখার তলায় অনেকক্ষণ জিরিয়ে তবে মুখে কথা ফুটলো।

বললে, 'দেখলেন তো ঠাকুরপো, আপনি না থাকলে আমি আজ মরেই যেতাম!'

মিছরি-বৌদিকে এবার ভালো করে দেখলাম। কাঠির মতো পাতলা শরীর, গলায় কণ্ঠা বেরোন। গালের চোয়াল দু'টোও স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, তীক্ষ্ণ। কোথাও কোনো চর্বি যেন নেই শরীরে।

অমরেশ বলেছিল, 'দেখলি তো ভাই, এই রকম সারাদিন—খালি বিছানায় শুয়ে থাকবে।'

খেতে বসে দেখলাম মিছরি-বৌদি খাবারগুলো টেবিলের নিচে একটা বাটিতে লুকিয়ে ফেলেছে। অমরেশ মিছরি-বৌদির উল্টো দিকে বসেছিল। খাওয়া দেখছিলাম আমি অমরেশের। এক প্লেট ভাত, চার বাটি মাংস, এক ডিস্ ফল, তারপর প্রায় দু'সের দুধ আর একুনে তিরিশখানি রুটি। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই। আর এক-একবার মুখ তুলে আমাকে বলছে, 'খা খা। ফেলে রাখিস্‌নে, সব খেতে হবে।'

তারপর মিছরি-বৌদিকে লক্ষ্য করে বললে, 'ক'টা রুটি খেলে তুমি?'

মিছরি-বৌদি অক্লেশে বললে, 'এই তো বারোখানা হচ্ছে।'

'আর মাংস?'

মিছরি-বৌদি অম্লান বদনে বললে, 'তিন বাটি।'

অমরেশ বললে, 'আর চারখানা রুটি খেলে তবে তোমার ছুটি।'

মিছরি-বৌদি কিছু বললে না। কিন্তু দেখলাম খুব সন্তর্পণে মাংস, রুটি, তরকারী, ফল—সমস্ত টেবিলের নিচে একটা পাত্রে লুকিয়ে ফেলেছে।

পরে আমাকে মিছরি-বৌদি বলেছিল, ও'কে যেন বলবেন না, তাহলে আমায় একেবারে খুন করে ফেলবেন। ষোলখানা রুটি খেয়ে কি মরবো নাকি পেট ফুলে, ঠাকুরপো।'

'ক'খানা খেলেন সত্যি সত্যি ?'

'মাত্র দু'খানা খেলেই আমার পেট ভরে যায়।'

খেতে খেতে অমরেশ বলেছিল, 'খাবে, দৌড়বে, লাফাবে-ঝাঁপাবে, হৈ হৈ করবে—তবে না লাইফ্। আর তা না হলে কুড়ি বছরেই বুড়িয়ে গিয়ে একদিন রক্ত-আমাশা হয়ে টুপ করে মরে যাও—বাঙালীর তো ওই এক পরিণতি।'

মিছরি-বৌদি পরে বলেছিল, 'এ আর কী দেখছেন ঠাকুরপো, আপনি এসেছেন তাই, নইলে দুপুরবেলা যেদিন বাড়ি থাকেন, সেদিন হঠাৎ যদি খেয়াল হয়, তো স্কিপিং করতে হবে ও'র সঙ্গে···সে আর শেষ হতে চায় না, পা হাত কন্‌কন্ করলেও রেহাই নেই, শেষকালে একেবারে আমার অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো অবস্থা হয়—'

বলতে বলতে মিছরি-বৌদির যেন ভয়ে মুখ শুকিয়ে এল।

আর ওই দেখুন দোল্‌না, বিকেলবেলা এসেই দোল্‌না চাপতে হবে—ওতে নাকি পায়ের আর বুকের জোর বাড়ে, আবার মাঝখানে একবার ঘোড়া কিনেছিলেন একটা, বললেন—রাইডিংটা সবচেয়ে নাকি ভালো একসারসাইজ।'

'সে ঘোড়া কোথায় গেল ?'

'সে মরে গেল তাই, কিন্তু ক'দিন যে সে কী গায়ে ব্যথা—ঘুমোতে পারি না, শুতে পারি না, দাঁড়াতে পারি না, বসতে পারি না—সে যে কী অশান্তি! শেষে ঘোড়াটার বোধহয় মায়া হল আমার ওপর, মরে গেল একদিন দয়া করে।'

অমরেশের ব্যাপারটা আমার বরাবরই কেমন যেন একটা ব্যাধি বলে মনে হত। সব শুনে সেদিনও মনে হয়েছিল ব্যাধিটা যেন বেড়েছে বৈ কমেনি। আর একটা দিন মাত্র ছিলাম জব্বলপুরে, কিন্তু সেই একদিনেই মিছরি-বৌদির জন্যে আমার সত্যিই মায়া হল। এমন স্বামীর হাতে পড়ে মিছরি-বৌদি নিশ্চয় একদিন মারা যাবে মনে হল। ওই শরীর নিয়ে যে কী করে বেঁচে আছে, এইটেই আশ্চর্য মনে হয়েছিল সেদিন। ওই স্বাস্থ্য-উদ্ধারের নামে অত্যাচার—এ অমরেশের আর একরকম চরিত্র-বিকৃতি। ওর চিকিৎসা, সাধারণ চিকিৎসা নয়। রোগটা মানসিক। মনের নিভৃতে কোথায় যেন পোকা ধরেছে অমরেশের।

আসবার দিন মিছরি-বৌদিকে কথা দিয়েছিলাম, 'এদিকে এলে নিশ্চয় উঠবো আপনার এখানে।'

মিছরি-বৌদি বলেছিল, 'এলে আমাকে আর দেখতে পাবেন না, ঠাকুরপো, তবে আপনার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে ঠিকই।'

মিছরি-বৌদি অবশ্য হাসতে হাসতেই কথাটা বলেছিল, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছিলাম তার মনের গোপন ব্যথাটুকু। সেদিন মিছরি-বৌদির কথায় প্রতিবাদও করতে পারিনি সেই জন্যে। জানতাম অমরেশের হাতে মিছরি-বৌদির ইহলীলা

একদিন হঠাৎ অকালে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবেই শেষ হয়ে যাবে। কোনও সন্দেহ নেই আর তার।

অমরেশ গাড়িতে তুলে দিতে আসবার সময় বলেছিল, 'তুই বোধহয় ও-সব চর্চা-টর্চা ছেড়ে দিয়েছিস্, না রে?'

আমি কিছু উত্তর দিইনি।

খানিক থেমে অমরেশই বলেছিল, 'যদি দীর্ঘ পরমায়ু পেতে চাস্ তো, একসারসাইজ্‌টা ছাড়িস্‌নে, বুঝলি?'

কিন্তু তখন আমার চোখের সামনে মিছরি-বৌদির জ্বলন্ত উদাহরণটা স্পষ্ট ভেসে রয়েছে। আমি সেদিন ভালো করে কথাই বলিনি অমরেশের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত।

এ-ঘটনার পর অনেকদিন কেটে গেছে। জব্বলপুরের দিকে আর যাওয়া হয়নি। মিছরি-বৌদির খবরও আর পাইনি। অমরেশের সঙ্গেও আর দেখা হয়নি।

এতদিন পরে আবার জব্বলপুর স্টেশনে মিছরি-বৌদির সঙ্গে দেখা হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত ঘটনাটা মনে পড়লো।

কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম দেখে—সেই মিছরি-বৌদি এমন স্বাস্থ্যবতী হল কেমন করে! তবে কি অমরেশ শেষ পর্যন্ত নিজের সিস্টেমে সব রোগ সারিয়ে দিলে মিছরি-বৌদির। নাকি ডাক্তারের কোনো ভালো ওষুধে কাজ হলো শেষ পর্যন্ত।

সাইকেল-রিক্‌শায় চলেছিলাম দুজনে। নেপিয়ার টাউনের বাজারের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মিছরি-বৌদি বললে, 'এই দেখুন ঠাকুরপো, এই আমাদের ইস্কুল।'

'ইস্কুল। ইস্কুলে পড়েন নাকি?'

'না, বুড়ো বয়সে আর পড়বো কেন? পড়াই।'

'মাস্টারি করেন?'

মিছরি-বৌদি বললে, 'হ্যাঁ, মাস্টারিই তো। আজ সাত বছর এই এক ইস্কুলেই কেটে গেল।'

কিন্তু কথাটা শুনে কেমন যেন অবাক্ হয়ে গেলাম। অমরেশ কি শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকে দিয়ে চাকরি করাচ্ছে। তবে হয়ত চাকরি করছে বলেই স্বাস্থ্যটা ভালো হয়েছে মিছরি-বৌদির। সারাদিন ঘরে বসে থাকলে শরীর মন কিছুই কি ভালো থাকে? ভালোই হয়েছে, মনে মনে ভাবলাম।

জিগ্যেস করলাম, 'মাস্টারি আগে কি করেছিলেন কখনও?'

মিছরি-বৌদি বললে, 'ওমা, মাস্টারি করতে যাবো কেন, আমারই বলে তিন-তিনটে মাস্টার ছিল, তখন বাবা বেঁচে ছিলেন—সকালে একজন পড়াতো ইংরেজী, বিকেলে অঙ্ক আর রাত্রে হিস্ট্রি; কিন্তু তখন অত পড়েও দেখুন স্বাস্থ্য খারাপ হয়নি; বিয়ে হবার পর থেকেই যে কী হল—'

বললাম, 'কিন্তু এখন তো আপনার চেহারা একেবারে বদলে গেছে।'

মিছরি-বৌদি বললে, 'তাই তো আপনি আমাকে চিনতে পারেননি—আমি কিন্তু আপনাকে ঠিক চিনেছি, ঠাকুরপো।'

একটা দোকানের সামনে এসেই মিছরি-বৌদি রিক্শাওয়ালাকে থামতে বললে। আমাকে বললে, 'আপনি একটু বসুন ঠাকুরপো, দোকানে একটা জিনিস কেনবার আছে আমার।'

মিছরি-বৌদি নেমে গেল। আমি ভাল করে দেখতে লাগলাম পেছন থেকে। আশ্চর্য! চেনাই যায় না আর সেই আগেকার মিছরি-বৌদিকে। সারা শরীরে আগে যেখানে তীক্ষ্ণতা ছিল, এখন সেখানে নিটোল নিভাঁজ, লাবণ্য। সুডৌল পরিপূর্ণ, নরম মিছরি-বৌদি। অথচ অমরেশ মিছরিবৌদিকে নিয়ে কী লোফালুফিই না করেছে একদিন। দোল খাইয়ে, ঘোড়ায় চড়িয়ে মোটা করবার জন্যে অমরেশের বকুনির আর অন্ত ছিল না। কিন্তু এ পরিবর্তন হল কী করে!

মিছরি-বৌদি ঘামতে ঘামতে এল। হাতে একগাদা জিনিস-পত্তোর।

আবার রিক্শায় উঠে আমার পাশে বসে রিক্শাওয়ালাকে বললে, 'চল, জল্দি জল্দি চল্—'

আমার দিকে চেয়ে মিছরি-বৌদি বললে, 'মোটা হওয়ার অনেক বিপদ, ঠাকুরপো—দেখছেন কী ঘামছি! অথচ আগে কত ওষুধ খেয়েছি, কত বকুনি খেয়েছি ও'র কাছে এই জন্যে। বলতেন,—তোমাকে নিয়ে সমাজে বেরোতে আমার লজ্জা করে। তা বলুন তো ঠাকুরপো, এখন কি আমাকে ভালো দেখায়?'

বললাম, 'তা দেখায় বৈকি।'

'আর আগে?'

বললাম, 'আগেও ভালো দেখাত, তবে এখন আরো ভাল দেখায়।—তা অমরেশ কী বলে।'

মিছরি-বৌদি বললে, 'উনি আর কী বলবেন? আমার দিকে চেয়ে দেখলে তো! কেবল নিজের স্বাস্থ্য নিয়েই ব্যস্ত। এই দেখুন না, বিস্কুট লজেন্স নিয়ে যাচ্ছি ওঁর জন্যে।'

'অমরেশ লজেন্স খাবে নাকি বুড়ো বয়সে?'

মিছরি-বৌদি বললে, 'কেবল খাবার জন্যে যখন বায়না ধরেন তখন দু'টো লজেন্স দিয়ে বলি চোষো, নইলে বড় বিরক্ত করেন কিনা! আর আমি তো সারাদিন ইস্কুলে, সকালবেলা খাইয়ে দাইয়ে রেখে ইস্কুলে চলে আসি, সন্ধ্যেবেলা গিয়ে দেখি ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

কেমন যেন অবাক্ লাগলো। কিছুই বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'আজকাল অমরেশ সন্ধ্যেবেলায় ঘুমোয় নাকি?'

মিছরি-বৌদি বললে, 'সকাল-সন্ধ্যে-বিকেল সব সময়েই ঘুমোচ্ছেন, আমি তো তাই বলি—অত ঘুম ভালো নয়, সারাদিন ঘুমোলে ক্ষিদে তো পাবেই, তাই বিছানার পাশে এই বিস্কুট, লজেন্স, আপেল, কমলালেবু ছাড়িয়ে কেটে

রেখে আসি। আমারও তো চাকরি ঠাকুরপো, বেশি কামাই করলে আমাকেই বা চাকরিতে রাখবে কেন? আজকাল তো পয়সা ফেললে লোকের অভাব হয় না—চাকরির বাজার তো দেখছি।'

আরো আশ্চর্য লাগলো।

বললাম, 'সারাদিনই ঘুমোয় অমরেশ তো, আপিস যায় কখন?'

মিছরি-বৌদি বললে, 'উনি তো রিটায়ার করেছেন।'

রিটায়ার করেছে অমরেশ! এই বয়েসেই রিটায়ার করলো! চল্লিশও হয়নি যে!

মিছরি-বৌদি বললে, 'না, বুঝলুম না-হয় যে রিটায়ার করলে পুরুষ-মানুষের খারাপ লাগেই, বিশেষ করে ওঁর মতন ছটফটে মানুষের পক্ষে। কিন্তু তা বলে ঘুমোনো কেন পড়ে-পড়ে? বই পড়লেও তো হয়। ভালো ভালো বই লাইব্রেরী থেকে আনতে পারি, বললে উনি বলেন, পড়তে আর ভালো লাগে না। তা আমি বলি, বই পড়তে আর ভালো না লাগে ছবি আঁকো, শেখো—আমি তুলি, রঙ, কাগজ কিনে দিচ্ছি—ছবি আঁকতে কী আর হাতী-ঘোড়া দরকার হয়, সময় কাটানো নিয়ে তো কথা। ভালো ছবি হতে হবে তার কী মানে আছে, তাতে অন্তত মনটা প্রফুল্ল থাকবে—মনটাই তো সব। মন খারাপ হলেই স্বাস্থ্য খারাপ—তা আমার কথা তো কোনোদিনই শুনলেন না—'

জিগ্যেস করলাম, 'অমরেশ একসারসাইজ করে আজকাল?'

মিছরি-বৌদি বললে, সে-সব এখন চুলোয় গেছে ঠাকুরপো। অন্য কিছু না করুন, ডাম্বেল দু'টোও তো ভাঁজতে পারেন—সে-সব মরচে পড়ছে! এবার ভাবছি বেচে দেব সব এতোয়ারী বাজারে পুরনো লোহার দোকানে। কত টাকার জিনিস বলুন তো, ঠাকুরপো। শুধু শুধু ফেলে রেখে লাভ কী—'

জিগ্যেস করলাম. 'আর খাওয়া! খাওয়া সেই রকম আছে? তিরিশখানা রুটি, আর…'

মিছরি-বৌদি হাসলো, বললে, 'আছে, তবে সে-রকম আর নেই, সে-রকম তো আর পরিশ্রম হচ্ছে না। আগে ফ্যাক্টরিতে পরিশ্রম ছিল খুব, ফ্যাক্টরির ইলেকট্রিক করাতটা চালাতেন—সমস্ত প্ল্যান্টটারই তো ইনচার্জ ছিলেন। তা বাবা মারা না গেলে ওঁকে আরো উন্নতি করে দিয়ে যেতেন—বাবাও হঠাৎ মারা গেলেন আর ওঁরও…কিন্তু বাবাও বলেছিলেন ওঁকে,—ফ্যাক্টরির কাজে অত ছটফটে স্বভাব হওয়া ভালো নয়, বেশ ধীর স্থির হতে হবে, শুধু গায়ের জোরের কাজ নয়।'

চড়াই উতরাই রাস্তা। হঠাৎ যেন মনে হল, এ তো অন্যদিকে চলেছি!

জিগ্যেস করলাম, 'এ কোন্ দিকে চলেছেন, বৌদি?'

'কেন ঠাকুরপো. ঠিক দিকেই তো চলেছি। আমরা তো ফ্যাক্টরির বাঙলো ছেড়ে দিয়েছি বহুকাল, এখন তো এতোয়ারী বাজারের কাছে বাড়িভাড়া নিয়েছি একটা, আমার স্কুলটা কাছে পড়ে…আর তা ছাড়া ওদিকে ভাড়াও একটু সস্তা

—উনি পেনসন পান, আর···আর আমার ইস্কুলের চাকরি—সব দিক বুঝে শুনে তো চলতে হবে ? একটা চাকর শুধু রেখেছি ওঁকে দেখবার জন্যে, আর রান্না বান্না আমি নিজের হাতেই করে নিই—দু'টো লোকের তো রান্না। সেই চাকরই মাইনে নেয় কুড়ি টাকা করে।'

'এখানে চাকরের তো অনেক মাইনে ?'

মিছরি-বৌদি বললে, 'তা অনেক মাইনে কি সাধ করে দিই ঠাকুরপো, সবই তো করতে হয় তাকে—বাজার করা, হাট করা, জল তোলা। ওঁর দ্বারা তো একটা কুটো পর্যন্ত নেড়ে উপকার হবার নয়।'

বললাম, 'একেবারে স্রেফ বসে বসে খাচ্ছে নাকি ?'

'বসে হলে তো বাঁচতুম ঠাকুরপো, শুধু শুয়ে। জানালা খোলা থাকলে পর্যন্ত বলেন,—ওটা বন্ধ করে দাও, চোখে আলো লাগছে। তা বলুন তো ঠাকুরপো, শরীরে একটু আলো হাওয়া লাগানো ভালো না ? মনটা না হলে ভালো থাকবে কেন ?'

কী জানি কেমন যেন অবাক্ লাগছিল। অমরেশ শেষকালে এমন হয়ে গেল! অথচ কতদিন কতভাবে নিজেই তো ও-সব উপদেশ দিয়েছে আমাদের। বয়েস বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি ওমনিই হয়।

মিছরি-বৌদি বললে, 'এই তো আজ ছুটির দিন, আমাদের ইস্কুলের সেকেটারির ফ্যামিলি বম্বে যাচ্ছিল, তাই স্টেশনে ট্রেনে তুলে দিতে গিয়েছিলাম, গিয়ে এখন চান করাবো ওঁকে—রান্না চড়াবো—কত কাজ পড়ে আছে।'

বললাম, 'তাহলে অমরেশের বাত হয়েছে বুঝি, বৌদি ? খুব যারা এক্সারসাইজ করে তাদের কিন্তু এরকম বাত হয় শুনেছি।'

মিছরি-বৌদি বললেন, 'হয়নি। কিন্তু বাত হতে আর দেরিও নেই ঠাকুরপো, এই আপনাকে বলে রাখলুম।'

বলে রিক্‌শাওয়ালাকে বললে, 'এই—রাখ্, রাখ্—'

রিক্‌শা থামতেই নামলাম আমরা। সামনে চেয়ে দেখলাম, পুরনো ইটের গাঁথুনি-করা একটা বাড়ি। কয়েকটা ছাগলছানা, দুটো মুরগি চরে বেড়াচ্ছে সামনে। একটা মোটরের পুরনো মার্ডগার্ড মরছে ধরে ঝাঁঝরা হয়ে পড়ে আছে বাড়ির পাশেই। মিছরি-বৌদিকে কেমন যেন বেখাপ্পা লাগলো এই পরিবেশের মধ্যে। সেদিন সেই অমরেশের বাঙলোতে যেমন সেই মিছরি-বৌদিকে মানায়নি, আজকের মিছরি বৌদিকেও যেন এই এতোয়ারী বাজারের ভাড়াটে বাড়িতে মানালো না একেবারে!

জিনিসপত্তরগুলো হাতে করে নিয়ে মিছরি-বৌদি বললে, 'আসুন ঠাকুরপো, এই আমাদের বাড়ি।'

সেখানে যে ঘরে গিয়ে বসলাম, সেটাও যেন কেমন নোংরা-নোংরা মনে হল। বললাম, 'অমরেশ কোথায় ?

মিছরি-বৌদি বললে, 'শুয়ে আছেন নিশ্চয়ই। দেখি—'

বলে পরদা সরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। আমি একলা চুপচাপ বসে রইলাম। দেওয়ালে সেইসব ছবিগুলো ঝুলছে—স্যাণ্ডো, এ্যাপোলো, হারকিউলিস।

মিছরি-বৌদি হঠাৎ দরজার পরদা সরিয়ে বললে, 'যা বলেছি তাই—এই দেখুন ঠাকুরপো—আপনার বন্ধুকে দেখে যান।'

গেলাম।

দেখলাম খাটের ওপর চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে আছে অমরেশ।

কিন্তু যাকে দেখলাম, তাকে অমরেশ বললে একটু ভুল হয়। সে অমরেশের প্রেতাত্মা যেন।

মিছরি-বৌদি বললে, 'দেখলেন তো ঠাকুরপো, আমি যা বলেছিলুম। এই এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোলে শরীর থাকে, না, মন ভালো থাকে?'

বলে হঠাৎ ডাকতে লাগলো, 'শুনেছো, ওগো শুনেছো, কে এসেছে দেখো।'

একটু ডাকতেই ঘুম ভেঙে গেল অমরেশের। ভাবলাম—এখনি আমাকে দেখে, হয়তো উঠে, পিঠে একটা কিল বসিয়ে দেবে আনন্দের চোটে। কিন্তু কিছুই করলে না অমরেশ। শুধু বললে, 'কিরে তুই এসেছিস্?'

বললাম, 'শুয়ে আছিস কেন? বাইরে আয় না।'

অমরেশ বললে, 'বাইরে?···বাইরে নয়, তুই বরং এখানে বোস্—ওই চেয়ারটা টেনে নে।

বললাম. 'ঘরের ভেতরে কেন? বাইরে ওই ঘরে চল্ না।'

অমরেশ বললে, 'বাইরে যেতে পারি না।'

'কেন?'

'পা যে কাটা, দুটো পা ই···জানিস না তুই?'

পা-কাটা। কেমন যেন হতবাক্ হয়ে গেছি।

অমরেশ বললে, 'কেন, খবরের কাগজে তো বেরিয়েছিল, ইলেকট্রিক স' মেসিনে পা ঢুকে গিয়েছিল—এই দ্যাখ।'

বলবো কি, সেদিন অমরেশের বাড়ি গিয়ে দিনটা যে কী করে কাটিয়েছি তা আমিই জানি। আমি তখন আকাশ-পাতাল ভাবছি। কিন্তু খানিক পরেই অবশ্য মিছরি-বৌদি আমায় দুর্ভোগ থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল সেদিন।

ঘরে ঢুকে বললে, 'আপনি একটু ও-ঘরে গিয়ে বসুন তো ঠাকুরপো—চান করিয়ে দিই ওঁকে—বেলা একেবারে পড়ে এল। আপনার কিন্তু খেতে একটু দেরি হয়ে যাবে ভাই, কিছু মনে করবেন না যেন।'

চেয়ে দেখি মিছরি-বৌদির হাতে বেড-প্যান।

তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলে এসেছিলাম মনে আছে।

কিন্তু আজ এতদিন পরে একটা সত্যিকথা বলবো। সেদিন অমরেশের কাটা পা-দুটোর চেহারা দেখে মুখ দিয়ে যে একটা 'আহা' শব্দও বেরোয়নি, সে শুধু মিছরি-বৌদির কথা ভেবেই। আমার যেন কেমন মনে হয়েছিল মিছরি-

বৌদি হয়ত অমরেশের ওপর তার বহুদিনের পোষা রাগের প্রতিশোধ নিচ্ছে ! আর, তা ছাড়া অমরেশের পা না কাটলে কি মিছরি-বৌদির স্বাস্থ্যই ফিরতো, না, মিছরি-বৌদিই এমন সুন্দরী হত !

এ-গল্পটা শুনেও সোনাদি বলেছিল, 'তুই আমায় কথা দে, দশ বছর তোর লেখা আর ছাপাবি না কোথাও।'

এখন বুঝতে পারি, সোনাদি কতখানি উদারতা নিয়ে আমার গল্পগুলো শুনতো। কিন্তু মতামতগুলো ছিল নিরপেক্ষ। আমাকে বার বার কেবল লেখা ছাপতে বারণ করেছে। বলেছে, 'লেখা ছাপতে এত আগ্রহ কেন তোর ? লেখা ছাপা হলেই কি মহা-লেখক হয়ে যাবি ?'

সব দিক থেকে যখন হতাশ হয়ে আর কোথাও যাবার মত জায়গা থাকতো না আমার, তখন যেতাম সোনাদির বাড়ি। কিন্তু না-গেলেও কোনোদিন কোনো অনুযোগ শুনিনি সোনাদির কাছে। এ শুধু আমার ব্যাপারেই নয়। ছেলে-মেয়েদের অসুখেও কোনো উদ্বেগ দেখিনি কখনও। মনে হোত সোনাদি যেন সারা পৃথিবীতে একলা। দাশসাহেবের বাড়িতে থাকলেও যেন দূরে চলে যায়নি সোনাদি। নিজের চারদিকে এক দুর্ভেদ্য-রহস্য-জাল জড়িয়ে রাখে অনেকে। সোনাদির তা-ও ছিল না। সহজ-সরল স্বাভাবিক ব্যবহার সোনাদির। তবু সোনাদিকে কাছে পাবার গৌরব কারো কপালেই যেন নেই। সোনাদি যেন কাছে থেকেও সুদূর, আবার দূরে গেলেও যেন দূরে যায় না। সোনাদি কারো কোনও কাজে কোনোদিন আপত্তি করেনি, তবু কোনো কাজ করতে গেলে যেন সোনাদিকে না জিগ্যেস করলেও চলবে না।

জব্বলপুরে সোনাদির যে-আচরণ অনেকের চোখে অস্বাভাবিক মনে হয়েছে, দাশসাহেবের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসার পর তা যেন তাদের চোখে অসঙ্গত মনে হল। কেউ আর সোনাদিকে বুঝতে পারলো না। কিন্তু বুঝেছিলেন বোধহয় স্বামীনাথবাবু। তিনি সোনাদিকে অল্পদিনেই চিনে নিয়েছিলেন, তিনি জানতেন এবং বিশ্বাসও করতেন, বাইরের সেবার দ্বারা যে পুজো তার চেয়ে হৃদয়ের প্রেমের দ্বারা যে ভোগ তা বড় জিনিস। তিনি বুঝেছিলেন— ভেতরটা যেখানে সম্পূর্ণ, বাইরেটা সেখানে বাহুল্য। সংসারে এক-একজন মানুষ থাকে যারা নিজেদের বিকীর্ণ না করে বাঁচতে পারে না। অন্তরের মধ্যে যেখানে সমাপ্তি, সেইখানেই পূর্ণতা বলে তারা বিশ্বাস করে না। অথচ জীবনে সমাপ্তিটা যেমন সত্যি, ব্যাপ্তিটাও তার চেয়ে কম সত্যি নয়। ভাব যদি সত্যি হয়, তো প্রকাশ কম সত্যি নয় তা বলে। পরিণতি যদি সত্যি বলে মানি, পরিপূর্ণতাকে অস্বীকার করতে পারিনে কোনও কারণেই।

তা একদিন দাশসাহেব জব্বলপুরের চাকরি থেকে বদলি হয়ে চলে এলেন কলকাতায়।

রীতি আর শিশু বায়না ধরলে, 'তুমি আমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাবে না, মা ?'

দাশসাহেব বললেন, 'তুমি আদর দিয়েই ওদের বাড়িয়ে দিয়েছ।'

শেষে যাবার দিন ঘনিয়ে এল। জিনিসপত্তোর বাঁধা-ছাঁদা হল। দাশসাহেব বললেন, 'কলকাতায় গিয়ে ওদের নিয়ে একলা মুশকিলে পড়বো—'

সোনাদি বললে, 'তুমি তোমার অফিসে যেয়ো, আমি দেখবো ওদের।'

'তুমি?'

স্বামীনাথবাবুকে গিয়ে সেদিন সোনাদি বললে, 'পরশু দাশসাহেবের সঙ্গে কলকাতায় যাচ্ছি, তোমার আপত্তি নেই তো?'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'হাওয়া বদলালে তোমারও শরীরটা ভালো হবে।'

'হাওয়া বদলাতে তো যাচ্ছি না।'

'তবু কলকাতায় তো অনেকদিন যাওনি, দেখাশোনা হবে অনেক লোকের সঙ্গে।'

সোনাদি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপর জিগ্যেস করলে, 'কিন্তু কেন আমি কলকাতায় যাচ্ছি, তা তো জিগ্যেস করলে না?'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'তুমি ভালো বুঝেছ তাই যাচ্ছ, তুমি তো অবুঝ নও।'

'কিন্তু পুঁটুকে দেখতে পারবে তো তুমি?'

'পুঁটুর জন্যে তুমি কিছু ভেবো না।'

'আসছে মাসের পনরোই পুঁটুর জন্মদিন, নতুন জামা-কাপড় কিনে দিয়ো, আর কানের একজোড়া দুলও ওকে দিয়ো—এই চুড়িটা ভেঙে গড়িয়ে দিয়ো।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'টাকা তো রয়েছে, চুড়িটা তুমি রাখো।'

'তা হোক, তবু নাও।'

স্বামীনাথবাবু প্রতিবাদ কখনো করেননি। হাত বাড়িয়ে নিলেন।

যাবার দিন সোনাদি বললে, 'জিগ্যেস করলে না তো, কবে আসবো?'

'তুমি তো আমার চেয়ে ভালো বোঝ। যতদিন খুশি থেকো, তারপর রতি-শিশুকে বুঝিয়ে রেখে একদিন এসো।'

ননদদের তখন বিয়ে হয়ে গেছে। যার-যার শ্বশুরবাড়িতে তারা। বিশ্বেশ্বর-বাবুও মারা গেছেন আজমীরে। আত্মীয়-পরিজন যারা রাজস্থানে ছড়িয়ে ছিল, তারাও আর যোগাযোগ রাখেনি। পরিবারের বৃহৎ শাখাপ্রশাখা। কে কার খবর রাখে?

সেই সময় দাশসাহেব ছেলেমেয়ে নিয়ে জব্বলপুরের সংসার তুলে নিয়ে কলকাতায় এলেন।

স্টেশনে স্বামীনাথবাবু তুলে দিতে এসেছিলেন পুঁটুকে নিয়ে।

সোনাদি বললে, 'আধসের করে দুধ নিয়ো রোজ নিজের জন্যে।'

'আমার জন্যে ভেবো না বেশি, নিজের শরীরের দিকে নজর রাখবে।'

সোনাদি বললে, 'পুঁটুর ইস্কুলে খাবার পাঠাতে ভুলো না যেন।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'গিয়ে চিঠি দিয়ো।'

ট্রেন ছেড়ে চলে গেল।

পুটু জিগ্যেস করলে, 'মা কোথায় গেল বাবা ?

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'মা তো কোথাও যায়নি মা, কাঁদতে নেই, ছিঃ—আমি কি কাঁদছি ?'

কলকাতায় এসে দাশসাহেব নতুন বাড়িতে বাসা করলেন। চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজে একটা ব্যাংক করলেন। ব্যাংকের নামটা আপনারাও জানেন। নামটা আমার মুখে না বলাই ভালো। রতি আর শিশু নতুন ইস্কুলে ভর্তি হল। সেখানেই ওই অসুখটা সুরু হল সোনাদির। সেই অদ্ভুত অসুখ। কিছু কাজ করতে পারবে না। ডাক্তারে বললে,—শুধু শুয়ে-বসে থাকতে হবে। অথচ খাওয়া-দাওয়ার কোনো বাছ-বিচার নেই।

ডাক্তার আরো বললে, 'এ-ও একরকম টি-বি।'

সোনাদি বললে, 'রতি-শিশুকে তুমি দূরে বোর্ডিং ইস্কুলে পাঠিয়ে দাও।'

দাশসাহেব তাই-ই করলেন।

'আর তুমি ?'

'আমার কথা বলছো ?'

সোনাদি বললে, 'আমার কাছে তুমি এসো না, রোগটা ভালো নয়।'

দাশসাহেব হাসলেন। বললেন, 'তোমার কাছে কেউ আসতে পারে, এমন কথা কোনো আহাম্মকেও বলবে না, সোনা।

তারপর খানিক থেমে বললেন, 'জব্বলপুরে স্বামীনাথবাবুকে একটা খবর দিই, কী বলো—হয়তো ভাববেন খুব।'

সোনাদি বললে, 'খবরটা পরে দিলেই চলবে, তাড়াতাড়ি কী ?'

বলে হাসলো সোনাদি।

ননদরা এসে জিগ্যেস করে, 'বৌদি কোথায় দাদা ?'

সব শুনে তারাও অবাক্ হয়ে যায়। বলে, 'তুমি একটু কড়া হতে পারো না দাদা ?'

স্বামীনাথবাবু হাসেন।

'তুমি হাসছো ?'

তবু স্বামীনাথবাবু হাসেন।

বলেন, 'তোরা শুধু বাইরেটাই দেখিস, লোকে কী বলবে এইটেই ভাবিস ; আমি তো কিছু তফাত দেখতে পাই না, আমার মনে হয় ও এখানেই আছে—'

ননদ বলে, 'তুমি কি পাথর দাদা ?···সত্যি বলো তো কিছু ঝগড়া হয়েছিল বুঝি ?'

'ঝগড়া করবার মতো লোকই বটে রে সে, চোখের সামনে দেখলেও আমি

তা বিশ্বাস করবো না।'

'তোমার কথা ছেড়েই দিলাম, তুমি না হয় দেবতা, কিন্তু তার ওই নিজের পেটের একফোঁটা মেয়েটা।'

'তা পুটুর তো কোনো অসুবিধে হচ্ছে না—অসুবিধে হচ্ছে নাকি?

'জন্ম দিয়েই যে কত ছেলের মা মারা যায়, তাতে কি অসুবিধে হয় তাদের? কিন্তু আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে যে মুখ দেখাতে পারবো না দাদা।'

'তোর তো বড় কষ্ট হবে তা হলে?'

'কষ্ট! তুমি বলছো কি দাদা, আমার যে আত্মঘাতী হতে ইচ্ছে করছে।'

'তুই ওঁদের বলিস, আমার অনুমতি নিয়েই সে গেছে।'

'বৌদিকে তো জানি, তোমার অনুমতি নিতে তার বয়ে গেছে।'

'নারে, অনুমতি নিয়েছে, আর মুখ ফুটে অনুমতি চাওয়াটাকেই কি তোরা বড় ভাবিস—আর তা ছাড়া এই একটা জীবনে আমাদের কতবার জন্ম নিতে হয়, জানিস তুই? মহাভারতে পাণ্ডবদের জীবনে অজ্ঞাতবাসের পালা এসেছিল একবার, সেটা কি ভাবিস একেবারে অর্থহীন? তা তো নয়, আমি মনে করি সেটা তাদের আর এক নবতর জন্মের উদ্যোগপর্ব—তা এসব কথা তোর শ্বশুর-শাশুড়ীরা যদি না বোঝেন তো বলিস তাঁদের যে, যাকে অনুমতি দিতে পারলে কৃতার্থ হয় লোক, তার অনুমতি চাওয়া-না-চাওয়া তুচ্ছ—'

'যদি কখনও ফিরে আসে বৌদি তো বাড়িতে তাকে ঢুকতে দিয়ো না দাদা, আমাদের বংশের মুখ পুড়িয়েছে সে।'

'ও কথা বলিসনি, ওতে আমার কষ্ট হয় রে।'

'কষ্ট তোমার ছাই হয়, দাদা।'

'না রে, তাকে ছাড়া আমি একদিনও থাকতে পারি না, সত্যি বলছি।'

'তবে এখন আছো কেমন করে?

'সে তো আমার কাছেই আছে সব সময়, মনে হয় যেন পাশের ঘরেই আছে, ডাকলে সাড়া দেবে, যেমন তার বই নিয়ে পড়াশোনা করতো তেমনি করছে! জীব অনু, না বিভু' এই নিয়ে তার সমস্যার আর শেষ নেই। তোর বৌদির ওপর তোরা অবিচার করিস নে—'

বিকেলবেলা ননদ বললে, 'পুটুকে আবার দুধ পাঠাচ্ছ ইস্কুলে, দাদা?'

'কিন্তু সে যে দুধ পাঠাতে লিখেছে সেখান থেকে।'

'কাল তো দুধ খায়নি ও, ফেলে দিয়েছে যে সবটা।'

'তা হলে আবার চিঠি লিখে পাঠাই।'

'এ-ও তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, দাদা। তোমার কি নিজের কিছু করবার ক্ষমতা নেই?

'সে-ই যে এ-সংসারের গিন্নী রে, তাকে না জিজ্ঞেস করে কি কিছু করতে পারি?'

'সংসার জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে সে যে চলে গেছে, তার তো এ সংসারের জন্যে ভারি মাথাব্যথা।'

দাশসাহেব অফিসে যান। গিয়ে একবার ফোন করেন, 'কেমন আছো, সোনা?'

সোনাদি বলে, 'তোমার ব্লাড-প্রেসারটা যদি সারে তো কী বলেছি।'

অভিলাষকে ডেকে বলে দিলে সোনাদি, 'তোমার সাহেবকে খেতে দেবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে দিয়ো এবার থেকে।'

সকালবেলা সোনাদি বলে, 'কাল অনেক রাত্রে তোমার ঘরে আলো জ্বলছিল কেন?'

'ঘুম আসছিল না যে।'

'কাল থেকে যেন আলো না দেখতে পাই আর।'

তা এই ঠিক এমনি সময়ে আমি এসে পেঁছুলাম সোনাদির জীবনে। জীবনে অনেক রকম চরিত্রের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়েছিল, কিন্তু অদ্ভুত লাগলো! কোথাও কোনো বিরোধ নেই। রাত ন'টা বাজলেই সোনাদি দাশসাহেবকে বলে, 'যাও, ন'টা বাজলো, এবার শোওগে যাও, গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে দেবে।'

দাশসাহেব হয়তো মৃদু প্রতিবাদ করেন, 'ঘুম এখন আসবে না আমার।'

'না আসুক, শুয়ে থাকোগে।'

নিঃশব্দে দাশসাহেব চলে যেতেন। যেন ছোট শিশুটি দাশসাহেব—ঘুম পাড়িয়ে তবে সোনাদির স্বস্তি। এক-একবার মনে হত সোনাদি বুঝি আমাদের সকলের মা, আর আমরা সবাই ছেলে-মেয়ে। ওই স্বামীনাথবাবু, দাশসাহেব, আমি, রতি, শিশু, পুটু—সবাই।

এক-একদিন এরই ফাঁকে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। মাইলের পর মাইল দূরে চেতলা থেকে আপার সারকুলার রোড। সেখানে 'প্রবাসী' অফিস। সাইকেলটা উঠোনে চাবি দিয়ে বেঁধে দুরু-দুরু বুকে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় গিয়ে উঠি। সোনাদি যতই বলুক, 'প্রবাসী'তে লেখা না ছাপা হলে স্বস্তি পাই না। 'প্রবাসী'তে লেখা ছাপা না হলে জীবনই বৃথা। সদ্য দেখে এসেছি আমার গল্প বেরিয়েছে 'ছায়ার মায়া'। ব্রজেনবাবু থাকতেন ডান-দিকের ঘরে সামনের চেয়ারে। বড় গম্ভীর মানুষ। দেখলে ভয় হত।

বললেন, 'কী চাই?'

বললাম, 'একটা গল্প ছাপা হয়েছে এ-মাসে।'

'কার গল্প? দাদার?'

ছোট ছেলে দেখে বোধহয় বিশ্বাস হয়নি।

বললাম, 'আমার—'

যেন না জেনেশুনে মহা অপরাধ হয়ে গেছে তাঁর। অন্তত এত কম বয়েস আগে জানলে যেন লেখা ছাপতেন না। অতি রূঢ় ব্যবহার। কোনও আশা

বা উৎসাহ পেতাম না সে-দৃষ্টিতে। অথচ কত আশা নিয়ে গিয়েছিলাম। একটার পর একটা গল্প ছাপিয়েছেন, কিন্তু দৃষ্টির রূঢ়তা তবু একতিল কমেনি। তারপর আবার সেখান থেকে সাইকেল নিয়ে যেতাম 'ভারতবর্ষ' অফিসে। গায়ের জামা খুলে দিয়ে জলধর সেন মশাই ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। কানে খাটো ছিলেন। জোরে জোরে সমস্ত অফিস-সুদ্ধ লোককে শুনিয়ে নিজের নিজের নিবেদন জানাতে হয়।

বলেন, 'আমার গল্পটা তুমি 'প্রবাসী'তে ছাপিয়েছ নাকি ?'

বললাম, 'না, ওটা অন্য গল্প।'

'যাবে, যাবে, আসছে মাসে যাবে।'

বুকে ভরসা নিয়ে সেখান থেকে যেতাম 'বিচিত্রা' অফিসে। উপেনবাবু কিন্তু বসতে বলতেন। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। গল্প করতেন। উৎসাহ দিতেন। মর্যাদা দিতেন। আবার লেখা দিতে বলতেন। সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কিন্তু তারপর সারারাত ধরে আমার লেখা চলতো আবার। এক-একদিন ভোর হয়ে যেত। তখন আমার লেখাটা নিয়ে কোনো বন্ধুকে গিয়ে পড়িয়ে শুনিয়ে এসেছি। কিন্তু সোনাদিকে পড়াতে তবু ভয় করতো। কত লোভ হত। মনে হত—এবার হয়তো সোনাদি ভালো বলবে। এবার হয়তো ছাপাতে অনুমতি দেবে। কিন্তু সামলে নিতাম নিজেকে। মনে হত—সোনাদির ভালো লাগবার মতো লেখা কবে লিখতে পারবো। কবে সোনাদির পছন্দমতো হোমারের 'ইলিয়ড', 'অডিসি' কিম্বা কাদম্বরীর মতো কাব্য কিম্বা বাল্মিকী বেদব্যাসের মতো 'রামায়ণ', 'মহাভারত' লিখতে পারবো। কবে তেমন লেখা আমার হাতে বেরোবে।

প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রায় তখন মাসের পর মাস গল্প বেরিয়েছে। আমার এক বন্ধু একদিন বললে, 'দেশ' কাগজে একটা লেখো, ও-কাগজটা ভালো হচ্ছে আজকাল—'

মনে আছে 'আবীর ও উর্বশী' গল্পটা নিয়ে গিয়ে দিয়ে এলাম একদিন। কাউকেই চিনি না।

বন্ধু পরের দিন জিগ্যেস করলে, 'কী নিয়ে লেখা ?'

মুখে বললাম সব গল্পটা।

বন্ধু শুনে বললে, 'ও-গল্প ওখানে ছাপবে না, ও-কাগজের পক্ষে একটু কড়া হয়েছে।' কী জানি কেন—আমারও মনে হল হয়তো তাই। সেই রাত্রে আর একটা গল্প লিখে পরদিন নিয়ে গেলাম হাতে করে।

শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষ বসেছিলেন। গিয়ে নিজের নাম বললাম। আরো বললাম, 'পুজো-সংখ্যার জন্যে একটা গল্প দিয়ে গিয়েছিলাম, আমার এক বন্ধু বললে, ওটা নাকি আপনাদের কাগজে ছাপার মতো নয়—তা আমি আর একটা লেখা নিয়ে এসেছি—'

শুনে তিনি খুঁজে খুঁজে বার করলেন 'আবীর ও উর্বশীর' পাণ্ডুলিপিটা।

বললেন, 'আপনি বসুন, আমি পড়ে দেখছি গল্পটা।

তারপর চুপ করে অধীর আগ্রহ নিয়ে সেইখানে বসে রইলাম, আর তিনি পড়তে লাগলেন। এক-একটা মিনিট যেন আর কাটতে চায় না। মনে হয় বিচারকের সামনে যেন নিজের দণ্ড শোনবার প্রতীক্ষায় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছি।

এক সময়ে তিনি মুখ তুলে বললেন, 'গল্প খুব ভালো হয়েছে, এটা যাবে, আমি ছাপবো এ-গল্প।'

আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। বললাম, 'আপনি ছাপবেন, ওতে যে…'

'যা-ই থাক, আমি ছাপবো।'

তাঁর মুখ দেখে মনে হল তিনি যেন মরিয়া হয়ে বলছেন, 'আমি ছাপবো, কিছু হবে না।'

কিন্তু তবু সোনাদিকে সে-গল্প পড়াতেও আমার সাহস হয়নি। ছাপলেই যেন অপরিণত বয়েসের লজ্জা চিরস্থায়ী হয়ে রইল। এপিক্ ছাড়া সোনাদির আর কিছুই ভালো লাগে না। বাজারচল্তি লেখা সোনাদির কাছে সব অপাঠ্য। ব্রজেনবাবু, জলধরবাবু, উপেনবাবুরও যে-লেখা ভালো লেগেছে, সোনাদির যেন তা ভালো লাগবার কথা নয়। ভাগ্যিস সোনাদি ও-সব পত্রিকা কিছুই পড়ে না, নইলে আমার হয়তো ও বাড়িতে যাওয়াই বন্ধ হত।

সেদিন সোনাদিকে আমার 'রাঙা মাসিমা'র গল্পটা বলেছিলাম। রাঙা মাসিমার গল্পটা তখনও লেখা হয়নি। শুধু নোট্ বইতে স্কেচ করে রেখেছি।

মাসিমা আর মেসোমশাই-এর সম্পর্কটাও আমার কাছে বড় বিচিত্র লাগতো বরাবর।

মা বলতো, 'আহা! কী কপাল করেই যে এসেছিল রাঙাদি—'

সত্যিই হিংসে করবার মতো কপালই বটে রাঙা মাসিমার। খুব ছোটবেলায়, মনে পড়ে, রাঙা মাসিমার বাড়ি গেছি। তখন ভাড়াটে বাড়ি ছিল। রাঙা মাসিমা নিজের হাতে রান্না করা, ময়লা কাপড় সেদ্ধ করা, যাবতীয় কাজ করেছে। মেসোমশাই পর্যন্ত কখনও মুড়ি ছাড়া আর কিছু জলখাবার পায়নি।

আমাকে দেখিয়ে মেসোমশাই বলেছে, 'ওকে দুটি মুড়ি দাও না।'

মাসিমা বলেছে, 'ওরা আর মুড়ি খায় না আমাদের মতন।'

তারপর হাতের কাজ করতে করতে বলেছে, 'ওর বাবা তোমার মতো আর অকম্মা লোক নয়—ওদের তিনজনের সংসার, তবু চার সের দুধ নেয় ওর মা জানো?'

মেসোমশাই বলেছে, 'তা মুড়ি কি খারাপ জিনিস, গা। বর্ষাবাদলের দিনে তেলনুন মেখে খেতে তো বেশ লাগে আমার।'

রাঙা মাসিমা রেগে গিয়ে বলেছে, 'তোমার মতো লোকের হাতে পড়ে মুড়ি ছাড়া যে আর কিছুই জুটবে না তা আমি জানি। যেমন ফুটো কপাল আমার।'

তখনও মেসোমশাই জজ্ হয়নি। সামান্য উকিল মাত্র। বউবাজারের একটা গলিতে সে যে কী বাড়িতে থাকত। একখানা মাত্র শোবার ঘর। তারি মধ্যে ঢালোয়া বিছানা। তিন-চারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে সেই একটা ঘরের মধ্যে থাকা। আর রান্নাঘরটা গোলপাতার ছাউনি। সেই এক চিল্‌তে রান্নাঘরের মধ্যে দিনরাত কাটতো মাসিমার। কিন্তু তবু কত যে পরিপাটি কাজ। রান্না সারা হয়ে গেছে, খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে, ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে, মেসোমশাই কোর্টে—তখন যত রাজ্যের কাজ মাসিমার। বড়ি শুকোতে দিয়েছে রোদ্দুরে, ক্ষার কাচতে বসেছে, কিংবা চাল বাছতে শুরু করেছে কুলো নিয়ে। একটা ঝি নেই, চাকর নেই।

মেসোমশাই কতবার বলেছে, 'একটা বিধবা মেয়েমানুষ আছে, ওরা বলছিল—মাইনে নেবে না, শুধু খাবে—রাখলেও তো পারো।'

রাঙা মাসিমা ঝাঁজিয়ে উঠত, 'থামো তুমি, তোমার মতো অকম্মা লোকের হাতে যখন পড়েছি, তখন জানি আমার কপালে কষ্ট আছে—জিগ্যেস করো ওকে, ওদের তিনজনের সংসার, তবু ওর মাকে কখনো নিজে রাঁধতে হয়নি।'

মেসোমশাই বলত, 'তা বলে তোমার একটা অসুখ-বিসুখ করলে তখন?'

মাসিমা বলতো, 'অসুখ-বিসুখ হলে তো বেঁচে যাই, আমাকে আর ভূতের বেগার খাটতে হয় না তোমার সংসারে।

মেসোমশাইকে দেখেছি ভোর বেলা উঠে নিজের হাতে নিজের জামা-কাপড় কেচে, ঘর পরিষ্কার করে বাইরের ঘরে কাজ নিয়ে বসে গেছে। তারপর চট করে এক ফাঁকে মক্কেলকে বসিয়ে রেখে বাজারও করে এনেছে।

মাসিমা দেখতে পেয়ে হৈ হৈ করে উঠেছে।

'ওকি' মাছের থলি আর আনাজের থলি একাকার করে ফেললে যে, ছিষ্টি আঁশ করে ফেললে যে তুমি, অমন বাজার করবার মুখে আগুন—নাও, হাত ধোও।'

নিজেই জলের ঘটি নিতে যাচ্ছিল মেসোমশাই।

আবার হৈ হৈ করে উঠেছে মাসিমা।

'ওই দেখো, আমার হেঁশেল সুদ্ধ আঁশ করে দেবে নাকি। কী অকম্মা লোকের হাতেই পড়েছি মা। বলি, আঁশ হাতে যে হেঁশেলের ঘটি ছুঁচ্ছিলে তুমি।'

মেসোমশাই হয়তো তখন সত্যিই বড় ব্যস্ত। বাইরের ঘরে মক্কেল বসিয়ে রেখে এসেছে। একটু যেন গলা চড়িয়েই বললে, 'তা আমার হাতে একটু জল দাও, মক্কেলরা বসে আছে যে সব—'

মাসিমা রান্নঘর থেকে বলে, 'তা তোমার মক্কেলরাই বড় হল গা তোমার কাছে। ওলো, কর্তার কথা শোন্ তোরা, শুনেছিস অনাছিষ্টির কথা—' বলে সাক্ষী মানতো ছেলেমেয়েদের।

আমাদের লক্ষ্য করে মেসোমশাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে মাসিমা কতদিন

বলতো, 'এই আমা-হেন গিন্নী পেয়েছিলে বলেই এ-যাত্রা টিকে গেলে তুমি— যা বলব—'

তারপর একটু থেমে বলতো, 'একবার ইচ্ছে হয় দেখতে আমি দু'দণ্ড চোখ বুজলে তুমি কেমন করে চালাও সব।'

আমরা তখন অতি ছোট। সব জিনিস বোঝবার বয়স হয়নি। দেখতাম, মাসিমার কথা শুনে মেসোমশাই কেমন নিরুত্তর হয়ে থাকতো। অত যে অভিযোগ অনুযোগ, সেদিকে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। মেসোমশাই নির্বিকার চিত্তে আদালতের নথিপত্র পড়ছে। নিজে উদয়াস্ত পরিশ্রম করে টাকা এনে সংসারে তুলে দিচ্ছে মাসিমার হাতে। মাসিমা আবার সে টাকা আঁচলে গেরো বেঁধে রাখছে। কিন্তু একটা কোনো খরচের জন্যে টাকা চাইলেই মাসিমা আগুন। বলতো, 'কোত্থেকে টাকা পাবো সে হিসেব রাখো—টাকা কোথায় পাবো—টাকা আমার হাতে নেই।'

মেসোমশাই বলতো, 'তা ছেলেটার জ্বর, ওষুধ তো আনতে হবে—'

মাসিমা তখন সে-দৃশ্য থেকে দূরে সরে গেছে।

মেসোমশাই রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত গিয়ে বললে, 'ওষুধটা তাহলে এনে দিয়ে যাই—'

'তা যাও না, কে বলছে যে ওষুধ এনো না।'

'টাকা দাও দুটো।'

মাসিমা বললে, 'টাকার কি গাছ আছে আমার, না আমি পুরুষ মানুষ, চাকরি করে টাকা আনব। তা আমি যদি পুরুষ মানুষ হতুম, তো সংসারের এমন দশা হত না? জিগ্যেস করো ওকে, ওদের তিনজনের সংসার, ক'টা ঝি আর ক'টা চাকর রেখেছে ওর বাবা।'

ঝি-চাকর আসে। মেসোমশাই বলে-কয়ে দশজনকে খোশামোদ করে বাড়িতে আনে। চাকরকে লুকিয়ে লুকিয়ে বলে যায়, 'একটু যদি বকুনি-টকুনি দেয় তোর মা, তো কিছু মনে করিসনি বাবা, তোকে আমি আলাদা বকশিশ দেব। যদি ভাত খেয়ে পেট না ভরে তো আমাকে বলিস - আমি তোকে পয়সা দেবো, দোকান থেকে কিনে খেয়ে নিস্।'

কিন্তু অশান্তি আরো বেড়ে যেতো তাতে।

মক্কেলদের সঙ্গে কাজের কথা বলতে বলতে এক-একবার কানে তালা লেগে যাবার অবস্থা হয়। চাকরের সঙ্গে মাসিমার বচসার আর অন্ত নেই।

মাসিমা বলে, 'ডাক্ তো তোর বাবাকে। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো —বেশ ছিলাম সুখে, চাকর-বাকর বাড়িতে ঢুকিয়ে এ এক 'কাল' হল। দুটো মানুষের ভাত খাবে অথচ কাজের বেলায় এত ফাঁকি। এ তো চাকর আনা নয়, আমাকে জ্বালানো—যেমন হয়েছে কর্তা, তেমন হয়েছে কর্তার চাকর।'

তারপর যথারীতি একদিন কোর্ট থেকে ফিরে এসে দেখে সব নিস্তব্ধ।

মেসোমশাই জিগ্যেস করে, 'হরি কোথায় গেল?'

মাসিমা বোধহয় এই প্রশ্নেরই অপেক্ষা করছিল। বললে, 'যেমন তুমি অকর্মা বাবু, তেমনি তোমার অকর্মা চাকর। ও কাউকেই আমার দরকার নেই। আমার যেমন কপাল, তোমার মত লোকের হাতে যখন পড়েছি, তখনই জানি অদৃষ্টে আমার অনেক কষ্ট। জিজ্ঞেস করো ওকে, ওদের তিনজনের সংসার, তবু—'

এ-সব কথা যখনকার তখন আমরা খুব ছোট। তারপর বউবাজারের বাড়ি ছেড়ে মেসোমশাই কলেজ স্ট্রীটের ওপর সদর রাস্তায় বাসা নিয়েছে। আয় বেড়েছে। ছেলে মেয়েদের বয়েস হয়েছে। খুকুর বিয়ে হয়ে গেছে এক বড় ঘরে। খুকুর বিয়েতে মেসোমশাই জাঁকজমক করেছিল খুব। সে-বিয়েও মেসোমশাইয়ের এক মক্কেলের কল্যাণেই। একটা পয়সা নেয়নি পাত্রপক্ষ। মক্কেলেরা গাদা-গাদা জিনিসপত্তোর দিয়ে গেছে বাড়িতে বয়ে। ধন্য ধন্য করেছে সব আত্মীয়-স্বজন নতুন কুটুম দেখে। বরকর্তা বলেছে, 'জিতেনবাবু এমন সজ্জন লোক, তাঁর মেয়ের বিয়েতে আমরা টাকা নেব না।' কেবলমাত্র মেসোমশাইকে দেখেই পাত্রী পছন্দ করেছে তারা। এমন সাধু লোকের মেয়ে ঘরে আনতে পারাও যে বহু পুণ্যের ফল।

মাসিমা কিন্তু তখনও সেই ভিড়ের মধ্যে বলেছে, 'ওঁর সাধ্যি কি ওই মেয়ে পার করেন, যা দেখছো মা, সব এই আমি হেন মেয়ে ছিলাম বলে—কোনো যুগ্যিতা নেই তো ওঁর।'

গায়ে-হলুদ দেখে সব লোক অবাক্। মেয়েকে দিতে আর কিছু বাকি রাখেনি।

মাসিমাও গরদের জোড় পরে বললে, 'দেখছ তো মা তোমরা ওই অকর্মা মানুষটিকে, সেই মেয়ে-দেখার সময় থেকে এই পর্যন্ত যা কিছু সব আমাকে করতে হচ্ছে, একটা কাজ তো ওঁকে দিয়ে হবার উপায় নেই।'

মেসোমশাই সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল।

মাসিমা বললে, 'হাসছ কি, এই তো সবাই সাক্ষী আছে, বলুক দিকি কেউ তুমি কোন্ কাজটা করেছ, যে-কাজটা আমি দেখবো না সব তো পণ্ড করবে, এমন কপাল আমার মা, যে একা হাতে সব কাজ করতে হবে।'

সত্যি মাসিমাও মেসোমশাইকে দেখে এক-একবার অবাক্ হয়ে যেত। বলত, 'আমার একবার কাছারিতে গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করে, তুমি কেমন করে কাজ চালাও সেখানে।'

উকিল থেকে আস্তে আস্তে মেসোমশাই জজ্ হল। গোলদীঘির পেছনে মস্ত বাড়ি কিনলে। মণ্টু তখন ডাক্তারি পাশ করে রেলে চাকরি নিয়েছে। মেজ ছেলে ইঞ্জিনীয়ার হয়েছে কাশী থেকে। জম্-জমাট সংসার। তিনটে চাকর, দু'টো ঝি। আত্মীয় স্বজন, নাতি-নাতনি, বিধবা-সধবা গলগ্রহের কল-কোলাহলে বাড়ি পূর্ণ। তার মধ্যে সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত মাসিমার কেবল ওই এক কথা।

'হলে কি হবে মা, আমি যেদিকে দেখব না, সেইদিকেই তো চিত্তির। যেমন হয়েছে বাড়ির অকম্মা কর্তা, তেমনি সবাই, একটা মানুষ যদি কাজের...সবাই এ বাড়ির কর্তার ধারা পেয়েছে।'

গৃহ-প্রবেশের দিনে আত্মীয়-স্বজন সকলের নিমন্ত্রণ হয়েছে।

গিয়েই মাসিমার গলা শুনতে পেলাম। বলছে, 'আচ্ছা, তুমি অকম্মা মানুষ, তুমি আবার কাজের ভিড়ের মধ্যে কেন শুনি—'

মেসোমশাই বুঝি নিজের গামছার খোঁজে এসেছিল অন্দরমহলের ভেতর। মাসিমার মন্তব্য শুনে আবার যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। কোন বিরক্তি নেই, বিরাগ নেই—সদাশিব ধীর স্থির শান্ত মানুষটি বরাবর। সামান্য অবস্থা থেকে নিজের ধৈর্য, সাহস, কর্তব্যনিষ্ঠা, একাগ্রতা দিয়ে অক্লান্ত উদয়াস্ত পরিশ্রম করে বিত্তশালী হয়েছে, কিন্তু কোনো হিংসা, ক্ষোভ, দুর্ব্যবহার নেই কারো ওপর।

মাসিমা বলে, 'এও বলে রাখছি বাপু তোমাদের (তোমরা এখন বড় হয়েছ, সব বুঝতে পারো), এই আমার মতো গিন্নী পেয়েছিল বলেই তোমার মেসোমশাই এই বাড়ি-ঘর-দোর করতে পারলে কলকাতায়।'

পুত্রবধূদের ডেকে বলে, 'এই শোন বৌমারা, এই আজ আমাকে দেখছ তোমরা এমনি, এই আমিই একদিন ছেলে মানুষ করা থেকে এই কলকাতায় বাড়ি করা পর্যন্ত সব একা করেছি। আমি না থাকলে ওই ছেলেরাও মানুষ হত না, মেয়েদের বিয়ে হত না। ওই অকম্মা মানুষ শুধু মাসে মাসে ক'টা টাকাই এনে তুলে দিয়েছে আমার হাতে, আর তো কোন যুগ্যিতা ছিল না ও-মানুষের।'

যে-মানুষের কোন যোগ্যতা ছিল না, সে-মানুষ সামান্য অবস্থা থেকে এত বড় কেমন করে হল এ-প্রশ্ন কেউ কোনোদিন করেনি মাসিকে। দিনে দিনে বাড়ি হয়েছে; গাড়ি হয়েছে; পুত্র, পৌত্র, ধন জন কিছুরই অভাব থাকেনি মাসিমার। সে মুড়ি খাওয়া এখন উঠে গেছে। এখন সংসারে দৈনিক পাঁচ সাত সের দুধ খরচ হয়। নাতনিদের এক খেপে গাড়ি করে ইস্কুলে পৌঁছে দিয়ে তারপর কর্তাকে কোর্টে পৌঁছে দেয়। মেসোমশাই গরমের ছুটিতে মাসিমাকে পাহাড়ে বেড়াতে নিয়ে যায়। সংসার জ্বলজ্বল করছে। চারিদিকে সাফল্য, চারিদিকে সাচ্ছল্য! পাড়ার পাঁচ-দশজন রোজ এসে কুশল প্রশ্ন করে যায়। দেশের দশ-বিশটা ব্যাপারে মেসোমশাই-এর ডাক পড়ে। কত অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে দাতব্য করতে হয়। সময় পায় না মেসোমশাই সব জায়গায় যেতে।

তবু ক'জন আমায় পীড়াপীড়ি করছিল ক'দিন ধরে, মেসোমশাইকে গিয়ে তাদের প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে বলবার জন্যে। আমিও মাসিমাকে দিয়ে বলাবো ভাবছিলাম।

মাসিমা শুনে বললে, 'ও-মানুষকে তো চিরটা কাল দেখে আসছি, বিয়ে

হওয়া এন্তোক আমাকে জ্বালিয়েছে। ও'কে দিয়ে তোদের কাজের কী সুসার হবে বলতো ?'

মাসিমা সত্যিই হেসে বাঁচে না।

বলে, 'ও'কে সভাপতি করবে, তবেই হয়েছে—আর লোক পেলি নে রে—'

কথায় কথায় মাসিমা খোঁটা দেয়, 'ওই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, জিগ্যেস করো না ওকে, ওদের তো তিনজনের সংসার, এখন না-হয় ওর বউ ছেলে-মেয়ে হয়েছে, কিন্তু ওর মা কোন্ দিন সংসারের কোন্ কুটোটা নেড়েছে—বলুক ও।'

কখনও কখনও রেগে বিরক্ত হয়ে গিয়ে বলে, 'পারব না আমি এত দেখতে তোমার সংসার তুমি দেখ, আমি পারব না। বিয়ে হয়ে এ-বাড়িতে ঢোকা ওব্দি এক দণ্ডও ফুরসুত পেলাম না মা—। কেন, কী আমার দায় পড়েছে। হোক্‌গে সব লণ্ড-ভণ্ড, তুমি নিজে দেখতে পারো ভালো, নইলে রইলো সব পড়ে—সব অপচো-নষ্ট হোক্, আমি ফিরেও দেখবো না আর।'

বলে মাসিমা নিজের শোবার ঘরে বিছানায় উঠে গিয়ে বসে।

বড় বউমা লোক ভালো। মন-রাখা কথা বলতে জানে।

বলে, 'মা' আপনি এখানে বসে থাকলে কেমন করে কী করবো, আমরা ছেলেমানুষ, কী বুঝি—আপনি সামনে বসে দেখিয়ে দিন, আমরা শিখে নি।'

মাসিমা বলে, 'কেন, উনি কোথায়, তোমার শ্বশুর—'

'তিনি তো বাইরের ঘরে।'

'ডাক তাঁকে, ডেকে আনো, দেখুন না এসে সংসারে হুজ্জুতটা কত!'

'তা কি আর কেউ জানে না মা, সবাই জানে, আপনি তবু একবার চলুন নিচেয়।'

'না, তুমি যাও বউমা, আমি যাবো না, একদিন ও-মানুষ দেখুক কাজটা কী হয় সংসারে, বাইরে বাইরে শুধু গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ান তো নয়, তোমার শ্বশুরের কথা বলছি, সারা জীবনটা আমার এমনি করে হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়েছে বউমা, একটা দিনের তরে শান্তি পাইনি আমি, এমন অকম্মা লোকের হাতে পড়েছিলুম মা!'

বলতে বলতে মাসিমার চোখ সত্যিই ছলছল করে ওঠে।

সাধারণতঃ মাসিমা কাক-কোকিল ডাকবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে ওঠে। সেই সুরু হয় চরকির মতো পাক খাওয়া। কে কী খাবে, কোথায় অপচয় হচ্ছে, কার কী প্রয়োজন, সমস্ত জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে। যেখানকার যে-জিনিস সেখানে না থাকলেই অনর্থ। রান্নাঘরের পাশে উঠোনের ঝাঁটাটা কাত হয়ে পড়ে আছে। মাসিমা সৌরভীকে ডেকে দু'কথা শুনিয়ে দেবে, 'হ্যাঁ গা মেয়ে উঠোনের ঝাঁটাটা যে বড় কাত হয়ে পড়ে আছে, এ কেমন ধারা অনাছিষ্টি কাজ গা—সবাই কি বাড়ির কর্তার ধারা পেয়েছে।'

ইদানিং মাসিমা পুজোর সময় প্রতি বছরেই একটা-না-একটা গয়না গড়াত। বউদের যা হবার তা তো হয়ই। সেবার কাজের ভিড়ে স্যাকরাও সময়মত

জিনিসটা গড়িয়ে দিয়ে যেতে পারেনি। বার বার লোক দিয়ে তাগাদা দিয়েও মহালয়া পেরিয়ে গেল।

মাসিমা সেদিন একেবারে মেসোমশাই-এর সদরে গিয়ে হাজির। মেসোমশাই কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত ছিল। মাসিমাকে দেখে অবাক্। মেসোমশাই মুখ তুলে চাইতেই মাসিমা বললে, 'বলি, তোমাকে তো বলা বৃথা,—তুমি তোমার রাজকাজ্য নিয়েই ব্যস্ত!'

'কি, হল কী?'

'বলি, সংসারে তো তুমিও একজন, না তুমি সংসার ছাড়া? সংসারে থাকতে গেলেই দু'চার কথা বলতে হয় তাই বলি, নইলে আমার আর কী? যেদিন মরে যাবো, দু'চক্ষু বুজবো, সেদিন তোমাকে বলতে আসবো না—তুমিও নিশ্চিন্তে রাজকাজ্য করবে। তা ভেবো না, তোমাকে আমি দুষছি; দোষ তোমারও নয়, দোষ আমারই পোড়া কপালের। তা নইলে এত লোক থাকতে তোমার মত অকম্মা লোকের হাতেই আমায় পড়তে হয়—'

মেসোমশাই কিছু বুঝতে না পেরে বললে, 'কী, হল কী বুঝতে পারছিনে তো।'

মাসিমা বললে, 'হ্যাঁ গা, আমার কপালেই কি যত অকম্মা জুটতে হয়। চাকর, ঝি, বউদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, তারা না হয় কেউ আপনার জন নয়, কিন্তু গয়লা, স্যাকরা এদেরও কী বেছে বেছে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে জ্বালিয়ে খাবার জন্যে?'

সেদিন গয়লা এলে তাকে সোজা শুনিয়ে দিলে মাসিমা, 'তোকে আর দুধ দিতে হবে না বাছা, কত্তার রক্ত-জল-করা পয়সা, আর তুই এমনি করে ঠকাবি। কত্তা না নয় মানুষ নয়, তা আমরাও কি চোখের মাথা খেয়ে বসেছি?'

কতদিন ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী আমাদের সকলের সামনে মাসিমা দুঃখ করে মেসোমশাইকে বলেছে, 'তোমার হাত থেকে যে কবে নিষ্কৃতি পাবো কে জানে, আর জন্মে কত পাপই করেছি!'

মাসিমা বলত, 'সেই এগারো বছর বয়েসে বউ হয়ে ঢুকেছি এ-বাড়িতে আর এখন বুড়ী হয়ে গেলুম, সুখ যে কী দ্রব্য তা জানলুম না এ-জীবনে।'

মা বাবাকে বলত, 'পড়তে তুমি দিদির হাতে তো বুঝতে ঠেলা, অমন দেবতার মতো স্বামী, তা-ও উঠতে-বসতে গঞ্জনা!'

বাবা বলত, 'তোমার দিদি বুঝবে মজা একদিন—কর্তার মারা যাওয়ার পর ছেলেরা কী করে দেখো।'

আমাদের জ্ঞান হওয়া থেকে দেখে আসছি মাসিমাকে ওই একই রকম। আগে যখন মেসোমশাই-এর অবস্থা খারাপ ছিল তখনও অভিযোগের অন্ত ছিল না। তারপর সংসারী মানুষের যা কিছু কাম্য, কিছু আর পেতে বাকি ছিল না মাসিমার। ঐশ্বর্য, সম্পদ, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, সচ্ছলতা, পরিজন, দাসদাসী। তারপর ভবানীপুরের প্রাসাদতুল্য বাড়ি। মেসোমশাই-এর বাড়ি নয় তো—

রাজপ্রাসাদ। সমস্তই মেসোমশাই-এর নিজের চেষ্টায়, নিজের সৎ উপার্জনে। জীবনে কারো ক্ষতি করেনি। কারো ওপর হিংসা নয়। দূরের কাছের যে-কেউ আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে এসেছে, আদর এবং অভ্যর্থনা পেয়েছে, বাড়ির একজনের মতো থেকেছে। দিনে দিনে পরিজনের বৃদ্ধি সংখ্যা পেয়েছে। এ-সমস্তর মূলে একজনের অক্লান্ত অধ্যবসায় পরিশ্রম আর মানুষের সংসারে প্রতিষ্ঠালাভ করার ঐকান্তিক নিষ্ঠা। সমাজে মেসোমশাই-এর প্রতিষ্ঠা বেড়েছে দিন দিন, কোর্টে পসার বৃদ্ধি পেয়েছে, পদোন্নতি হয়েছে। সম্মানের সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছে একদিন। কিন্তু যখন দিন গেলে পাঁচ টাকা এনে মাসিমার হাতে তুলে দিয়েছে তখনও যা, যেদিন পাঁচ হাজার এনে তুলে দিয়েছে সেদিনও তাই। সে-টাকায় সংসারেরই শুধু সমৃদ্ধি হয়েছে, ছেলে-মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার বেড়েছে কিন্তু মেসোমশাই-এর পরিশ্রমের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়নি ; মাসিমার কাছে কোনোদিন কোনো মর্যাদারও তারতম্য হয়নি ; মাসিমা ছেলেমেয়েদের খাওয়ার তদারক যতখানি করেছে ততখানি করেনি মেসোমশাই-এর।

মাসিমা সন্ধ্যে হতেই হুকুম দিয়েছে খোকাবাবু আজ লুচি খাবে, মনে থাকে যেন ঠাকুর ; আর মণ্টুর মাছের তরকারিতে যেন ঝাল দিয়ে বোসো না।

ঠাকুর হয়তো বলেছে, 'বাবুর খাবারটা আগে দিয়ে দেব, মা ?'

মাসিমা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছে, 'বাবুর খাবার পরে হবে, খোকাবাবু ঘুমিয়ে পড়লে আর খেতে চায় না, জানো না ?'

বড়ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রিত বহু লোকজন এসে খেয়ে দেয়ে গেল। হাজার লোকের খাওয়ার আয়োজন হয়েছিল। রাত তখন বারটা। সবাই খেয়ে দেয়ে ঘুমোতে যাবার আয়োজন করছে। হঠাৎ কে যেন বললে, 'বড় বাবু তো কই খাননি।'

খবর পেয়ে সবাই লজ্জিত সংকুচিত।

মাসিমা খাবার ঘরের সামনে এসে এত লোকের সামনে বললে, 'হ্যাঁ গা, তোমায় অকম্মা বলি কি সাধে, খেতে ভুলে গেলে কী বলে তুমি ? এইটুকু উপকার তোমায় দিয়ে হয় না, আমার কি একটা কাজ, আমি একলা মানুষ কত দিকে নজর দেব ?'

কত জায়গায় একে একে বদলি হল মেসোমশাই। মেসোমশাই-এর কোর্টে যাবার কথা কিন্তু কারো মনে থাকে না সচরাচর। ঠিক সময়ে খাবার দেওয়ার কথাও কেউ ভাবে না। ঠিক সময়ে তৈরি হয়ে এসে মেসোমশাই দেখে খাবারের কোনো আয়োজনই হয়নি।

মাসিমা এসে হাজির হয়। বলে, 'যখন একলা এই শরীরে সংসার ঠেলেছি, তখন তো কই ভাত দিতে কখনও দেরি হয়নি, এখন কেন হয় ?'

মেসোমশাই বলে, 'কেন হয় তা তুমিই জানো।'

মাসিমা বলে, 'আমার জানতে বয়ে গেছে, তুমিই দেখ, গাদা গাদা লোক রেখেছ, বোঝ এখন যে আমার মত গিন্নী পেয়েছিলে বলেই তুমি এ যাত্রা

টিঁকে গেলে। তুমি কি ভেবেছ চিরটা কাল তোমার সংসারে বাঁদীগিরি করবো বলেই জন্মেছি, আমার আর নিজের সুখ-আহ্লাদ বলে কিছু নেই? পারব না আমি দেখতে তোমার ভূতের সংসার, তুমি থাকো তোমার সংসার নিয়ে, আমি পারব না। যতদিন গতর ছিল দেখেছিলাম, আর নয়, ঢের হয়েছে, সংসার করার সাধ আমার খুব মিটে গেছে—।'

সংসার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে মাসিমারও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে দেখতাম। মাসিমাকে দেখলেও আর চিনতে না পারার কথা। নাতি-নাতনী, পুত্র-পৌত্র, পুত্রবধূদের ঘিরে বিকেলবেলা মাসিমা যখন বারান্দায় বসে, তখন সে এক দৃশ্য। এক বউমা মাসিমার চুল বেঁধে দিচ্ছে, আর একজন সামনে বসে তরকারি কুটছে শাশুড়ীকে জিগ্যেস করে করে।

'মন্টুর কপির তরকারিতে গরমমসলা দিতে বারণ করো, ছোট বউমা।'

'খুকুর বাটিতে আজ যেন দুধ রেখো না, কদিন থেকে পেটের অসুখ করেছে, তোমরা তো কেউ দেখবে না—'

'ভোলা আজ লুচি খাবে না বলেছে, ওর জন্যে তিজেল হাঁড়িতে এক মুঠো ভাত করে দিয়ো।'

'পিন্টুর দুধটা একটু ঘন করবে ঠাকুর, পাতলা দুধ খেতে পারে না ও, জানো তো।'

এমনি তদারক চলে মাসিমার সারাদিন ধরে।

হঠাৎ হয়তো কেউ বললে, 'মা, কর্তাবাবু কোটে' চাবি নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন।'

মাসিমা বলে, 'জানিনে বাপু, সারাদিন কোন্ রাজকাজ্য করেন ভগবান জানে। আমার শতেক কাজ, এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে কর্তার চাবির কথা সে-ও আমাকেই ভাবতে হবে, পারব না আমি অত। সংসারের একটা কুটো নেড়ে তো ও-মানুষের উপ্‌গার নেই, বাইরে বাইরে কেবল গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন, আর আমার ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে দিয়ে মজা দেখছেন। পারব না আমি, যার যা খুশি করুক, খবরদার, আমাকে কেউ কিছু বলতে আসিসনি, ভালো হবে না।'

তা এমনি করে মাসিমার দাম্পত্য-জীবন কত বছর চলতো কে জানে। সংসার তখন জম-জমাট। মেসোমশাই প্রতিষ্ঠার সুউচ্চ শিখরে উঠেছে। মাসিমারও চুল পেকে গেছে। সম্পদ আর ঐশ্বর্যের সীমা নেই। এমন সময় মেসোমশাই হঠাৎ রোগে পড়ল। ভীষণ রোগ। সকালবেলা কল-ঘরে গিয়ে কী যেন হলো আর বেরোয় না। শেষে জানা গেল কপালের শিরা ছিঁড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। আত্মীয়-স্বজন যে-যেখানে আছে সবাই ছুটে গেল।

মাকে সঙ্গে নিয়ে আমিও ছুটে গেলাম খবর পেয়ে।

সমস্ত বাড়িতেই একটা থমথমে ভাব। ঝি-চাকর, নাতি-নাতনী সবাই সন্ত্রস্ত। শুনলাম মাসিমা সেই যে মেসোমশাই-এর পাশে গিয়ে বসেছে আজ

দু'দিন আর ওঠেনি। নাওয়া খাওয়া নেই। কারো কথা শুনবে না। সবাই বলে বলে হার মেনেছে।

মাকে দেখে মাসিমা উঠে এল। চোখে জল নেই। শুকনো খট্‌খটে। রাগে যেন চোখ দু'টো শুধু লাল জবাফুল হয়ে আছে। বললে, 'এসেছিস্ তুই, দেখে যা ও-মানুষের কাণ্ড, সংসারের একটা উপ্‌গার করা দূরে থাক, এই অসুখে পড়ে আমাকে একেবারে জ্বালিয়ে খাচ্ছেন। ও-মানুষ কি সোজা মানুষ ভেবেছিস, আমার ঘাড়ে সংসার চাপিয়ে দিয়ে নাচতে নাচতে এখন পালাবার মতলব ও'র।'

মা বললে, 'রাঙাদি, তুমি নিজের শরীরটার দিকে একবার চেয়ে দেখ।'

মাসিমা বললে, 'আমার নিজের শরীরের কথা ভাবব, তাহলে যে আমার সুখ হবে রে—। আমার সুখ দেখলে ও-মানুষের বরাবর পিত্তি জ্বলে যায়, আমার হবে সুখ, বিয়ে হওয়া এস্তোক চিরটা কাল আমায় জ্বালিয়েছে ও-মানুষ। সুখ বলে কী দ্রব্য জীবনে জানতে পারিনি—সুখের আমার হয়েছে কী বোন, সারাটা জীবন আমায় জ্বালিয়েছেন, এখন মরে গিয়ে পর্যন্ত আমায় জ্বালাবার মতবল ও'র—উনি কি সোজা মানুষ ভেবেছিস?'

মাসিমার শেষ জীবনটাও আমরা দেখেছি। মেসোমশাই মারা যাবার আগে তার যাবতীয় সম্পত্তি মাসিমার নামে লিখে দিয়েছিল। ভবানীপুরের বিরাট বাড়ি। নগদে আর স্থাবর অস্থাবরে মিলিয়ে প্রায় সাত লক্ষ টাকার সম্পত্তি। ছেলেদের আগেই মানুষ করে গিয়েছিল মেসোমশাই। সব মেয়েদের বিয়েও দিয়ে দেওয়া হয়েছিল শেষ পর্যন্ত। কোথাও কোন ত্রুটি নেই।

মাসিমা বলত, 'মরণ আমার, সারাজীবন এক দণ্ড সুখ দেয়নি সে-মানুষ, ও'র সম্পত্তি নিয়ে আমি রাজা হব, দেখিস, আমি ও'র সম্পত্তির একটা পয়সা ছুঁচ্ছিনে হাত দিয়ে, আমার সোনার টুকরো ছেলেরা বেঁচে থাকুক, ছেলেরা থাকতে কর্তার পয়সায় আমার দরকার নেই মা, আমি কর্তার পয়সায় কখনও পিত্যেশ্ করিনি, আর করবও না।'

তা সত্যিই, মাসিমা মেসোমশাই-এর পয়সার প্রত্যাশা করেনি।

আমাদের দেশে যখন যাই, বড় হাসপাতালটার দিকে চেয়ে আমার সব কথা মনে পড়ে যায়, মেসোমশাই-এর নামেই হাসপাতাল। মেসোমশাই-এর সেই প্রাসাদতুল্য বাড়িটা মায় সমস্ত সাত লাখ টাকার সম্পত্তি, সব মাসিমা দান করে গিয়েছিল। শেষ জীবনটা ছেলেদের ছোট বাড়িতে কেটেছে তার। অতবড় বাড়িতে ওই ঐশ্বর্যের মধ্যে এতদিন কাটিয়েও এখানে কোনও অসুবিধে হত না।

মেসোমশাই-এর নামে হাসপাতাল যেদিন প্রতিষ্ঠা হল সেদিনও মাসিমা একবার দেখতে গেলে না। যাঁর টাকা তাঁরই নামে হাসপাতাল। প্রকাণ্ড মিটিং হল। মেসোমশাই-এর গুণকীর্তন করে কত লোক কত কী বক্তৃতা দিলে। সামান্য অবস্থা থেকে কেমন করে ধনী হয়েছিলেন সেই ইতিহাস।

এতটুকু অহঙ্কার ছিল না, বিদ্বেষ ছিল না। অনলস কর্মপ্রাণ মহাপুরুষ। কর্মই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান নিদিধ্যাসন। জীবনে এক মুহূর্তের জন্যে তিনি অলস হননি। প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর কর্ম-সাধনায় কেটেছে। তিনি কর্মপ্রাণ, কর্মপ্রতীক, কর্মবীর মানুষ। শেষে তাঁর বিধবা স্ত্রীর দানশীলতা ও অচলা পতিভক্তির জন্যে ধন্যবাদ জানিয়েও একটা প্রস্তাব পাঠ করা হল সভায়। আদর্শ হিন্দু রমণী হিসেবে মাসিমার নামও লেখা রইল হাসপাতালের খাতায়।

তবু হাসপাতালটার দিকে চাইলেই আমার কেবল মনে পড়ত মাসিমার কথাগুলো, 'সারাজীবন আমাকে জ্বালিয়ে খেয়েছে রে সে-মানুষ, আর তাঁর টাকা ছোঁবো আমি, ওই অকম্মা লোকের হাতে পড়ে আমার সারাজীবন জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে, আমার সোনার টুকরো ছেলেরা বেঁচে থাক, তাদের খুদকুঁড়ো যা জোটে তা-ই খাবো, তবু সে মানুষের টাকা আমি ছুঁচ্ছিনে, দেখে নিস তুই—'

চল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবন আর একুশ বছরের বিধবাজীবন—এই এতদিনের একনিষ্ঠ পতিনিন্দার পরে যথারীতি একদিন সকালে মাসিমার মৃত্যুর খবর শুনে চমকেও উঠেছিলাম মনে আছে।

মনে আছে এ সব ছোটবেলাকার ঘটনা। এর পরে কত রকম রকম-ফের হয়েছে সমাজ-জীবনে। যে-সব মেয়েরা বরাবর বিয়ে করে সংসার করার জন্যে তৈরি হচ্ছিল, তারাই এসে দলে দলে সরকারী অফিসে ঢুকেছে একদিন। নানারকম পার্টিতে যোগ দিয়েছে। ধর্মঘট, শ্রমিক আন্দোলন হয়েছে। মেয়েরা এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। জাস্টিস চৌধুরীর মেয়ে লোক নৃত্য দেখিয়েছে স্টেজে উঠে। যারা কখনও মোটর ছাড়া চলেনি, দাঙ্গার সময় তারাই এসে নারী-কর্মী-সঙ্ঘ গড়ে তুলেছে। দল বেঁধে মিছিল করে চৌরঙ্গী দিয়ে লাল-নিশান উড়িয়ে চলেছে। সে আর এক জগৎ, আর এক অধ্যায়। আমার 'কন্যাপক্ষ'তে একবার তাদের কথা বলা হল না। আর তাদের ক'জনকেই বা দেখেছি এক মিলি মল্লিক ছাড়া। সব পাড়াতেই যেমন এক-একটা বাড়ি থাকে, যেখানে একটা-দুটো মেয়ের জন্যে পঞ্চাশটা ছেলের জটলা। আর মিলি মল্লিক নিজে না বললে, আমি-ই কি তার সেই অতীত পরিচয় জানতাম, না উষাপতিই জানতো। অমরেশের আখড়ায় উষাপতিও ছিল একজন পাণ্ডা। কিন্তু সে-কথা পরে বলবো।

আর সে-সময়ে আমিই কি কলকাতায় ছিলাম। লেখাই তো ছেড়ে দিয়েছিলাম বছর দশেক। সোনাদির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে লেখা আর ছাপবো না। লিখবো, পড়বো, সাধনা করবো কিন্তু ছাপিয়ে নাম কলঙ্কিত করবো না। দশ বছর পরে তখন যদি সোনাদি অনুমতি দেয় তো ছাপাবো আবার।

সোনাদি বলেছিল, 'মহাভারতের পাণ্ডবদের মতো এই দশটা বছর তোর উদ্যোগপর্ব ধরে নে, এই দশটা বছর তোর অজ্ঞাতবাসের পালা মনে কর।'

সোনাদির সামনে বসে বলেছিলাম, 'তাই হবে সোনাদি।'

তারপর বলেছিলাম, 'কিন্তু বন্ধুরা যে অনেক বই লিখে ফেলবে ততদিনে?'

'তা লিখুক, কিন্তু শেষে যদি একখানা তেমন বই লিখতে পারিস, তো সকলকে যে টপ্‌কে যাবি তুই আবার।'

যা হোক, সেদিনের সে-প্রতিজ্ঞা আমি রেখেছিলাম বৈকি। কিন্তু সেই দশ বছরে এমন কাণ্ড হবে কে জানতো! এমন করে সব উল্টে-পাল্টে যাবে! এমন করে নিজের জীবন দিয়ে সোনাদি লিখতে শিখিয়ে যাবে আমাকে। বন্ধু-বান্ধবরা লেখা চাইতো কাগজের জন্যে। যারা মুখে কখনও প্রশংসা করেনি আগে, লেখা বন্ধ করবার পর তারা কিন্তু বলতো 'খাসা মিষ্টি হাত ছিল আপনার।'

একদিন সোনাদি বললে, 'এবার থেকে তোর সঙ্গে দেখা হবে না আর।'

আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'কেন?'

'এখানে তো অনেকদিন হয়ে গেল, এবার জব্বলপুরে যাবো।'

'কিন্তু তোমার অসুখ যে সারেনি।'

দাশসাহেবও সেদিন সেই কথাই বললেন, 'তুমি চলে যাবে বলছো, কিন্তু শরীরটা তোমার এখনো যে সারেনি।'

সোনাদি বললে, 'আমি ঠিকই আছি, কিন্তু তুমি যেন আবার অত্যাচার শুরু কোরো না—তোমার যা সহ্য হয় না, সেই সব জিনিস খেতেই তোমার লোভ কেবল।'

দাশসাহেব বললেন, 'বলা তোমাকে বৃথা, আর ধরে রাখবোই বা কোন্ অধিকারে? কিন্তু একটা কথা জিগ্যেস করি—সংসারে কোনও কিছুর ওপরেই কি তোমার মায়া নেই? আমার কথা বলবো না, আমি কেউই নই তোমার, নেহাত ছেলে-মেয়েদের পাল্লায় পড়ে একদিন এসে পড়েছিলে তাই, কিন্তু সত্যই কি এ-বাড়ির ওপরেও তোমার কোনও টান হয়নি? রতি আর শিশুকে কি একেবারেই ভুলে যেতে পারবে! তারা গরমের ছুটিতে বাড়িতে এলে তাদের কী বোঝাবো?'

সোনাদি শুধু হাসতে লাগলো।

দাশসাহেব তবু হাল ছাড়লেন না। বললেন, 'তোমাকে বলতেই হবে সোনা, পৃথিবীতে এমন কেউ-ই কি নেই যে গর্ব করে বলতে পারে তোমাকে কাছে পেয়েছে? যাকে ছেড়ে চলে যেতে তোমার এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়বে চোখ বেয়ে?'

সোনাদি হাসতে হাসতে বললে, 'তুমি আজ হঠাৎ এমন করে কথা বলছো যে?'

দাশসাহেব বললেন, 'বলিনি, সে শুধু-সাহস হয়নি বলে, কিন্তু কত যে

আশ্চর্য লেগেছে আমার। স্বামীনাথবাবু তোমার চিঠি না পেলে কিছু করেন না, তাঁর সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি তোমার উপদেশ অনুযায়ী চলে, তাঁর বাড়ির নতুন ঝি-চাকর বহাল হয় বরখাস্ত হয় সে-ও তোমার চিঠির মারফত, তুমি চলে আসো এক কথায় নিজের সংসার ছেড়ে আর একজনের সংসারে। আবার হয়তো একদিন আর একটা অনাত্মীয় সংসারে তুমি এমনি করেই জড়িয়ে পড়বে। এ কেমন তোমার নিয়ম। যেদিন জব্বলপুর থেকে চলে আসি, তুমি চলে এলে আমার সঙ্গে, মনে মনে ভেবেছিলাম বুঝি জিত হল আমার, কিন্তু আমার অন্তরাত্মাই জানে কেবল যে সে আমার কতবড় ভুল।'

সোনাদি তেমনি ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপ করে বসেছিল আর হাসছিল।

দাশসাহেব আবার বললেন, 'আর অবাক্ লাগে স্বামীনাথবাবুকে। কোনো অভিযোগ কোনো অনুযোগও কি করতে নেই সে-মানুষটির, রক্ত-মাংসের মানুষ এমন করে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে জয় করতে পারেন কেমন করে বলতে পারো?'

সোনাদি হাসতে হাসতেই বললেন, 'তুমি সাহেব মানুষ, তোমার হঠাৎ এ-ভাবান্তর কেন হল বলো তো?'

'এ তোমার উত্তর এড়িয়ে যাওয়া, সোনা।'

এমনি করে উত্তর এড়িয়েই গেছে সোনাদি বরাবর। আমি পাশে বসে শুনেছি। নেহাত ছোট ছেলে বলে কখনও কেউ আমার উপস্থিতিতে আপত্তি করেনি। আর দাশসাহেব তো আমাকে আমলই দিতেন না। আমি এসব কথা চুপ করেই বরাবর শুনে গেছি। আর দরকার হলে শুধু খাতায় টুকে রেখেছি দু-একটা টুকিটাকি কথা।

মনে আছে তখন সব তোড়জোড় হয়ে গেছে। জিনিসপত্র সব বাঁধাছাঁদা প্রস্তুত। সোনাদি ইজি-চেয়ারে বসে তদারক করছে। দাশসাহেব অফিসে। অভিলাষ বাক্স গুছিয়ে রাখছে। সোনাদি চলে যাবে, মনটা কেমন খারাপ লাগলো।

সোনাদি বলছিল, সারাজীবন 'কত লোককে হারাবি, কত লোককে পাবি, কত লোক ভালবাসবে, কত লোক আবার আঘাত দেবে—এই হারানো, এই পাওয়া, এই ভালবাসা, এই আঘাত, এই নিয়েই তো জীবন; এই সব দেখেই তো একদিন প্রজ্ঞা আসবে, তবেই তো লেখক হতে পারবি, তবেই তো···

এমনি সময়েই সেই লোকটা এসে হাজির।

গেট্-এর কাছে গিয়ে বললাম, 'কাকে চাই?'

'একটা চিঠি এনেছি স্বামীনাথবাবুর কাছ থেকে।'

লোকটা চলে গেল। চিঠিটা পড়ে সোনাদি কী যেন ভাবতে লাগলো খানিকক্ষণ। তারপর টেলিফোন তুলে দাশসাহেবের সঙ্গে অফিসে কথা বলতে লাগলো।

সোনাদি বললে, 'তোমার গাড়িটা এখনি পাঠিয়ে দাও, আমি একবার বৌবাজারে যাবো...না, কখন আসবো কিছু ঠিক নেই।...তোমার খাবার খেয়ে নিয়ে শুয়ে প'ড়ো,...আমার ফিরতে দেরি হতে পারে।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'কোথায় যাবে সোনাদি ?'

'চল্, তুইও আমার সঙ্গে যাবি।'

মনে আছে তখনও জানি না কোথায় যাবে সোনাদি। স্বামীনাথবাবু কোথা থেকে চিঠি পাঠাচ্ছেন, কেন পাঠাচ্ছেন, কী লেখা আছে চিঠিতে, তা-ও দেখতে পাইনি। যখন গাড়ি নিয়ে সোনাদি বৌবাজারের এক গলির ভেতর নামলো তখনও জানি না। নম্বর খুঁজে পেয়ে সোনাদি কড়া নাড়তে লাগলো। কড়া না-নাড়লেও চলতো। একটু ঠেলাতেই দরজা ফাঁক হল সামান্য, আর দেখা গেল একজন বুড়োমানুষ সামনের রান্নাঘরে যেন রান্না করছেন।

সোনাদির পেছন-পেছন আমি ঢুকলাম ভেতরে। সোনাদিকে দেখে বুড়ো-মানুষটি যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন এক নিমেষে। বললেন, 'তুমি।'

সোনাদি বললে, 'পণ্টু এখন কেমন আছে ?'

'সেই রকমই, কিন্তু...'

কী জানি কেন আমার যেন মনে হল ইনিই স্বামীনাথবাবু। হঠাৎ তাঁর হাতের দিকে নজর পড়তেই সোনাদি বললে, 'হাত পুড়িয়েছ দেখতে পাচ্ছি। কী দিয়েছ ?'

'নারকোল তেল. কিন্তু...'

'সরো তুমি, একটু চাল-ডাল ফুটিয়ে নেবে তা-ও পারো না, তা পণ্টুর অসুখ হল আর আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিতে পারলে না।'

'সময় পেলাম কই ? শিমুলতলায় এসেছিলাম ওকে নিয়ে হাওয়া বদলাতে আর হঠাৎ একদিন এই কাণ্ড, তাড়াতাড়ি এখানে এনে হাসপাতালে তুললুম, তারপর...'

'এতদিন কী করছিলে, দিন পাঁচেক হল তো এসেছো ?'

'কেবল হাসপাতাল আর ঘর করি, আর নিজের ভাতটা ফুটিয়ে নিই।'

'নিজের ভাতটা যা ফোটাচ্ছ তা-তো দেখতে পাচ্ছি, হাত তো পুড়িয়ে ফেলেছ, ঝি-চাকর কাউকেই তো আনোনি দেখছি, তোমার মতলব কী বলো তো ?'

স্বামীনাথবাবু অপ্রস্তুত হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর সোনাদি সেই সিল্কের শাড়ি ব্লাউজ নিয়ে রান্নাঘরের মধ্যে বসলো। এ সোনাদিকে যেন চেনা যায় না। ভাবা যায় না, একেই দেখেছি দাশসাহেবের পার্টিতে শৌখিন সমাজের চুড়োয়। জাস্টিস চৌধুরী, ব্যারিস্টার ব্যানার্জি, আর মিসেস চ্যাটার্জির সঙ্গে যেমন অবাধে মিশেছে, তেমনি করে এই বৌবাজারের ছোট বাসা-বাড়ির রান্নাঘরের ভেতরে একাকার হতেও বাধলো না সোনাদির।

স্বামীনাথবাবু এক ফাঁকে বললেন, 'তুমি কেমন আছো ?'

সোনাদি সে-কথার উত্তর দিলে না। বললে, 'তোমার হাতে আমার সংসারের ভার ছেড়ে দিয়ে তো আমি ভারি আরামে আছি। আমি জব্বলপুরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি আর এদিকে এই কাণ্ড...'

'তুমি যাবে জব্বলপুরে ?'

'যাবো না তো চিরকাল থাকতে এসেছি কলকাতায় ?'

মনে আছে স্বামীনাথবাবুকে সেই আমার প্রথম দেখা। এতদিন স্বামীনাথবাবু সম্বন্ধে যা কিছু শুনেছি সোনাদির মুখে সব মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। নির্বাক, নিরহংকারী মানুষটির ঠিক এমনি চেহারাই আশা করেছিলাম। এমনি আপত্তিহীন, অভিযোগহীন আত্মনির্ভরশীল উদার একটি ব্যক্তি। যেন সংসারে কাউকে অবিশ্বাস করতে জানেন না। সমস্ত জগৎ তাঁকে প্রবঞ্চনা করলেও যেন তিনি নিজের আস্থা হারাতে রাজী নন। ধব ধবে রং, খালি গা, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, সমস্ত মিলিয়ে মানুষটিকে যেন পরম আপনার বলে মনে হল।

দু'দণ্ডের মধ্যে কী করে যে সোনাদি শেষ করলে কে জানে। সোনাদি যে এমন পাকা সংসারী, দাশসাহেবের বাড়িতে তাকে দেখে তা মনে হয়নি।

সোনাদি বললে, 'নাও, হল, এরই জন্যে হাত পুড়িয়ে, পা পুড়িয়ে একাকার একেবারে...'

খাওয়া-দাওয়া শেষ করতেই বেলা গড়িয়ে এল।

সোনাদি বললে, 'বাড়িভাড়া যা হয়েছে, মিটিয়ে দাও। আর জিনিসপত্তোর তো দেখছি কিছুই আনোনি—'

স্বামীনাথবাবু যেন কিছুই বুঝতে পারলেন না।

সোনাদি বললে, 'টাকা না থাকে আমিই পাঠিয়ে দেব কাল, কিন্তু এখন চলো—'

স্বামীনাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'কোথায় ?'

'কোথায় আবার, আমার বাড়িতে। তোমাকে রেখে আবার হাসপাতালে যেতে হবে এখুনি—'

তারপর সোনাদির বাড়িতেই উঠতে হল। শুধু কি স্বামীনাথবাবু! অদ্ভুত মেয়ে সোনাদি। পুটু যেদিন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেল, সে-ও সেদিন উঠলো ওখানে। দাশসাহেবের বিছানাতেই শোবার ব্যবস্থা হল স্বামীনাথবাবুর। দাশসাহেব বাইরের ছোট ঘরটায় আশ্রয় নিলেন। আর অসুস্থ পুটু রইলো সোনাদির ঘরের আলাদা একটা বিছানায়।

এ এক অদ্ভুত সংসার। এ-সংসারের মতো এমন অদ্ভুত দৃশ্য কোথাও আর দেখিনি পরে। পরে যখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, ঝি-চাকর বাবুর্চি দারোয়ান ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তখনও...কিন্তু সে-কথা পরে বলবো সময়মতো।

তা সেই বাড়িতেই দেখেছি লম্বা খাবার টেবিলে সবাই খেতে বসেছে। ছুটির দিনের দুপুরবেলা। সোনাদি টেবিলটার মাথায় বসে সকলের তদারক

করছে। একপাশে স্বামীনাথবাবু বসেছেন আর একপাশে দাশসাহেব। আর ওপাশে পন্টু, রতি, শিশু। ইস্কুলের ছুটিতে তারাও বাড়ি এসেছে।

মাঝপথেই রতি হাত গুটিয়ে বসেছে।

সোনাদি বললে, 'তুই কিছু খাচ্ছিসনে কেন রে ?'

'পেট-ব্যথা করছে মা।'

দাশসাহেবকে লক্ষ্য করে সোনাদি বললে, 'শুনছো, বাগানের পেয়ারা-গাছের একটা পেয়ারাও রাখেনি ওই তিনটেতে।'

দাশসাহেব খেতে খেতে বললেন, 'তুমি কিছু বলো না কেন ?'

স্বামীনাথবাবু মুখ তুলে বললেন, 'আমিও একটা খেয়েছি।'

দাশসাহেব হেসে উঠলেন, 'আপনিও খেয়েছেন নাকি পেয়ারা ?'

স্বামীনাথবাবুও হাসলেন, 'হ্যাঁ, দিলে যে ওরা—কাশীর পেয়ারা, খেতে ভালো।'

আমাকে দেখিয়ে দাশসাহেব বললেন, 'ওই পেয়ারাগাছতলায় ওদের কুস্তির আখড়া ছিল, মাটিটা খুব সারালো কিনা, ফল ফলে ভালো।'

স্বামীনাথবাবু আমাকে বললেন, 'তুমি কুস্তি করতে নাকি ?'

বললাম, 'তখন করতাম।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'বেশ, তা অভ্যেসটা ছেড়ো না, ওতে শরীর মন দুই-ই ভালো থাকে।'

সোনাদি একবার বললে, 'তুমি অত খাচ্ছ যে ?'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'কে আমি ? আমাকে বলছ ?'

'তুমি না, দাশসাহেবকে বলছি।'

দাশসাহেব মুখ তুললেন, 'আমি ?'

'হ্যাঁ, তোমার কথাই তো বলছি, শেষকালে প্রেসার বেড়েছে বলে যেন কান্নাকাটি কোরো না আবার।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'তা তো বটে, আপনার বেশি অত্যাচার করা ভালো নয়, সোনা বলেছে ঠিক।'

দাশসাহেব বললেন 'মাঝে মাঝে ভুলে গিয়ে বেশি খেয়ে ফেলি—'

সোনাদি বললে, 'রতি-শিশুকে তবু বকলে শোনে, যত বয়েস হচ্ছে, ছেলে-মানুষ হয়ে যাচ্ছো দিন দিন...'

এমনি করে এক সময়ে খাওয়ার পাট চুকতো। তারপর যার যার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়তো সবাই। তখন ইজি-চেয়ারে চুল এলিয়ে দিয়ে বসতো সোনাদি। আর আমি পাশে বসে-বসে আমার কাজ করতাম। নিজের অভিমান, দুঃখ, আনন্দ সব কিছু জানাবার একমাত্র মানুষ। সোনাদি জিগ্যেস করতো, 'আর ছাপাতে দিসনি তো লেখা ?'

বলতাম, 'না সোনাদি।'

'সত্যি কথা ?'

'সত্যি, তুমি দেখে নিয়ো, দশ বছর পরে যা লিখবো, দেখবে নতুন জিনিস, সবাইকে চমকে দেব—তখন তোমাকে ভালো বলতেই হবে, দশটা বছর দেখতে দেখতে যাবে...'

কিন্তু আজ ভাবি, সেই দশ বছরে কি কম অদল-বদলটা হল। কোথায় রইল সোনাদি আর কোথায় রইলাম আমি। কোথায় গেলেন স্বামীনাথবাবু। আর কোথায়ই বা গেলেন দাশসাহেব। চেষ্টা করলে আজো যেন দেখতে পাই চোখ মেলে।

এর পর আমি কলেজের লেখাপড়া শেষ করেছি। ঘটনাচক্রে চাকরি নিয়ে বিলাসপুরে গেছি। বন্ধুবান্ধব লেখার জন্যে তাগাদা দিয়েছে। কেউ কেউ না-লেখার জন্যে অভিযোগ করেছে, অনুযোগ করেছে। কিন্তু কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি। মাঝে মাঝে কলকাতায় এসেছি বটে, কিন্তু লেখক কি সম্পাদক বন্ধুদের সঙ্গে দেখাও করিনি, পাছে প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হয়। পাছে সোনাদির কাছে দেওয়া কথার খেলাপ হয়। সেই দশ বছরে পাঠক সমাজ আমাকে ভুলে গেল। সাহিত্য-জগৎ থেকে আমার নির্বাসন হল বলা চলে। সে দশ বছর আমার জীবনে অজ্ঞাতবাসের পালা। নবজন্মের উদ্যোগ পর্ব। আমি নতুন করে দেখছি। নতুন করে শিখছি। খণ্ড কল্পনার ছলনায় আর ভুলব না। অখণ্ডকে অনুভব করবো। আমার এই আমি সেই দশ বছরে পরম-আমির মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালো। মনে আছে সেই দশ বছরেই প্রথম জীবনকে নতুন করে দেখার দৃষ্টি পেলাম। আমার তৃতীয় নেত্র খুললো।

আর সোনাদি ?

কিন্তু সোনাদির কথা বলবার আগে পলাশপুরের মিলি মল্লিকের গল্পটা আমি বলে নিই। পরে বলবার আর ফুরসুত পাবো না। মনে আছে, সেদিন মিলি মল্লিকের গল্পটা লেখবার লোভ আমি অতি কষ্টে সামলে নিয়েছিলাম। তবু আজ এতদিন পরে আমার নোট খাতা থেকে উদ্ধার করতে আপত্তি নেই। আসলে এটা ঊষাপতির বৌকে নিয়ে লেখা। আমাদের কুস্তির আখড়ার ঊষাপতি। অমরেশের মতো ঊষাপতিও চাকরি নিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিল। রেলের চাকরি তার। একরাত্রের জন্যে ঊষাপতির পলাশপুরের রেলকোয়ার্টারে অতিথি হয়েছিলাম। আর সেই রাত্রেই একটা হীরের টুকরো কুড়িয়ে পেলাম আমার শোবার ঘরে।

মাত্র দু'রতি ওজনের এক টুকরো হীরে। তাই নিয়েই একটা গল্প মাথায় এসেছিল। গল্পটা লেখবার আগে ঊষাপতিকে একটা চিঠি লিখেছিলাম তার অনুমতি চেয়ে।

ঊষাপতি উত্তরে লিখেছিল, 'সতীকে নিয়ে গল্প তুই লিখতে পারিস, তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু দেখিস ভাই, যাতে সতীর কোনো দুর্নাম হয় বা বদনাম হয় আমাদের, এমন কিছু লিখিস নে। জানিস তো, মেয়েমানুষের মন, চট করে এমন কাণ্ড করে বসবে—'

আরো অনেক কথা লিখেছিল। উষাপতি তখন ছিল পলাশপুরের স্টেশন-মাস্টার। এখন বদলি হয়েছে রায়গড়ে। মাইনেও অনেক বেড়েছে। দু'পয়সা এদিক-ওদিক থেকেও আসে। নিজেও বিশেষ খরচে-স্বভাবের লোক নয়। কিন্তু চিঠির শেষে লিখেছে, তোদের ওখানে যদি ভালো কোনো ডাক্তার থাকে, একটু খবর নিয়ে জানাস, সতীকে চিকিৎসা করাতে চাই। অনেক ডাক্তার, বদ্যি, হাকিম, সাধুকে দেখালাম—খরচও হচ্ছে প্রচুর—কিন্তু কিছুই হচ্ছে না—'

উষাপতির অনুমতি নিয়ে গল্পটা লিখতে আরম্ভ করেছিলাম বটে। কিন্তু লিখতে গিয়ে হঠাৎ কেমন হাসি এল। সতীকে নিয়েই গল্পটা বটে। উষাপতিকে অবশ্য জানাইনি দু'রতি ওজনের হীরের কথা। জানিয়েছিলাম, সতীই আমার গল্পের নায়িকা। কিন্তু আসলে তো জানি যে, সতী আমার গল্পের উপনায়িকা ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। শকুন্তলার যেমন প্রিয়ম্বদা। কিন্তু সেই রাত্রের অন্ধকারে আমার ঘরে কে এসেছিল? এ-গল্পের নায়িকা, না উপনায়িকা?

সত্যি সেই রাতটার মধ্যেও যেন কিছু মোহ ছিল। সেটা বুঝি ফাল্গুনী-পূর্ণিমার রাত। জীবনে কতদিন জীবিকার জন্যে রাতের পর রাত কাটিয়েছি তার হিসেব নেই। অফিসের চারটে দেওয়ালের মধ্যে কাজ করতে করতে অনেকবার বাইরে চেয়ে দেখেছি। কেমন করে রাতের গাঢ় অন্ধকার পাতলা হয়ে নীল হয়, সেই নীল কেমন করে সাদা হয় তাও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তবু মনে হয়েছে রোজই যেন নতুন দৃশ্য দেখেছি। দশ বছর আগের সেই রাতটা যেন আজো আমার জীবনে অনন্য আর একক হয়ে রয়েছে। পলাশপুরের স্টেশন-মাস্টারের বাঙলোর সেই সঙ্গীহীন ঘরে সারারাত তো আমার অনিদ্রাতেই কেটেছিল। তবু সকালবেলা জলখাবার খেতে বসে উষাপতি অবাক হয়ে গিয়েছিল আমার চেহারা দেখে।

বলেছিল, 'রাত্রে তোর ঘুম হয়নি নাকি?'

বলেছিলাম, 'না।'

উষাপতি বলেছিল, 'আমারও হয়নি।'

কী জানি কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল। বলেছিলাম, 'কেন, তোর হয়নি কেন?

উষাপতি চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলেছিল···

কিন্তু যা বলেছিল, তা বলবার আগে গোড়া থেকে সমস্ত ঘটনাটাই বলা দরকার।

উষাপতি তখন সবে বদলি হয়েছে পলাশপুরে। নতুন বিয়ে করে সংসার পেতেছিল ওখানে। ওর অনেকদিনের সাধ ছিল আমাকে ওর বউ দেখাবার। চিঠিতে লিখেছিল কতবার। নাকি বেশ নিরিবিলি জায়গা। অন্তত কলকাতার চেয়ে নিশ্চয়ই নিরিবিলি। চার-পাঁচটা কোলিয়ারীর সাইডিং শুধু বেরিয়ে গেছে স্টেশন থেকে। কোলিয়ারী ছাড়া স্টেশনের আর কোনো উপযোগিতাও

ছিল না। মাঝে মাঝে চিঠি লিখতো আমাকে, 'এবার শীতকালে নিশ্চয়ই আসিস। তোর জন্যে সব রকমের ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

কিন্তু যাওয়া আর আমার হয়ে ওঠেনি। উষাপতি যখনই ছুটিতে এসেছে, দেখা করেছে আমার সঙ্গে। বলেছে, 'আমার ওখানে গেলি না তো একবার!'

বিশেষ করে, স্টেশন-মাস্টারের বাড়িতে অতিথি হওয়ার একটা লোভও ছিল বরাবর। মুরগি, মাছ, ডিম, ঘি—সবই স্টেশন-মাস্টারের প্রায় বিনা-পয়সায় প্রাপ্য। আকারে-প্রকারে উষাপতি আমাকে জানিয়েও দিয়েছে সে-কথা। কিন্তু নিজের কোটর ছেড়ে নড়া-চড়া করার সুবিধে কখনও হয়ে ওঠেনি বলে যাওয়াও হয়নি ওর কাছে।

কিন্তু সেবার বম্বে যাবার পথে কেমন করে যে কাট্‌নী স্টেশনে হঠাৎ নেমে পড়লাম, তা নিজেই জানি না। কাট্‌নী থেকে কয়েকটা স্টেশন গেলেই পলাশপুর। ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেন। একটা রাত থাকবো ওখানে, তারপর পরদিন আবার ফিরবো। এই-ই ছিল মতলব।

যখন গিয়ে পলাশপুরে পেঁছিলাম তখন বিকেল।

স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল উষাপতি। সাদা গলাবন্ধ কোট পরলেও চিনতে কষ্ট হল না। আমাকে দেখেই একেবারে জড়িয়ে ধরেছে।

বললাম, 'কিন্তু কালকেই আমাকে ছেড়ে দিতে হবে ভাই, ভীষণ কাজ—'

'সে হবে না' বলে কাকে যেন হুকুম দিলে আমার মালপত্তোর বাড়িতে নিয়ে যেতে।

তা পলাশপুর বেশ বড় স্টেশন। সব গাড়ি জল নেয় এখানে। বাইরে বিরাট একটা খেলার মাঠ। জাফরি-দেওয়া বড় বড় বাঙলো। রাস্তায় ফিরিঙ্গী সাহেব-মেমদের ভিড়। সাইকেল-রিক্‌শা'র চল্‌ আছে বেশ এদিকে। বিকেল-বেলার গাড়ি দেখতে প্ল্যাটফরমে টাউনের লোক এসে জুটেছে। গাড়ি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সব চলে গেল প্ল্যাটফরম থেকে। ফাঁকা স্টেশন।

উষাপতির হাজার কাজ। দশজনকে হুকুম দিতে হয়। দশজনকে শাসন করতে হয়।

কাজের ফাঁকে একবার বললে, 'আর একটু বোস, একসঙ্গে যাবো বাড়িতে—আর এই কাজটা সেরেনি।'

শেষ পর্যন্ত একসময় কাজ সেরে উঠলো উষাপতি। বললে, 'আর পারিনে কাজের ঠেলায়। এই দেখ না, তুই এলি, তোর সঙ্গে একটু ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতে পারলাম না—যা হোক, তারপর কাল কিন্তু তোর যাওয়া হবে না বলে রাখছি—ওসব ওজর আপত্তি শুনছিনে।'

বললাম, 'তা হয় না রে। ওদিকে একদিন দেরি হলে ভারি অসুবিধে হবে আবার—'

'সে কৈফিয়ত দিস তুই মিলির কাছে, তার হাতে তোকে ছেড়ে দিয়ে আমি খালাস, ভাই—বাড়ির ব্যাপারে আমি নাক গলাই না। বাড়ির মধ্যে ঢুকেছ

কি আমার এলাকার বাইরে চলে গেলে—সেখানে মিলির কথাই ফাইন্যাল।'

বললাম, 'পুরোপুরি ডিভিসান-অব-লেবার দেখছি।'

উষাপতি সিগ্রেটে টান দিতে দিতে বললে, 'না করে উপায় ছিল না, ভাই। আমার অফিসের এত কাজ যে, এর পরে আর বাড়ির কোনো ব্যাপারে মাথা ঘামাবার ফুরসুত পাই না, ওটা মিলি নিজেই ঘাড়ে নিয়েছে, বলেছে,—বাড়ির ব্যাপারে আমায় সম্পূর্ণ স্বরাজ দিতে হবে। তা এমন কি, ওর চিঠি পর্যন্ত আমি খুলে পড়তে পারবো না, ও-ও আমার চিঠিপত্র খুলবে না।'

তারপর একটু থেমে বললে, 'এই যে তুই এলি, কী খাবি না-খাবি,—সমস্ত ভাবনা তার। কোথায় শুবি, কী করবি—ও নিয়ে আমায় আর মাথা ঘামাতে দেবে না।'

বললাম, 'এরকম স্ত্রী পাওয়া তো সৌভাগ্যের কথা রে।'

উষাপতি হাসলো। বেশ যেন পরিতৃপ্তির হাসি। বললে, 'তা জানিনে। তবে যারা এসেছে বাড়িতে, দেখেছে মিলিকে, তারা বলে,—আমার নাকি স্ত্রীভাগ্য ভালো। তবে বিয়ে তো একটাই করেছি, তুলনামূলক বিচার করতে পারবো না ভাই।'

উষাপতি আবার বলতে লাগলো, 'আমি অবশ্য তোদের অনেক পরে বিয়ে করেছি, বলতে পারিস একটু বুড়ো বয়সেই। মনে একটা ভয় ছিল বরাবর, এ বয়েসে বিয়ে করে হয়তো আর-একজনকে কষ্ট দেব—কিন্তু'…

'কিন্তু' বলে কথাটা আর শেষ করলো না উষাপতি। আত্মতৃপ্তির এক বাঙময় হাসিতে আবার ভরে উঠলো উষাপতির মুখ। সে-হাসি গোপন করতে চেষ্টা করলো না উষাপতি।

বললাম, 'তাহলে বিয়ে করে খুব সুখী হয়েছিস বল্—বিয়ে করবো না বলে যে রকম পণ করেছিলি তুই—'

উষাপতি আবার হাসলো। বললে, 'সুখী?…তবে আমি মিলিকে বলেছিলাম বি. এ. পরীক্ষাটা দিয়ে দিতে, কারণ বরাবর ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করে এসেছে—শেষকালে আমাকে না দোষ দেয় যে, তোমার জন্যে আমার ডিগ্রীটা পাওয়া হল না। তা কী বলে জানিস—?'

বললাম, 'কী বলেন?'

'মিলি বলে…'

কিন্তু মিলি কী যে বলে তা আর বলা হল না। হঠাৎ ল্যাজ নাড়তে নাড়তে একটা বিলিতী টেরিয়ার কুকুর এসে আপ্যায়ন জানাতে লাগলো উষাপতিকে। উষাপতি বললে, 'আরে, তুই ঠিক টের পেয়েছিস দেখছি।'

বললাম, 'তুই আবার কুকুর পুষেছিস নাকি?'

'আরে আমি পুষতে যাবো কেন? মিলির। মিলির ছোটবেলাকার কুকুর, বিয়ের পর এ-ও এসেছে সঙ্গে…যাক্‌গে যে-কথা বলেছিলাম—'বলে উষাপতি আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এল।

গলা নিচু করে হাসতে হাসতে বললে, 'কালকে আমাদের বিয়ের বার্ষিকী গেছে কিনা—খুব খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল, কুকুরটা খুব খুশি আছে তাই, তা সেই উপলক্ষে হীরে-বসানো নেকলেস একটা দিয়েছি ভাই মিলিকে—আনিয়েছি কলকাতা থেকে। তুই একবার দেখিস তো—বেটারা ঠকালো, না ঠিক দাম নিয়েছে।'

বললাম, 'কত দাম নিলে ?'

'চোদ্দ শো টাকা নিয়েছে অবশ্য, তা নিকগে, সে জন্যে কিছু নয়। উপরি পয়সা ওয়াগন পিছু কিছু-কিছু পাওয়া যায়, কোলিয়ারী যদ্দিন আছে ভাই, টাকার অভাবটা নেই তদ্দিন। তারপরে যদি বদলি করে কখনও কোনো খারাপ স্টেশনে তখন দেখা যাবে—'

কথা বলতে বলতে উষাপতির বাঙলোর সামনে এসে গিয়েছিলাম। উষাপতির আভাস পেয়ে বুঝি তার স্ত্রীও এসে দাঁড়ালো সামনে। আমাকে অবশ্য আশাই করছিল। কারণ আমার স্যুটকেস, বিছানা আগেই পেঁছে গেছে এখানে।

কিন্তু উষাপতির স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন থমকে গেলাম। আমাকে দেখে যেন কালো হয়ে এল তাঁর মুখখানা।

তবে এক মুহূর্তের জন্যে। এমন কিছু নজরে পড়বার মতো নয়।

উষাপতি এগিয়ে গিয়ে বললে, এই দেখো, কাকে এনেছি। আমাদের দলের হীরো এ—আর ইনি—'

আলাপ হল। এবার হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন মিলিদেবী। টেবিলে গিয়ে বসলাম। চায়ের সরঞ্জাম তৈরি ছিল।

চা তুলে নিয়ে উষাপতি বললে, 'কিন্তু ও কী বলছে জানো, ও নাকি কালই চলে যাবে।'

মিলিদেবী হঠাৎ অবাক্ হয়ে আমার দিকে চাইলেন, 'সে কী ? তা বললে শুনছি না, কাল আপনার যাওয়া চলবে না।'

উষাপতি বললে, 'এখন তোমার হাতে ভার দিয়ে দিলাম—আমার আর কিছু করবার নেই। যা ভালো বোঝ করো।'

মিলিদেবী হাসতে হাসতে বললেন, 'তাই নাকি ?'

বললাম, 'ক্ষমা করবেন এবার। পরের বার বরং থাকবো যতদিন বলেন, এবারে বিশেষ জরুরী কাজে—'

মিলিদেবী বললেন, 'বাড়িতে যখন আমার এলাকার মধ্যে এসেছেন, তখন আপনাকে দু'দিন থেকে যেতেই হবে···আমরা বিদেশে পড়ে থাকি, একটু বুঝি দয়া-মায়া নেই আপনাদের।'

উষাপতি হাসতে লাগলো।

হাসতে লাগলাম আমিও।

মিলিদেবীও হাসতে লাগলেন।

কথা বলতে বলতে উষাপতি হঠাৎ বললে, 'তোমার নেকলেসটা দাও তো একবার, দেখাই।'

বললাম, 'আমি তো এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি বেশ—ও'র গলাতেই তো মানাচ্ছে ভালো। কেন আর—'

উষাপতি বললে, 'না না, তা কি হয়। হারটা খুলে দাও—বেটারা ঠকালো কিনা জেনে নেওয়া ভালো। এ আমাদের ভালো সমঝদার একজন, ওদের ফ্যামিলিতে এ-সব জিনিস আছে অনেক।'

মিলিদেবী নেকলেসটা খুললেন। বেশ চমৎকার জিনিসটা মনে হল। দেখে মনে হল, ন্যায্য দামই নিয়েছে। নতুন ডিজাইনের জড়োয়ার কাজ করা হার। ঠিক লকেটের ওপর একটা দু'রতির হীরে জ্বলজ্বল করছে।

হারটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, 'বড় সুন্দর জিনিস—আপনার পছন্দ আছে বৌদি।'

মিলিদেবী খানিক পরে চলে যাবার পর উষাপতি বললে, 'বেশি বয়েসে বিয়ে করলে এই সব গুনোগার দিতে হয় ভাই।'

বললাম, 'কেন? এ কথা বলছিস কেন?'

উষাপতি সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কী একটা কাজে পাশের ঘরে চলে গেল। আমিও এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে লাগলাম। বড়লোক হয়েছে উষাপতি এখন। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছে। শুধু সুন্দরী স্ত্রী নয়, সুশিক্ষিতা বিদুষী বলা চলে। হয়তো উষাপতি নিজের ঐশ্বর্য দেখাতেই আমাকে এতবার আসতে নিমন্ত্রণ করেছিল। তবু খুশি হলাম দেখে যে, তার জীবন সার্থক হয়েছে। বিয়ে করে সুখী হয়েছে সে। বাপ-মা-মরা উষাপতি। বড় গরীব ছিল আমাদের দলের মধ্যে। বরাবর ওর উচ্চাশা, একদিন আমাদের সমান পর্যায়ে এসে দাঁড়াবে। এতদিন পরে তা সফল হয়েছে। দেখে আনন্দই হল।

অনেকদিন আগেকার কথা। ভালো করে সব মনে নেই। শুধু মনে আছে বেশ আনন্দে, হাসিতে, গল্পে কেটে গেল সে-সন্ধ্যেটা। আরো মনে আছে বার বার মিলিদেবী কেবল বলেছেন, 'কাল আপনার যাওয়া হবে না তা বলে, আর একটা দিন থাকতেই হবে।'

সেই রাত্রেই ঘটনাটা ঘটলো।

ঠিক কত রাত্রে বলতে পারবো না। নতুন জায়গায় ঘুম আসছিল না। মনে হল ভেজানো দরজাটা খুলে কে যেন ঘরে ঢুকলো। নিস্তব্ধ রাত। শুধু মাঝে মাঝে রেলের ইঞ্জিনের ফোঁসফোঁসানি আক্রোশের গর্জন কানে আসে।

বললাম, 'কে?'

ছায়ামূর্তি বললে, 'আমি—'

বিছানার ওপর সটান উঠে বসেছি। অস্পষ্ট হলেও অনুমান করে নিতে কষ্ট হল না?

বললাম, 'আপনি। হঠাৎ?'

মিলিদেবী বলে উঠলেন, 'আপনি এখানে আসতে পারেন হঠাৎ, আর আমি আসতে পারি না? এ আমার বাড়ি, আমার স্বামীর ঘর, আমি এখানে খুব সুখে ছিলাম—কেন তুমি এলে? বলো, সত্যি কথা বলো—কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে?'

হতচকিত নির্বাক বিস্ময়ে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এল।

বললাম, 'কী বলছেন আপনি!'

'চীৎকার করো না, পাশের ঘরে আমার স্বামী শুয়ে আছেন। তুমি ললিতকে বোলো, মিলি তাকে ভুলে গেছে। কাঁসারিপাড়া লেন-এর সে-বাড়িটা সে-ঘরটা আমার আর মনে নেই, আমি এখন মিলি মল্লিক—আমি এখন পরস্ত্রী।'

আবার বললাম, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'মিথ্যে কথা বলো না, আমি তোমাদের সবাইকে চিনি। ললিত তোমার ভাগ্নে নয়। বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিক্‌নিক্‌ করতে আমাদের সঙ্গে যাওনি তুমি? ইণ্টারমিডিয়েট টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে ট্যাক্সি করে কারা ঘুরিয়েছিল আমাকে। আমরা গরীব ছিলুম, তাই তোমাদের সাহায্য আমরা তখন নিয়েছি। কিন্তু এখন তো আমি বড়লোকের স্ত্রী। এখন তোমাদের প্রয়োজন আমার মিটে গেছে। এখন শাড়ি দিতে এলেও নেব না, গয়না দিতে এলেও নেব না আমি, সিনেমা দেখাতে এলেও যাবো না তোমাদের সঙ্গে—কেন এসেছ তুমি? একজনকে পাগল করে দিয়েছ বলে ভেবেছ আমাকেও করবে? সত্যি বলো তো, কিছু মনে পড়ছে না?'

ললিত নামে কোনো ভাগ্নে দূরে থাক, ও নামের কোনো বন্ধুও আমার কোনও কালে ছিল না। কী জানি কী খেয়াল হল, বললাম, 'পড়েছে।'

'ললিত তোমায় পাঠিয়েছে? সত্যি কি না বলো?'

এবারও বললাম, 'হ্যাঁ।'

'আমি তোমাদের সকলকে চিনি, জানতাম না আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব আছে—কিন্তু তোমাদের পায়ে পড়ি, আর কখনও এসো না এখানে, যাও, কাল সকালেই চলে যেয়ো এখান থেকে—বুঝলে?'

বললাম, 'যাবো।'

'হ্যাঁ, তাই যেয়ো।'

শরীরটাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মিলিদেবী যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন।

তারপর সমস্ত রাত আমার আর ঘুম এল না। মনে হল—কার ভুল? আমার, না, মিলিদেবীর? আর কখনো কোথাও ওকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। কে ললিত। কার ভাগ্নে। কবে কার সঙ্গে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঘুরেছেন। কবে ঘুরে বেড়িয়েছেন ট্যাক্সিতে। আমার চেহারার সঙ্গে কি

অন্য কারো চেহারার বা নামের মিল আছে? নিজের স্মৃতির অলি-গলি-ঘুঁজি সমস্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো কিনারা করতে পারিনি।

ভোরবেলাই বিছানা ছেড়ে উঠেছি।

উষাপতি তারও আগে উঠেছে। চায়ের টেবিলে পোশাক পরে তৈরি সে। এখনি বোধহয় ডিউটিতে যাবে। পাশে কালকের মতো মিলিদেবীও বসে। কিন্তু চেহারার মধ্যে কোনো বৈলক্ষণ্য নেই যেন।

উষাপতি আমাকে দেখেই বললে, 'কাল রাত্রে তোর ঘুম হয়নি নাকি? এরকম চেহারা কেন রে?'

বললাম, 'না, নতুন জায়গা বলে হয়তো।'

উষাপতি বললে, 'আমারও হয়নি।'

জিগ্যেস করলাম, 'কেন?'

উষাপতি বললো, 'সতী কাল রাত্রে বড় বিরক্ত করেছে।'

'সতী! সতী কে?' জিগ্যেস করলাম।

মিলিদেবী চা ঢালতে ঢালতে বললেন, 'আমার দিদি।'

উষাপতি বললে, 'হ্যাঁ, মিলির দিদি। মাথাটা সম্প্রতি খারাপ হয়েছে, পাগলের মতো লক্ষণ, আমার এখানেই রয়েছে এখন।'

হঠাৎ যেন কেমন সন্দেহ হল। মিলিদেবীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। শান্ত, পরিতৃপ্ত, স্নিগ্ধ দৃষ্টি। কাল রাত্রে তবে কি ভুল দেখেছি! পাগলের প্রলাপ শুনেছি কেবল?

উষাপতি আবার বললে, 'মাঝে মাঝে বেশ থাকে, কাল রাত থেকে আবার হঠাৎ কিরকম মাথাটা বিগড়ে গেছে—সারা বাড়িময় ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে, চিৎকার করেছে, বকেছে—কেঁদেছে—'

উষাপতি আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখালে। একটা ঘরের ভেতরে বন্ধ। অবিকল মিলিদেবীর মতো দেখতে। বয়সে দু'এক বছরের ছোট-বড় হয়তো। ঘরের মধ্যে আপন মনেই বিড়বিড় করে বকছে।

উষাপতি বললে, 'এখন ওইরকম কিছুদিন থাকবে, তারপর আবার কিছুদিন ভালো হয়ে যাবে—স্বামী নেয় না, তারপর থেকেই···কিন্তু তুই আজকে থাকছিস তো?'

বললাম, 'না ভাই, আজ পারবো না থাকতে।'

উষাপতি মিলির দিকে চেয়ে বললে, 'ও কী বলছে শোনো—থাকবে না নাকি আজ।'

মিলিদেবী তেমনি স্নিগ্ধ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'তা হবে না, থাকতেই হবে কিন্তু—'

চা খেতে খেতে হঠাৎ উষাপতি একবার স্ত্রীর দিকে কৌতূহলী হয়ে যেন কী দেখতে লাগলো। কাছে গিয়ে গলার নেকলেসটা দেখে বললে, 'একি? তোমার লকেটের হীরে কোথায় গেল?'

'কই দেখি? কী সর্বনাশ!'

আমিও দেখলাম।

মিলিদেবীও নেকলেসটা খুলে দেখে অবাক্ হয়ে গেছেন। তাই তো! কাল সন্ধ্যেবেলাও তো ছিল সেটা! কোথায় গেল একরাত্রের মধ্যে। খোঁজো তো বিছানাটা। বিছানাটা খোঁজা হল। খোঁজা হল ঘর-দোর। এখানে-ওখানে। ব্যস্ত হয়ে পড়লো উষাপতি। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মিলিদেবী। কোথাও তো যাওনি? দেখো তো বাথরুমটা! যাবে কোথায়? হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে না। শোবার ঘর, হল ঘর, আর নয়তো বাথরুম!

কিন্তু বৃথা চেষ্টা!, সেদিন কোথাও সেই দু'রতি ওজনের হীরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। উষাপতি আর মিলিদেবীর কাছে আজ পর্যন্ত সেটা নিরুদ্দেশ হয়েই আছে হয়তো।

মনে আছে সেদিন কারো অনুরোধ উপরোধ না-শুনেই চলে এসেছিলাম পলাশপুর থেকে।

ফিরে এসে গল্পটা সমস্ত লিখে পাঠিয়েছিলাম উষাপতির কাছে। আপত্তির কিছু আছে কি না জানতে। উত্তরে উষাপতি লিখেছিল, 'মিলিও তোর গল্পটা মন দিয়ে পড়েছে। বলেছে,—গল্পটা ভালো হয়েছে, কিন্তু যেন অসম্পূর্ণ মনে হল লেখাটা। দু'রতি হীরের কথাটা গল্পের পক্ষে অবান্তর হয়ে গেছে নাকি। গল্পের সঙ্গে ওর যোগাযোগ কী বোঝা গেল না, আমি অবশ্য সাহিত্যের কী-ই বা বুঝি—যা হোক সেই হীরেটা এখনও পাওয়া যায়নি, পাওয়া যাবেও না বোধহয়।'

আজ এক-একবার ভাবি, মিলিদেবীকে চিঠি একটা লিখবো নাকি! লিখবো নাকি হীরেটা আমার কাছেই আছে। জানিয়ে দেব নাকি যে সেদিন ভোরবেলা নিজের বিছানাটা বাঁধবার সময় আমার শোবার ঘরেই সেটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম আমি! সেই দু'রতি ওজনের হীরেটা। কিন্তু আবার ভাবি, থাক্ না। উষাপতি স্ত্রী নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করছে। ওদের সংসারে আগুন জেলে লাভ কি! আমার এ গল্প যদি অসম্পূর্ণ থাকে ত থাক—আমি জীবনে আরো অনেক সম্পূর্ণ গল্প লিখতে পারবো, কিন্তু ওরা সুখে থাকুক। আমার একটা সামান্য গল্পের চেয়ে ওদের জীবন যে অনেক দামী।

আজো পলাশপুরের মিলি মল্লিকের গল্পটা আমার নোট-খাতাতেই বন্দী হয়ে আছে। আমি লিখিনি। ও আমি লিখবোও না। মিষ্টিদিদি, কালোজামদিদি, মিছরিবৌদি সকলের গল্পের মতো ও আমার জীবনের শুধু সঞ্চয়ই মাত্র হয়ে থাক। ওর চেয়ে মহৎ কিছু লিখবো। মহত্তর, শ্রেষ্ঠতর কিছু। ওদের অতিক্রম করে নারীত্বের আরো বড় সত্তাকে দেখবো আমি। নারীর অন্তরাত্মাকে আমি খুঁজবো। আমার নবজন্মের উদ্যোগপর্বে সেই হবে একমাত্র উদ্দেশ্য। আমার দশ বছরের অজ্ঞাতবাস তবেই হবে সার্থক।

বিলাসপুরে চলে যাবার আগে সোনাদিকে আমি সেই কথাই দিয়েছিলাম।

আমার প্রতিজ্ঞা আমি রেখেছি। কিন্তু বিলাসপুরে যাবার আগে আমি কি জানতাম এমন হবে।

মনে আছে বিলাসপুরের সেই জীবন। কোনও কাজ নেই, শুধু চুপ করে দেখা আর শোনা। কেবল ট্রেনে চড়ে ঘুরে বেড়াই। কখনো জব্বলপুর, কখনো কাটনী, কখনো অনুপপুর। কত সব অখ্যাত ইস্টেশান। জঙ্গল, পাহাড় আর বিচিত্র সব মানুষ। মহেন্দ্রগড়, চিরিমিরি, নাইনপুর, গণ্ডিয়া, বালাঘাট। অমরকণ্টক রেঞ্জ ধরে রেললাইন চলেছে। পেণ্ড্রা রোড। কখনো চড়ি গার্ড সাহেবের ব্রেকভ্যানে। কখনো আইস-ভেণ্ডারদের থার্ড-ক্লাস কামরায়। আবার দরকার হলে কখনো ফারস্ট ক্লাস কামরার নির্জনে। সে-এক বিচিত্র চাকরি, বিচিত্র জীবন। নিজেকে বড় নগণ্য মনে হল এই পৃথিবীর ভিড়ে। প্রথম উপলব্ধি হল, পৃথিবীটা শুধু কলকাতাই নয়। এ-পৃথিবী আরো অনেক বড়। এ ম্যাপ দেখে পৃথিবী দেখা নয়। মানুষ যত বড়ই হোক, মনে হল বিশাল বিশ্ব-প্রকৃতির কাছে সে তুচ্ছ। বড় স্বস্তি পেলাম। নিজের আমাকে আমার মধ্যে খুঁজে পেলাম। সোনাদির কথাই সত্যি মনে হল। সোনাদি বলতো, 'বস্তুকে দেখবিনে, সত্যকে দেখবি। বাচ্ছা পাখির যেমন চোখ ফোটার আগেই আলো দেখবার জন্যে বাসনা হয়, কাকে বলে আলো তা সে জানে না তখনও, তবু তার বোজা চোখের মধ্যেও সেই আলোর সত্যটা প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে—তেমনি করেই তোর জীবনে সব দেখা সত্যি হোক।'

সোনাদি আরো বলতো, 'জীবনে সুখ নেই বলে দুঃখ করিস নে। জীবনকে তার সমস্ত সুখ-দুঃখ, সমস্ত ক্ষয়-ক্ষতি, সমস্ত উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে যেন ভালোবাসতে পারিস এমন শক্তি পাওয়া চাই।'

আরো কত কী কথা কতদিন বলেছে, সব কি আজ মনে আছে।

একদিন জিগ্যেস করেছিলাম, 'তুমি নিজে কোনোদিন লিখেছ, সোনাদি?'

আমার যেন কেমন মনে হত সোনাদিও এককালে লেখার চেষ্টা করেছে, নইলে এত কথা জানলে কী করে। আমি লিখি বলে কেন এত খাতির করে।

সোনাদি বললে, 'দূর, আমি লিখতে যাবো কেন।'

বললাম, 'তবে যে তুমি এত কথা জানো। কে তোমায় শেখালে?'

সোনাদি বলতো, 'সব আমার বাবার কাছে শোনা, বাবাকে তুই দেখিসনি, দেখলে বুঝতে পারতিস কী অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁর। আমার বাবাও লিখতেন।'

জিগ্যেস করেছিলাম, 'কি লিখতেন, গল্প?'

সোনাদি বলেছিল, 'বাবা ছিলেন কিষেণগড়ের দেওয়ান। মনে আছে, ঢালু ডেস্কের ওপর কাগজ নিয়ে দিনরাত লিখে চলেছেন—শুধু কি গল্প? উপন্যাস, ইতিহাস, সাহিত্য—কী নয়?'

'সে-সব বই কী হল?'

'সে-সব আর ছাপা হয়নি, বাবা ছাপতে দিতেন না। কিন্তু আমি তো

পড়েছি, ছাপলে সে-বই নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত বাজারে। কিন্তু বাবার ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—তিনি লিখবেন, কিন্তু ছাপা হবে না। হয়ত ছাপাও হত, কিষেণগড়ের দেওয়ানের লেখা ছাপাবার জন্যে রাজার ছাপাখানা সব সময়ই খোলা ছিল। রাজাও বলেছিলেন বাবাকে। আমিও বলেছিলাম। বাবা রাজী হতেন না, বলতেন,—লিখি আমার আত্মবোধের জন্যে, আত্মপ্রকাশের জন্যে নয়—'

সত্যিই বিলাসপুরে সমস্ত দেখে শুনে আমার তাই মনে হত আত্মবোধ না হলে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা বুঝি বিড়ম্বনা। এতদিন যেন সেই বিড়ম্বনাই করে এসেছি। জগতকে না দেখে এতদিন শুধু বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটারি দেখেছি। যার আত্মবোধ হয়েছে, জীবন তার কাছে কত সহজ রূপে ধরা দিয়েছে। যে আত্মরূপ দেখেছে সে বিশ্বরূপ দর্শন করেছে। সেখানে তর্ক-বিতর্ক নয়, বিজ্ঞান নয়, দর্শন হয়—সে একটি একের সম্পূর্ণতা, অখণ্ডতার পরিব্যাপ্তি। তার বাহিরও মিলেছে অন্তরও মিলেছে। অন্তর-বাহির, আপন-পর, ভেদ-অভেদ একাকার, একীভূত, একাত্ম হয়ে গেছে তার কাছে।

মনে হত সোনাদি আত্মবোধের দীক্ষা বাবার কাছেই পেয়েছে বুঝি!

তারপর একে একে সবাই ভুলে গেল আমাকে। আমি যে একদিন লিখেছি, তা কয়েক বছর পরে আর কারো মনে থাকবার কথা নয়। আমার লেখক-জীবনের মৃত্যু হল। আমার মুক্তি হল। শুধু একজন ভোলেননি। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক মাঝে মাঝে চিঠি দিতেন। লেখা চাইতেন। লিখতেন, 'বিলাসপুরে গিয়ে বিলাসী হয়ে গেলেন নাকি!' আমি কখনও সে-চিঠির উত্তর দিয়েছি, কখনও দেইনি।

একদিন সোনাদি চিঠি লিখলেন, 'তুই যে লিখছিস আবার, এখনো যে দশ বছর কাটেনি তোর—'

কিন্তু কই, আমি তো লিখিনি। কিন্তু আমার একজন প্রতিবেশীই আমার ভুল ধরিয়ে দিলেন—

বললেন, 'দেশ' পত্রিকায় আপনার একটা লেখা পড়লাম, বড় ভালো লাগলো।'

বড় লজ্জায় পড়লাম। সত্যি পত্রিকা খুলে দেখি আমিই লিখেছি। সে যে কী লজ্জা কী বলবো। সম্পাদককে চিঠি লিখলাম, 'এ কার লেখা ছাপিয়েছেন আমার নাম দিয়ে?'

তখনো কি জানি এ কেন হল!

সম্পাদক ভয় দেখিয়ে লিখলেন, 'আপনি যদি না লেখেন তো আরো লেখা আপনার নামে ছাপা হবে—'

কিন্তু কেমন করে প্রকাশ করবো—আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সোনাদিকে যে আমি কথা দিয়েছি। দৌড়ে এলাম কলকাতায়। মনে আছে হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা সোনাদির বাড়ি গিয়ে হাজির। কিন্তু এই ক'বছরে এবাড়ির

ভেতর-বাইরে যে এমন পরিবর্তন হয়ে গেছে তা তো টের পাইনি। বাড়ির বাইরে বাগানে সে-বাহার নেই। নেই সেই ঘাসের কেয়ারি। নেই যত্ন-লালিত সেই ফুলের বাগান।

সোনাদির ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই কেমন ফাঁকা লাগলো সব। সোনাদির সেই আলমারি-ভর্তি বইগুলোর ওপর ধুলো জমেছে। বিছানাটা তেমনি রয়েছে পাশে। সোনাদির বড় মেয়ে পুটু শুয়ে রয়েছে তার ওপর। আর সোনাদির সেই ইজি-চেয়ারটা ফাঁকা। রোজকার মতো সেই পরিচিত দৃশ্য আর নেই এখানে।

অভিলাষ দেখতে পেয়েছে আমাকে।

জিগ্যেস করলাম, 'সোনাদি কোথায় অভিলাষ?'

অভিলাষ বললে, 'মা তো রান্নাঘরে।'

রান্নাঘরে! শুনে অবাক্ হলাম। দাশসাহেবের বাড়িতে সোনাদিকে কখনও রান্নাঘরে যেতে দেখিনি। দাশসাহেবের খানসামা বাবুর্চি ছিল। আবার ঠাকুর-চাকরেরও ব্যবস্থা ছিল সোনাদির জন্যে। সোনাদি দু'জনের হাতের রান্নাই খেয়েছে। পার্টিতে যখন বড় বড় ঘরের বউরা মেয়েরা আসতো, সোনাদিকে তাদের সঙ্গে সমান তালে ইংরেজী খানা খেতে দেখেছি, ইংরেজী কেতায় চলতে দেখেছি। শাড়িতে, গয়নায়, কেতা-দুরস্তে সে যেন এক অন্য সোনাদি, আবার যেদিন স্বামীনাথবাবুর বৌবাজারের বাসায় অল্প-পরিসর রান্নাঘরের মধ্যে মাটির হাঁড়িতে ভাত রাঁধতে দেখেছি সে-ও এই একই সোনাদি। অথচ সোনাদিকে আমি চিনেছি বলেই সোনাদির চরিত্রের বৈচিত্র্যের মধ্যে কোনও বিরুদ্ধতা পাইনি। কিন্তু দাশসাহেবের বাড়িতে এমনিভাবে এমন সময় রান্নাঘরে যাওয়ার ঘটনা সত্যিই চমকে দেওয়ার মতো।

মাঝখানে বিলাসপুর থেকে যখন আর একদিন কলকাতায় এসেছিলাম, সেদিনও এমন ছিল না।

শুনেছিলাম, দাশসাহেব চাকরি ছেড়ে দিয়ে এক ব্যাংক খুলেছেন, ব্যাংকের মালিক হয়েছেন। ব্যাংকও খুব ভালো চলেছে।

মনে আছে সে-এক ছুটির দিন। দাশসাহেব পাশে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন, আর পাশের বিছানায় হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছেন স্বামীনাথবাবু। তখনও পুটুর অসুখ ভালো হয়নি। রতি আর শিশু খেলা করছে বারান্দায়।

দাশসাহেব মুখ তুলে বললেন, 'দেখো সোনা, কে এসেছে?'

স্বামীনাথবাবু উঁচু হলেন।—'কী খবর হে?'

আমি দু'জনকেই নমস্কার করলাম।

সোনাদি আমাকে একেবারে পাশে বসালে টেনে। বললে, 'কেমন আছিস?'

দাশসাহেব বললেন, 'ও একটু রোগা হয়ে গেছে, না সোনা?'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'তুমি আমাকে দেখে অবাক্ হয়ে গেছ, না?'

বললাম, 'তখন শুনেছিলাম আপনি বেশিদিন থাকবেন না?'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'যাওয়ারই তো সব ঠিক ছিল ভাই, ওই দেখো না, দাশসাহেব যেতে দিলেন না।'

দাশসাহেব বললেন, 'অনেকদিন তো চাকরি করলেন আপনি, বিশ্রাম তো করেননি কখনও। একটু না-হয় দিন কতক বিশ্রামই নিলেন।'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'আপনার নিজের ব্যাংক, আপনি বিশ্রাম নিতে পারেন, আমার হল পরের চাকরি।'

মনে আছে তারপর চা নিয়ে এল অভিলাষ।

দাশসাহেবকে সোনাদির সামনে যেমন দেখতাম, তাঁর ব্যাংকে আবার ছিল অন্যরকম চেহারা। বিরাট ব্যাংক। বড়সাহেব বলতে ভয়ে কাঁপতো সবাই। দরজা-বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে মাঝে মাঝে ঘণ্টার শব্দ হত আর চাপরাশি মহলে ছুটোছুটির পালা পড়ে যেত। সবাই তটস্থ। সে আমি দেখেছি। আর স্বামীনাথবাবুর অফিস আমি দেখিনি, তবে শুনেছি সোনাদির কাছে। সোনাদি বলতো, 'অফিসে গেলে বাড়ির কথা মনে থাকে না ওঁর, আর বাড়িতে এলেও আবার অফিসের কথা ভুলে যান—এমনি মানুষ—'

কিন্তু স্বামীনাথবাবুকে দেখে বোঝা যেত না, অতবড় অফিসটা উনি চালান কী করে। সেই স্বামীনাথবাবুর নিজের হাতে রাঁধবার দৃশ্যটা যেন ভুলতে পারি না। আর দাশসাহেবের নতুন ছোট শোবার ঘরটায় গিয়েও দেখেছি। স্বামীনাথবাবুকে নিজের ঘরটা ছেড়ে দেবার পর এই ঘরটায় দাশসাহেবের থাকবার ব্যবস্থা হল। গোছান হল খাট, বিছানা, বই, কাগজ, ফাইল। আর দেয়ালে টাঙানো হল সব ছবি। সবচেয়ে বড় ছবিটা ছিল মধ্যেখানের দেয়ালে। ছবিতে পাশাপাশি বসে আছেন দাশসাহেব আর সোনাদি। আর রতি আর শিশু। ছবিটা অনেকক্ষণ ধরে দেখেছি। মনে হয়েছে ছবিটা দেখে যে-কেউ সোনাদিকে দাশসাহেবের স্ত্রী বলেই ভাববে। কিন্তু যারা সোনাদির সঙ্গে মিশেছে তারা জানে, অতবড় ভুল সোনাদির শত্রুও যদি কেউ থাকে তো তারাও করবে না।

কিন্তু অবাক্ হয়েছিলাম আর-একটা ছবি দেখে। সেটা টাঙানো ছিল স্বামীনাথবাবুর ঘরে। সেটাতেও সোনাদি বসে আছে স্বামীনাথবাবুর পাশে, আর সোনাদির পাশে পাঁচ বছরের ছোট মেয়ে পুটু। দু'টো ছবিতেই সোনাদি যেন স্ত্রী হয়ে বসে আছে। একই মুখের ভাব, একই চোখের দৃষ্টি, কোথাও কোনো তারতম্য নেই তার।

কিন্তু এবার এ-বাড়িতে পা দিয়ে যেন সব বদলে গেছে মনে হল।

মনে হল, যেখানে যা থাকবার সে যেন নেই।

সোনাদি দাশসাহেবের রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রান্না করছিল।

আমাকে দেখেই হাসিমুখে বললে, 'কী রে, তোর সোনাদিকে মনে পড়লো।'

বললাম, 'কেমন আছো, সোনাদি?'

'ভালোই তো আছি, কেন, কী রকম দেখছিস?'

ভালো করে সোনাদিকে চেয়ে দেখলাম। কোথাও ও-চেহারার কিছু পরিবর্তন হয়েছে কি। মুখের হাসির ভাষা কি কিছু কম মুখর, চোখের দৃষ্টির রং কিছু কম উজ্জ্বল। কোথাও তো টের পাচ্ছি না। সোনাদি উনুনের ডেক্‌চি নামিয়ে কড়া তুললে।

খানিক পরে বললাম, 'সোনাদি, তুমি রাঁধছ ?'

'কেন আমি রাঁধতে পারিনে ?' বলে উনুনের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল সোনাদি।

তবু যেন আমার ভয় গেল না।

বললাম, 'সত্যি বলো না, কী হয়েছে ?'

'হবে আবার কী রে, পাগল ছেলে।'

'কিছু হয়নি—সত্যি? তবে খানসামা, বাবুর্চি, পীরালি, সুখ সিং, ঝি-রা, বামুনঠাকুর সব কোথায় গেল, কাউকে দেখতে পাচ্ছিনে যে।'

'ও, তাই বলছিস। তাদের তো ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন ?'

'কেন আবার, দাশসাহেবের ব্যাংক যে ফেল্‌ হয়েছে, শুনিস নি ?'

আমি যেন ভুল শুনছি। আমার মনে হল যেন স্বপ্ন দেখছি চোখ মেলে।

সোনাদি আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'ট্রেন থেকে নেমে সোজা আসছিস নাকি।'

আমি কিছু উত্তর দিতে পারলাম না।

আবার জিগ্যেস করলাম, 'তাহলে কী হবে সোনাদি ?'

'কী আবার হবে ?' বলে সোনাদি আপন মনে রান্নাই করতে লাগলো।

বললাম, 'সোনাদি, কথা বলো না ?'

সোনাদি আমার পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। তারপর তেমনি রান্না করতে করতেই বললে, 'কী কথা বলবো, বল ?'

মনে আছে এখনও, কী ভীষণ সে দিন ক'টা। দাশসাহেব নিজের বিছানায় চুপ করে শুয়ে আছেন। মুখে কোনো কথা নেই। টেলিফোনের পর টেলিফোন আসছে। কত লোক আসছে দেখা করতে, কারো সঙ্গে দেখা করছেন না দাশসাহেব। অভিলাষ বলতো, 'দেখা হবে না দাশসাহেবের সঙ্গে, সাহেবের অসুখ।'

তারপর কত কী ঘটলো। সে কী ভীষণ অসুখ দাশসাহেবের। ব্লাডপ্রেসার ছিলই, তারপর কেমন হল, আর বিছানা ছেড়ে উঠে বসতে পারেন না। সোনাদি তার ওই দুর্বল শরীর নিয়ে পাশে বসে চামচে করে খাইয়ে দেয়। বলে 'এইটুকু খেয়ে নাও—'

দাশসাহেব চুপ করে খেয়ে নেন। কিছু কথা বেরোয় না তাঁর মুখ দিয়ে। চুপ করে সব দেখেন। চোখের সামনে একে একে সকলকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল।

অভিলাষকে ডেকে সোনাদি বললে, 'অভিলাষ, সাহেবের অবস্থা তো দেখছ,

তোমাকে মাইনে দিতে পারবো কিনা বুঝতে পারছি না।'

অভিলাষ তবু যেতে চায় না। বলে, 'অনেক নুন খেয়েছি সাহেবের, আমাকে আর তাড়িয়ে দেবেন না, মা।'

রতি আর শিশুও একদিন ইস্কুল ছেড়ে চলে এল। সেখানেও গঞ্জনা শুনতে হবে সকলের কাছে। খবরের কাগজেও খবরটা বেরিয়ে গেছে। এক হাজার দু-হাজার টাকার ব্যাপার নয়, লাখ লাখ টাকার কারবার। সব বন্ধ। সোনাদি রান্নাবান্না সেরে রতি আর শিশুকে নিয়ে পড়াতে বসে। বলে, 'এবার থেকে আমি নিজেই তোমাদের পড়াবো।'

আমি চুপ করে শুনি, দেখি সব। কী চমৎকার সোনাদির পড়ানো। কী চমৎকার সোনাদির ইংরিজী উচ্চারণ। আর সেই হাসিমুখ। সেই হাসিমুখেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সোনাদির সংসারের কাজ। কাজ করতে ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই। টেলিফোনের লাইনটা একদিন এসে কেটে দিয়ে গেল কোম্পানির লোকেরা। মোটরগাড়িটা ক্রোক্ করে নিলে। পুলিশ দাশসাহেবকে কী সব জিগ্যেস করলে। অ্যারেস্ট করে জামিনে খালাস করে দিয়ে গেল। সমস্ত জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করে নিলে। নিঃস্ব নিরাভরণ বাড়িঘর। সোনাদি একটা একটা করে গয়না খুলে দিতে লাগলো। শুধু সোনাদি আর অভিলাষ। আর তিনটি শিশু—দাশসাহেব, রতি আর শিশু।

আমি এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলাম, আরো একমাস বাড়িয়ে ছুটির দরখাস্ত করে দিলাম।

আমি জিগ্যেস করতাম, 'কতদিন এমনি করে চলবে, সোনাদি?'

সোনাদি তেমনি হাসতো। বলতো, 'চালাবার মালিক কি আমি, আমায় যে জিগ্যেস করছিস?'

'তোমাকে জিগ্যেস করবো না তো কাকে জিগ্যেস করবো আমি?'

সোনাদি দাশসাহেবের ভাত বাড়তে বাড়তে বলতো, 'এতদিন যেমন করে চলেছে, তেমনি করেই চলবে।'

ওদিকে পুলিস আসে, লোকজন আসে, সোনাদি তাদের সঙ্গে কথা বলে। কী স্পষ্ট, কী ভদ্র, কী শান্ত ব্যবহার। দাশসাহেবকে আড়ালে রেখে সোনাদি এগিয়ে আসে সামনে। আড়াল করে রাখে রতিকে শিশুকে। কাউকে কিছু বুঝতে দেয় না। কিন্তু বুঝতো সবাই। আস্তে আস্তে সোনাদির সমস্ত দেহ নিরাভরণ হয়ে আসে। তবু সোনাদির মুখের হাসি তেমনি অম্লান।

মনে আছে তখনো কতদিন, যখনি অবসর হয়েছে, সোনাদি ইজি-চেয়ারে বসে আমার সঙ্গে গল্প করেছে। সেদিন সকাল-সকাল সোনাদির বাড়ি গেছি, হঠাৎ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল একটা ট্যাক্সি আর নামলেন স্বামীনাথবাবু।

সোনাদি বললেন, 'তুমি?'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'খবরের কাগজে সব দেখলাম, তা দাশসাহেব কোথায়?'

সোনাদি বললে, 'ওই ঘরে দেখো গে, শরীর খারাপ ও'র, বড় মন-খারাপ হয়ে গেছে।'

স্বামীনাথবাবু জিগ্যেস করলেন, 'কেন এমন হল হঠাৎ?'

সোনাদি বললে, 'কেন হল তা কি আমি জানি?' আগের দিনও অফিসে গেছেন, টেলিফোন করেছেন, যেমন রোজ খান তেমনি দু'শ্লাইস ব্রেড আর টোম্যাটোর সস্ খেয়েছেন, বিকেল তিনটের সময় টেলিফোন এল, বললেন, 'আমার বাড়িতে যেতে একটু দেরি হবে—'

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'তারপর—'

সে গল্প সোনাদি আমাকেও বলেছে। ডালহৌসি স্কোয়ারে লোকে লোকারণ্য। হাজার হাজার লোক ব্যাঙ্কের সামনে চীৎকার করছে। ব্যাঙ্কের কোল্যাপসিব্‌ল গেট বন্ধ করে দিয়েছে। কত লোক সেই দেয়ালের পাথরের ওপরই মাথা কুটছে। দাশসাহেব আট্‌কে পড়লেন অফিসের কামরায়। পরপর টেলিফোন করলেন সোনাদিকে।

সোনাদি টেলিফোন ধরে বললে, 'বাড়ি চলে এসো এখুনি।'

'এখন যাওয়া অসম্ভব, ওরা সমস্ত রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমাকে বেরোতে দেবে না—সমস্ত রাস্তা বন্ধ।'

সোনাদি বললে, 'আমি যাচ্ছি এখুনি, গাড়িটা পাঠিয়ে দাও।'

'তুমি এসো না সোনা, তোমাকেও এরা বাধা দেবে, আসতে দেবে না।'

'তবে আমি ট্যাক্সি করে যাচ্ছি' বলে টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে উঠলো সোনাদি।

সোনাদি বললে, 'দাশসাহেবকে কি বা'র করে আনতে পারি সেদিন, হাজার হাজার লোক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে, আমি ট্যাক্সি থামিয়ে সোজা ভিড় ঠেলে গিয়ে উঠলুম, তারপর কেমন করে যে দাশসাহেবকে নিয়ে আবার বাড়িতে এলুম, তা আমিই জানি। কিন্তু সেদিন রাত্রেই দাশসাহেব বিছানায় পড়লেন, দেখে এসো গিয়ে, আর উঠতে পারেন না, আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিতে হয়—'

তারপর সে-ক'দিন স্বামীনাথবাবু কী পরিশ্রমই করলেন। যে-ক'দিন ছিলাম সেবার, দেখেছি স্বামীনাথবাবু সারাদিন কোথায় কোথায় যান। উকীল, ব্যারিস্টার, অ্যাটর্নি, সলিসিটর। জলের মতো টাকা খরচ করেন। ঝি-চাকর যাদের ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল আবার রাখা হল। সুখ সিং আবার এসে গেট-এ দাঁড়ালো। সোনাদির পুরনো ঝি-রা আবার এল। স্বামীনাথবাবু নিজের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুললেন। সারাজীবনে যা কিছু জমিয়েছেন পুঁটুর বিয়ের জন্যে, কলকাতায় বাড়ি করবার জন্যে কয়েক হাজার টাকা আলাদা করা ছিল তা-ও সব তুলতে হল।

স্বামীনাথবাবু বললেন, 'ঠিক আগে যেমন ছিল, তেমনি চলুক, কোথাও যেন ত্রুটি না থাকে।'

আমিও উকীল ব্যারিস্টারের বাড়ি ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। একা স্বামীনাথবাবু কত পারবেন।

দাশসাহেব বিছানায় শুয়ে বললেন, 'সলিসিটররা কী বলেছে ?'

'সে সব আপনি ভাববেন না, আমি তো আছি—'

তারপর যখন সারাদিনের কাজের পর স্বামীনাথবাবু বাড়ি আসেন, তখন টেবিলে গোল হয়ে বসে আবার সভা হয়। আসর আবার জমে।

সোনাদি বলে, 'পুটু, খাচ্ছো না তো ?'

পুটু মুখ কাঁচু-মাচু করে বলে, 'ক্ষিদে পাচ্ছে না যে মা ?'

স্বামীনাথবাবু বলেন, 'আজকেও আবার পেয়ারা খেয়েছে বোধহয়!?'

সোনাদি জিগ্যেস করে, 'কতদিনের ছুটি নিলে তুমি ?'

স্বামীনাথবাবু বলেন, 'এ-ব্যাপারটা না মিটলে তো আর যেতে পারি না।'

সোনাদি আবার জিগ্যেস করে, 'নয়ন কী রকম কাজ করছে ওখানে ?'

'ও বলছিল, আর দু'টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিতে—'

'আর দুধটা দেখে নেওয়া হয় তো এখনো ?'

'সব তো শনিচরীর-মা করে, ওর ওপরেই ছেড়ে দিয়েছি।'

পুটু তো লেখাপড়া কিছু পারে না, দ্বিতীয় ভাগের বানানও সব ভুলে বসে আছে।'

'পুটুকে তুমি তোমার কাছেই রাখো এখানে।'

এক-একদিন স্বামীনাথবাবু এসে জিগ্যেস করেন, 'দাশসাহেব কেমন আছেন আজ ?'

'সেই রকমই।—কিছু সুরাহা হল ?'

স্বামীনাথবাবু জামা ছাড়তে ছাড়তে বলেন, 'সুরাহা হবে বলেই তো যেন মনে হচ্ছে এবার।'

'সলিসিটরকে কত টাকা দিলে আজ ?'

'আগে যা দিয়েছিলাম, তার পরে আজকেও আবার চেক্ দিলাম।'

'কতদিন আর চলবে কেস্ ?'

'যত বছরই লাগুক, চালিয়ে তো যেতেই হবে।'

"আর কতদিন এখানে থাকবে ?'

'ছুটি আরো বাড়িয়ে নিয়েছি, তা জব্বলপুরের বাড়িটার জন্যে একটা পার্টি এসেছিল আজ—'

'কত দর দিতে চায় ?....'

তা আমি বেশিদিন থাকতে পারিনি সেবার। দাশসাহেবের মামলা তখনও চলছে। বিলাসপুরে এসে আবার চাকরিতে যোগ দিয়েছি। সোনাদিকে চিঠি দিয়েছি। ঠিক ঠিক জবাব এসেছে প্রত্যেকবার। প্রত্যেকবারই সোনাদি লিখেছে, 'লেখার কথা ভুলে যাসনি তো ?'

লেখার কথা কি ভুলতে পারি! পাঠকরা আমাকে ভুলে গেলেও আমি ভুলিনি তাদের। যুদ্ধের বাজারে কত রকম পত্রিকা বেরোলো! কত নতুন

প্রতিভাকে নিয়ে মাতামাতি হল। আমি তবু ভুলিনি। আমি ভুলিনি আমার সোনাদির কথা। সোনাদিকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা। আমি জানি আমার পথ সামনে, আমার পথ অদূরে। আমার মধ্যে সংশয়রহিত আমি। আমি সেই একটি একককে পেয়েছি। একেবারে রসরূপে, আনন্দরূপে, অব্যবহিতভাবে পেয়েছি। এ জানা নয়, সংগ্রহ নয়, জোড়াতালি দেওয়া নয়—এ প্রকাশ। সূর্যের প্রকাশের মতো ভাস্বর। যে প্রকাশকে খুঁজতে বাহিরে যেতে হবে না। কারো দরজায় গিয়ে খোশামোদ করতে হবে না। হাটে বাজারে গিয়ে খুঁজতে হবে না। শুধু অন্তরের জানালা-দরজাগুলো খুলে দিলেই সে-আলো একেবারে অখণ্ড হয়ে উদ্ভাসিত হবে। সোনাদি আমাকে দিনের পর দিন সেই দীক্ষাই দিয়ে এসেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, সোনাদিই তা দেখতে পেলে না। সোনাদিকেই দেখাতে পারলাম না শেষ পর্যন্ত, এ-ক্ষোভ আমার রাখবার জায়গা নেই।

একদিন হঠাৎ স্বামীনাথবাবুর চিঠি পেলাম। লিখেছেন, 'সোনাদি তোমায় দেখতে চেয়েছে একবার, চলে এসো শিগ্‌গির।'

কী জানি চিঠি পেয়ে বড় উৎকণ্ঠা হল। ছুটে এলাম কলকাতায়।

মনে আছে, সোনাদির আগের চিঠিতে জানতে পেরেছিলাম—দাশসাহেব মামলা থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু সে-মুক্তির মানে যে কী, তা আমি আন্দাজ করতে পারতাম। দাশসাহেবের মুক্তির জন্যে স্বামীনাথবাবু জীবনের যা-কিছু সঞ্চয়, যা কিছু সামর্থ্য সমস্ত ব্যয় করেছেন। জব্বলপুরের বসত বাড়িটাও বাঁধা দিয়েছেন। এমন কিছু ছিল না, যা দেননি। প্রয়োজন হলে বাকী সবকিছুই তিনি দিতে পারতেন। তারপর যখন সমস্ত দিকে সুরাহা হয়েছে, দাশসাহেব সেরে উঠেছেন, আবার ছেলে-মেয়েদের ইস্কুলে ভর্তি করা হয়েছে, আবার সোনাদি যখন স্বামীনাথবাবুর কাছে জব্বলপুরে ফিরে যাবার কথা ভাবছে—এমন সময় এমন কী কাণ্ড ঘটলো।

গিয়ে দেখলাম—সমস্ত বাড়িতে একটা অস্বস্তিকর আবহাওয়া। তবু বাগানের চেহারা আবার ফিরেছে। গেট-এ সুখ সিং দাঁড়িয়েছিল। সেলাম করলে আমায়। বললে, 'মাঈজরি বড় বেমার—'

আমি গিয়ে দাঁড়ালাম সোনাদির ঘরে। সোনাদি শুয়েছিল। যেন চিনতে পারলে আমাকে। যেন হাসলো। যেন দৃষ্টি দিয়ে কাছে ডাকলে। কাছে গেলাম। দাশসাহেব মাথার কাছে বসেছিলেন। এ-পাশে স্বামীনাথবাবু দাঁড়িয়েছিলেন শুকনো মুখে। আর, একজন ডাক্তার কী যেন লিখছিলেন একটা কাগজে।

ওষুধ-পত্রে ছেয়ে গেছে টেবিল।

সেদিনের সব কথা আজ আর বলবার দরকার নেই। সব কথা আমি ছাড়া আর কারো হয়তো মনেও নেই। তবু মনে আছে যখন সব শেষ হয়ে গেছে, তখন স্বামীনাথবাবু শান্ত-স্নিগ্ধ চোখে সোনাদির প্রাণহীন দেহটার দিকে উদার দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। কিন্তু দাশসাহেবের অবস্থা বড় করুণ। ছেলে-

মানুষের মতো আছড়ে-পিছড়ে কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে সবাই মিলে ধরেও থামানো যায় না এমনি অবস্থা তাঁর।

মনে আছে স্বামীনাথবাবু বলেছিলেন, 'দাশসাহেব বড় কাতর হয়ে পড়েছেন—ও'কে তুমি দেখো—'

দাশসাহেবও মনে আছে বলেছিলেন, 'স্বামীনাথবাবুর কাছে গিয়ে একটু বোসো ভাই তুমি, ও'র শোকটাই দারুণ—'

আর আমি!

স্বামীনাথবাবু এখনও জব্বলপুরে। দাশসাহেব সেই ব্যাঙ্ক ফেল পড়বার পর আর-একটা ব্যাঙ্ক করেছেন কলকাতায়। তাঁদের সঙ্গে আমার আব কোনও যোগাযোগ নেই আজ। তাঁরা কী পেয়েছিলেন জানি না। দু'জনের ঘরে গিয়েই দেখেছি দুটো বড় বড় ছবি। একটা ছবিতে দাশসাহেবের সঙ্গে সোনাদি, আর একটা ছবিতে স্বামীনাথবাবুর সঙ্গে। কতবার ভেবেছি, সোনাদির কাছে কে সব চেয়ে প্রিয় ছিল। স্বামীনাথবাবু, দাশসাহেব, না আমি। আমার কথা ও'রা দু'জনেই হয়তো কখনো ভাবেননি। কিন্তু ও'রা যা পেয়েছেন, তার চেয়ে যে কত বেশি পেয়েছি আমি। আমার পাওয়ার যেন শেষ নেই। আমি যে আশাতীত পেয়েছি। সোনাদিকে পেয়েও পেয়েছি, হারিয়েও পেয়েছি। জীবনের মধ্যে দিয়ে পেয়েছি, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে পেয়েছি। এই যে আজ অন্তরের সঙ্গে বাইরের, আচারের সঙ্গে ধর্মের, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির, বিচারশক্তির সঙ্গে বিশ্বাসের সামঞ্জস্য করতে পেরেছি—এ তো সোনাদিরই শিক্ষা।

আজ আমার জীবনে অন্তর মিলেছে, বাহির মিলেছে, সুখ মিলেছে, দুঃখও মিলেছে। শুধু যে জীবন পেয়েছি তা নয়, মৃত্যুও পেয়েছি। শুধু বন্ধুই নয়, শত্রুও পেয়েছি। তাইতো আমার জীবন ত্যাগ আর ভোগ দুই-ই পবিত্র, লাভ আর ক্ষতি দুই ই সার্থক। সমস্ত সুখ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদ, বিরহ-মিলনের সার্থকতা আমার জীবনে নিটোল হয়ে একটি অখণ্ড প্রেমের পরিপূর্ণতায় এক হতে পেরেছে। প্রশংসাও যেমন পেয়েছি, নিন্দাও পেয়েছি তেমনি। তবু আমার প্রাপ্য বলে আমি দু'টিকেই গ্রহণ করেছি। আমি বলতে পেরেছি, সমস্ত লোক-লোকান্তরের উর্ধ্বে নিস্তব্ধ-বিরাজমান্ হে পরম-এক, তুমি আমার মধ্যে এসে আমার হও!'

তারপর আমার অজ্ঞাতবাসের পালা শেষ হল একদিন। মনে আছে আবার কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। এবার অনেক দূরের যাত্রা। এবার বৃহত্তের দিকে আমার লক্ষ্য। আমি স্থিতধী হয়েছি। সোনাদি আমার সত্যদৃষ্টি দিয়ে গেছে। আমার তৃতীয় নেত্র খুলেছে। আমি নতুন করে জন্ম নিলাম। আমার নতুন উপন্যাসের সেই হল গোড়াপত্তন। আগেকার সব লেখা বাতিল হয়ে গেল। সোনাদির সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের একটা অধ্যায়ের এখানেই পড়লো পূর্ণচ্ছেদ।

রঙ বদলায়

বড় জটিল গল্প এটা। আমার অন্য সব গল্পের চেয়ে জটিল। জটিলও বটে আবার আলাদাও বটে। আবার গল্প একটু জটিল না হলে পাঠকেরও ভাল লাগে না তেমন। যে গল্প যত জটিল সে গল্প লেখা তত বিপজ্জনক। যে সাপ যত বিষধর, সে সাপ ধরতে সাপুড়েদের তত সতর্কতা দরকার। কিন্তু সাপই হোক আর গল্পই হোক, আসলে বিপদ না থাকলে আনন্দও যে থাকে না। গল্পের জট ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে আনন্দের চরম পরিণতিতে পেঁছে যখন লেখক তার পূর্ণচ্ছেদ টানে, তখন জটিলতা আর জটিলতা থাকে না। তখন পূর্ণ তৃপ্তি। গায়ক যখন মালকোষে তান ধরে, তখন উদ্বিগ্ন হয় শ্রোতা। ঠিক সমে এসে পড়বে তো? পা পিছলে রসহানি ঘটবে না তো? এদিকে গলার কসরত, আর তানের বিস্তার যত জটিলতর হয়, ওদিকে তত উদ্বেগ বাড়ে শ্রোতার। কিন্তু সেই গানই যখন শেষ পর্যন্ত সমে এসে নিঃশ্বাস ছাড়ে, তখন শ্রোতারও যত আনন্দ, গায়কেরও তত। দুর্গমকে সুগম করাই তো শিল্পীর কাজ। জটিলকে সরল।

বলেছি, জটিল গল্প এটা। সত্যিই জটিল। জানি না সমে এসে সঙ্গমে মিলতে পারবো কি না, কিন্তু এখন আর পেছোবার উপায় নেই। সামনে যবনিকা উঠে গেছে। সামনে আমার অসংখ্য শ্রোতা। এপাশে তাকিয়া, ওপাশে বালিশ। আর সামনে আমার মাইক্রোফোন। আপনারাও উদ্‌গ্রীব।

এবার আপনাদের অনুমতি নিয়ে আরম্ভ করি:

সবিনয় নিবেদন,

আপনি আমাকে চিনিতে পারিবেন না। আমিও আপনাকে প্রত্যক্ষভাবে চিনি না। চিনি আপনার লেখার মারফত। গল্প-উপন্যাস আগে পড়িতাম। পড়িতে ভালই লাগিত। এখন আর ভাল লাগে না। নানা কারণেই ভাল লাগে না। সেজন্য গল্প-উপন্যাসের দোষ দিই না, দোষ দিই আমার এই মনটিকেই। যে মন থাকিলে অপরের মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পিত-কাহিনী পড়িয়া আনন্দ পাওয়া যায়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে মনটিকেই আমি হারাইয়া ফেলিয়াছি। তবু আপনাদের আমি শ্রদ্ধা করি। বিশেষ করিয়া আপনাকে। কেন, বিশেষ করিয়া আপনাকেই শ্রদ্ধা করি তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। আমার অত বিদ্যা নাই। আমি নির্জন এবং নিঃসঙ্গ মানুষ। নিঃসঙ্গ বরাবর ছিলাম না, কিন্তু এখন নিঃসঙ্গ হইয়াছি। বাধ্য হইয়াই হইয়াছি। আর নিঃসঙ্গতা ছাড়া উপায় নাই বলিয়াও নিঃসঙ্গ হইয়াছি। সে-সব কথা পরে সাক্ষাতে হইতে পারে।

আপাততঃ এইটুকু মাত্র অনুরোধ আপনার নিকট যে আমি আপনার সাক্ষাৎ-প্রার্থী। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া একবার দিনকয়েকের জন্যে আমার গৃহে পদধূলি দেন তো আমি চির-কৃতার্থ হইব। আমার শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্য থাকিলে আমি স্বয়ংই আপনার নিকট গিয়া সাক্ষাৎ করিতাম, কিন্তু আমি অপারগ। অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন না থাকিলে আপনার মূল্যবান সময়ের অপচয়ের কথা তুলিতাম না। সে-কথা একমাত্র সাক্ষাতেই বলা চলে। ইতি—

ভবদীয়
সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

গল্পের সূত্রপাতে ছিল এই সামান্য একখানা মাত্র চিঠি। এত সামান্য চিঠি যে এতে কোনও সম্ভাবনার ইঙ্গিত মাত্রও ছিল না। কিন্তু সামান্যই মাঝে মাঝে তো অসামান্য হয়ে ওঠে। সুহাসবাবুকে দেখেও কিন্তু তাকে অসামান্য মানুষ বলে আমার মনে হয়নি সেদিন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট মানুষটি। অর্থবান। কোথাও কোনও শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার লক্ষণও দেখতে পাইনি। যেমন আর পাঁচজন সাধারণ ভদ্রলোক সংসারে আছেন, তিনিও তাঁদের মধ্যে একজন। তবে সারাদিনই একলা থাকেন। নিজের বাড়ির ভেতর নিজেকে নিয়েই আবদ্ধ থাকেন। পৃথিবীতে যে প্রতিদিন এত ঘটনা এবং এত দুর্ঘটনা ঘটছে তার কোনও খবরই রাখেন না। কত দেশে কত রাষ্ট্রের পতন-অভ্যুদয় ঘটেছে তার খবর রাখারও প্রয়োজন মনে করেন না। তিনি মনে করেন কেবল একলা তিনিই আছেন তাঁর পৃথিবীতে এবং আছে তাঁর পরলোকগত স্ত্রী। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি সামনের বারান্দায় এসে ইজিচেয়ারটায় বসেন। সামনে অবারিত মাঠ। সকালবেলার সূর্যটা এসে পৌঁছেছে সবে দিগন্তরেখায়, তখন তিনি চেয়ে থাকেন সেই দিকে। তারপর সূর্যটা যখন আরো ওপরে ওঠে তখন আরো তন্ময় হয়ে যান। নিজেকে নিয়েই তন্ময় হয়ে যান। তলিয়ে যান নিজের মনের তলায়। মনের তলায়ই বা তাঁর কী এত ভাবনা? কবে একদিন একটা কালো কুচকুচে বেড়াল দেখে ভয় পেয়েছিলেন তিনি। সেই কথা। অনেক ছোটবেলার কথা। যশোরের একটা ছোট গ্রাম। গ্রামের নামটাও আজ কষ্ট করে মনে করতে হয়। নলচিটা। বেড়ালটা চুপি চুপি ঘরে এসেছিল দুধ খেতে। দুধের কড়া থাকত খাটের তলায় ঢাকা। সেই দুধের লোভে। বেড়াল মাঝে মাঝে কালো কুচকুচে হয়। কিন্তু সেই বেড়ালটা সত্যিই বড় কালো ছিল। আর চোখ দুটো বড় ধারালো। বিষের চেয়েও ধারালো যেন।

কেন যে হঠাৎ তাঁর কালো বেড়ালের কথা মনে পড়ে যেত কে জানে। কোনও কারণ নেই। এমনি। সেই নলচিটা। নলচিটার বাড়িটার সামনে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। বাজা পেয়ারা গাছ। কস্মিনকালেও পেয়ারা হতো না

তাতে। এক-একজন মেয়েমানুষের মত পেয়ারা গাছও যে বাঁজা হয়, তা সেই প্রথম আর শেষ দেখা তাঁর।

এত বছর পরে, প্রায় এক যুগ পরে কেন যে হঠাৎ সেই পেয়ারা গাছটার কথা মনে পড়ে গেল, আশ্চর্য। সে কত বছর আগের কথা হবে? হয়ত চল্লিশ বছর আগেকার কথা! চল্লিশ বছর পরে হঠাৎ মনে পড়বার কারণটাই বা কী?

কিংবা এক-একদিন মনে পড়ে যায় আগের রাত্রে দেখা স্বপ্নটার কথা। তিনি যেন কাটনী রেল-স্টেশনের ধারে লাইনের ওপর দিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ সামনে দেখলেন একটা সাপ মরে পড়ে আছে। কী সাপ ওটা! মরা সাপের দিকে চেয়ে দেখতে কোনও বিপদ নেই, কিন্তু দেখলেন সাপ নয়, একটা মাধবী লতার ডাল। ট্রেনের তলায় পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। যেই সেটার পাশ দিয়ে চলতে আরম্ভ করবেন অমনি তখনি ফণা তুলে ধরেছে। আসলে সাপই ওটা—। সাপের ভয়ে আঁতকে উঠে চিৎকার করে উঠতে গেছেন—সঙ্গে সঙ্গে ঘুমটা ভেঙ্গে গেছে।

আশ্চর্য! কাল রাত দু'টোর সময় দেখা স্বপ্নটা এত দেরিতে কেন মনে পড়লো? আর সাপের স্বপ্ন দেখলেনই বা কেন? আসলে তিনি তো গ্রামের লোক। তাঁর তো সাপ দেখে ভয় পাবার কথা নয়। সাপ অমন অনেক দেখেছেন নলচিটায়। সাপ নিয়ে খেলা করেছেন। সাপের ভয় ছিল কাজলের। কাজল কলকাতার মেয়ে কি না!

—বাবু!

চমকে উঠে পেছন ফিরতেন সুহাসবাবু।

—কী রে?

—খাওয়া-দাওয়া করবেন না?

সুহাসবাবু রেগে যেতেন। বলতেন—এই সকাল আটটার সময় খাবো কী রে, এত সকাল-সকাল আমি খাই কখনও?

—আজ্ঞে বেলা হয়েছে খুব, বেলা পুইয়ে গেছে।

—কেন? ক'টা বেজেছে?

—আজ্ঞে, বেলা দুটো বেজে গেছে যে।

বেলা দুটো! কখন এত বেলা হলো! এই তো সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠে ইজিচেয়ারে এসে বসলেন। এই তো সূর্যটা উঠলো আকাশে। এই তো সবে চা খেয়েছেন। এই একটু আগে। কখন সূর্যটা মাথার ওপর দিয়ে পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, কিছুই টের পাননি তো তিনি। কখন যে বেলা হয়ে যায়, কখন যে বয়েস বাড়ে, কখন যে রাত কেটে সকাল হয়—এ এক আশ্চর্য ব্যাপার পৃথিবীতে। অথচ আগে প্রত্যেকটি মিনিট, প্রত্যেকটি সেকেণ্ড, প্রত্যেকটি পল-দণ্ড পর্যন্ত গুণে গুণে তিনি অনুভব করেছেন।

খেতে বসেও আবার অন্যমনস্ক হয়ে যান।

কানাই বলে—মাছের তরকারিটা খেলেন না?

—মাছ? মাছ রেঁধেছিস আজকে?

তারপর হঠাৎ নজরে পড়ে। মাছের বাটিটা চোখের সামনেই রয়েছে, অথচ এতক্ষণ দেখতেই পাননি।

মাছ রেঁধেছিস তা আমাকে বলিসনি কেন? মাছ কোথায় পেলি?

কানাই বলে—আজ্ঞে, আজ বাজারে মাছ এসেছিল—

খাওয়া-দাওয়ার পর তখন নিজের ঘরে গিয়ে বসেন সুহাসবাবু। তখন আর বারান্দায় নয়। নিজের ঘরে। কখনও নিজের খাটের ওপর। কখনও টেবিলের সামনে, চেয়ারে। আবার কখনও দাঁড়িয়ে থাকেন জানালাটার সামনে। ঘরের ভেতরে অন্ধকার হয়ে আসে বেলা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে।

—কানাই, কানাই!

দোতলার ওপর থেকে ডাক ছাড়েন সুহাসবাবু। নিচের রান্নাঘরের কোণে বসে কানাই তখন খাচ্ছে। সবে হয়ত খেতে বসেছে। হঠাৎ বাবুর গলা কানে যায়। বলে—যাই বাবু—

হাতটা মুখটা তাড়াতাড়ি ধুয়ে নিয়ে ওপরে আসে। বাবুর ঘরের ভেতর তখন অন্ধকার। অন্ধকারের ভেতরে বাবুকে স্পষ্ট দেখা যায় না। বাইরে দাঁড়িয়ে বলে—আলো জ্বালিয়ে দেব বাবু?

—না।

—তবে আমায় ডাকছিলেন কেন?

সুহাসবাবু বললেন—আমার সেই চিঠিটা কী হলো?

কী চিঠি! কীসের চিঠি, কিছুই পরিষ্কার করে বলবেন না কখনও। সব কথা ইঙ্গিতেই বুঝে নিতে হবে। স্পষ্ট করে কথা বলা স্বভাব নয় বাবুর।

—আজ্ঞে কোন্ চিঠিটার কথা বলছেন?

—সেদিন যে চিঠিটা ডাক-বাক্সে ফেলতে দিয়েছিলুম, সেটার কী হলো?

কানাই বললে—আজ্ঞে, আমি তো সেটা তখনই ফেলে দিয়েছিলাম।

—তার উত্তর এল না কেন তবে এখনও?

এর উত্তর কিছু নেই। আর কথা বাড়ালেই তো কথা বাড়ে। কথা বলায় কোনও লাভ নেই বাবুর সঙ্গে। বাবুর সঙ্গে কানাই তাই বেশি কথা বলেও না। বাবু যখন ডাকেন, বাবু যখন বকেন, তখন কানাই সব অপরাধ মাথা পেতে নেয়। প্রতিবাদ করলে এই চাকরি ছেড়ে চলে যেতে হয়। এ-চাকরি করা ছাড়া তার উপায়ও নেই আর। এতদিন বাবুর কাছে কাজ করে করে এখন এ বয়েসে আবার কোথায় যাবে সে। কোন্ চুলোয় যাবে? অন্ধকার বাড়িটাতে একলা-একলা তার সময় যেন আর কাটতে চায় না। সকাল বেলা বাবু যখন ঘুম থেকে ওঠেন, তখন চা করে দিতে হয়। তারপর বাজার। বাজার থেকে আসে আলু, বেগুন, কুমড়ো, লাউ। কখনও কখনও মাছ। তারপর রান্না। রান্না হবার পর বাবুকে খেতে ডাকবারও অধিকার নেই তার। বাবু তখনও বসে আছেন। চুপচাপ বাইরের মাঠটার দিকে চেয়ে বসে আছেন বটে, কিন্তু যেন কোনও দিকেই চেয়ে নেই।

বাইরে যেন সমস্ত ঝাপ্‌সা দেখছেন, সমস্ত ঝাপ্‌সা। বাবুর চোখের দিকে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায় যেন তিনি কোথাও কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। তখন ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে ডাকে—বাবু—

—কী রে ?

—খাওয়া-দাওয়া করবেন না ?

বাবু যেন অবাক হয়ে যান। বলেন—এই সকাল আটটার সময় খাবো কী রে ? এত সকাল-সকাল আমি খাই কখনও ?

—আজ্ঞে, বেলা হয়েছে খুব, বেলা পুইয়ে গেছে—

—কেন ? ক'টা বেজেছে ?

—আজ্ঞে বেলা দুটো বেজে গেছে যে !

তখন বাবুর হুঁশ হয়। তখন বাবুকে উঠিয়ে ভাত খাইয়ে দিতে হয়। আর ভাত খাওয়া হলেই যে ছুটি তা নয়। সারাদিন ডাকেন না। কিন্তু কখন যে আবার বাবু ডাকবেন, তারও ঠিক নেই। এমনি করেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাটে, এমনি করেই দিন কাটে, মাস কাটে, বছরও কাটে। এমনি করেই বাবু যেন আরো দিন দিন কেমন হয়ে যান।

তখন দুপুর। খাওয়া-দাওয়া সারা হয়ে গেছে। সুহাসবাবু বিছানায় বসেছিলেন স্থির হয়ে। বাবু অমন বসে থাকেন মাঝে মাঝে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এমন অসাড় হয়ে মানুষ বসে থাকতে পারে কী করে, কে জানে। কানাই তো পারে না। তা বয়েস হলে বোধহয় এই রকমই হয় মানুষের। কানাইও হয়ত বুড়ো হলে এই রকমই হবে। আর মা মারা যাবার পর থেকেই এমনি হয়েছে বাবুর। যেন কেমন অগোছালো, যেন কেমন চুপচাপ, যেন কেমন বোবা হয়ে গেছেন।

সুহাসবাবু উঠলেন আস্তে আস্তে। তারপর টেবিলের কাছে গিয়ে বসলেন চেয়ারটায়। কলম নিয়ে আবার লিখতে লাগলেন।

সবিনয় নিবেদন,

মাস কয়েক আগে আপনাকে একখানি পত্র দিয়াছিলাম। আশা করি পাইয়াছেন। আপনার নিকট হইতে কোনও জবাব না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত আছি। জানি, আপনাকে অনেক মূল্যবান কার্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়। সব সময়ে সকলের পত্রের জবাব দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমি যে-প্রয়োজনে আপনাকে পত্র লিখিতেছি, তাহা নিতান্ত তুচ্ছ নয়। আমি একজন নিঃসহায় নিঃসম্বল ব্যক্তি। অর্থের দিক দিয়া নিঃসম্বল না হইলেও পরমার্থের দিক দিয়া তো বটেই। কারণ আমি মানুষের কাছে একজন মহাপাতক, ঈশ্বরের কাছেও তাই। আপনাকে আমি আর কী লিখিব। আপনি আমা

অপেক্ষা অনেক জ্ঞানী, অনেক গুণী। তবু নিজের কথা কিঞ্চিৎ না প্রকাশ করিলে আপনি সম্যক্ সমস্ত উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের আত্মা বলিয়া একটা জিনিস আছে। দেহ বা মন অপেক্ষা আত্মার প্রয়োজনীয়তা অধিক বলিয়া স্বীকার করিবেন কিনা জানি না—কিন্তু আমি স্বীকার করি। আত্মা নাকি অবিনশ্বর। আত্মার নাকি মৃত্যু নাই। কিন্তু আমি এতই হতভাগ্য যে আমি আমার সেই আত্মা হইতেই বঞ্চিত। আমি জীবিত আছি, কিন্তু আত্মাহীন; আমার দেহ আছে মন আছে, আত্মা নাই। আপনি হয়ত শুনিয়া অবাক হইবেন যে আমি আমার সেই আত্মাকেই হত্যা করিয়াছি। আর আমি নিজেই হত্যা করিয়াছি। স্বহস্তে। এত কথা শুনিয়াও যদি আপনার এতটুকু করুণা হয় তো অনুগ্রহ করিয়া একবার আসিবেন—আসিয়া আমার আতিথ্য গ্রহণ করিবেন। আপনি অনুমতি-পত্র দিলেই আমি ডাকযোগে আপনার পাথেয় পাঠাইয়া দিব। আপনি গ্রহণ করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন এবং আমায় পুনর্জীবন দান করিবেন। ইতি—

ভবদীয়

সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

ওপর থেকে বাবুর ডাক পেয়েই কানাই দৌড়ে গেল। ঘরের ভেতরে তখন বেশ অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যেই বসে বসে বাবু কী সব করছিলেন। কাছে গিয়ে বললে—আমায় ডাকছিলেন বাবু?

—হ্যাঁ, কখন থেকে ডাকছি তোকে। কোথায় গিয়েছিলি?

—আমি তো যাইনি কোথাও, নিচেই ছিলুম।

—এই চিঠিটা স্ট্যাম্প লাগিয়ে এখুনি ডাক-বাক্সে ফেলে দিয়ে আয়—যেন ঠিক বাক্সের ভেতরে পড়ে, ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ফেলবি—

এর পর থেকে রোজই ডাকেন কানাইকে। উঠতে বসতে নাইতে খেতে আর বিরাম নেই। কানাই বলে—এ এক ভারি জ্বালা হলো তো?

বাবু জিজ্ঞেস করেন—কী রে, চিঠিটা ঠিক ফেলেছিলি তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ফেলেছিলুম ঠিক।

—বাক্সের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ফেলেছিলি তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাক্সের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ফেলেছিলুম।

—তবে উত্তর আসছে না কেন?

এরপর আর কোনও উত্তর দেবার থাকে না। আর কোনও কথা না বলে বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকে কানাই। বাবুও তার দিকে চেয়ে থাকেন, কানাইও তার দিকে চেয়ে থাকে। দু'জনেই যেন নিরুত্তর হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্যে। কানাই-এর কেমন একটা দুঃখ হয় বাবুর দিকে চেয়ে। সোনার চেহারা বাবুর, কী হয়ে গেল। দেখতে দেখতে মানুষটা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেল। যেন বাবুকে আর চেনাই যায় না এই ক'দিনের মধ্যে। কী যে হলো সংসারে।

এই কাটনীতে এই বাড়িতে আসার পর থেকেই যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল। তারপর আস্তে আস্তে বাবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল কানাই। বাবু তখনও তার দিকে চেয়ে আছেন একদৃষ্টে। কানাই গিয়ে বাবুর হাতটা ধরলে। বললে—আপনি একটু ঠাণ্ডা হোন, একটু ঠাণ্ডা হোন, আপনি ভাববেন না, আমি চিঠিটা ফেলেছি ঠিক, নিশ্চয় উত্তর আসবে—দেখবেন—আপনি শুয়ে পড়ুন—

আস্তে আস্তে শুয়ে পড়েন সুহাসবাবু। বলেন—উত্তর আসবে, না রে? উত্তর আসবে, কী বল?

—হ্যাঁ বাবু, নিশ্চয় উত্তর আসবে। নিশ্চয়ই—

বলে সুহাসবাবুকে শুইয়ে দেয় কানাই বিছানায়। তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে আসে বাইরে। আর, তারপর নিচে গিয়ে নিজের ঘরখানাতে নিজেই শুয়ে পড়ে। দিন গড়িয়ে রাত হয়। রাত গড়িয়ে আবার সকালও হয়। আবার চলে সেই পুনরাবৃত্তি। এমনি চলে দু'জন নির্জন নিঃসঙ্গ মানুষের জীবন-যাত্রা।

সেদিন হঠাৎ খট্‌খট্‌ করে সদর দরজার কড়া নড়ে উঠলো। সদর দরজার কড়া এমন করে নড়ে না কখনও। এই নির্বান্ধব দেশে যেদিন থেকে বাবুর সঙ্গে কানাই এসেছে, সেদিন থেকেই একেবারে নিঃশব্দে জীবন-যাত্রা চলেছে। বাজার যাবার সময়ও কানাই বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে চলে যায়। ভোরবেলা, কাঠওয়ালা কাঠ দিয়ে যায় রান্নার, তা-ও সকালবেলা। সকলকেই বলা আছে—দেরি করে এসো না বাপু তোমরা—দেরি করে এলে দরজা খুলবো না। আমাদের বাড়িতে দরজা খুলে দেবার লোক নেই কেউ—

তারপর সারাদিন আর কাজ কী? কোনও কাজই নেই কানাই-এর। কোনও দায়িত্বই নেই। মা যতদিন ছিল, কাজ ছিল। সে তো কলকাতার কথা। কলকাতার পাট তো কবেই চুকে-বুকে গেছে। কলকাতার সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচেই গেছে একেবারে। মা যখন ছিল, তখন কত লোক আসতো। দিনরাত আসা-যাওয়া লেগেই ছিল। দিনরাতই চা-কফি-জলখাবার করতে হতো। মা-ও নেই, মা'র সঙ্গে সঙ্গে সে-সব কাজকর্মও চুকে-বুকে গেছে।

মা বলতো—কানাই, চা তো আজকে ভাল হয়নি তোর—

সেদিন কানাই চা করেনি। করেছিল ঠাকুর। মা বললে—ঠাকুরকে ডাক তো একবার—

ঠাকুর এল। মা বললে—তুমি চা পর্যন্ত করতে শেখনি? তোমার জন্যে আজ সকলের সামনে কী-রকম অপদস্থ হতে হলো বলো দিকিনি।

তারপর মা বললে—যাও, তোমাকে আর কাজ করতে হবে না, যাও তোমার মাইনে যা পাওনা আছে নিয়ে আজই সরে পড়ো—

ঠাকুর হাত-জোড় করে মিনতি করতে লাগলো। বললে—দুধে একটু ধোঁয়ার গন্ধ হয়ে গিয়েছিল—

মা বললে—ও-সব আমি শুনবো না, আজই তোমার চাকরি খতম হয়ে গেল। কাল সকালে বাবু থাকবেন, তখন তোমার পাওনা টাকা এসে নিয়ে যেও—

তা সেইদিন ঠাকুর বরখাস্ত হয়ে গেল। সেইদিনই মা নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে হাঁড়ি-কড়া ধরতে গিয়েছিল। কিন্তু কানাই দেয়নি ধরতে।

কানাই বলেছিল—আপনি সরুন মা, আমি তো আছি—আমি থাকতে আপনাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেব না—

—তুই রান্না করতে পারবি ?

মারও যেন বিশ্বাস হয়নি যে কানাই রান্না করতে পারবে। কানাই বলেছিল —আমি তো য়্যাদ্দিন ধরে রান্নার যোগাড় দিয়ে আসছি, আর রান্নাটা করতে পারবো না ?

পরদিন কিন্তু রান্না খেয়ে মা অবাক। বললে—বাঃ, কানাই তো আমার বেশ রাঁধতে পারে। তবে আর ঠাকুরকে খোসামোদ করে লাভ কী। ও-ই রাঁধুক।

বাবুও খাচ্ছিল একই টেবিলে। বাবু বেশি কথা বলেন না কোনও কালেই। বললেন—তা রাঁধুক।

সেই থেকেই কানাই চাপরাশিকে-চাপরাশি, ঠাকুরকে-ঠাকুর, চাকর-বাকর, একাধারে সমস্ত। কানাই একলাই সংসারের মালিক হয়ে গেল। আবদুল অবশ্য ছিল। আবদুল ছিল বাবুর বাবুর্চি। সে শুধু রান্না করেই খালাস। তার বিবিও ছিল। সে করতো মা'র তদারকী। মা'র কাজকর্ম'ই করতো সে কেবল। কেউ বাড়িতে মা'র সঙ্গে দেখা করতে এলে কানাই-ই এসে দরজা খুলে দিত। নাম জিজ্ঞেস করতো। একটা শেলটেব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল মা। বলেছিল—এই শেলটটাতে নাম-ধাম লিখে নিবি, নিয়ে আমাকে দেখাবি, তবে আমি দেখা করবো—

কলকাতায় তখন খুব নাম-ডাক মা'র। মা'র তখন অনেক কাজ। মাকে ছাড়া কোনও কাজই হয় না। অনবরত লোকে দেখা করতে আসে মা'র সঙ্গে। সাহেব-সুবোরা আসে। আচারিয়া সাহেব আসে। দলে দলে মেয়েরা আসে। বড় বড় গাড়ি আসে বাড়ির সামনে।

কানাই এগিয়ে যায় দরজা খুলে। শেলটটা এগিয়ে দেয় সামনে। বলে—কার সঙ্গে দেখা করতে চান ?

—মিসেস মুখার্জি'র সঙ্গে।

কানাই বলতো—এই শেলটে আপনাদের নাম-ধাম লিখে দিন, কী কাজ, তাও লিখে দিন—

তারা নাম-ধাম লিখে দিত নিজেদের, কী কাজে তারা এসেছে তাও লিখে দিত। তারপর সেই শেলটখানা নিয়ে গিয়ে দেখাত মা'কে। মা হয়ত শেলটের

ওপরে লেখা দেখেই চমকে উঠতো। বলতো—করেছিস কী তুই, আরে যা যা শিগগির ভেতরে ডেকে নিয়ে আয়—

মা তখন সবে গা ধুয়ে সাজছে-গুজছে। বসবার ঘরে তাড়াতাড়ি এনে বসাতো তাদের।

মা তাড়াতাড়ি মুখে পাউডার ঘষেই একেবারে তরতর করে নেমে এসেছে বসবার ঘরে। একজন ভদ্রলোক আর একজন মেয়েমানুষ।

মেয়েমানুষটা বললে—কাজলদি, এ তোমার কী রকম ব্যাপার, একটা শ্লেট রেখেছ নাম-ধাম লেখবার জন্যে ?

মা বলতো —কী করবো ভাই, অনেক রকম লোক আসে দেখা করতে—

—তা শিলপ্ সিস্টেম করলেই পারো। থাকো সাহেবি-পাড়ায়, আর ফ্যাশানটা করেছ শ্যামবাজারের ?

সত্যিই মা-ও যেন লজ্জায় পড়ে যেত। বলতো—আরে, সাহেবি-পাড়ায় থাকি বলে কি সাহেবই হয়ে গেছি সত্যি-সত্যি ?

—না, না কাজলদি, এ সিস্টেম তোমার বদলাও—। লোকে কী মনে করবে বলো তো।

—লোকে যদি কিছু মনে করে তো আমি কী করবো বল ? আচ্ছা ঠিক রইল—এবার থেকে তোকে আর শ্লেটে নাম লিখতে হবে না।

তারপর থেকে চিনে নিয়েছিল কানাই। মা বলেছিল—দ্যাখ কানাই, এই তোর সুধা-মাসীমাকে চিনে রাখ্, যেবার এই মাসীমা আসবে তোর, এঁকে আর নাম লিখতে বলবি না, বুঝলি—

তা শেষ পর্যন্ত যখন সবাই আপত্তি করেছিল তখন কাউকেই আর শ্লেটে নাম লিখতে হতো না। তারপর শ্লেটটাই একদিন কী করে হঠাৎ হাত থেকে পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল। চুকে গেল ল্যাঠা। সেই থেকে নিয়ম হলো শিলপ্। শেষে তাও উঠে গেল। সুধা-মাসীমা যখন-তখন হুট করে আসতো। যখন-তখন এসে একেবারে মা'র শোবার ঘরে ঢুকে যেত। মা থাকলেও আসতো, না থাকলেও আসতো। বাবু সাহেব-পাড়ায় কোয়ার্টার পাবার পর থেকেই এমনি উৎপাত চলতে লাগলো।

শেষে একদিন যা ঘটবার ঘটে গেল।

তখন রাত অনেক হয়েছে। সাহেব-পাড়ায় সন্ধ্যে থেকেই মাঝ-রাত হয়। কানাই তখন নিজের ঘরটাতে বসে বসে ঝিমোচ্ছে। বাবু বাড়িতে নেই। বাড়ির সামনে বাগান। বড় বড় গাছ বাগানের ভেতর। গেটের সামনে একটা মস্ত আলো জ্বলতো সারা রাত। গেট থেকে লম্বা খোয়া বিছানো ঘোরানো রাস্তা। রাত তখন অনেক হয়েছে বৈকি। রাস্তার মোড়ের বড় গীর্জাটার ঘড়িতে ঢং ঢং করে কয়েকবার বেজে গেল। একটু বোধহয় তন্দ্রা এসেছিল কানাইয়ের। ঘরের মধ্যেই বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। কখন মা ডাকে তার তো ঠিক নেই।

এখনও মনে পড়লে কানাই-এর বুকটা থর থর করে কেঁপে ওঠে।

সেদিন আবার বিপদের ওপর বিপদ। বাড়িতে বাবুও ছিল না। আপিসের কাজে বাবুকে যেমন বাইরে যেতে হতো মাঝে মাঝে তেমনি গিয়েছেন। সঙ্গে আর্দালী গেছে। আর্দালী বাবুর সঙ্গেই বাইরে যেত বরাবর। ওদিকে আবদুল রসুইখানা নিয়ে ব্যস্ত। বিবি তখনও শোবার ঘরে বিছানা পাতছে। অর্থাৎ বৈঠকখানায় যে কী ঘটছে তা আর কারো জানবার কথা নয় আসলে।

হঠাৎ বন্দুকের গুলির শব্দ হলো দুম্ দুম্ করে।

—দুম্-দুম্-দুম্।

কানাই বন্দুকের আওয়াজটা পেয়েই চমকে উঠেছে। কী বিকট আওয়াজ! কে যেন সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো। একটা চিৎকার। সমস্ত নিঝুম অন্ধকার। সাহেব-পাড়াটা সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চমকে উঠলো। কানাই দৌড়ে এসেছে। আবদুল রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এসেছে। বিবি ছিল শোবার ঘরে। সে-ও শব্দ শুনে দৌড়ে এসেছে। আসলে বন্দুকের আওয়াজ নয়, পিস্তলের আওয়াজ। তখনও ধোঁয়া উঠছে পিস্তলের মুখ দিয়ে। সেই ধোঁয়ার গন্ধ নাকে লাগতেই কানাই দৌড়ে বাইরে এল ঘর থেকে। এসে দেখে এক কাণ্ড···

ঠিক বাগানের খোয়া বিছানো রাস্তায় ওপরেই পড়ে আছে কোট-প্যাণ্ট পরা····

কানাই আর দেখতে পারলে না চোখ দিয়ে। চোখে যেন তার ধাঁধা লেগে গেছে। ততক্ষণে আবদুলও এসে গেছে সেখানে, বিবিও এসে গেছে। আসে পাশের বাড়ির আয়া-খানসামা-আর্দালী সবাই আসতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে ভিড় হয়ে গেল একগাদা।

তারপর খবর পেয়েই পুলিশ এসে গেল থানা থেকে। বাবুও ঠিক সেই সময় এসে পড়লো মফঃস্বল থেকে।

এ-ঘটনা আমি পরে জানতে পেরেছিলাম। কলকাতায় বসে এ-ঘটনা জানার আমার কোনও সুযোগ ছিল না। কারণ এ-সব কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেকার ঘটনা। কলকাতার খবরের কাগজে হয়ত এ-সব বেরিয়েছিল তখন। তখনই হয়ত পড়েছিলুম। কিন্তু তারপর অন্য ঘটনার গোলমালে সব মন থেকে মুছে গিয়েছিল। এতদিন পরে আবার এই ঘটনার মুখোমুখি হবো—এই বা কেমন করে জানবো?

ভাবলাম, একজনকে চিঠিটা দেখাবো। কিন্তু আবার মনে হলো হয়ত এই চিঠির আড়ালে কোনও গোপন কাহিনী থাকতে পারে। যে ভদ্রলোক দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার আশায় চিঠিটা লিখেছেন, তা আর পূর্ণ হবে না। কত মানুষের কত গোপন বেদনা থাকে, বাইরের সমাজের চোখ থেকে তা আড়ালে রাখতে চান। হয়ত একজন বিশেষ কাউকে না বলতে পারলে মনে শান্তি পাচ্ছেন না। এতদিন এ পৃথিবীতে বেঁচে থেকে অনেক অদ্ভুত চরিত্রই তো দেখলাম। এই সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও হয়ত তাদেরই মত একজন।

আর তা ছাড়া এই ঘটনার আগে পর্যন্ত আমি শুধু আমাদের নিজের সমাজকেই একটু সামান্য চিনতে পেরেছি—এই যে-সমাজে আমি মানুষ হয়েছি। যে-সমাজে আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সচরাচর চলাফেরা করে। আমরা, অর্থাৎ আমাদের সমাজের লোকরা মধ্যবিত্ত পাড়ায় থাকি। মধ্যবিত্ত সমাজের মন জানি। ট্রামে-বাসে চড়ি, কেরাণীগিরি করি বা অবসর সময়ে তাস খেলি। আর খুব বেশি সমাজের-সেবা যদি করি তো সকাল-বিকালে খবরের কাগজের রাজনীতি নিয়ে তর্ক করি। বাঙলা দেশে এর চেয়ে মহৎ ভূমিকা আমাদের নেই।

কিন্তু সুহাসবাবু তো মধ্যবিত্ত সমাজের লোক নন। তিনি পুলিশ অফিসার। বেশ উঁচু পোস্টের চাকরি তাঁর। কাজল মুখোপাধ্যায় এককালে মধ্যবিত্ত সমাজের মহিলা থাকলেও বিয়ের পর তারও পদোন্নতি হয়েছিল। (তাঁদের প্রথম জীবনের কথা পরে বলবো)। যখন গল্প শুরু হয়েছে তখন সুহাসবাবু ক্লাস ওয়ান গভর্ণমেণ্ট অফিসার। নিজের গাড়ি চড়েন, নিজের উর্দি-পরা ড্রাইভার আছে। বাড়িতে খানসামা, বাবুর্চি, আয়া, মালী সবই আছে। বৃটিশ আমলের যা কিছু লিগেসি সবই তখন পুরো দমে ভোগ করছেন মিস্টার আর মিসেস মুখার্জি।

মিস্টার মুখার্জির উড্‌ল্যাণ্ড স্ট্রীটের নিরিবিলি বাড়িটাতে তখন সন্ধ্যেবেলা রোজই সোসাইটি জমায়েত হয়। কলকাতা শহরের ক্রেজ্‌রা আসে সেখানে। কফি চলে, সিগ্রেট চলে অনেক সময় মাইল্ড ড্রিঙ্কস্‌ও চলে। ড্রিঙ্কস্‌ চলতো বিশেষ বিশেষ অকেশনে। অর্থাৎ যেদিন কোনও রেসপেক্টেবল ফরেনার হাজির হতো, সেইদিন। মিস্টার আর মিসেস হাচিন্স্‌ এসেছিলেন একদিন। মিস্টার আর মিসেস তাকোয়া এসেছিলেন একবার। তাছাড়া মিস্টার চৌধুরী, মিস্টার গাঙ্গুলী, মিস্টার ব্যানার্জিরা তো হামেশাই আসতো।

বাইরে থেকে রাস্তা দিয়ে যদি কেউ হেঁটে যেত তো শুনতো, মিস্টার মুখার্জির বাড়ির বাগানের ভেতরের জমায়েতে আলোচনার সাবজেক্ট ছিল বিচিত্র। লণ্ডনের ফগ্‌ থেকে শুরু করে চার্চিলের চুরোট পর্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় সেখানে কফি আর সিগ্রেটের ধোঁয়ার সঙ্গে হাওয়ায় উড়তো। আর বিচিত্র এই যে, সে-সভায় ইণ্ডিয়ার পভার্টি নিয়েও আলোচনা হতো গম্ভীর সুরে। ইণ্ডিয়ার পভার্টির জন্যে কারা দায়ী, তার কী কী প্রতিকার, তারও একটা ফতোয়া দিতেন তাঁরা। তারই মধ্যে খবরের কাগজে কোনও অনাহারে মৃত্যুর খবর পড়লে এক-একজন সমবেদনাও জানাতেন। বলতেন – পুওর সোল্‌—

মিস্টার হাচিন্স্‌ বলেছিলেন—ইণ্ডিয়ানরা বড় লেজি ফেলো—

মিস্টার মুখার্জি বলেছিলেন—আই কন্‌কার মিস্টার হাচিন্স্‌—বড় লেজি—

—আর এই লেজিনেস্‌-এর জন্যেই আজ তারা বৃটিশের স্লেভারি করছে—

মিস্টার চৌধুরী কফিতে চুমুক দিয়ে সিগ্রেট টানতে টানতে বলতো—ইউ আর পারফেক্ট্‌লি রাইট্‌ মিস্টার হাচিন্স্‌—

—এর জন্যে প্রপার এডুকেশন্‌ দরকার, এডুকেশন্‌ পেলে সব ঠিক হয়ে যাবে—

এরই মধ্যে মিসেস মুখার্জি মোলায়েম গলায় মুখবাড়িয়ে জিজ্ঞেস করতো —মোর কফি মিস্টারহাচিন্স্ ?

আর মিস্টার হাচিন্স্ সসম্ভ্রমে বলতো—নো, থ্যাঙ্কস্ মিসেস মুখার্জি—

মাঝে মাঝে সুধাও আসতো পার্টিতে। অর্থাৎ মিসেস সান্ন্যাল। মিস্টার সান্ন্যাল ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের গেজেটেড্ অফিসার। মিস্টার মুখার্জির ছোট-বেলার বন্ধু। যতদিন কলকাতায় থাকতো, আসতো এখানে। করাচীতে বদলি হবার পর মিসেস সান্ন্যালও আসতে পারতো না আর। মিস্টার সান্ন্যালও আর ছুটি পেত না।

আর আসতো মিস্টার আচারিয়া। আচার্য। মিসেস মুখার্জি আর মিসেস সান্ন্যালের পুরোন জীবনের বন্ধু। মিস্টার আচারিয়াকে ডাকতে হতো না। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, একদিন এসে হাজির হতো। তার হঠাৎ আবির্ভাবে অবাক হয়ে মিস্টার মুখার্জি জিজ্ঞেস করতো—এতদিন কোথায় ছিলেন মিস্টার আচারিয়া ? আফ্টার সাচ্ এ লং টাইম—

—সিঙ্গাপুরে।

অদ্ভুত কেরিয়ার এই মিস্টার আচারিয়ার। আজ সিঙ্গাপুর, কাল পেনাঙ, পরশু জাভা, তারপর দিন হয়ত একেবারে স্ট্রেট্ ইউ-কে। মস্ত বড় নামজাদা ফার্ম ম্যাক্‌লাউড কোম্পানীর ইণ্টারন্যাশন্যাল কমিশন এজেণ্ট। কখনও গাড়ি হাঁকিয়ে আসে, কখনও ট্যাক্সি, কখনও স্টেশন-ওয়াগনে।

—কোথা থেকে এলেন ?

—গভর্ণরস্ হাউসে টী-পার্টি ছিল।

তারপর একে একে যখন সবাই চলে যেত, উড্‌ল্যাণ্ড পার্কের বাইরের রাস্তা থেকে গাড়িগুলো একে একে যখন চলে যেত, তখনও থেকে যেত মিসেস সান্ন্যাল। মিস্টার সান্ন্যাল নিরীহ ভালোমানুষ গোছের অফিসার। এমন কিছু কাজ নেই তার বাড়িতে যে সকল-সকাল ফিরে যেতে হবে। লোকটা ভাল। ভাল স্টুডেণ্ট ছিল কলেজে। রীতিমত কম্‌পীটিটিভ একজামিনেশন দিয়ে পাশ করে সার্ভিস পেয়েছে। বলতে গেলে সমাজে উঠেছে। সমাজে উঠতে গেলে যা-যা গুণ সবই আয়ত্ত করেছে। প্রথম প্রথম মিস্টার সান্ন্যাল সিগ্রেট খেতনা। তারপর খেতে শুরু করলো। টার্ফ ক্লাবের মেম্বার হলো। তারপর সামান্য ছোটখাটো কক্‌টেল-পার্টি থেকে শুরু করে বড় বড় ডীনারে গিয়ে হুইস্কি খেতেও শিখেছে। কিন্তু তখনও ভাল করে পার্টির ম্যানার্স শিখতে পারেনি। রাত্তির হলে হাই তুলতে শুরু করে। সারাদিন অফিসের খাটুনির পর রেস্ট নিতে ইচ্ছে করে। মিসেস সান্ন্যালের জন্যে তাও সম্ভব হয় না। আসলে মিসেস সান্ন্যালের জন্যেই এই সব করা। এই সিগ্রেট, এই কক্‌টেল, এই হুইস্কি।

—তুমি বাড়ি যাবে না ?

মিসেস মুখার্জি বলতো—আপনি যান মিস্টার সান্ন্যাল, আমরা দুই বন্ধুতে মিলে একটু গল্প করি।

সত্যি, বহু দিনের বন্ধু মিসেস মুখার্জি আর মিসেস সান্ন্যাল। বিয়ের আগে থেকেই দু'জনের বন্ধুত্ব। যখন সবাই চলে যেত, মিস্টার মুখার্জিও ঘুমোতে যেতেন নিজের ঘরে, তখন দুই বন্ধুতে আলাপ হতো নিরিবিলি।

কানাই এসে দাঁড়াতো। বলতো – মা—

মিসেস মুখার্জি বলতো—তুই শুতে যা কানাই, আর তোকে দরকার নেই—আবদুলকে বল্ সেও শুয়ে পড়ুক—

এইসব নিরিবিলি আড্ডাগুলোই মিসেস মুখার্জি আর মিসেস সান্ন্যালের ছিল বড় প্রিয়। কত ছোটবেলা থেকে দু'জনে একসঙ্গে মেলামেশা করেছে। তখন কি কাজল জানতো একদিন সে মিসেস মুখার্জি হবে আর সুধাই কি জানতো যে সে হবে মিসেস সান্ন্যাল। ভাগ্যের পেণ্ডুলামের দোলায় ডাইনে-বাঁয়ে ধাক্কা খেতে খেতে কত লোক তলিয়ে যায়, কত লোক ঢেউ-এর তলায় চাপাও পড়ে। কিন্তু এদের বেলায় তা হয়নি। কেন হয়নি সেইটেই এই উপন্যাসের কাহিনী। সেই কাহিনী বলতে গেলে আজ থেকে পঁচিশ-তিরিশ-চল্লিশ বছর পেছিয়ে যেতে হবে আমাদের।

তিরিশ-চল্লিশ ছর আগে কলকাতার এমন চেহারা ছিল না। এমন ট্রামে-বাসে ছেলে-মেয়েদের ঘেঁষাঘেঁষি চলতে দেখা যেত না। সেই সময়েই ভাগ্যের এক অমোঘ নির্দেশে এই শহরে কোন্ দূর এক পাড়া-গাঁ থেকে এসে পড়েছিল একটি মেয়ে। তার নামই কাজল। মিসেস মুখার্জি বলে যার পরিচয় দিয়েছি এখানে। সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে বিয়ে করে মিসেস মুখার্জি হয়েছিল।

কিন্তু আমি মিসেস মুখার্জিকে দেখিনি। অথচ তাকে নিয়েই আমার এই গল্প।

প্রথমেই বলেছি এ একটা জটিল গল্প। জটিল হবার কারণও আছে। এ গল্প আরম্ভ হলো আমার চিঠি পাওয়ার পর থেকে। প্রথমেই সেই অজ্ঞাতনামা ভদ্রলোকের চিঠি। চিঠি পাওয়ার পরেই বলেছি কাটনী-শহরে সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায় আর তাঁর চাকর কানাই-এর কাহিনী। আর তারপরেই বলেছি তাঁদের কলকাতার জীবন-কথা।

কাটনীতে যখন আমি যাই, তখন থেকে একটু-একটু করে কাহিনীর ছেঁড়া টুকরো জোড়া দিয়ে দিয়ে পুরো কাহিনীটা পেয়েছিলাম। পুরো কাহিনীটা বোঝবার সুবিধে হবে যদি সেই তিরিশ-চল্লিশ বছর আগেকার কলকাতা থেকে শুরু করি।

সেই কলকাতার লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ের ভেতর যে সব নতুন মানুষ এল-গেল, তার হিসেব-নিকেশ লেখবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, যদি না আজ মিস্টার মুখার্জি, মিসেস মুখার্জি, মিস্টার সান্ন্যাল, মিসেস সান্ন্যাল, মিস্টার আচারিয়া আর এ-কাহিনী যে আগাগোড়া দেখে আসছে—সেই কানাই এর জীবনের রং বদলাতো। রং সব জীবনেরই বদলায়। শৈশব থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে। কিন্তু তা বলে এমন করে?

সে বহুদিন আগেকার কথা।

কাজল তখন স্কুল-মিস্ট্রেস। সুধাও তাই। কোনও কেষ্ট-বিষ্টু স্কুলে নয়, একেবারে আটপৌরে একটা পাড়ার মেয়েদের করুণাময়ী গার্লস্-স্কুল। সেই স্কুলে পড়াতো আর অন্ধকার মেস-বাড়ির একটা ঘরে দু'জনে থাকতো। দশ টাকা সিট্-রেন্ট্। আর কুড়ি টাকা খাওয়া খরচ। স্কুল-টিচার। সকালে বেরিয়ে যেত স্কুলে, আর ফিরতো স্কুলের পর। কোনও মাসে কিছু দেনা হতো, আবার পরের মাসে তা শোধও হয়ে যেত।

বর্ষাকালের রাত্রে মেসের ছাদ দিয়ে জল পড়তো এক-একদিন। বৃষ্টি হলেই দু'জনকে এক তক্তপোষে শুতে হতো।

কাজল বলতো—এ-জীবন আর ভাল লাগে না ভাই—

সুধা বলতো—আমারও—

এক-একদিন ছুটি হলে দু'জনে সিনেমায় যেত। তখনকার দিনে বেশি রাত করে রাস্তায় ঘোরা ছিল বিপজ্জনক। সিনেমা দেখে আবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসতো। তারপর আবার সেই দু'জনে একলা। মেসের অন্য মেয়েদের সঙ্গে তত মিল ছিল না তেমন। অন্য মেয়েরা বলতো—মানিক-জোড়—

এক-একদিন সস্তা দামের শাড়ি আর সস্তা চটি পরে দোকানের শোকেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াতো দু'জনে। আসল উদ্দেশ্য সময় কাটানো।

কাজল বলতো—ওই শাড়িটা দেখ্ ভাই—

সুধা বলতো—ওর অনেক দাম—

কলেজ স্ট্রীটের দোকানের শো-কেসগুলোর ভেতরে শাড়ি দিয়ে সাজানো পুতুল নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো দু'জন গ্রামের মেয়ের দিকে। আর তার গায়ে লেখা দামের টিকিটগুলো দেখে তখনি চলে যেতে হতো সেখান থেকে মুখ বুজে। স্কুলের টিচারদের অত সখ ভাল নয়। কাজল বলতো—ও-সব বড়লোকদের জন্যে ভাই—আমাদের জন্যে নয়—

বাবাও তাই বলতো। কলকাতা থেকে শেয়ালদা স্টেশনে ট্রেনে উঠে তবে দেশে যেতে হতো। দেশের বাড়িতে বাবা প্রথমে আপত্তি করেছিল কলকাতায় আসবার সময়। বিদেশ-বিভুঁই। জানাশোনা নেই কারো সঙ্গে। সেখ নে গেলে কি টিকতে পারবে। কলকাতা যে বড় ভয়ঙ্কর জায়গা। কিন্তু দরখাস্তের উত্তর তখন এসে গিয়েছে। তিরিশ টাকা মাইনে, আর কিছু নয়, তিরিশ টাকা থেকে কত টাকাই বা সে বাঁচাবে আর কত টাকাই বা তার বাবাকে পাঠাবে। তা হোক। তিরিশ টাকা চিরকাল তিরিশ টাকায় দাঁড়িয়ে থাকবে না। ভাগ্যে থাকলে তিরিশটাকাই একদিন পঞ্চাশটাকায় দাঁড়াতে পারে। বাবাই একদিন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল এখানে। এই শেয়ালদা স্টেশনে এসে নেমে কালীঘাটে গ্রামের এক লোকের বাড়িতে উঠেছিল। তারপর এই মেসটার সন্ধান পাবার পর বাবা চলে গিয়েছিল আবার দেশে।

মেসটায় তখন বেশি মেয়ে ছিল না। মেসের কাছেই ছিল স্কুলটা। প্রাইমারী মেয়ে-স্কুল—করুণাময়ী বালিকা বিদ্যালয়। সকালবেলা হেঁটে হেঁটে স্কুলে

পড়াতে যাওয়া আর বিকেল বেলা মেসে ফিরে এসে চুপচাপ শুয়ে থাকা। আর রোজ বাবাকে একটা করে চিঠি লেখা।

বাবা চিঠি লিখতো—

মা কাজল, প্রত্যহ একটা করিয়া চিঠি লিখিবে। তোমাকে কলিকাতায় রাখিয়া আসিবার পর হইতেই আমি বড় উদ্বেগে দিন কাটাইতেছি। রাত্রে তোমার কথা চিন্তা করিয়া আমার ঘুম হয় না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি সর্বদা সর্বাঙ্গীন কুশলে থাকো। আমার দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। যাইবার আগে তোমার বিবাহ দিয়া যাইতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু তোমার লেখাপড়া করার ইচ্ছা, তাই তোমার ইচ্ছায় বাধা দিই নাই। কিন্তু তোমার মা নাই, তাই আমাকেই তোমার ভবিষ্যতের কথা সব ভাবিতে হইতেছে। আমি ইতি-মধ্যে ভাল পাত্রের সন্ধানে আছি। দু' একটি ভাল পাত্রের সন্ধানও পাইয়াছি। বিবাহের পরও লেখাপড়া লইয়া থাকিতে পারিবে। ইতিমধ্যে তোমার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখিও—

ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা। বাবার স্নেহের শেষ ছিল না। জীবনে অর্থের অভাব আর আসেনি কখনও কাজলের। মিস্টার মুখার্জির সঙ্গে বিয়ে হবার পর অর্থের অভাব মিটে গিয়েছিল তার। কিন্তু স্নেহ? স্নেহের পাট শেষ হয়ে গিয়েছিল বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই।

সেই মেসের জীবনেই প্রথম আলাপ হলো সুধার সঙ্গে। সুধা এসে উঠলো তারই ঘরে। ছোট্ট বেঁটে-খাটো মেয়েটি। মিসেস সান্যালকে দেখলে সেই সেদিনকার সুধাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সেই সুধাই একদিন মিস্টার আচারিয়ার নাম করেছিল প্রথম। তখনও মিসেস মুখার্জি আচারিয়াকে দেখেনি।

কাজল জিজ্ঞেস করেছিল—তোর সঙ্গে আলাপ হলো কী করে?

সুধা বলেছিল—ট্রেনে—

ট্রেনেই আলাপ। তারপর ট্রেন থেকে ছাড়াছাড়ি হবার পর কলকাতার রাস্তায় আর একবার দেখা। সাধারণ বেকার লোক নয় মিস্টার আচারিয়া। কেরাণী নয়, ব্যবসাদার নয়। অদ্ভুত এক পেশা তার। আজ সিঙ্গাপুর, কাল পেনাঙ, পরশু জাভা। তার পরদিন হয়ত একেবারে স্টেট্‌স্ ইউ-কে। সুধা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল এই লোকের সঙ্গে পরিচয় করে। সামান্য থার্ড ক্লাশ কম্পার্ট-মেণ্টে সেই সুবিখ্যাত লোক যে কী করতে উঠেছিল কে জানে। কলকাতার নামজাদা ফার্ম ম্যাক্‌লাউড এণ্ড কোম্পানীর ইণ্টারন্যাশন্যাল কমিশন্ এজেণ্ট-এর ফার্স্ট ক্লাশে না চড়ে থার্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে কী দরকার থাকতে পারে, তা কল্পনা করতে পারেনি সেদিন পাড়াগাঁয়ের মেয়ে সুধারাণী দাস।

—আপনি বুঝি কলকাতায় যাচ্ছেন?

সুধা বলছিল—হ্যাঁ—

মিস্টার আচারিয়া জিজ্ঞেস করেছিল—কলকাতায় আগে কখনও গিয়েছেন?

সুধা বলেছিল—না—

মিস্টার আচারিয়া তখন সাবধান করে দিয়েছিল—কলকাতায় ওঠবার জায়গা ঠিক আছে তো ?

সুধা বলেছিল—হ্যাঁ, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের এক মেসে—

মিস্টার আচারিয়া বলেছিল - খুব সাবধানে থাকবেন কলকাতায়। মেয়েদের পক্ষে বড় ভয়ের জায়গা। সেখানে কাউকে বিশ্বাস করলেই ঠকতে হবে।

সেই কলকাতায় আসবার দিনই ভাল লেগেছিল সুধার। মিস্টার আচারিয়ার মত একজন সম্ভ্রান্ত লোকের সহানুভূতি পাওয়া সহজ নাকি !

প্রথম-প্রথম কাজল কিছুই জানতো না, কিছুই বলতো না সুধা। কিন্তু বহুদিন এক বাড়িতে থেকে, এক স্কুলে কাজ করেও, এক-একবার মনে হতো সুধা যেন কেমন-কেমন। কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থাকে এক-এক সময়। কলকাতায় গিয়ে গুন্ গুন্ করে গান গাইতো।

কাজল বলতো—কি রে, মনে বুঝি খুব আনন্দ হয়েছে তোর ?

সুধা বলতো—না কাজলদি, আনন্দ আসবে কোত্থেকে বলো ?

—কিন্তু এত গান কোত্থেকে আসে মনে ?

এর পর আর কিছু বলতো না সুধা, মুখ টিপে টিপে হাসতো। এড়িয়ে যেত কথাগুলো। যা মাইনে পেত তাই দিয়েই সস্তা পাউডার ক্রীম কিনে আনতো, এনে টিনের আয়নাটার সামনে মুখ রেখে দেখতো নিজেকে।

কাজল জিজ্ঞেস করতো—কি হয়েছে তোর বল্ তো ? তোর যেন কেমন পরিবর্তন দেখছি—

সুধা বলতো—আর কি হবে কাজলদি,—

—তুই প্রেমে পড়েছিস নাকি ? আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে ভাই—

সুধা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠতো। বলতো—তুমি যে কি বলো কাজলদি, তার ঠিক নেই, তিরিশ টাকার ইস্কুল-মাস্টারনীর আবার প্রেম কোত্থেকে জুটবে—

কথাগুলো প্রথম-প্রথম বিশ্বাস হতো কাজলের। মনে হতো সুধাও বুঝি ঠিক তারই মত। তারই মত গরীব ঘরের মেয়ে। নিজের চাকরি আর নিজের লেখাপড়া নিয়েই মেতে আছে।

কিন্তু একদিন সুধা ধরা পড়ে গেল।

ক'দিন থেকেই সুধা যেন ছট্‌ফট্ করছিল। কেবল বলছিল—আমার কোনও চিঠি এসেছে কাজলদি ? কোনও খাম কি পোস্টকার্ড ?

—কেন রে ? কার চিঠি তোর চাই ? কে চিঠি লিখবে তোকে ? কে আছে তোর শুনি ?

তা চিঠি লেখবার কি আর লোক নেই পৃথিবীতে। কাজলের মত নির্বিকার হয়ে আর কে জন্মেছে পৃথিবীতে। সংসারে বাবা ছিল। বাবা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। দেশ ছেড়ে বাবা আসতে চাইত-না কখনও। অত যজমান রয়েছে দেশে। তার পাণ্ডা-গণ্ডা আদায়পত্র সব তো দেশেই। দেশ ছেড়ে চলে এলে কে তাকে প্রণামী

পাঠাবে ? কিন্তু কাজল এ-যুগের মেয়ে। বাবা বলেছিল—তোমাকে আমি বাধা দেব না মা, তোমাকে এ-যুগের সঙ্গে তাল রেখেই চলতে হবে, তুমি যদি মনে করো লেখাপড়া শিখলে ভাল হবে, তাই করো। আমি যেমন করে পারি সাহায্য করবো—আমার বড়লোক যজমানরা আছে, আমি হাত পাতলে তারা এখনও না করতে পারবে না—

কালীঘাটের এক জানাশোনা প্রতিবেশীর বাড়িতে যেদিন বাবা এসে প্রথম তুলে দিয়ে গিয়েছিল, সেদিনও বলেছিল,—তোমরা কাজলকে একটু দেখো বাবা, কলকাতায় তো আগে কখনও আসেনি ও, বিপদ-আপদে তোমরাই আছ ওর, আর কে দেখবে বলো ?

বুড়ো মানুষের যা কিছু করবার, যা কিছু বলবার, তার কিছুই বাকি রাখেনি। তারপর দেশে ফিরে গিয়ে প্রতি হপ্তায় একখানা করে চিঠি দিত। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিত কাজল। কাজল লিখতো--

পরম পূজনীয় বাবা,

তোমার পত্র পেয়েছি। আমার জন্যে বেশি চিন্তা করো না। আমি শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মেসটাতে বেশ আরামেই আছি। খাওয়া-দাওয়ার কোনও অসুবিধাই হচ্ছে না। আশেপাশে ভদ্রগৃহস্থদের বাড়ি। চারিদিকে ভদ্র আবহাওয়া। আমার ঘরে আমার মতই আর একটি মেয়ে আছে। আমরা দুটিতে এক সঙ্গেই কাটাই। তোমার কোনও ভয় নেই। তোমার শরীর কেমন আছে এখন জানবে ! ইতি সেবিকা—

কাজল

কিন্তু সেই বাবার মৃত্যুর সময়েও কাজল কাছে হাজির থাকতে পারেনি। বাবা যে এত শিগগির চলে যাবে কে ভাবতে পেরেছিল। কি চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল বাবার। বাবা একটা আস্ত কাঁঠাল একলা খেতে পারতো। ছ' ফুট লম্বা চেহারার মানুষ। লম্বা—আজানুলম্বিত বাহু যাকে বলে। গ্রামের লোক বলতো —পণ্ডিত মশাই।

সেই পণ্ডিত মশাই-এর মেয়েই এই কলকাতা শহরে এসে একদিন স্কুলের টিচারি করবে, সে-কথা সেদিন গ্রামের কোনও লোকই বিশ্বাস করতে পারেনি। কাজল নিজেও অবাক হয়ে যেত। কাজল যে এই কলকাতা শহরের মধ্যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে একদিন নিজের ভাগ্য নিয়ে লড়াই করতে পারবে, এ-কথা যেন সে বিশ্বাস করতে পারেনি এতদিন।

বাবার মৃত্যুর পর কাজলের কাছে সুধা যেন আরো আপনার হয়ে গিয়েছিল। আরো কাছে এসে গিয়েছিল কাজলের।

সে-রাত্রে দু'জনেই ঘুমোয়নি।

সুধা বলেছিল—তাতে কি হয়েছে কাজলদি, বাবা কি কারো চিরকাল থাকে ?

সত্যি, সুধারও কেউ ছিল না। কলকাতা শহরের অগণিত অসংখ্য মানুষের

ভিড়ে কত কাজল কত সুধা ছড়িয়ে আছে, কে তার হিসেব রাখে। বাঁচার প্রতিযোগিতায় কত ছেলে কত মেয়ে গলে পচে পিষে থেঁতলে যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, তার হিসেব থাকে না ক্যালকাটা কর্পোরেশনের রেকর্ড সেকশানের খতিয়ানে। কত বাড়ি গড়ে, কত ভাঙে, কত গুঁড়ো হয়ে ধুলো হয়ে যায়, আবার কত গজিয়ে ওঠে, সুধা আর কাজলের মত কত স্নেহাতুর বাবার মেয়ে এখানে এসে মাথা তুলে বাঁচতে চায়, তার রেকর্ড কেউ জানতেও চায় না। স্রোতের পর স্রোত আসে মানুষের, সে-স্রোত শহরের সমুদ্রে এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। গ্রামের মানুষ, বস্তির মানুষ, বিদেশের মানুষ—মানুষে-মানুষে আসলে তখন কোনও পার্থক্য থাকে না আর। তখন সব মানুষ মিলে রূপান্তর হয় জনতায়। সেই জনতার ভিড়েই কাজল আর সুধা এসে একদিন মিশেছিল। তারপর তারা একাকার হয়ে গিয়েছিল শহরের জনতার সঙ্গে।

এই রকম যখন অবস্থা, তখনই পরিচয় হয়ে গিয়েছিল মিস্টার আচারিয়ার সঙ্গে।

মিস্টার আচারিয়া। নামটা শুনে কে আর বাঙালী বলে ভুল করবে?

সুধা জানতো, সুধা দেখেছিল। সুধার সঙ্গে গোয়ালন্দর ট্রেনে আলাপ হয়েছিল, তাই সুধা জানতো।

কাজল বলেছিল—তা কোথা থেকে এত চিঠি লেখে সে তোকে?

সুধা বলেছিল—এখন এসেছে সিঙ্গাপুর থেকে।

সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুরের নাম বাঙ্গালীরা পড়েছে ভূগোলের পাতায়। আর শুধু সিঙ্গাপুরই নয়, পেনাঙ, জাভা, ইউ-কে, সব জায়গায়ই যেতে হয় মিস্টার আচারিয়াকে। ম্যাক্‌লাউড্‌ এণ্ড কোম্পানীর ইণ্টারন্যাশন্যাল কমিশন এজেণ্ট মিস্টার আচারিয়া।

কাজল জিজ্ঞেস করলে—কি রকম দেখতে? কত বয়েস?

সুধার কাছে তখন মিস্টার আচারিয়া ছিল গড। কিংবা গডের চেয়েও বড় যদি কিছু থাকে, তাই।

সুধা বলতো—তুমি বিশ্বাস করবে না কাজলদি, আচারিয়া তিন হাজার টাকা মাইনে পায়—

—তিন হাজার?

কাজল মাইনের অঙ্কটা শুনে চমকে যেত। কোথায় তিরিশ আর কোথায় তিন হাজার।

—হ্যাঁ রে, মাসে না বছরে?

সুধা বলতো—বছরে কি কাজলদি, মাসে! আমাকে সেদিন একটা ব্রোকেডের শাড়ি কিনে দিতে চেয়েছিল দোকান থেকে, কিন্তু আমি নিইনি কাজলদি, আমার যেন কেমন ভয় করছিল।

কাজল বলেছিল—না, নিসনি, না-নেওয়াই ভাল। কলকাতা শহরে এ-রকম অনেক লোক আছে। তারা মেয়েদের জিনিস-পত্তোর দিয়ে ভুলিয়ে দিতে চায়। বাবা আমাকে তাই গোড়াতেই বারণ করে দিয়েছিল—

সুধা বলতো—না কাজলদি, আচারিয়া সে-রকম নয়, সে-রকম লোক হলে আমি এতদিনে ধরতে পারতুম না ? এতদিন এক সঙ্গে কত ঘুরেছি, কত রেস্টুরেণ্টে গিয়েছি, কত সিনেমায় গিয়েছি, কিন্তু বলতে নেই, কোনও দিন কোনও অভদ্র আচরণ করেনি—

—কিন্তু তোর সঙ্গে এত মেলামেশা করবার আসল মতলবটা কি ?

সুধা মুখ টিপে হাসতো। বলতো—কি আর, এমনি—

—এমনি মানে ?

—বারে, এমনি বেটাছেলেদের মেয়েদের সঙ্গে মিশতে ভাল লাগে না! বেটাছেলেরা তো মেয়েদের সঙ্গে মিশতে চাইবেই।—

কাজল বলতো—তা হয়ত চাইবেই, কিন্তু ওটা বড় রিস্কি, যদি কিছু য়্যাক্সিডেণ্ট ঘটে যায়, তখন ?

—যাঃ, কি যে বলো তুমি কাজলদি! আমি কি সেই রকম ? আমাকে কি তুমি সেই রকম ভাবো নাকি ? আমার কি বুদ্ধি বিবেচনা নেই একটা ? এবার সিঙ্গাপুর থেকে এলেই আমি আচারিয়ার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দেব, দেখবে কি পারফেক্ট জেণ্টেলম্যান, এত ভাল ম্যানার্স জানে, তোমাকে কি বলবো! আচারিয়ার সঙ্গে আমি চৌরঙ্গীর বড় বড় হোটেলে গিয়ে ঢুকেছি, জানো। আমার একটু ভয় করে না ওর সঙ্গে—

কাজল বলতো—কিন্তু ওখানে তো মদ খেতে দেয়, শুনেছি—

সুধা বলতো—না কাজলদি, তুমি কি বলছো ? আমি মদ কি খেতে পারি ? আমায় আচারিয়া কত বলেছে, আমি কিছুতে খাইনি। আচারিয়া বলে—মদ খেলে কোনও দোষ নেই, সাহেব-মেমসাহেব সবাইকে বসে মদ খেতে দেখি, কিন্তু আমি কিছুতেই খাই না কাজলদি, আমার কেমন ঘেন্না-ঘেন্না করে—

সব শুনে-টুনে জিজ্ঞেস করেছিল—তা কোথায় আলাপ হয়েছিল তোর ওর সঙ্গে প্রথম ?

—ট্রেনে কাজলদি, অর্থাৎ যখন আমি কলকাতায় আসছিলাম নতুন।

সব শুনে কাজল সাবধান করে দিয়েছিল সুধাকে। বলেছিল—কিন্তু খুব সাবধান ভাই, এ-রকম মেলামেশা বড় ডেঞ্জারাস, আজকাল শুনেছি বহু মেয়ের এই রকম করে সর্বনাশ হয়ে গেছে—

সুধা তবু মানতে চাইতো না। বলতো—এবার সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এলে আমি ঠিক তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব কাজলদি, দেখবে কত ভাল লোক আচারিয়া। আর তাছাড়া, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায় সে—

—আমার সঙ্গে ?

কাজল অবাক হয়ে যেত।

—আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায় কেন ? তুই আমার কথা বলেছিস নাকি ?

সুধা অবাক হয়ে যেত। বলতো—বা রে, তোমার কথা আমি বলবো না ? তোমার কথা তো আমি সবাইকে বলি কাজলদি, তুমি যে আমার ইণ্টিমেট ফ্রেণ্ড,

এ সব্বাই জানে—

সব শুনে কাজল বলতো—না ভাই, আমি আলাপ করবো না, ও-সব লোকের সঙ্গে আমার আলাপ করতে ভয় করে, শেষকালে কি থেকে কে হবে।

কিন্তু আলাপ শেষ পর্যন্ত হয়েছিল। হয়েছিল একটা হোটেলে। সুধা ছাড়েনি কিছুতেই। জোর করে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সুধা, বলেছিল—আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি কাজলদি, তোমার কিচ্ছু ভয় নেই—আচারিয়া সে-রকম ছেলেই নয়—

তা সত্যিই 'সে-রকম' ছেলে নয় আচারিয়া। হোটেলের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল আচারিয়া। লম্বা টাই, ট্রপিক্যাল স্যুট পরনে। দূর থেকেই সুধা দেখতে পেয়েছে আচারিয়াকে।

সুধা বললে ওই দেখ কাজলদি, আচারিয়া দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জন্যে—

কাজলও চেয়ে দেখলে। সত্যিই সুন্দর দেখতে আচারিয়াকে। কাছে যেতেই মাথা নুইয়ে নমস্কার করলে আচারিয়া।

বললে—আপনিই তো সুধার কাজলদি? আমি ঠিক ধরেছি—

সুধা বললে—জানো, কাজলদি মোটে আসতে চায় না, আমি জোর করে ধরে এনেছি। কাজলদিকে একটু বেশি করে খাতির ক'রো কিন্তু—

আচারিয়া বললে—তোমার যখন কাজলদি, তাহলে তো আমারও কাজলদি—

সুধা বললে—এই কাজলদি ছিল বলেই আমি তবু বেঁচে আ'ছ আচারিয়া, কাজলদি না থাকলে আমাকে আবার দেশে ফিরে যেতে হতো!

আচারিয়া বললে—দেশে? দেশে কী করতে যাবে তুমি?

তারপর কাজলের দিকে ফিরে বললে—আচ্ছা কাজলদি, আপনিই বলুন তো সুধা কেবল বলে দেশে ফিরে যাবে। দেশে গিয়ে কোথায় উঠবে বলুন তো! কে এমন আছে দেশে যে কেবল দেশে যাবার নাম করে?

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাজল যেন একেবারে আত্মীয় হয়ে উঠলো আচারিয়ার। আচারিয়ার কথা, আচারিয়ার পোশাক, আচারিয়ার ব্যবহার, আচারিয়ার চাকরি, সব তার জানাই ছিল যেন। এতদিন তাকে না দেখেও যেন দেখা হয়ে গিয়েছিল। আচারিয়ার অদ্ভুত গুণ ছিল। বিশেষ করে মেয়েদের ব্যাপারে। এক মিনিটের মধ্যে আপন করে নেবার ক্ষমতা ছিল তার অসাধারণ।

আচারিয়া বললে—আচ্ছা কাজলদি, আপনিই বলুন তো, আমি যদি সুধাকে একটা ব্রোকেডের শাড়ি কিনে দিই তো কিছু অন্যায় হয়? আপনিই বলুন?

সুধা বললে—আচ্ছা কাজলদি, তুমিই বলো, আমি কেন শাড়ি নিতে যাবো? আমার কি শাড়ি নেই?

আচারিয়া বললে—সে তো অর্ডিনারি শাড়ি। তোমার পোশাকী শাড়ি কই? নিজের বাবা মা কি ভাই থাকলে তো তারাই দিত? তখন নিতে না?

সুধা বললে—তা বলে, তোমার কাছ থেকে কি নেওয়া যায়?

আচারিয়া বললে—কেন নেওয়া যায় না? আমি তোমার কী এমন পর যে আমার কাছ থেকে কিছু নেওয়া যায় না? এ-রকম পর-পর মনে করলে কি কারো ভালো লাগে, আপনিই বলুন তো কাজলদি?

সুধা বললে—না না, সে বড় খারাপ দেখাবে। আর কাজলদি যদি বলে তবে নিতে পারি—

আচারিয়া বললে—কাজলদি, আপনি সুধাকে বলুন তো একটা শাড়ি নিতে—

কাজল বললে—আপনিই বা শাড়ি দিতে অত পীড়াপীড়ি করছেন কেন মিস্টার আচারিয়া? না-ই বা নিলে ও?

আচারিয়া বললে—কিন্তু, নিলে কি দোষ! প্রেজেণ্টেশন্ তো লোকে দেয়ই—

চারদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে কাজল সেদিন অবাক হয়ে যাচ্ছিল। এত বড় হোটেলের ভেতর এত বড় হল্। চারদিকে কেবল চেয়ার টেবিল ছড়ানো। একটা করে ছোট টেবল আর চারপাশে চারটে চেয়ার। সাহেব-মেমসাহেবদের ভিড়ই বেশি। মেমসাহেবদের সত্যিই লজ্জা নেই। পিঠটা আগাগোড়া খোলা, ফরসা লাল টুকটুকে পিঠ। পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে গল্প করে চলেছে, সিগারেট খাচ্ছে। কোন লজ্জা-সরমের বালাই নেই। ওপাশে একজন মেমসাহেব উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে পেত্নীর মত গলায় এক নাগাড়ে গান গেয়ে চলেছে। পাঁচ ছ'জন লোক কত রকম বাজনা বাজাচ্ছে। খানসামা বয় বাবুর্চি'রা ঘুরে ঘুরে খাবার দিয়ে বেড়াচ্ছে। এ এক অদ্ভুত জগৎ সত্যি! এতদিন বাইরে থেকে এই হোটেলটা দেখেছে। বাসে ট্রামে যেতে যেতে চেয়ে দেখেছে এদিকে কতদিন। আজ এই প্রথম ঢুকলো সুধার কল্যাণে। ভেতরে যে এমন, তা জানা ছিল না কাজলের। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মেসের ভাঙাচোরা বাসা-বাড়িটার সঙ্গে যেন এর আকাশ-পাতাল তফাত। অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিল কাজল চারদিকে।

কাজল বললে—ওরা সবাই মদ খাচ্ছে নাকি?

আচারিয়া বললে হ্যাঁ—

কাজল আবার জিজ্ঞেস করলে—আপনিও মদ খান?

আচারিয়া বললে—আমি? আমি মদ খেতে যাবো কেন কাজলদি? কত লোক মদ খেতে পীড়াপীড়ি করে আমাকে, তবু আমি খাই না, আট বছর আমি মদ আর মাছ-মাংস খাওয়া ছেড়েছি—

কাজল অবাক হয়ে গিয়েছিল কথাটা শুনে। বলেছিল—সে কি! আপনি আগে মদ খেতেন নাকি!

আচারিয়া বললে—খেতাম আট বছর আগে। আমাকে তো নানান লোকের সঙ্গে মিশতে হতো। একবার এক মাতালের কাণ্ড দেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, জীবনে আর মদ কখনও খাবো না।—

কাজল সত্যিই সেদিন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল আচারিয়াকে দেখে। এত টাকা মাইনে পায়, এত বড় চাকরি করে, ইচ্ছে করলেই তো সব কিছু করতে পারে। কিন্তু কত সংযমী।

আচারিয়া বললে—এই তো কাল ইউ-কে যাচ্ছি, অফিস থেকে আমাকে রোজ তিরিশ টাকা করে খাই-খরচ দেবে, কিন্তু তিরিশ টাকা আমার পুরো খরচ হয় না, কোম্পানীর লাভ হয় আমাকে পাঠিয়ে—

সেদিন হোটেল থেকে বেরিয়ে সুধা জিজ্ঞেস করেছিল—কেমন দেখলে কাজলদি আচারিয়াকে ?

কাজল বলেছিল—খুব ভাল রে, খুব ভাল, এত ভাল আমি ভাবতেই পারিনি—

সুধা বলেছিল—দেখলে তো, কী রকম মর‍্যাল ক্যারেকটার ! আমি তো এতদিন ওর সঙ্গে মিশছি, একদিনের জন্যেও ওকে আমি মদ খেতে দেখিনি—ও-সব বিষয়ে ও খুব গোঁড়া কাজলদি—

তারপর একটু থেমে বলেছিল—এই তো ইউ-কে যাচ্ছি, যাবার পথে রোজ আমাকে একটা করে চিঠি লিখবে। অথচ আমি ওর তুলনায় কী, বলো ? আমার চেয়ে কত সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ইচ্ছে করলে মিশতে পারে।

কাজল জিজ্ঞেস করেছিল—চিঠিতে কী লেখে ?

সুধা বলেছিল—কী আবার আমার, কথাই দিন-রাত কেবল মনে পড়ে, এই সব—

—তোকে বিয়ে করতে চায় নাকি ?

সুধা বললে—তা কোনওদিন বলেনি কিন্তু। কেবল দেখা হলেই আমাকে শাড়ি-গয়না এই সব কিনে দিতে চায়—

—তা সেই কথাটা জিজ্ঞেস কর। শুধু শুধু দিনের পর দিন মিশে কী হবে ! আর এ-রকম মেলামেশাও তো ভাল নয় তোদের ! শেষকালে যদি কোনও বিপদ ঘটে যায়, তখন ? তখন তোকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে ও হয়ত পালিয়ে যাবে—

সুধা বলতো—ছি, ছি, তুমি যে কী বলো কাজলদি ! আচারিয়া কি সেই রকম লোক ! আচারিয়াকে দেখেও কি তোমার তাই মনে হলো ?

অবশ্য, আচারিয়া সে-রকম ছেলে নয় তা কাজল বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তবু কিছু তো বলা যায় না। কলকাতা শহরে কত লোক কী মতলবে ঘুরে বেড়ায় বলা যায় না। কার মনে কী আছে কে জানে ! একটু সাবধান হওয়াই তো ভাল।

কাজল বলেছিল—তবু একটু সাবধান হয়ে চলিস্।

সুধা বলেছিল—আমি খুব সাবধানেই থাকি কাজলদি—

—তুই ওকে জিজ্ঞেস করিস তোকে বিয়ে করবে কি না।

সুধা বলেছিল—তাই কি কখনও জিজ্ঞেস করা যায়।

—তা জিজ্ঞেস করতে দোষ কী ?

সুধা বলেছিল—না না, ছি, সে বড় লজ্জার কথা, মেয়েমানুষে কি তাই জিজ্ঞেস করতে পারে নাকি কখনও ?

ক'দিন পরেই মিস্টার আচারিয়া ইউ-কে চলে গেল। যাবার আগের দিন সুধার সঙ্গে দেখা করে গেল। কিন্তু যাবার পর দিন থেকে সুধার সে কী অস্বস্তি ! কেবল চিঠির জন্যে ছট্‌ফট্ করে। সকালবেলা স্কুল থেকে এসেই খোঁজ নেয়

চিঠি এসেছে কিনা। একে জিজ্ঞেস করে, ওকে জিজ্ঞেস করে।

কাজলকে বললে—আচ্ছা কাজলদি, এখনও চিঠি দিলে না কেন বলো তো?

কাজল বলে—এটা কিন্তু তোর একটু বাড়াবাড়ি; লোকটা কাজে গেছে সেখানে, তার নিজের কাজ-কর্ম করবে না তোকে চিঠি দেবে!

—কিন্তু কাজলদি, আমাকে যে বলে গেল, গিয়ে পৌঁছেই চিঠি দেবে!

কাজল তখন সুধার কাণ্ড দেখে হাসতো। একেই বোধহয় প্রেম বলে। এই রকম ছট্‌ফটানি, এই চিঠির জন্যে ঘুম খাওয়া-দাওয়া সব ত্যাগ করা। সুধার কাণ্ড দেখে কাজল তখন বেশ মজা পেত। সমস্ত রাত ঘুম নেই। একই ঘরে পাশাপাশি তক্তপোষে শুয়ে কাজল এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়তো। মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে যেতেই দেখতো সুধা ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে।

কাজল বলতো কী রে ঘুমোসনি তুই?

সুধা বলতো—ঘুম আসছে না যে কাজলদি—

কাজল বলতো—কিন্তু এ-রকম করলে বাঁচবি কী করে তুই?

সুধা বলতো—বেঁচে আর কী লাভ কাজলদি—আমার মরে যাওয়াই ভাল—

এমনি এক-একবার আচারিয়া কলকাতার বাইরে যেত আর সুধা ছট্‌ফট্ করতো। সে-সব দিনগুলোতে সুধা ভাল করে কথা বলতো না, শুধু কাঁদতো। তারপর যেদিন চিঠি আসতো, সেদিন আবার হাসি ফুটতো তার মুখে। আবার ভাল করে ঘুমোত, ভাল করে কথা বলতো, ভাল করে খেত, আর ভাল করে ক্লাশে মেয়েদের পড়াতো। আর সে কী বড় বড় চিঠি সব! কত কথা সে সব লিখতো তাতে আচারিয়া। ওদিক থেকে আচারিয়া লিখতো আর এদিক থেকে লিখ'তো সুধাও। সুধাও বড় বড় চিঠি লিখতো। সেই চিঠিগুলো আবার সিল্কের ফিতে দিয়ে জড়িয়ে যত্ন করে সাজিয়ে রাখতো ট্রাঙ্কের ভেতরে। সেই চিঠি জমে জমেই বাক্সের মধ্যে পাহাড় হয়ে উঠতো।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষের মন। আর আশ্চর্য মানুষের মনের ভুলে যাবার ক্ষমতা।

আচারিয়া সুধাকেই বিয়ে করবে, সুধাকে নিয়েই সংসার পাতবে এই রকম সব ঠিকঠাক। কিন্তু সব উল্টে গেল একদিন।

আজকের সুধা আর আজকের কাজলের কাছে সেকালের সেইসব দিন-গুলোর কথা যেন হাসির খোরাক হয়ে আছে।

যখন মিসেস মুখার্জির বাড়িতে পার্টি হয়, যখন সবাই এসে জোটে সে পার্টিতে, তখন মিসেস সান্যালও আসে, মিস্টার সান্যালও আসে। কথা বলতে বলতে অনেক রাত হয়ে গেলে সবাই যখন চলে যায়, তখন দুই বন্ধুতে আবার ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে। সেই সব দিনের কথা মনে পড়ে যায় দু'জনের।

কাজল বলে—মনে আছে সুধা, তখন কী-রকম পাগলামী ছিল তোর? আচারিয়ার চিঠি না পেলে কী-রকম ছট্‌ফট্ করতিস্!

সুধা বলতো—খুব মনে আছে কাজলদি, বলতে গেলে তুমিই সেইদিন বাঁচিয়ে দিয়েছিলে আমাকে—

কাজল বলতো—তখন তুই আচারিয়ার জন্যে যে-রকম পাগল হয়ে গিয়েছিলি

তাতে আমারই ভয় হয়ে গিয়েছিল ভাই—

সত্যি বলতে গেলে কাজলই বাঁচিয়ে দিয়েছিল সেদিন। ম্যাক্‌লাউড এণ্ড কোম্পানীর ইণ্টারন্যাশন্যাল কমিশন এজেণ্ট মিস্টার আচারিয়ার কথা অবিশ্বাস করবার তো কথা নয় কারো। দু'হাতে টাকা খরচ করে, মদ খায় না, নিজের সংসার নেই, বাপ-মা-ভাই-বোন কেউ নেই, এ-রকম লোককে গোড়াতেই তো সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রথম প্রথম কাজলও সন্দেহ করেনি। দেখতো—এত ভদ্র আচারিয়া।

কাজল জিজ্ঞেস করেছিল—আচ্ছা, আপনি আচারিয়া লেখেন কেন নামের শেষে? আচার্য লিখলেই পারেন?

আচারিয়া বলেছিল - আপনি তো বেশ কথা বললেন কাজলদি, আচার্য বললে ফরেনে কেউ বুঝবে? তাছাড়া আছে উচ্চারণ। আচারিয়াটা শুনতে, উচ্চারণ করতে কত সহজ!

কাজল আরো জিজ্ঞেস করেছিল—আপনি সুধাকে বিয়ে করে কোথায় তুলবেন? বাড়ি ভাড়া করতে হবে তো?

আচারিয়া বলেছিল—তা তো করতে হবেই – আমি এখন হোটেলে থাকি, কারণ আমার কেউ নেই বলে। বিয়ে করলে তো আর হোটেলে থাকা চলবে না।

কাজল আবার জিজ্ঞেস করেছিল - আর একটা কথা, আপনি যে বাইরে বাইরে ঘুরবেন, বছরের মধ্যে ছ'মাস ইণ্ডিয়ার বাইরে থাকবেন, তখন সুধা একলা কী করে থাকবে এখানে?

আচারিয়া বলেছিল – কেন? সুধাও ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে যাবে—

এর পর আর কাজলের আপত্তি হয়নি।

কাজল বলেছিল—তুই বিয়ে করে সুখী হোস্ এটা আমিও চাই ভাই, তোর ভালোর জন্যেই তো আমি এত কথা জিজ্ঞেস করে নিয়েছি, তোর মামারা যদি এ সব ব্যাপারে ভার নিত তাহলে আর আমাকে এ-কাজ করতে হতো না—

সুধা মামাদের নাম শুনলেই রেগে যেত। বলতো—না কাজলদি, মামার আমার কেউ নয়, দেখছো না, এতদিন এখানে আছি, একটা খোঁজ-খবরও নেয় না কেউ? মামারা যখন আমার কথা ভাবে না, তখন আমিই বা তাদের কথা ভাববো কেন?

তা সেই মেসের মধ্যে বসেই দুই বন্ধুর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতো তারা। কেমন করে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে, চিরকাল তো আর স্কুলমাস্টারি করা চলবে না। চিরকাল এই মেয়ে ঠেঙিয়ে আর তিরিশ টাকা মাইনে মাস-কাবারি নিয়ে জীবন তো কৃতার্থ হবে না। ভবিষ্যৎ তো ভাবতে হবে।

সুধা জিজ্ঞেস করতো—আচ্ছা, তুমি কী করবে কাজলদি? তুমি বিয়ে-থা করে সংসার পাতবে না?

কাজল বলতো—দূর, আমার আবার ভবিষ্যৎ, আমার আবার সংসার—আমার

রকম মেয়ে ঠেঙিয়ে দিন কেটে যাবে—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মেয়ে-ঠেঙিয়েই কাজলের দিন সত্যি সত্যি কাটলো না। কাজলের জীবনেও একদিন এল একজন। এল সুহাস। সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। তখন বি. এস্‌সি. পাশ করেছে। এম. এসসি. ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে চাকরির চেষ্টা করছে। সে-যুগে চাকরি পাওয়া অত সহজ ছিল না। চাকরি পেতে গেলে দিনের পর দিন দরখাস্ত করতে হতো চারদিকে। কত রকমের কম্‌পিটিটিভ্‌ পরীক্ষা দিতে হতো। যুদ্ধের আগেকার দিনে চাকরি পাওয়া আর ভগবান পাওয়ার মধ্যে কোনও তফাতই ছিল না।

সুধা সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিল সুহাসকে দেখে। জিজ্ঞেস করেছিল—ও কে কাজলদি?

কাজল বলেছিল—কে? কার কথা বলছিস্‌?

—বা রে, ওই যে তোমাকে মেস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে এসেছিল? ও কে? বেশ চেহারা কিন্তু ভদ্রলোকের।

কাজল বলেছিল—ওকে তুই চিন্‌বি না, ও সুহাস—

সুধা অবাক হয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—তা আমাকে তো বলোনি কিছু ওর কথা? তুমিও বুঝি প্রেমে পড়েছ?

—চুপ কর পোড়ারমুখী, কী যে বলিস্‌ তার ঠিক নেই। আমি তোর মত নই, অত সহজে আমি টলি না তোর মত।

সুধা জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু ও কে? কী করে?

কাজল বলেছিল—করবে আবার কী?

—তবু চাকরি-বাকরি তো একটা কিছু করে?

কাজল বলেছিল—চাকরি করে কিনা তা জানি না। আর আমার অত জানবার দরকার কী? চাকরিই করুক আর বেকারই হোক, তাতে আমার কী এসে যায়?

আসলে সুহাস এসেছিল স্কুলে। তখন চিনতো না, জানতোও না তাকে। কোন একটা ক্লাবের কী একটা ফাংশন হবে। চ্যারিটির ব্যাপার। বন্যা-পীড়িতদের জন্যে একটা গান-বাজনার আয়োজন হয়েছে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে, তারই টিকিট বিক্রীর ব্যাপার।

স্কুল তখন ছুটি হয়ে গেছে। কাজলও তখন বাড়ি যাবার বন্দোবস্ত করছে। সবে স্কুল কম্পাউন্ড্‌ পার হবে এমন সময় সুহাস এসে বলেছিল—আচ্ছা, আপনাদের স্কুলের হেড্‌ মিস্ট্রেস এখন আছেন?

হঠাৎ এক অচেনা ছেলের মুখোমুখি হওয়াতে কাজল প্রথম থম্‌কে উঠে-ছিল। তারপরেই একটু সোজা হয়ে বলেছিল—স্কুল তো ছুটি হয়ে গিয়েছে, আপনি কাল আসবেন—

তারপর সুহাস জিজ্ঞেস করেছিল—কাল কখন আসবো?

কাজল বলেছিল—এই ধরুন সকাল ন'টা সাড়ে ন'টার মধ্যে।

তারপরেই উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার করে খুলে বলেছিল সুহাস। ফরিদপুরে বুঝি বন্যা হচ্ছিল সে-সময়। স্যার পি. সি. রায় একটা সংকট-ত্রাণ সমিতি করেছেন, দেখেছেন বোধহয়। সেই জন্যেই সকলের কাছ থেকে চাঁদা তুলছি আমরা। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে যার যথাসাধ্য সংগ্রহ করছি। আর এই সঙ্গে একটা গান-বাজনার বৈঠক হচ্ছে, এর যদি টিকিট কেনেন আপনারা তো বহু লোকের উপকার হয়।

উপলক্ষ্যটা এই রকম সামান্যই।

প্রথমে সব ব্যাপারেই উপলক্ষ্যটা সামান্য থাকে। সেই চাঁদা তোলার ব্যাপারেই কাজল একটু সাহায্য করেছিল সুহাসকে।

স্কুলের হেড্ মিস্ট্রেসকে বলে প্রত্যেক ছাত্রীর কাছ থেকে কিছু কিছু চাঁদা আদায় হয়েছিল। যেটুকু হয়েছিল তা শুধু কাজলের জন্যেই বলতে পারা যায়।

সুহাস বলেছিল—বাইরে আর কোথাও কি আপনার সোর্স আছে? আত্মীয়-স্বজন কেউ?

কাজল বলেছিল—আমি তো থাকি মেসে, আমার কোনও আত্মীয়-টাত্মীয় নেই—। তবে আপনি যখন বলছেন তখন আমি নিজেও আলাদা একটা কিনতে পারি—

—আপনার মেসে কেউ কিনবে না?

কাজল হেসে ফেলেছিল। বলেছিল—আমাদের মেসে সকলের আমার মতই অবস্থা, ধার করে করে মাস চালাতে হয়, তাদের কষ্ট দিতে চাই না—

তবু কাজল দু'টাকার টিকিট কিনেছিল শুধু সুহাসের জন্যে।

সুহাস বলেছিল—আপনার খুব ক্ষতি করে দিলাম তো? আপনার বোধহয় টানাটানি করতে হবে—

কাজল বলেছিল—এ আমাদের প্রত্যেক মাসেই টানাটানি করে চালাতে হয়—একটা মাস না হয় সৎকাজের জন্য টানাটানিই করলাম—

তা ফাংশনটা ভালই লেগেছিল কাজলের। কে. সি. দে গান গেয়েছিলেন। কী তাঁর গলা! আর কী দরদ!

কে. সি. দে, নজরুল ইসলাম, নলিনীকান্ত সরকার—যে-সব লোকের গানই শুনেছে এতদিন, চেহারা দেখেনি, সেই সবাই এসেছিলেন। যখন আসর শেষ হলো, সুহাস এসে জিজ্ঞেস করলে—আপনি একলা বাড়ি যেতে পারবেন তো?

কাজল বলেছিল—অনেক রাত হয়ে গেছে, না?

সুহাস বলেছিল—চলুন আপনাকে পৌঁছিয়ে দিই—

কাজল বলেছিল—কিন্তু আপনি চলে গেলে এখানে অসুবিধে হবে না তো?

—না না, অসুবিধে আর কী, আপনার জন্যে অনেক উপকার হয়েছে আমাদের, আপনি অনেক টাকার চাঁদা তুলে দিয়েছেন।

তা শেষ পর্যন্ত সুহাস শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের মেস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। অনেক রাত্রে সুধা দরজা খুলে দিয়েছিল ঘরের। সুধা

বলেছিল—ওমা, তুমি একলা এলে নাকি এত রাত্তিরে ?

কাজল বলেছিল—না, একজন পেঁছে দিয়ে গেল—

—কে কাজলদি ?

কাজল বলেছিল—ওই ওদের সমিতির একজন মেম্বার—

কিন্তু ফাংশান শেষ হয়ে গিয়েও মেলামেশা শেষ হয়ে যায়নি। নানা ব্যাপারে দেখা হয়ে যেত রাস্তায় যেতে আসতে।

কাজল একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—অনেক দিন যে দেখিনি আপনাকে ?

সুহাস বলেছিল—চাকরির খোঁজ করছি,—খুব ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে চারদিকে—

—তবে যে বলেছিলেন ব্যবসা করবেন ?

সুহাস বলেছিল—ব্যবসা করতেই তো স্যার বলেন, কিন্তু ব্যবসা করি কী করে বলুন তো! স্যার বলেছেন ব্যবসা করলে ক্যাপিট্যাল দেবেন আমাকে। বলেছেন—যে-কোন ব্যবসা করতে, একটা পান-বিড়ির দোকান করে বেহারীরা কত টাকা রোজগার করছে, আর বাঙ্গালীরা চাকরি বলতে অজ্ঞান—

—তা একটা পান-বিড়ির দোকানই করুন না!

সুহাস তখন খুব ছেলেমানুষ ছিল। সুহাস হেসে ফেলেছিল।

কাজল বলেছিল—আপনি পান-বিড়ির দোকান করলে আমাকে খদ্দের পেতে পারেন।

—আপনি বিড়ি খাবেন নাকি ?

কথাটায় সুহাসও হেসেছিল, কাজলও হেসেছিল। হাসতে হাসতেই তাদের আলাপ এগিয়ে চলেছিল। সুহাস একদিন বলেছিল—শেষকালে পুলিশের চাকরিতে একটা দরখাস্ত করে দিয়েছি, জানেন—

কাজল বলেছিল—শেষকালে এত চাকরি থাকতে, পুলিশ ?

সুহাস বলেছিল—কিন্তু কী করবো বলুন, আর যে কোথাও পাচ্ছি না। মার্চেণ্ট অফিসের চাকরি হয়ত খুঁজলে একটা পাওয়া যায়,কিন্তু কেরানীর চাকরি আর ভাল লাগে না।

—কিন্তু কোনদিন যদি স্বদেশীরা আপনাকে খুন করে ফেলে ?

সুহাস বলতো—করবে, করবে! আর করলেই বা কী করছি! কিছু না-করার চেয়ে কিছু করা ভাল! আর তা ছাড়া আমি খুন হলে আমার জন্যে কেউ অনাথা হবার ভয় নেই—

কাজল বলতো—ওমা, এখন না-হয় বিয়ে করেননি, কিন্তু একদিন তো বিয়ে করবেনই—

সুহাস বলতো—বিয়ে আমি করবো না।

—কেন ? বিয়ের ওপর এত বিরাগ কেন ?

সুহাস বলতো—আমার নিজের বিরাগ না থাকলেও, অন্য মেয়েদের তো আমাকে বিয়ে করায় বিরাগ থাকতে পারে। পুলিশকে বিয়ে করতে কে আর

চাইবে বলুন ?

কাজল বলতো—মেয়েরা না চাক, মেয়েদের অভিভাবকরা তো চাইতে পারে।

—কিন্তু কোন্ মেয়ের বাপের প্রাণ এত পাষাণ যে জেনেশুনে মেয়ের বৈধব্য কামনা করবে ?

কাজল বলতো—তাহলে এমন মেয়ে খুঁজে বার করুন না যার কোনও বাপ-মা আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই ?

সুহাস বলতো—তেমন কোনও মেয়ে যদি কোথাও জানা থাকে আপনার তো খবর দিন না, একটু চেষ্টা করে দেখি !

কাজল বলতো—বা রে, বিয়ের ঘটকালি করা আমার কাজ নাকি ?

হঠাৎ সুহাস বলেছিল—আচ্ছা, শুনেছিলাম আপনারও তো কোনও অভিভাবক নেই, আপনিই তো বলেছিলেন—

কাজল এর পরে আর দাঁড়ায়নি সেখানে। বলেছিল—আপনি দেখছি ভদ্রতার সীমা-রাখতেও জানেন না—

কিন্তু সুহাস তাতেও পেছ-পা হয়নি। তাড়াতাড়ি পেছনে গিয়ে বলেছিল —শুনুন—

সত্যিই কেমন রাগ হয়ে গিয়েছিল কাজলের। স্কুলের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছিল সে।

সুহাসের ডাকে একবার পেছন ফিরলো।

সুহাস বললে—দেখুন, আপনি যদি পুলিশের চাকরি অপছন্দ করেন তো পুলিশের চাকরি না-হয় করবো না, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—

এর পরে আর কয়েকদিন দেখাই নেই। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে বার বার এদিক-ওদিক চেয়েও কোনও হদিস মিলতো না সুহাসের। কাজল যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যেত।

সুধা বলতো—কাজলদি, কী হলো তোমার ?

কাজল বলতো—কই, কিছু হয়নি তো—

—তাহলে তুমি কিছু খেলে না যে ?

কাজল বলতো—আজকে শরীরটা ভাল নেই রে আমার—

সুধা বলতো—কিন্তু তোমাকে তো এত অন্যমনস্ক দেখিনি কখনও আগে ?

কাজল বলতো—বা রে, তা বলে শরীর খারাপও হবে না মানুষের !

সুধা বলতো—কিন্তু ক'দিন থেকে দেখছি তুমি আমাকে না নিয়েই একলা-একলা বেরিয়ে যাচ্ছো, একলা-একলা ইস্কুল থেকে চলে আসছো, রেবাদি বলছিল তুমি নাকি ভাল করে ক্লাশে পড়াচ্ছো না—তোমার হলো কী কাজলদি?

কাজল বলতো—তুই রেবাদিকে বলে দিস আজকে আমি স্কুলে যেতে পারবো না, আমার বড্ড মাথা ধরেছে—

সুধা বলতো—মাথা যদি ধরে থাকে তো ওষুধ নিয়ে আসছি, খেয়ে নাও না—

কাজল বলতো—আমার মাথা ধরার জন্যে তোকে ভাবতে হবে না, আমি ওষুধ আনিয়ে নেব, তুই যা—

সুধা শেষ পর্যন্ত চলে গেল। কিন্তু সেদিন কাজলও বেশিক্ষণ চুপচাপ ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকতে পারেনি। স্কুল নেই, তাই সমস্ত কিছুই ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে শ্রীগোপাল মল্লিক লেন থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে তাই-ই ঠিক ছিল না। তারপর মির্জাপুর স্ট্রীটে, তারপর কলেজ স্কোয়ার, তারপর ইনস্টিটিউটের সামনে গিয়েও খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক চেয়ে দেখেছিল। তারপর আর বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে সাহস হয়নি। দুপুরবেলার কলকাতা শহরের রাস্তার চেহারাটা দেখা তো অভ্যেস নেই। তাই কেমন নতুন লেগেছিল সব। এদিক-ও-দিক চাইতে চাইতে মনে হয়েছিল—ওই বুঝি সুহাস। ওই বুঝি সুহাস আসছে।

কিন্তু কোথায় কে? সুহাস হয়ত ততক্ষণ তার নিজের হোস্টেলে বসে তাস খেলছে কিংবা ঘুমোচ্ছে। সুহাস জানতেও পারছে না যে কাজল সারাদিন স্কুলেই গেল না তার জন্যে। সুহাসের জন্যেই কাজল রাস্তায় বেরিয়েছে অকারণে। কিন্তু কলকাতা শহরের ভেতরে কোথায় পাওয়া যাবে সুহাসকে?

সুধা বিকেলবেলা এসেই জিজ্ঞেস করলে—কেমন আছো কাজলদি?

কাজল কথাও বললে না, মাথাও তুললে না।

সুধা কাজলের কপালে ঘাড়ে হাত দিয়ে বললে—কই, জ্বর-টর তো হয়নি দেখছি, সেদিন অনেক রাত করেছিলে সেই জন্যেই হয়ত—

সেদিন অবাক কান্ড। সত্যিই অবাক হবার মত ঘটনা ঘটালে সুহাস।

ঠিক স্কুলে যাবার পথে একটা রাস্তার বাঁকের মুখে নিরিবিলি দাঁড়িয়ে ছিল সুহাস একলা। কাজলের হাতে একগাদা সেলাই-এর কাপড় আর পরীক্ষার খাতা। চোখ পড়তেই চোখ সরিয়ে নেবার কথা ভাবছিল কাজল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী বলবে ভেবে পেলে না।

সুহাস বললে—আমার ওপর রাগ করেছেন জানি, কিন্তু কলিকাতা থেকে চলে যাবার আগে আপনাকে বলে না-যাওয়াটা ঠিক নয়, তাই বলতে এলাম—

—কলকাতা থেকে চলে যাবেন?

সুহাস বললে—হ্যাঁ, চাকরি পেয়েছি—

কাজলের মুখটা বোধহয় একটু শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখনি সামলে নিয়েছে নিজেকে। বললে—কোথায় পেলেন? কলকাতা থেকে দূরে?

সুহাস বললে—হ্যাঁ, অনেক দূরে—

কাজল জিজ্ঞেস করলে—স্যারের মত আছে?

সুহাস বললে—স্যারকে বলিনি। স্যারকে বললে তিনি চাকরি নিতেই

দিতেন না। তিনি নিজে আট শো টাকা মাইনে পান, হাতে চল্লিশ টাকা রেখে আর সব দিয়ে দেন, তাঁর কথা আলাদা। তিনি তো বলেন, বাঙালীরা চাকরি করেই সব গেল—

—তা'হলে?

সুহাস বললে—তিনি বুড়ো হয়ে গেছেন, আমার মত অনেক ছাত্রই তাঁর মতের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, তাই তাঁর জন্যে আমার তত ভাবনা নয়, যত ভাবনা আপনার জন্যে—

—আমার জন্যে ভাবনা?

কাজল অবাক হয়ে গেল।

সুহাস বললে—শুধু ভাবনা নয়, ভয়ও বটে—

—ভয়? আমাকে আবার আপনার ভয় কিসের?

সুহাস বললে—পুলিশের চাকরি আপনি ঘেন্না করেন যে।

কাজল বললে—আমার ঘেন্নায় আপনার কী আসে-যায়।

সুহাস বললে—আসে-যায় বলেই তো যাবার আগে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে এলাম। আপনি তো পুলিশের চাকরি নিতে বারণ করেছিলেন।

কাজল হেসে ফেললে এবার। বললে—বা রে, আমি আপনার কে যে আমার বারণ আপনি শুনবেন?

সুহাস বললে—তা জানি না, তবে মনে হলো, এতে আপনার সায় নেই। আর আজকাল তো পুলিশের চাকরিতে তেমন সম্মান নেই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, একদিন আমিই স্যারের কথায় নিজের হাতে চরকা কেটে জামা-কাপড় তৈরী করিয়ে পরেছি। কিন্তু জীবন-যুদ্ধে আর পারছিলাম না—

কাজল বললে—কিন্তু আপনি তো সংসারে একলা, একলার জন্যে আবার জীবন-যুদ্ধটা কী।

—বা রে, একলা বলে বুঝি আর জীবন-যুদ্ধ থাকে না। আপনি নিজেও তো একলা, আপনাকেও তো জীবিকার জন্যে যুদ্ধ করতে হচ্ছে দিনরাত?

কাজল বললে—আমার কথা ছেড়ে দিন—

—কেন, আপনার কথা ছাড়বোই বা কেন? আপনিও তো এই শহরের একজন বুদ্ধিজীবী মানুষ। আপনাকেও তো আপনার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়—

কাজল বললে—আমার আবার ভবিষ্যৎ, স্কুল-মাস্টারণীর আবার ভবিষ্যতের ভাবনা—

সুহাস বললে—আচ্ছা, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা আপনাকে বলবো।

কাজলের বুকটা থর থর করে কেঁপে উঠলো। ভয়ে ভয়ে বললে—কী কথা?

সুহাস যেন সেই রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে একটু অন্তরঙ্গ হতে চেয়েছিল।

বলেছিল—আমার অনেক দিন থেকেই বলার ইচ্ছে, কিন্তু বলতে সাহস হয় না—

এর পর আর দাঁড়াবার সাহস হয়নি কাজলের। বললে—আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি আসি—

বলে কাজল আর দাঁড়ায়নি। সুহাসও আর ভয়ে তার অনুসরণ করেনি। কাজল যেন সেদিন তাদের স্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকে আত্মরক্ষা করে বেঁচেছিল।

এর পর আর ব্যাপারটা চাপা থাকেনি। এর পরই চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল কাজল। একেবারে বিয়ের আগের দিন সুধা জানতে পারলে। জেনে যেন আকাশ থেকে পড়লো।

বললে—সে কি কাজলদি? তোমার বিয়ে? কাল? কার সঙ্গে? আমি তো কিছুই টের পাইনি!

সুধার কথায় কাজল সেদিন মনে মনে হেসেছিল। যেন কাজল নিজেই জানতো! যেন জীবনে আগে থেকে সব কিছু জানা সম্ভব! জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে-বিচিত্র নক্সা পাতা আছে, তার রাজপথ অলি-গলি সব যদি জানতেই পারবে মানুষ তো জীবন এত জটিল হয় কখনও? জীবনে রং কখন ধরে আর কখন বদলায় কেউ কি আগে থেকে জানতে পারে? কাজলও জানতে পারেনি। আর জানতে পারেনি বলেই আজ আমাকে এই গল্প লিখতে হচ্ছে—

এ শুধু কাজলের গল্পই নয়, সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়েরও গল্প। আর শুধু দু'জনেরই বা কেন? আচারিয়া, সুধা, তাদের গল্পও বটে। উনিশ শো তিরিশ-একত্রিশ-বত্রিশ সালে যারা জীবন-যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল, যারা যুদ্ধের আগের আদর্শ সামনে রেখে জীবন-যুদ্ধে নেমেছিল তাদেরও গল্প। সেই সব দিন, যখন ছেলেরা চাকরি পায় না, মেয়েরা বিয়ে করতে বর পায় না, চার টাকা মণ চলের যুগেও যারা আধা উপোষ করে, যুগ বদলের পরে সেই সব মানুষের নিগ্রহ আর নির্যাতনের গল্প।

কোথায় গেলেন সেই স্যার পি. সি. রায়। সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সেই স্যার। যিনি বাঙালীর ভবিষ্যৎ দিব্য চক্ষে দেখতে পেয়ে বার বার সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করতেন। কোথায়ই বা গেল সেই পাড়ায় পাড়ায় লাঠিখেলা আর কুস্তির ক্লাব। কোথায় গেল সেই সব স্কুলের শিক্ষক, পাড়ার অভিভাবকদল! শুভানুধ্যায়ী মানুষেরা একে একে সব কোথায় অন্তর্ধান করলেন!

সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায় সেই যুগের ছেলে। সেই যুগের প্রতিনিধি। ছোটবেলায় দেশে বিধবা মাকে রেখে স্যার পি. সি. রায়ের দাতব্যের ওপর নির্ভর করে কলকাতায় এসেছিল। এসে খদ্দর পরেছে। কুস্তির ক্লাবে কুস্তি শিখেছে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে গিয়ে বক্তৃতা শুনেছে। বন্যার সময় কাঁধে কম্বল আর মাথায় চালের বস্তা নিয়ে সংকট-ত্রাণ করেছে, শরীর ঠিক রেখেছে,

মন ঠিক রেখেছে, স্বামী বিবেকানন্দের "ব্রহ্মচর্য" বই পড়েছে, নারীকে মা বলে জ্ঞান করেছে। সি. আর. দাশ, গান্ধী, সুভাষ বোস আর. জে. এম. সেন-গুপ্তের বক্তৃতা পড়েছে খবরের কাগজে। দেহে মনে পবিত্রতার আদর্শ নিয়ে এগিয়ে চলেছে। শেষকালে সেই ছেলেই কিনা আবার জীবন-যুদ্ধে অপারগ হয়ে পুলিশের চাকরি নিয়েছে।

প্রথম প্রথম মনে কষ্ট হয়েছিল সুহাসের। যেন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে স্যারের কাছে। যেন পুলিশের চাকরি নিয়ে সে সমস্ত বাঙালীর মুখে চুণ-কালি লেপে দিয়েছে।

সুহাস বলতো—জানো কাজল, আজ সুভাষ বোস এখানে এসেছিলেন মীটিং-এ, আর আমারই ডিউটি পড়েছিল—

সান্ত্বনা দিত কাজল। বলতো—তাতে কী হয়েছে, অত লজ্জা করবার কী আছে? তোমার মত আরো অনেক লোকই তো পুলিশের চাকরি করছে—

সুহাস বলতো—কিন্তু তারা তো কেউ আমার মত খদ্দর পরেনি এককালে—

প্রথম প্রথম সুহাসকে সান্ত্বনা দিয়ে কাজল চাঙ্গা করে রেখেছিল বলেই চাকরিতে তার উন্নতি হয়েছিল তাড়াতাড়ি। কত স্বদেশীদের লাঠি মারতে হয়েছে, জেলে পুরতে হয়েছে। নুনের সত্যাগ্রহের সময় নিরীহ গোবেচারী সত্যাগ্রহীদের ধরে নিয়ে গিয়ে থানায় পুরেছে। সে-সব দিনে সুহাস মাঝে মাঝে বড় মুষড়ে পড়তো। রাত্রে এসে বিছানায় শুয়ে একমনে চুপ করে থাকতো। মফঃস্বলের সদরে তখন চাকরি করছে সুহাস। চারদিকে স্বদেশীরা বোমা-গুলী-বারুদ নিয়ে আন্দোলন জুড়ে দিয়েছে। সেই সব দিনে পুলিশের চাকরি করা যে কী বিপজ্জনক, তা আজকালকার পুলিশরা কল্পনাও করতে পারে না। ধোপা-নাপিত বন্ধ হয়েছে। গয়লা দুধ পর্যন্ত দিতে আসে না—পুলিশের কোয়ার্টারে। একলা বউ তখন বাড়ির মধ্যে। আর বুড়ী বিধবা শাশুড়ী।

শাশুড়ীর তখন খুব বয়েস হয়েছে। শাশুড়ী বলতো—বৌমা, খোকা আজ এখনও বাড়ি আসেনি?

সুহাসকে এক-একদিন সমস্ত দিন সমস্ত রাত বাড়ির বাইরে থাকতে হতো ডিউটিতে। দুটো কনেস্টবল আর একটা রিভলবার ভরসা। সুহাসকে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ কংগ্রেসীদের সামনে এগিয়ে যেতে হতো বুক ফুলিয়ে। এরই নাম পুলিশের চাকরি, এরই নাম পুলিশের ডিউটি। কেন আত্ম-মর্যাদায় আঘাত লাগতো তখন। বিবেকের সঙ্গে লড়াই করতে হতো।

আর কাজল সেই নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে একমাত্র বুড়ী শাশুড়ীকে নিয়ে দিন কাটিয়েছে। সুহাসকে বুঝতেই দেয়নি তার নিজের মনের কথা। সুহাস যখনই সারাদিনের পর বাড়ি ফিরে এসেছে, কাজল হাসিমুখে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুহাস বলেছে—ভয় করছে না তোমার?

কাজল বলেছে—না না, ভয় করবে কেন? তুমি তো আছো!

সুহাস বলেছে—আমি তো তোমাকে বলেছিলাম, এ চাকরি আমার পোষাবে না, বিবেকের বিরুদ্ধে আর কত যুদ্ধ করবো?

কাজল বলেছে—না না, তুমি অত ভেবো না, ভগবানের ওপর বিশ্বাস রেখে কাজ করে যাও—কখনও অন্যায় কিছু না করলেই তো হলো।

সুহাস বলেছে—কিন্তু এও তো অন্যায়, এই কংগ্রেসীদের ধরে ধরে জেলে পোরা। তারা তো দেশের স্বাধীনতার জন্যেই প্রাণ দিচ্ছে—

এর পর কাজলের আর কিছু করবার থাকতো না। এর পর সুহাসের মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায়ও ছিল না।

বিয়ের দিন কেউই তো আসেনি। আসলে কে ই বা ছিল সুহাসের যে আসবে। এসেছিল সুহাসের দু'চারজন বন্ধু। যারা একসঙ্গে হোস্টেলে থাকতো। মা দেশে ছিল, তাঁকে খবরটা দেওয়া হয়েছিল শুধু, কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে আসবার সময়ও ছিল না, লোকও ছিল না। কারণ তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলেই চাকরিতে গিয়ে জয়েন করতে হবে মফঃস্বলে।

সুধার জন্যেই সেদিন দুঃখ হয়েছিল কাজলের বেশি করে।

সুধা বলেছিল—তুমি এতদিন ছিলে কাজলদি, তবু কাটতো এক রকম করে। কিন্তু তুমি চলে গেলে যে কী করে কাটাবো!

কাজল জিজ্ঞেস করেছিল—কেন, তোর আচারিয়ার খবর কী?

—সে তো পেনাঙ-এ।

—ওমা, এই তো সেদিন শুনলাম ইউ-কে'তে, আবার কবে পেনাঙ-এ গেল?

সুধা বললে—আজকাল বড্ড কাজ পড়েছে ওর অফিসের। খুব খাটিয়ে খাটিয়ে মারছে।

—কিন্তু তোদের বিয়ের কী হলো শেষ পর্যন্ত?

সুধার মুখটা শুকিয়ে গিয়েছিল। বলেছিল—কী জানি কাজলদি, কথা তুললেই কেবল বলে—এবার ঘুরে এসেই একটা কিছু ঠিক করে ফেলবো।

বিয়ের আগে যতদিন কাজল কলকাতায় ছিল ততদিন সুধার মুখটা কেমন শুক্‌নো শুক্‌নো দেখাতো। সেই শুক্‌নো মুখ আরো শুকিয়ে গেল কাজলের বিয়ের পর। সামান্য কয়েকজন লোকের নেমন্তন্ন হয়েছিল, কিন্তু সুধার মুখখানার দিকে চেয়েই কাজল নিজের বিয়েটা ভাল করে উপভোগ করতে পারেনি। ছোট একটা বাড়ির দু'খানা ঘর ভাড়া করে আরো-ছোট একটা বিয়ের উৎসব সম্পন্ন হয়েছিল। সবাই যখন খাওয়া-দাওয়ার পর বিদায় নিয়ে যে-যার বাড়ি চলে গিয়েছিল, তখন সুধা এসেছিল কাছে। একান্তে কাজলের পাশে বসে বলেছিল—আমাকে যেন ভুলে যেও না কাজলদি—

কাজল সুধাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল—তুই কী বলছিস্ মুখপুড়ী, তোকে আমি ভুলে যেতে পারি?

সুধার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে শুরু করেছিল।

সুধা বলেছিল—কিন্তু তোমার চিঠি নিয়ে আমার কী হবে কাজলদি রাত্তিরে একলা-একলা আমার ঘুমই আসবে না—আমি কী করে যে থাকবো সেখানে—

কাজল সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—তুই কিছু ভাবিসনি ভাই, আমি সেখান থেকে তোকে প্রায় চিঠি লিখবো—

সুধা বলেছিল—কিন্তু তোমার চিঠি নিয়ে আমার কী হবে কাজলদি, তোমাকে তো আর পাবো না—

কাজল বলেছিল—এখন তুই তাই বলছিস বটে, কিন্তু দেখবি তোর বিয়ে হয়ে গেলে একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবি—

সুধা বলেছিল—না কাজলদি, তুমি দেখো, আমি কিছুতেই অন্যরকম হয়ে যাবো না—

কাজল বলেছিল—যখন শাচাবিয়ার সঙ্গে ইউ-কে আর সিঙ্গাপুর আর পেনাঙ ঘুরে ঘুরে বেড়াবি, তখন আমার কথাটা ভাবিস্ একবার—

—নিশ্চয় ভাববো কাজলদি, নিশ্চয় ভাববো, আমাকে তুমি তেমন পাওনি।

রাত্রে সুহাস বলেছি---এই বুঝি তোমার বন্ধু সুধা?

কাজল বলেছিল—হ্যাঁ, ওর কথাই তোমাকে বলেছিলুম, আমাকে বড্ড ভালবাসে, আজকে একেবারে কেঁদে ভাসাচ্ছিল—আজ থেকে বেচারী একেবারে একলা হয়ে যাবে। আমার মত ও-ও একলা সংসারে। আমার কেউ-ই নেই, কিন্তু ওর সব থেকেও কেউ নেই—ওর আপন মামারা ওকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে, একটা খবরও কেউ নেয় না, ও বেঁচে আছে কি মরে গেছে—

—ও বিয়ে করবে না?

কাজল বলেছিল—সবাই কি আমার মত ভাগ্যবতী?

সত্যিই কাজল মনে করতো সে বড় ভাগ্যবতী! সুহাসের সঙ্গে কলকাতার বাইরে মফঃস্বলে প্রথম সংসার করতে গিয়ে বার বার নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করেছিল সে। কেমন গুছিয়ে কেমন মানিয়ে-গুণিয়ে সংসার পেতেছিল কাজল! তা সুহাসের আজও মনে আছে। কী অশান্তির দিন সে-সব। প্রাক্-যুদ্ধের বাঙলা দেশ। ঘরে ঘরে স্বদেশী, ঘরে ঘরে বিলাতি-বয়কট, ঘরে ঘরে 'বন্দে মাতরম্'। ঘরে ঘরে বোমা, পিস্তল, বন্দুক। বাঙলা দেশের মেয়েরা পর্যন্ত নেমেছিল সেদিন দেশের কাজে। গান্ধীজীর ডাকে সভা-সমিতিতে মেয়েরা হাসি-মুখে হাতের সোনার চুড়ি খুলে দিয়েছে। আর পুলিশের চাকরি নিয়ে সুহাস বিবেকের গলা টিপে নিজের দাসত্ব-দায় মোচন করেছে। পৃথিবীর কোথাও যখন সান্ত্বনার রেখাটুকুও দেখা যায়নি, অফিসের কর্তাদের কাছেও যখন সহানুভূতির শেষ চিহ্নটুকু নিঃশেষ হয়ে গেছে তখন ঘরের কোণে তার জন্যে ছিল অপার মমতা, অসীম সান্ত্বনা।

কাজল বলতো—মন দিয়ে চাকরি করাও তো একরকমের পুণ্য! যারা

তোমাকে খেতে পড়তে দিচ্ছে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা করাটা কি তোমার উচিত ?

সুহাস বলতো—এক-একবার ভাবি এ-চাকরি ছেড়ে দেব, কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিলেও যে পার নেই, আমার পেছনে স্পাই লাগবে, আমার জীবন নিয়ে তখন টানাটানি—

কাজল বলতো—অত অধৈর্য হচ্ছো কেন, চিরকাল এ-রকম থাকবে না, একদিন তো স্বরাজ হবেই দেশে—

—সে কবে হবে তার কি ঠিক আছে ?

কিন্তু এই রকম দোটানার মধ্যেই একদিন যুদ্ধ বেধে গেল পৃথিবীতে। এতদিনের ধ্যান-ধারণা, এতদিনের তপ-তপস্যা সব ভেঙে গুঁড়িয়ে পিষে থেঁতলে গেল। নর্থ পোল থেকে সাউথ পোল পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত স্তরে বিপর্যয় বেধে গেল রাতারাতি। স্যার পি. সি. রায়ের এতদিনের তপশ্চর্যার সমাধি হয়ে গেল রাতারাতি। যারা অসাধু তারা অসাধু রয়ে গেল, যারা সাধু তারাও আর সাধু রইল না। রাতারাতি রং বদলে গেল মানুষের, আর রং বদলে গেল মানুষের মনের আর মানুষের চেহারার।

আর ঠিক এই ডামাডোলের মধ্যে সুহাস বদলি হয়ে এল কলকাতায়।

আর শুধু বদলি নয়, একেবারে প্রমোশন নিয়ে চলে এল কলকাতা শহরে। আবার সেই আগেকার কলকাতা। যে-কলকাতায় একদিন ছাত্রজীবন কেটেছে, যে-কলকাতায় একদিন সংকট-ত্রাণ সমিতি করেছে। এই কলকাতার পথে পথেই একদিন বন্যার্তদের জন্যে চাঁদা আদায় করে বেড়িয়েছে। আর এই কলকাতার রাস্তাতেই একদিন কাজলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। শুধু মা-ই দেখতে পেলে না ছেলের এই উন্নতি। যশোরের কোন্ এক অজ সাব-ডিভিশন সেটা। মুড়াগাছা। নামেও যা, কাজেও তাই। সেই মুড়াগাছার ছোট পুলিশ কোয়ার্টারে গিয়ে প্রথম কাজলও মুষড়ে পড়েছিল আর মা-ও মুষড়ে পড়েছিল।

মা বলেছিল—এ কোথায় নিয়ে এলি বাবা আমাকে ?

সুহাস বলেছিল—চিরকাল কি আর এখানে থাকতে হবে মা, দু'এক বছর পরেই বদলি হয়ে যাবো অন্য কোথাও—

কাজলও প্রথম মুষড়ে পড়েছিল। কিন্তু মুখে তেমন কিছু বলতো না। মুখে বলতো—কই, আমার তো কোনও কষ্ট হচ্ছে না, আমার তো ভাল লাগছে, আমার তো বেশ ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে এখানে।

আরো বলতো—কলকাতাতে সেই ঘিঞ্জির মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছিলুম, এখন এখানে এসে একটু বেঁচেছি—

সুহাস প্রথম-প্রথম মন খারাপ করলে কাজলই বোঝাতো।

বলতো—আমরা কত সুখে আছি বলো তো ? অন্য সব লোকদের কথা ভাবো, যারা মাসে-মাসে নিয়ম করে মাইনে পায় না, যারা দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না। তাদের তুলনায় আমরা কত সুখী বলো তো ?

কিছুদিন থাকতে থাকতে মা'রও সহ্য হয়ে গিয়েছিল। মা'র শরীটাও ভাল হয়ে গিয়েছিল। শীতকালের দিনে মা রোদে বসে রোদ পোয়াতো। বাড়ির সামনে সুহাস ফুলের বাগান করেছিল। লাউগাছ পুঁইগাছ পুঁতেছিল। কী মিষ্টিই যে লেগেছিল সেই-সব তরকারী। সারাদিন বাড়ির বাইরে থেকে মনটা যখন বিবেকের সঙ্গে লড়াই করে করে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আসতো, তখন বাড়ি ফিরে এসে সংসারের আনন্দের মধ্যে আবার মনে হতো সে সুখী হয়েছে। হয়ত একদিন যে শিক্ষায় মানুষ হয়েছিল সুহাস, সে-শিক্ষার সুযোগ নিতে পারেনি। হয়ত স্যার পি. সি. রায়ের মুখ পুড়িয়ে দিয়েছিল সে, কিন্তু সংসারের চারদেয়ালের গণ্ডীর মধ্যে এসে তা আর তার মনে থাকতো না। সত্যিই মনে হতো সে সুখী। সাংসারিক লোক যাকে সুখী হওয়া বলে, সে-সুখ সে পেয়েছে।

কিন্তু দুঃখ থেকে গিয়েছিল মা'র জন্যে।

মা'র স্বাস্থ্য ভালই হচ্ছিল মুড়াগাছাতে। দেশ থেকে আসার পর স্বাস্থ্য ভাল হয়েছিল, মন ভাল হয়েছিল। ছেলের চাকরি হয়েছে, ছেলের বউ মনের মত হয়েছে, বুড়ো মানুষের জীবনে আর কী আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে?

মাঝে-মাঝে মা বলতো—বৌমা, আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না—

কাজল বলতো—আপনি ও-কথা বলবেন না,—ওতে আমাদের অকল্যাণ হয়—

—কিন্তু তোমার একটা ছেলে হলো না, সেই-ই আমার দুঃখ,—আমি এখানকার মঙ্গলচণ্ডী তলায় গিয়ে পুজো দিয়ে এসেছি; জানো—

এমনি আবোল-তাবোল বুড়ো মানুষের কথা সব। কাজলকে সবই শুনতে হতো। কিন্তু বুড়ো মানুষ শেষ পর্যন্ত মনের সাধ অপূর্ণ রেখেই চলে গেল। মৃত্যুর আগের দিন বলেছিল—বৌমা, খোকাকে ব'লো সে যেন ডাক্তার-টাক্তার দেখায়—

কিন্তু তারপরেই যুদ্ধ বেধেছিল। আর তারপরেই কলকাতায় বদলি হওয়া।

সুধা প্রায়ই চিঠি লিখতো। লিখতো—আমি এখনও সেই মেসটায় আছি কাজলদি, তুমি চলে যাবার পর থেকে আমি একলাই আছি সেই ঘরটাতে। একটু বেশি খরচ হচ্ছে, কিন্তু কী করবো বলো? কাউকেই আর ভাল লাগে না। একলা-একলাই সারাদিন কাটাই। তুমি কবে কলকাতায় আসবে?

কাজলও সান্ত্বনা দিত চিঠিতে।

লিখতো—আমি যাবো শিগ্‌গির, কিন্তু শাশুড়ীকে একলা ফেলে যেতে পারছি না। বুড়ো মানুষ, ভাল করে চোখে দেখতে পান না। সব সময়ে কাছে কাছে থাকতে হয় আমাকে—

তারপর যখন যুদ্ধ বাধলো, তখন সুধা লিখলে—যুদ্ধ বেধেছে, তুমি বেশ আরামে আছো কাজলদি, আমি কোথায় যাবো বুঝতে পারছি না—

কাজল লিখলে—তুই চলে আয় এখানে, আমার কোনও অসুবিধেহবে না—

কিন্তু সুধা লিখেছিল—না কাজলদি, এখন তো আমার ছুটি নেই। আর তা ছাড়া সময় কাটাবার জন্যে দু'একটা টুইশানি নিয়েছি, তাদের ছেড়ে যাই-ই বা কী করে ?

কাজল লিখেছিল—যেদিন তোর খুশি চলে আসবি, আমি স্টেশনে গিয়ে হাজির থাকবো—

কিন্তু তবু সুধা সময় করে উঠতে পারেনি। কিংবা হয়ত যেতে সংকোচ হয়েছে। কাজলদি সুখে আছে, তার মধ্যে আবার কেন সে গিয়ে ব্যাঘাত করবে।

কাজল লিখেছিল—কই, অনেক দিন তোর খবর পাইনি, তুই আসবি বলেছিলি তার কী হলো ? আর আচারিয়ার বা খবর কী ? সে এখন কোথায় ?

আচারিয়ার কথা একবারও লিখতো না সুধা। কাজল তখনই একটু অবাক হয়েছিল। এত ঘনিষ্ঠতা তাদের, এত পরিচয়। একদিন চিঠি না পেলে যে-মেয়ে অত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতো, সেই মেয়ে একবার আচারিয়ার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করে না।

কাজল পরের বার জোর তাগাদা দিয়ে লিখলো—বার বার করে তোকে আচারিয়ার খবর জানাতে লিখছি, তবু কেন লিখিস না ? তার খবর কী ? কোথায় সে ? তার সঙ্গে কি দেখা হয় না ? এর জবাব নিশ্চয়ই দিবি।

উত্তরে সুধা লিখলে—আচারিয়ার খবর জানতে চেয়েছ, কিন্তু সে-কথা চিঠিতে লেখা যায় না। যদি কোনদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়, তখন তোমাকে সব জানাবো।

এই চিঠিটা পেয়ে কাজল একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল। নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটেছে। নইলে সুধা তো এমন চিঠি লেখার মেয়ে নয়।

এমনি করে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে গিয়েছিল। আসল খবরটা জানা যায়নি। আর তাছাড়া কাজলেরও তো সংসারের কাজকর্ম আছে। তাকেও তো বুড়ো শাশুড়ী, স্বামী—সবাইকে নিয়ে সংসার করতে হয়। সুতরাং কাজলও আগেকার মত আর ঘন-ঘন চিঠি লিখতে পারতো না। যা-ও লিখতো তা-ও ছোট-ছোট। কাজল কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্নই হয়ে গিয়েছিল বলতে গেলে। তার জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত মনেও কিছু রং বদলেছিল। রং তো সকলেরই বদলায়। মন থাকলেই মনের রং বদলায়। তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ছোট ছোট চিঠি পেয়ে কিংবা দেরিতে চিঠি পেয়ে সুধা কিছু মনে করা ছেড়ে দিয়েছিল। সুধা জানতো তার কাজলদি বিয়ের পর বদলে যাবে। বদলে যাওয়াই স্বাভাবিক। বদলে না গেলেই বরং বুঝতে হবে বেঁচে নেই মানুষ। এই বদল, এই পরিবর্তন—এই-ই তো মানুষের জীবন।

এর পরেই বদলি হবার খবর এল।

কাজল লিখলে—তুই বোধহয় শুনে সুখী হবি, কলকাতায় আমরা বদলি হয়ে যাচ্ছি শিগ্‌গির—ওর একটা প্রমোশন হয়েছে—

সুধা লিখলে—কাজলদি, তুমি কলকাতায় আসছো শুনে কী খুশী যে হয়েছি কী বলবো। আবার যে তোমার সঙ্গে আমার কোনদিন দেখা হবে তা কল্পনাও করিনি। তুমি এলে সব বলবো তোমাকে, অনেক কথা জমে আছে মনে। তোমাকে না-বলতে পেরে আমার ঘুম হচ্ছে না। তুমি কবে আসবে লেখোনি কেন? কবে আসবে, নিশ্চয়ই পরের চিঠিতে জানাবে।

সুহাসের মনে আছে সেই দিনটার কথা। সেই প্রথম দিন। যেদিন বদলি হয়ে এল কলকাতায়। ট্রেনটা এসে শেয়ালদ' স্টেশনে পেঁছেছিল সকাল সাড়ে দশটায়।

তখন সবে যুদ্ধ বেধেছে। সে-শেয়ালদ' যেন আর নেই। সে চেহারা যেন আমূল বদলে গিয়েছে, খাকি পোশাকে ভরা চারিদিক। পুলিশ-পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। লোকে লোকারণ্য। মাত্র ক'বছরের ব্যবধান। তারই মধ্যে আরব্য উপন্যাসের মত সমস্ত জায়গাটায় যেন রূপান্তর ঘটে গেছে।

ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছাকাছি আসতেই মুখ বাড়িয়ে দেখলে কাজল। আর কিছুক্ষণ। আর একটু পরেই কলকাতা।

সুহাসও দেখছিল। বললে—আবার যে এখানে আসতে পারবো তা ভাবাই যায়নি—

কাজল বললে—জানো, বড় ভাল লাগছে আমার—

সুহাস বলেছিল—আমারও ভাল লাগছে—

কেন?

সুহাস বললে—কারণ এখানে ভাল কোয়ার্টার পাবো; সেই পাড়াগাঁয়ের ছোট বাড়ির মধ্যে আর তোমাকে বন্ধ থাকতে হবে না। এখানে কত কী আছে। কলকাতা শহর লাইফকে একঘেঁয়ে লাগতে দেয় না—

—কই, আমার তো একঘেঁয়ে লাগতো না সেখানে।

সুহাস বললে—মুখে না বললেও, আমি বুঝতে পারতুম তো। তাই অনেক চেষ্টা করে এখানে বদলি হয়েছি।

কাজল বললে—কিন্তু তোমার ধারণা মিথ্যে, আমার সেখানে মোটেই খারাপ লাগতো না। তুমি যেখানে থাকবে, সেখানেই আমার ভাল লাগবে। তোমার ভাল লাগলে সব জায়গায় যেতে রাজী আছি—

বলতে বলতে প্ল্যাটফরমে এসে পেঁছলো ট্রেনটা। মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধা কুলীর দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। লোক গিশ্‌ গিশ্‌ করছে প্ল্যাটফরমের ওপর। একটা অদ্ভুত গুম গুম আওয়াজ করতে করতে ট্রেনটা ঢুকলো।

জিনিস-পত্র গুছিয়ে নামতে একটু সময় লাগলো।

সুহাস জিজ্ঞেস করলে—তোমার সব নিয়েছ তো? কিছু ফেলে যাওনি তো?

কিন্তু কাজল তখন প্ল্যাটফরমের ওপর সুধাকে দেখে একেবারে দৌড়ে কাছে গিয়েছে।

বললে—এ কী চেহারা হয়েছে তোর ভাই?

সুধা বললে—কাজলদি, তুমি? আমার যে বিশ্বাস হচ্ছে না কিছুতেই—

এদিকে সুহাসের আর্দালি কানাই তখন এসে গেছে। সে থার্ড ক্লাশে ছিল। সঙ্গে আরো পুলিশ কনেস্টবল ছিল। তারাও এসে গেল। মালপত্র নামাবার কোনও অসুবিধে হলো না।

সুধা বললে—কাজলদি, তুমি আরো সুন্দর হয়ে গেছো, সত্যি—

কাজল বললে—তোকে আর খোশামোদ করতে হবে না, বিয়ে হলে তুইও সুন্দর হয়ে যাবি—

আজ এতদিন পরে সেই সব দিনগুলোর কথা যেন নতুন করে ভাবতে ভাল লাগে সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের। আজকের সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়—তখন লোকে বলতো মিস্টার মুখার্জি, পুলিশের চাকরিতে মিস্টার মুখার্জির আগে আর কেউ এমন প্রমোশন নাকি পায়নি। গ্রেড্ কমপ্লিট না হতেই আর একটা গ্রেডে প্রমোশন পাওয়া। লোকে বলে, চাকরিতে প্রমোশন পেতে গেলে মেরিটটা বড় কথা নয়, ফ্ল্যাটারিটাই আসল। অর্থাৎ খোশামোদ না করলে চাকরিতে উন্নতি নাকি হয় না কারো।

তা কই, মিস্টার মুখার্জির মনে পড়ে না কবে কাকে খোশামোদ করেছে।

আই-জি ছিল তখন গার্লিক। মিস্টার গার্লিক।

মিস্টার গার্লিক বলতো—আর ইউ হ্যাপি মুখার্জি?

মিস্টার মুখার্জি বলতো—ইয়েস স্যার—

ওয়ারের সময়, তখন ক্রাইমের সংখ্যা বেড়ে গেছে শহরে। এখানে চুরি, ওখানে ডাকাতি। আর ঘুষ। ঘুষের যেন বন্যা নেমে এল। সমস্ত কলকাতা পাগল তখন টাকা নিয়ে। দুহাতে টাকা লুটতে হবে। পৃথিবীতে যত টাকা আছে সব টাকা চাই আমার। আমার যদি টাকা না থাকে তো কারোর টাকা থাকা চলবে না। তোমার যদি টাকা থাকে তো আমাকে তার ভাগ দিতে হবে। নইলে তোমাকেও আমার মত নিঃস্ব হতে হবে। আর শুধু টাকা নয়, তোমার স্ত্রীর মত আমারও নারী চাই। তোমার গাড়ির মত আমারও গাড়ি চাই। তোমার বাড়ির মত আমারও বাড়ি চাই। সব চাই আমার। তোমার যা আছে, আমারও তাই চাই।

মিস্টার গার্লিক বললে—মুখার্জি, দিস্ মাস্ট বি স্টপড্—এ আর টলারেট করা যায় না, এ কাজ করতেই হবে—

ঠিক হলো মিস্টার মুখার্জিকে স্পেশ্যাল পাওয়ার দেওয়া হবে। থানার ইন্‌চার্জ নয়। সমস্ত বেঙ্গলের থানার ইন্‌চার্জ। পোস্টটাও স্পেশ্যাল। মিস্টার মুখার্জির অবাধ ক্ষমতা। শুধু ওয়ার-পিরিয়ডের জন্যে এ পোস্টটা

তৈরী হলো। দিল্লী থেকে কন্‌ফিডেনসিয়াল অর্ডার এসেছে। হোল্‌ ইণ্ডিয়ার পুলিশ অর্গানিজেসনের মধ্যে থেকে লোক বাছাই করে পোস্ট করতে হবে। কোন সিলেক্‌সন নয়, কোন ইণ্টারভিউ নয়—একেবারে খাঁটি নমিনেশনের ব্যাপার।

কলকাতাতে সুহাসের ওপর প্রীতির নজর পড়লো মিস্টার গার্লিকের।

বললে—সাবডিভিশনের কাজে আমি স্যাটিস্‌ফায়েড মুখার্জি, আই নমিনেট্‌ ইউ—তোমার কিছু আপত্তি আছে?

রাত্রে কাজলকে বলতেই কাজল জিজ্ঞেস করলে—তা তুমি কী বললে? তুমি রাজী হয়েছ তো?

সুহাস বললে—না, রাজী হইনি—তোমাকে জিজ্ঞেস না করে রাজী হই কী করে?

কাজল বললে—বা রে, তোমার চাকরির ব্যাপারে আমি কী বুঝি? তোমার যাতে উন্নতি হবে তাতেই মত দেওয়া উচিত—

—তবু তোমাকে না জিজ্ঞেস করে কি আমি রাজী হতে পারি? সব কাজই তো তোমাকে জিজ্ঞেস করে তবে করি। আমি দু'দিন সময় নিয়েছি মিস্টার গার্লিকের কাছে—

কাজল বলেছিল—মাইনে বাড়বে তো?

সুহাস বলেছিল—মাইনে তো বাড়বেই, কিন্তু মাইনেটাই তো সব নয়—আরো অনেক ব্যাপারই তো ভাবতে হবে।

—আর কী ব্যাপার?

সুহাস বললে—মাঝে মাঝে বাইরে যেতে হতে পারে—

কাজল বললে—তা যাবে।

—কিন্তু তুমি বাড়িতে একলা কী করে থাকবে?

কাজল বলেছিল—বা রে, আমি একলা থাকতে পারবো না? কলকাতা শহরে একলা থাকার অসুবিধে কী? মুড়াগাছায় সেই বন-জঙ্গলের মধ্যে একলা থেকেছি আর কলকাতা শহরে থাকতে পারবো না? এমন চাকরি কি কেউ হাত-ছাড়া করে?

—তাহলে নেব বলছো?

—নিশ্চয়ই নেবে। এ আবার জিজ্ঞেস করছো? এ-সুযোগ ক'জন পায়?

বাইরে সুহাস ছিল ইউনিফর্ম পরা ক্রস-বেল্ট্‌ আঁটা অফিসার। খাকি পোশাকে বাইরে থেকে দেখলে ভয় হতো, শ্রদ্ধা হতো, মাথা নিচু করতে ইচ্ছে করতো। কিন্তু আসলে কাজলের কাছে এলেই কেমন অন্য মানুষ। শিশুর মত কোমল, মেয়েমানুষের মত নরম।

কাজল বলতো—আচ্ছা, তোমাকে ভয় করে তোমার স্টাফ্‌রা?

—কেন, এ-কথা বলছো কেন?

—তোমাকে দেখলে তো মনেই হয় না, কেউ ভয় পায়। কেউ মানে

তোমাকে ?

সুহাস বলতো—বা রে, তাহলে আমার প্রমোশন হয় এই রকম? না মানলে কাজ চালাচ্ছি কী করে ?

—আমার তো ভয় করে না।

সুহাস হাসতো। বলতো—তোমার কাছে কি আমি পুলিশ যে তোমার ভয় করবে ? তোমার কাছে তো আমি সুহাস।

সত্যিই সুহাস এক-একদিন বাড়ি থেকে কোথায় চলে যেত। কখনও ময়মনসিং, কখনও ঢাকা, আবার কখনও বর্ধমান। আবার কখনও চব্বিশ পরগণা। সঙ্গে থাকতো কনস্টেবল, সঙ্গে থাকতো অন্য সব সরঞ্জাম। যুদ্ধের সময় তখন। একলা-একলা বাড়িতে থাকতে একটু ভয় ভয় করতো। বাড়িটা ছিল সাহেব-পাড়ার মধ্যে। বাড়ির মধ্যে কেউ খুন করে গেলেও কারো টের পাবার কথা নয়। বড় বড় গাছ চারিদিকে। তারই মধ্যে কোয়ার্টার, ওপাশে কানাই থাকতো আউট-হাউসে। আবদুলও থাকতো আউট-হাউসে। বিবিকে কাজল রেখে দিত নিজের শোবার ঘরের পাশে। বাগানে কয়েকটা গুল্‌মোহর গাছ। কয়েকটা পাম্। আর বড় বড় কয়েকটা অশ্বত্থ।

দিনের বেলা জায়গাটা ছায়া-ছায়া, কিন্তু রাত্রে চাঁদের আলো পড়লে ভারি ভাল লাগতো। একলা-একলা ওইখানে বেড়াতে ভাল লাগতো। অনেক দিন গল্প করতো বিবির সঙ্গে।

কাজল বলতো—জানিস বিবি, আমি এই কলকাতাতেই আগে ছিলুম—

বিবি নেপালী মেয়ে। বলতো—আমি আগে কলকাতা দেখিনি মাইজী—এই প্রথম দেখলুম—

কাজল জিজ্ঞেস করতো—এখন কলকাতা চিনে গেলি তো ?

—হ্যাঁ মাইজী, কলকাতা আমার জানা হয়ে গেল।

কাজল জিজ্ঞেস করতো—এ-ছাড়া আরো একটা বড় কলকাতা আছে, জানিস্ ?

—কোথায় মাইজী ?

কাজল বলতো—সে জায়গার নাম বউবাজার। সে এ-রকম জায়গা নয়। সেখানে বাড়িগুলো ঘেঁষাঘেঁষি। সন্ধ্যেবেলা ধোঁয়ার জ্বালায় টেকা যায় না সেখানে। সেখানে রাস্তায় ময়লা জমে পাহাড় হয়ে থাকে। সেখানে এত গাছ নেই—তুই যে-রকম আউট-হাউসে থাকিস, ওই রকম ঘরে বড়লোকের বাবু-বিবিরা ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করে—সেখানে মেস আছে। মেসের মধ্যে মেয়েরা থাকে। ইস্কুলের যারা মাষ্টারণী তারা সেখানে খুব কষ্টে দিন চালায়—জানিস ?

বিবি অবাক হয়ে যেত। বিবি সে-কলকাতা দেখেনি। বলতো—সে-ও কলকাতা শহর ?

কাজল বলতো—হ্যাঁ রে, সেখানে যারা থাকে তারা যে-ট্যাক্সো দের

এখানকার সাহেবরাও সেই একই ট্যাঙ্গো দেয়—

বিবি অবাক হয়ে সব শুনতো। গল্প করতে করতে ওদিকে হঠাৎ গেট খোলার শব্দ হতো। আর ঘোরানো মোরামের রাস্তায় কার পায়ের শব্দ হতো।

কাজল বলতো—দেখ তো বিবি, সুধা-দিদিমণি এল বোধহয়—

সত্যিই সুধা। সুধা না-হলে হঠাৎ এ-সময়ে আর কে আসবে!

কাজল বলতো—কী রে, তুই যে হঠাৎ? আজ ছুটি নাকি?

সুধার সেই আগেকার মতই চেহারা। হাঁফাতে হাঁফাতে এসে একেবারে কাজলের পাশের চেয়ারে বসে পড়েছে। যেন খুব ক্লান্ত, যেন খুব বিব্রত। খানিকক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারলে না।

কাজল জিজ্ঞেস করলে—কী রে, আচারিয়ার চিঠি এসেছে?

সুধা বললে—কাজলদি, সর্বনাশ হয়েছে, তুমি আমাকে বাঁচাও কাজলদি, বাঁচাও—

বলতে বলতে সুধা একেবারে ভেঙ্গে পড়লো কাজলের কোলের ওপর।

কাজল বলতো—কী হলো তোর? হলো কী?

সুধা আর কথা বলতে পারলে না। কেবল কাঁদছে তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কোলের ভেতর মুখ গুঁজে।

কাজল বললে—কী হলো বল্ না?

সুধা বললে—আমি আর কারো কাছে মুখ দেখাতে পারবো না কাজলদি, আমাকে বাঁচাও তুমি কাজলদি—

বলে অঝোরে কাঁদতে লাগলো সুধা।

কাজল সুধার মুখখানা নিজের কোলের ওপর তুলে নিলে। সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলো—চুপ কর্ তুই, আমি তো তোকে তখনই বলেছিলুম—আমি তো তখনই সাবধান করে দিয়েছিলুম তোকে—

কিন্তু সুধার তখন সে-সব সাবধান-বাণী শোনবার সময় নয়। যখন বাঁধ ভাঙে, তখন এ-সব কথার কোনও মানেও হয় না বোধহয়।

প্রথম দিন এটা বুঝতে পারেনি কাজল—যেদিন প্রথম সুহাস কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছিল। শেয়ালদ' স্টেশন থেকেই সোজা এসেছিল এই নতুন কোয়ার্টারে।

সুধা বলেছিল—না কাজলদি, তোমরা আগে নতুন কোয়ার্টারে গিয়ে ওঠো, তখন একদিন যাবো—আজ আর তোমাদের বিরক্ত করবো না—

কাজল ছাড়েনি। সুহাসকে বলেছিল—তুমি একটু বলো না ওকে যেতে, তুমি না বললে যাবে না বলছে। এ আমার বন্ধু সুধা—

সুহাস নমস্কার করেছিল। সুধাও নমস্কার করেছিল।

সুহাস বলেছিল—বিয়ের দিনই তো আপনাকে আমি দেখেছিলুম। চলুন না আপনি আমাদের সঙ্গে, আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না—

সুধা বলেছিল—কিন্তু আজকেই আপনারা এলেন, এখন আপনাদের সব জিনিস-পত্র গোছাতে হবে—

কাজল বলেছিল—সে-সব তোকে ভাবতে হবে না, সে আমাদের লোকজন সব রেডি আছে, পুলিশের চাকরিতে লোকের অভাব হয় না—

বাড়ি দেখে সুধা অবাক হয়ে গিয়েছিল। কাজলও অবাক হয়ে গিয়েছিল, সুহাসও অবাক হয়ে গিয়েছিল। মিস্টার গার্লিক মিস্টার মুখার্জির জন্যে এই ব্যবস্থা করে রেখেছিল আগে থেকে। স্পেশ্যাল স্কোয়াড্ পুলিশ। সাহেবের নিজের নমিনেট্ করা লোক। দেশী পাড়ায় থাকলে কাজের নাকি অসুবিধে হয়। ঠিক অর্ডিনারি পুলিশ নয়। আসলে মিলিটারি-কাম্-পুলিশ-কাম্-ওয়ার ডিপার্টমেণ্ট। খানিকটা সিক্রেট ওয়ার্ক। মুভ্মেণ্টও তার সিক্রেট থাকা উচিত। সত্যিই কাজলদি'র কী সৌভাগ্য। দু'জন একই ঘরে একই মেসে থাকতো, একই গ্রেডে চাকরি করতো। একই স্কুলে পড়াতো দু'জনে। অথচ আজ কাজলদি কোথায় উঠে গেল।

সুধা বললে—ভাই কাজলদি, আমার যে কী ভাল লাগছে, কী বলবো—সত্যি—

কাজল বললে—তুই থেকে যা আজ সুধা—এখানেই থাক্—

সুধা বললে—আজকে মেসে বলে আসিনি—আর একদিন আসবো বরং—

কাজল বললে—আরেক দিন নয়, কাল, কালই তোকে আসতে হবে—

সত্যিই পরের দিন এল সুধা। এসে বললে—জানো কাজলদি—রেবাদি কনকদি মলিনাদি সবাই আসতে চাইছিল তোমার কাছে, তাদের দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি বাইরে—

কাজল অবাক হয়ে গিয়েছিল। বললে—সে কী রে, তাদের ভেতরে নিয়ে আয়—

বলে কাজল নিজেই বাইরে গিয়ে সকলকে ডেকে নিয়ে এসেছিল। সেই রেবাদি কনকদি মলিনাদি। একদিন এক সঙ্গে কাজ করেছে। তখনও কারোরই বিয়ে হয়নি, সবাই ঠিক সেই রকমই আছে। সেই আগেকার মত। কাজল যেন বিয়ে করে তাদের চেয়ে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে হঠাৎ। অনেক উঁচু।

কাজলের ঐশ্বর্য দেখে সবাই সেদিন অবাকই হয়ে গিয়েছিল। কাজলের বাড়ি, কাজলের স্বামী, কাজলের চাপরাশি, কাজলের আয়া, কাজলের খানসামা। আবদুল, বিবি, কানাই সবাই মিলে সেদিন কাজলের বন্ধুদের আপ্যায়ন করেছিল। একদিনেই ঘরটা সাজিয়ে ফেলেছে।

রেবাদি বললে—তুমি যে আমাদের মনে রেখেছ তাতেই আমরা কৃতার্থ ভাই, আমরা তো প্রথমে ঢুকতেই সাহস পাইনি—

কনকদি, মলিনাদি তারাও সবাই সেই এক কথাই বলেছিল।

কাজল বলেছিল—আপনারা কিন্তু আসবেন রেবাদি মাঝে-মাঝে, আপনারা এলে আমি সত্যিই খুব খুশী হবো—সবে তো নতুন এসেছি কাল, আপনাদের

কিছু খাতির করতে পারলাম না ভাল করে—

কনকদি বলেছিল—তুমিও যেও কিন্তু ভাই—

—নিশ্চয়ই যাবো, নিশ্চয়ই যাবো।

পরের দিন সুধা আবার এসেছিল। বললে—সবাই খুব খুশী কাজলদি তোমার ওপর, বলছিল তোমার ভাগ্যটা খুব ভাল, কিন্তু বলছিল তোমার ছেলে-মেয়ে কিছু হয়নি কেন?

—ও কথা থাক্—আচারিয়ার কথা বল্—আচারিয়ার কথা বলছিস না কেন তুই?

সুধা বলেছিল—আমার কি-রকম যেন সন্দেহ হচ্ছে কাজলদি, আচারিয়া যেন অন্যরকম হয়ে গেছে—

—অন্যরকম হয়ে গেছে মানে?

সুধা বললে—কী জানি, সে-রকম যেন আর নেই।

—কেন? তার চাকরি আর নেই?

—না, তা আছে, কিন্তু আগে তুমি যেমন দেখেছিলে তেমন যেন আর নেই। তেমন করে যেন আর আগেকার মত ভালবাসে না আমাকে। একটুখানি দেখা করেই চলে যায়। বেশীক্ষণ থাকতে চায় না। বলে—কাজ আছে—

কাজল জিজ্ঞেস করলে—বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে কী বলে?

—ও কথা তুলতেই দেয় না, তুললেই অন্য কথা এনে ফেলে। তোমাকে এ-সব কথা চিঠিতে লিখতেও আমার খারাপ লাগতো কাজলদি, আগে কত ঘন-ঘন চিঠি দিত, এখন আমি দু'তিনখানা চিঠি দেবার পর একখানা দেয়—

—চিঠিতে কী লেখে?

সুধা বললে—লেখে আমি কেমন আছি, এই সব। আসল কথাটা একবারও লেখে না। কেবল এড়িয়ে যায়।

কাজল খানিকক্ষণ ভেবেছিল। তারপর ভেবে বলেছিল—কিন্তু কেন বিয়ে করতে চায় না, বল্ তো? তুই কিছু আন্দাজ করতে পারিস?

সুধা বলেছিল—না, কাজলদি, আমি কিছুই বুঝতে পারি না; আমার মনে হয়, আচারিয়া বদ্‌লে গেছে, আচারিয়ার কাছে আমি পুরোন হয়ে গেছি। আর মেয়েমানুষ হয়ে বার বার নিজের মুখে নিজের কথা বলতেই কি পারা যায়?

কাজল বললে—আচ্ছা, তুই এক কাজ কর, তুই একবার আমার সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দে—

সুধা যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিল। বলেছিল—তুমি দেখা করবে কাজলদি, সত্যিই তুমি দেখা করবে?

—নিশ্চয়ই দেখা করবো। তোর জন্যে আমি সব করতে পারি। তুই বোকা, তাই তুই আচারিয়াকে এখনও জব্দ করতে পারলি না। আমি হলে ওকে এতদিনে কবে স্বীকার করিয়ে ছাড়তুম। নিশ্চয় ওর কোনও বদ মতলব

আছে—

সুধা অতটা ভাবতে পারেনি। কিংবা অতটা ভাববার সাহসই হয়নি তার। বললে—না কাজলদি, তুমি ঠিক বুঝছো না, আচারিয়া অত খারাপ নয়, কিছুতেই অত খারাপ হতে পারে না—আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না, আমি এত বছর ধরে ওকে দেখে আসছি—ও কত বড় চাকরি করে, কত কাজে ব্যস্ত থাকে—

—কিন্তু তোকে বিয়ে করবে কি করবে না, সেটা তো খুলে বলবে?

—না কাজলদি, তুমি ওর ওপর রাগ কোর না, সত্যিই ও সময় পাচ্ছে না। এত কাজ ওর যে আমার কথা ইচ্ছে থাকলেও ভাবতে পারছে না। বিয়ে করতেও তো সময় লাগবে, সেই সময়ই নেই যে ওর। সারা ওয়ার্লড ঘুরতে হচ্ছে ওকে, মোটে সময়ই পাচ্ছে না—

কাজল বললে—কিন্তু এখন তো যুদ্ধ চলছে। এখন কোথায় যাচ্ছে ও?

—অফিস ওকে যে এখনও খাটাচ্ছে, এখনও যে বাইরে পাঠাচ্ছে ওকে, চাকরি ওর প্রাণ বার করে দিচ্ছে কাজলদি, চাকরিটা ছাড়তেও পারছে না। তিন হাজার টাকা মাইনের চাকরি এত হুট্ করে ছাড়া যায়, তুমিই বলো?

—কিন্তু বিয়ে করেও তো ও-চাকরি করা যায়। সবাই-ই তো তাই করে। সুহাসও তো করছে। দেখছিস না কী খাটুনি খাটতে হচ্ছে সারা দিন-রাত! কতদিন বাড়িতে আসতে পারে না—। তার সঙ্গে বিয়ের কি সম্পর্ক?

সুধা বললে—না কাজলদি, আচারিয়া তো মিথ্যে কথা বলবে না, মিথ্যে কথা বলবার লোক নয় ও, নিশ্চয় ওর কোনও অসুবিধে হচ্ছে—

কাজল বললে—তুই আর ওকে সাপোর্ট করিসনি সুধা, আমার কী রকম যেন সন্দেহ হচ্ছে, তুই একদিন নিয়ে আয় ওকে—

—তোমার এখানে নিয়ে আসবো?

—হ্যাঁ, আমি ওকে সব খোলাখুলি জিজ্ঞেস করবো।

কিন্তু ওকে যেন কোনও কড়া কথা শুনিয়ে দিও না কাজলদি, ও ভাববে আমি হয়ত তোমাকে সব বলেছি। একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ব'লো—

কাজল বলেছিল—সে আমি যা বলবার বলবো, তোকে কিছু ভাবতে হবে না। কবে নিয়ে আসবি বল? কালকে?

—ওমা, কালকে কী করে আনবো? সে যে এখন বর্মায়—

—কবে বর্মা থেকে আসবে?

—শিগ্গিরই আসবার কথা আছে, এলেই তোমার কাছে নিয়ে আসবো।

সেদিন এই পর্যন্ত কথা হয়েছিল। কিন্তু এর পরেই কাণ্ডটা ঘটলো।

সুহাস চলে যেত নিজের কাজে। এক-একবার দশ-বারো দিন একসঙ্গে বাইরে থাকতে হতো। আবার হঠাৎ একদিন এসে পড়তো। কোনও ঠিক-ঠিকানা ছিল না যাওয়া-আসার। তার চাকরিটাই এমনি। কাজলের কোনও অসুবিধেই

ছিল না। রেবাদি কনকদি মলিনাদি, তারা আসতো মাঝে-মাঝে।

বলতো—সত্যি ভাই, তোমার কাছে এসে কিছুক্ষণ কাটালে আমরা সব ভুলে যাই—

—তা আসেন না কেন রোজ? আমি তো একলাই থাকি সারাদিন, আমার তো কোনও কাজ নেই—

—তোমার মতন ভাগ্য করে তো আমরা আসিনি ভাই—। অনেক ভাবনা ভাবতে হয় আমাদের,—তুমি তো সবই জানো।

কাজল বলতো—কিন্তু আপনারা এলে আমি যে কী খুশী হই কী বলবো।

তারা জিজ্ঞেস করতো—কী করে সময় কাটাও তুমি?

—কী আর করি, এই ঘর গুছোই, রান্নার যোগাড় করি আর সুধা মাঝে-মাঝে এলে গল্প করি বসে বসে তার সঙ্গে—ও-ও তো রোজ আসতে পারে না। আর তারপর বাগান আছে আমার, বাগানে কত গাছ লাগিয়েছি। ফুলের গাছ লাগিয়েছি, ওদিকে লাউ-কুমড়ো শাকও লাগিয়েছি—

সবাই চলে গেলে বিবি জিজ্ঞেস করতো—ওরা কে মাইজী? তোমার রিস্তাদার?

কাজল বলতো—না রে বিবি, রিস্তাদার আমার কেউ নেই পৃথিবীতে—ওরা সব আমার বন্ধু, ওদের সঙ্গে আমি একসঙ্গে চাকরি করেছি—

বিবিও অবাক হয়ে যেত শুনে। বলতো—মাইজী, আপনার কাছ ছেড়ে আমি কোনওদিন অন্য জায়গায় যাবো না—

—কেন রে? অন্য জায়গায় যদি মাইনে পাস?

—তবুও যাবো না মাইজী। আমি যতদিন বাঁচবো ততদিন আপনার কাছে কাজ করবো।

আশ্চর্য মানুষের মন। আশ্চর্য মানুষের মায়া-মমতা করবার ক্ষমতা। কেন যে মানুষ একজনকে এমন করে ভালবাসতে পারে, আবার কেনই বা এত ঘৃণা করতে পারে! যে-মানুষ আকর্ষণ করে, সেই মানুষই আবার দূরে ঠেলেও ফেলে। সুহাস এতদিন চাকরি করেছে, এত অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে এসেছে, তবু মনে হয়েছে এতদিনের শেখা যেন তার সব মিথ্যে। এতদিনের জানা যেন তার সব ভেজাল। মানুষকে যদি চিনতেই পারবে, তবে এত গল্প এত উপন্যাস লেখা হলো কেন পৃথিবীতে। আর কাজলই বা উপন্যাস লিখতে সুরু করেছিল কেন শেষকালে?

সুহাস একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—কী করে সময় কাটাও তুমি?

—কী করে আর কাটাবো? তোমার কথা ভেবে ভেবে সময় কাটাই—

সুহাস হেসেছিল কথাটা শুনে। কাজলও হেসেছিল। আসলে কথাটা যে সত্যি তা দু'জনেই জানতো। সুহাস যেখানেই থাকুক, কাজলের কথা মন থেকে কি দূর করতে পারতো? কাজলও যখন একা-একা ব্যালকনিতে চেয়ারটা টেনে এনে বসতো—বসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতো তখনও সুহাসের কথা

ভাবতো।

একদিন হঠাৎ দুপুরবেলাই সুহাস এসে পড়েছিল বাড়িতে। সামনের ব্যালকনির একটা টেবিলে লেখার কাগজপত্র। অনেক কিছু লেখা রয়েছে কাগজ গুলোতে। এক বাণ্ডিল কাগজ। কাগজগুলো দেখে কিছুই বুঝতে পারেনি সুহাস। কাউকে চিঠি লিখছে নাকি এত বড়-বড় ?

কাজল এসে পড়তেই সুহাস বললে—এগুলো কী গো ? চিঠি ?

ওমা, তুমি কখন এলে ?

—এই তে এখনি। কিন্তু এগুলো কী লিখছো গো ?

কাজল বলেছিল—ও কিছু না, ও-সব তুমি দেখো না—

বলে কাগজগুলো গুটিয়ে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সুহাস ছাড়েনি। বললে—এত বড় চিঠি লিখছো কাকে তুমি ?

শেষ পর্যন্ত বলতেই হয়েছিল। কাজল বলেছিল—গল্প—

সুহাস অবাক হয়ে গিয়েছিল। কাজল বলেছিল—গল্প লিখছো তুমি ? এত বড় গল্প ?

কাজল বলেছিল—বসে থাকি তো সারাদিন, কোনও কাজই থাকে না দুপুরবেলা, তাই—

—তুমি গল্প লিখতে নাকি কোন কালে ?

কাজল বলেছিল—লিখিনি, তবে গল্পের বই তো পড়েছি, সেই রকম করে লেখবার চেষ্টা করছি—

—কী নিয়ে লিখছো ?

কাজল বলেছিল—আমার এক বন্ধুর জীবন নিয়ে—

—কোন্ বন্ধুর ?

কাজল বলেছিল—সে শেষ হলেই জানতে পারবে।

সুহাস যখন আসতো তখন সে-ক'দিনের আর কোনও ভাবনা থাকতো না কাজলের। কোথা দিয়ে সময় কেটে যেত, টের পেত না কেউ। কাজের কি শেষ আছে। সমস্ত দিন ধরে গল্প করেও ফুরতো না—আবদুল, বিবি, কানাই —ওরাও যেন কেমন খুশী হয়ে উঠতো সে-ক'দিন। কিন্তু যুদ্ধ যত বাড়তে লাগলো, সুহাসের কাজ যেন দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে চলতে লাগলো। সারা পৃথিবীর মানুষের বিরুদ্ধে যেন সারা পৃথিবীর মানুষ উঠে পড়ে লেগেছে।

গার্লিক সাহেব বলতো—মুখার্জি, আরো স্টাফ বাড়াতে হবে, আমাদের স্টাফের সর্টেজ হচ্ছে—

যুদ্ধের যারা বিপক্ষে তাদেরই শায়েস্তা করার কাজ স্পেশ্যাল স্কোয়াডের। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে জাল পেতে ফেলেছিল গার্লিক সাহেবের ডিপার্টমেণ্ট। র‍্যাণ্টি-সোশ্যাল এলিমেণ্ট কোথাও দেখলেই তাদের ধরে চালান দিতে হবে। তারপর যখন সময় হবে, তখন বিচার হবে, কিংবা বিচার হবে না। কিন্তু

যুদ্ধের কাজে বাধা দেওয়া চলবে না। ন্যাশন্যাল ওয়ার ফ্রন্টের কাজে সাহায্য করে যাবে এই পুলিশের স্পেশ্যাল পুলিশ স্কোয়াড।

যখন সুহাস অনেক দিন পরে বাড়ি আসতো, কাজল আনন্দ দিয়ে, সমবেদনা দিয়ে তার সব ক্লান্তি দূর করতে চেষ্টা করতো। তারপর আবার একদিন বাইরে যাবার নির্দেশ আসতো। আবার একদিন ব্যাগ-ব্যাগেজ গুটিয়ে নিয়ে আর্দালি কনেস্টবল নিয়ে বেরিয়ে পড়তো সুহাস। কখনও সাত দিন, কখনও পনেরো দিন। বাঙলা দেশে কোনও জেলা, কোনও গ্রাম দেখতে আর বাকি থাকেনি সুহাসের।

কাজল জিজ্ঞাসা করতো—আর কতদিন চলবে তোমার এই রকম ঘোরাঘুরি?

সুহাস বলতো—যুদ্ধ যতদিন চলবে—

—আর কতদিন যুদ্ধ চলবে?

সুহাস বলতো—যুদ্ধ চলে গেলে আমার এই স্পেশ্যাল চাকরিও তো চলে যাবে—আবার যে-কে-সে—

হয়ত ভালই হয়েছে। সুহাসের মনে হতো হয়ত এ ভালই হয়েছে। এ না হলে তো আবার তাকে সেই সাবডিভিসনের চার্জ নিয়ে গ্রামে যেতে হবে। সেখানে কোথায় থাকবে এই কোয়ার্টার, কোথায় থাকবে কাজলের এই মানসিক আরাম। যে-ক'বছর কলকাতায় আছে, সেই ক'বছরই তবু কাজল আবার তার পুরোন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে পারবে, তাদের সঙ্গে হাসি-গল্প করতে পারবে। কাজলের সুখটাই তো বড় কথা। কাজলের আনন্দই তো তার আনন্দ।

সুধা এলেই কাজল জিজ্ঞেস করতো—কী রে, এল আচারিয়া?

সুধা বলতো—না কাজলদি, কী যে করবো বুঝতে পারছি না—চিঠিও পাচ্ছি না বহুদিন ধরে—

—কিন্তু বর্মায় তো যুদ্ধ চলছে। এ-সময়ে সেখানে গেল কেন?

—আর কেন কাজলদি, চাকরির জন্যে।

—কিন্তু চাকরিটা বড় না জীবন বড়?

সুধা বলতো—যখন গিয়েছিল সেখানে, তখন তো যুদ্ধ বাধেনি, এখন এমন হবে কে জানতো?

—এখন হয়ত সেখানে আটকে গেছে, তাই আসতে পারছে না। আর সেইজন্যেই হয়ত চিঠিও লিখতে পারছে না।

সুধা বলতো—তাই হবে হয়ত—

কাজল বলতো—তা সে যাই হোক, এখানে এলে একবার তুই নিশ্চয়ই নিয়ে আসবি আমার কাছে, আমি সব খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে নেব—কী চায় সে—

কিন্তু সেদিন এক অবাক কাণ্ড ঘটলো।

সুহাস সেদিনও বাড়ি নেই। সন্ধ্যেবেলা কাজল বিবির সঙ্গে বসে বসে

আজেবাজে গল্প করছে। কোথায় কাজলের দেশ ছিল, দেশে কে কে ছিল, কোথায় চাকরি করতো—এই সব গল্প।

বিবি বলছিল—আমি আপনার নোকরি ছেড়ে কোথাও যাবো না মাইজী—

এমন সময় গেট খোলার একটা মড় মড় শব্দ হলো।

কাজল বললে—কেউ বোধহয় এল বিবি—দেখ তো কে? সুধা দিদিমণি বোধহয়—

কানাই ছিল কাছে। সেও এগিয়ে গেছে গেট-এর দিকে। সে এসে বললে—সুধা-মাসিমা এসেছে মা—

সুধা বাগানের ঘোরানো রাস্তাটা দিয়ে একেবারে সামনে এসেই পাশের চেয়ারটাতে বসে পড়েছে। বসে পড়েই হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠেছে—আমার সর্বনাশ হয়েছে কাজলদি, সর্বনাশ হয়েছে আমার—

কাজল তাড়াতাড়ি সামলে নিয়েছে সুধাকে। তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসালো তাকে। তারপর বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিলে। বললে—কী হয়েছে বল্ তো?

আবদুল ভেবেছিল প্রত্যেকদিন যেমন সুধা-দিদিমণি আসে আর তাকে চায়ের জন্য হুকুম করে মাইজী, সেই রকম হুকুম করবে। আবদুল তৈরিই ছিল। আবদুল কানাইকে জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ রে কানাই, চা করতে হবে না?

বিবিও অবাক হয়ে গিয়েছিল। সে ছাড়া কাজলের এক দণ্ড চলে না। দিনের মধ্যে যতক্ষণ কাজল জেগে থাকে ততক্ষণ বিবি তার সঙ্গে থাকে। কখনও গল্প করে, কখনও কাজলের চুল বেঁধে দেয়, কখনও আলতা পরিয়ে দেয়, নখ কেটে দেয়। সে-ও অবাক হয়ে গিয়েছিল মাইজীর ঘরের দরজা বন্ধ দেখে।

দরজা খুললো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সে অনেকক্ষণ পরে। অনেকক্ষণ পরে মাইজী বেরোল। সুধা-দিদিমণিও বেরোল।

বেরিয়ে মাইজী বললে—বিবি, আমি বেরোব, আমার শাড়ি-ব্লাউজ বার করে দে—

শাড়ি-ব্লাউজ বার করে দিলে বিবি। তারপর গাড়িতে করে বেরিয়ে গেল দু'জনে। কোথায় গেল কে জানে। মাইজীর মুখের চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করতেও সাহস হলো না কোথায় যাবে মাইজী। কখন আসবে, কখন খাবে তাও জিজ্ঞেস করতে পারলে না কেউ। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাজল আর সুধা দু'জনেই তাতে উঠে চলে গেল।

আবদুল কানাইকে জিজ্ঞেস করলে—কোথায় গেল মাইজী?

কানাই বললে—আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন? আমি তার কী জানি? মাকে জিজ্ঞেস করলে না কেন?

কিন্তু মা তো এমন করে বেরোয় না কোনওদিন। কোনওদিন এমন করে দরজা বন্ধ করে কারোর সঙ্গে কথাও বলে না। কলকাতায় আসার পর সেই-ই

বোধহয় প্রথম মা একলা একলা বেরোল। আগে কখনও বেরোয়নি তা নয়। নতুন বাড়িতে এসে জিনিস-পত্র কেনাকাটা নিয়ে কতদিন বেরিয়েছে সাহেবের সঙ্গে। আবার একসঙ্গে দু'জনে বাড়ি ফিরে এসেছে। ফিরে এসে কোনওদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে রেডিও শুনেছে, গল্প করেছে। তখন আবদুল, বিবি, কানাই যে-যার ঘরে গিয়ে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছে। অনেক রাত পর্যন্ত সাহেবের ঘরে আলো জ্বালা দেখেছে। তারপর কখন আলো নিভে গেছে, কখন কে ঘুমিয়ে পড়েছে কেউ খোঁজ-খবর রাখেনি।

যুদ্ধের সময় ব্ল্যাক্-আউটের রাতে বাইরে থেকে আলো দেখা যেত না। সেই তখনও কানাই অনেক রাত পর্যন্ত বাবু আর মা'র গলা শুনতে পেয়েছে। বোঝা যেত ভেতরে দু'জনের খুব জোরে জোরে কথা হচ্ছে। বাইরে থেকে শুনলে মনে হতো যেন ঝগড়া করছে বাবু আর মা। কিন্তু সকালবেলা বোঝা যেত না কিছুই।

সকালবেলা মা বলতো—আর এক কাপ চা দেব তোমাকে ?

বাবু বলতো—না, আর নয়, দু'কাপ তো খেয়ে ফেলেছি এরই মধ্যে—

ঐ অবস্থায় হঠাৎ সুধা-দিদিমণির সঙ্গে মা'কে বেরিয়ে যেতে দেখে সবাই যেন কেমন অবাক হয়ে গিয়েছিল।

সেদিন হঠাৎ সুহাস আবার এসে পড়লো মফঃস্বল থেকে। আর্দালি, কনেস্টবল, সবাই মিলে হুট্ করে এসে পড়লো।

কানাই ছিল নিজের ঘরে। গেট খোলার শব্দ হতেই একটু দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়েছে। কে ? কে এল ? মা নাকি ?

আবদুলও খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়ে নিজের বিছানাটা বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে। একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল সবে। হঠাৎ বাইরে শব্দ শুনে বুঝলো মাইজী এল।

বিবিও ঝিমোচ্ছিল। শব্দ পেয়েই ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালো।

মাইজী এসে গেছে। মাইজী এসে খাওয়া-দাওয়া করলে তবে তার কাজ শেষ। তবে সে গিয়ে নিজের ঘরে ঘুমোতে পারবে।

কিন্তু সাহেবের গলার শব্দ পেয়েই সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

কানাইকে সামনে পেয়েই বাবু জিজ্ঞেস করলে—মা কোথায় রে কানাই ? বাড়ি নেই ?

কানাই আম্‌তা আম্‌তা করে বললে—না, বাড়ি নেই—

—বাড়ি নেই তো কোথায় গেছেন ?

কানাই বললে—আজ্ঞে, তা তো বলে যাননি—

—কখন বেরিয়েছেন ?

—সেই সন্ধ্যেবেলা।

সন্ধ্যেবেলা! সন্ধ্যেবেলা থেকে বেরিয়েছে। সন্ধ্যেবেলা থেকে এই এতক্ষণ!

সুহাস ঘড়িটা দেখলে একবার। এতক্ষণ ধরে কোথায় আছে কাজল।

আবার জিজ্ঞেস করলে—কখন আসবেন কিছু বলে গেছেন?

—আজ্ঞে না তো।

সুহাস আবার জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, বিবিকে জিজ্ঞেস কর তো—

কানাই বিবিকে জিজ্ঞেস করে এল। সেও জানে না। আবদুলকে জিজ্ঞেস করে এল, সে-ও জানে না। এমন তো কখনও হয়নি। কলকাতায় এতদিন হলো এসেছে, এমন কখনও হয়নি। তা ছাড়া এই ব্ল্যাক-আউটের রাত্রে কোথায় গেল সে।

নতুন করে আবার রান্না করলে আবদুল। সুহাস খেয়ে-দেয়ে নিলে। তারপর চুপচাপ বসে রইল ইজি-চেয়ারে হেলান দিয়ে। হেলান দিয়ে ক্লান্তিতে বোধহয় একটু ঘুমিয়েই পড়েছিল। হঠাৎ কাজলের গলার শব্দে তন্দ্রা ভেঙে গেল।

—ওমা, তুমি কখন এলে?

সুহাস চোখ খুলতেই দেখলে, কাজল সেজেগুজে ঘরে ঢুকেছে। গায়ে সেন্টের গন্ধ। কপালে একটা টিপ্ পরেছে। ঠোঁট দুটো যেন পান খেয়ে রাঙা করা।

কাজল বসে পড়লো একেবারে পাশ ঘেঁষে। বললে—আমি তো ভাবতেই পারিনি তুমি আজকেই আসবে।

—এমনি কাজটা মিটে গেল আর এসে পড়লুম।

কাজল বললে—তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে?

সুহাস বললে—হ্যাঁ—

কাজল একটু হেসে আরো কাছে সরে এল। বললে—কই, তুমি তো জিজ্ঞেস করলে না আমি কোথায় গিয়েছিলুম?

সুহাস বললে—সত্যি, কোথায় গিয়েছিলে এত রাত পর্যন্ত?

কাজল বললে—বলো তো কোথায়?

—তোমার সেই সব পুরোন বন্ধুদের কাছে বুঝি? সত্যি, একলা-একলা তোমার থাকতে ভালই বা লাগবে কেন? আমি না-হয় কাজে ব্যস্ত থাকি, আমার সময় এক-রকম কেটে যায়। তোমারই অসুবিধে। তুমি তো এখনও খাওনি?

কাজল বললে—না, বিকেলবেলা তো পেট ভরে অনেক খেয়েছিলুম, তাই আর ক্ষিদে নেই।

—কিন্তু এত রাত করলে কেন? ব্ল্যাক-আউটের রাতে এতক্ষণ কি বাইরে থাকা ভাল?

তারপর খাওয়া-দাওয়ার শেষে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বাবু আর মা অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলেছে। কানাই আবার গিয়ে আউট-হাউসের ভেতর শুয়ে পড়েছে। আবদুলও শুয়েছে, বিবিও ঘুমের ঘোরে ঢুলছিল, সেও অঘোরে

ঘুমিয়ে পড়েছে কখন। মাঝরাত্রে কানাই একবার ঘুম থেকে উঠেছিল। দেখলে, জানালার ভেতর দিয়ে তখনও ঘরের ভেতর আলো দেখা যাচ্ছে। তখনও যেন বাবু আর মার কথার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে খুব জোরে জোরে কথা বলছে। বাইরে থেকে কান পেতে শুনলে মনে হয় যেন দু'জনে ঝগড়া করছে।

কিন্তু সকালবেলা মুখ দেখে আর কিছু বোঝবার উপায় নেই।

কাজল টী-পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে বললে—আর এক কাপ চা দেব তোমাকে?

সুহাস বললে—না, আর নয়, দু'কাপ তো খেয়ে ফেলেছি এর মধ্যে—আর খাবো না।

সে-ক'টা বছর যে কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছিল। কানাই-এর কাছে যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়। বাবু কোথায় কোথায় বেরিয়ে যেত, আর হুট্ করে একদিন চলে আসতো। সাহেব পাড়ার সেই নিরিবিলি বাড়িটাতে কানাই-এর বলতে গেলে কোনও কাজই ছিল না।

সুধা সেদিন আবার এল হঠাৎ।

বললে—কাজলদি, আচারিয়া কলকাতায়—

—কলকাতায়? বলছিস্ কী রে? সে বর্মায় ছিল বলেছিলি?

সুধা কেঁদে ফেললে। বললে—আমি তাকে হঠাৎ রাস্তায় দেখলুম আজ—

—রাস্তায়? তাহলে কবে এল সে?

সুধা আর কথা বলতে পারলে না খানিকক্ষণ। তারপর বললে—আর একজন মেয়ের সঙ্গে দেখলুম তাকে আজ—

—মেয়ে? মেয়েটা কে? কোথাকার মেয়ে? চিনিস তুই?

সুধা বললে—না কাজলদি, দেখে মনে হলো য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, আমাকে দেখতে পায়নি। আমি টুইশ্যানি সেরে ফিরছি, হঠাৎ বাস থেকে দেখতে পেলুম বৌবাজার স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে—

কাজল বললে—তাহলে বর্মায় যায়নি? এখানেই ছিল এতদিন?

—তা জানি না কাজলদি, আমার যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

কাজল বললে—তা তুই তখুনি বাস থেকে নেমে কথা বললি না কেন?

সুধা বললে—আমার কেমন ভয় করতে লাগলো কাজলদি, আমি সোজা বাস থেকে নেমে উল্টো দিকের বাস ধরে তোমার এখানে চলে এলাম—

—তা এখন কী করবি? তুই আচারিয়ার বাড়ি চিনিস? কোন্ হোটেলে থাকে জানিস?

সুধা বললে—জানলেও সেখানে আমি একলা যেতে পারবো না, সেইজন্যেই তোমার কাছে পরামর্শ নিতে এলাম, কী করি বলো দিকিনি?

কাজল বললে—চল্, আমি যাচ্ছি তোর সঙ্গে—

—তুমি যাবে ?

তারপর বিবিকে ডাকলে কাজল। বিবি এল। নতুন ধোয়ানো শাড়ি-ব্লাউজ বার করে দিলে। আবার গাড়ি বেরোল। যাবার সময় বলে গেল—ফিরতে দেরি হবে ; আবদুল, কানাই সবাই যেন খেয়ে নেয়—

মাইজী বেরিয়ে যাবার পর আবদুল জিজ্ঞেস করলে—কানাই, কোথায় গেল রে মাইজী ?

কানাই বললে—আমি কী জানি ? আমাকে কী বলে গেছে ?

বাবু হঠাৎ সেদিন রাত ন'টার সময় এসে হাজির হলো। সঙ্গে তার আর্দালী কনেস্টবল সবাই। গেট খোলার শব্দ পেয়েই কানাই দৌড়ে গেছে।

বাবু জিজ্ঞেস করলে—মা কোথায় রে কানাই ?

—আজ্ঞে মা তো বেরিয়েছেন।

—কোথায় বেরিয়েছেন ?

কানাই বললে—তা তো জানি না বাবু। আমাকে কিছু বলে যাননি।

—আবদুল জানে ? বিবি ? বিবি কিছু জানে ?

তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে এসে কানাই বললে—আজ্ঞে না বাবু ওরাও কেউ জানে না—

সেদিনও খাওয়া-দাওয়া সেরে ইজি-চেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসেছিল সুহাস। কানাই চলে গেছে। আবদুলও খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজের ঘরে গিয়ে ঝিমোচ্ছে। সুহাসেরও ক'দিনের ক্লান্তির পর একটু বোধহয় তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ কাজলের গলার শব্দে তন্দ্রা ভেঙে গেল।

—ওমা, তুমি ? তুমি কখন এলে ? তোমার তো হঠাৎ আসার কথা ছিল না ? খাওয়া হয়েছে তোমার ?

সুহাস বললে—হ্যাঁ—

কাজল বললে—তুমি তো জিজ্ঞেস করলে না, আমি কোথায় গিয়েছিলুম ?

সুহাস বললে—সত্যি, কোথায় গিয়েছিলে এত রাত পর্যন্ত ?

—বলো তো কোথায় ?

সুহাস বললে—তোমার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে বুঝি ? সত্যি, একলা-একলা তোমার বাড়িতে থাকতেই বা ভাল লাগবে কেন ? ভালই করেছ, একটু বেড়িয়ে এসেছো—

তারপর কানাই মাঝ-রাত্রে ঘুম ভেঙে উঠে একবার দেখেছে। তখনও আলো জ্বলছে বাবুর ঘরে। বাবু আর মা দু'জনের কথা শোনা যাচ্ছে বাইরে থেকে। জানালার পাশে গিয়ে শুনেছে কানাই, বাবু আর মা দু'জনে যেন ঝগড়া করছে। কথাগুলো বেশ জোরে জোরে বলছে দু'জনে। তারপর আবার কানাই শুতে গেছে।

কিন্তু সকালবেলা আর কিছু বোঝা যায় না। আবার দু'জনের বেশ

হাসি-হাসি মুখ। আবার দু'জনে একসঙ্গে চা খেতে বসেছে ব্যালকনিতে।

যাহোক, তারপর এই বাড়িতেই একদিন হঠাৎ উৎসবের আনন্দ মুখর হয়ে উঠলো। বেশ রীতিমত জোরদার উৎসব। বর এল। বরযাত্রী এল। সানাইও বেজেছিল। আবদুল সেদিন বেশ মোগলাই সাজে সেজেছিল। কানাইও তাই। বিবিও নতুন শাড়ি পেয়েছিল।

প্রথমে কিছুই জানতো না কানাই।

মা বলেছিল—কানাই, বিয়ে হবে সুধা-দিদিমণির, জানিস তো? খাটাখাটুনি করতে হবে তোকে, পারবি তো তুই? অনেক লোকজন খাবে, অনেক বরযাত্রী আসবে—

আগে সেই সাহেব-পাড়ায় কখনও এমন করে দিশী বিয়ে হয়নি। কোনও দিশী বিয়েতে এমন জাঁকজমকও হয়নি। মোটর গাড়িটা ফুল দিয়ে সাজিয়ে তার ভেতরে বর এসেছিল। ব্ল্যাক-আউটের জন্যে আলোর বাহার হয়নি বেশি। চারদিক ঢাকা। সুহাসের নিজের অনেক বন্ধুবান্ধব এসেছিল নেমন্তন্ন খেতে। পরিবেশন করতে করতে হিমসিম খেয়ে গিয়েছিল কানাই। আর কানাই তো একলা নয়। আরো অনেক ভাড়া-করা লোক এসেছিল। সানাই-এর শব্দে গম্‌গম্‌ করছে তখন সমস্ত সাহেব-পাড়াটা।

বর আসবার আগের ঘটনা। সরোজ নিজে বর, সরোজের সঙ্গেই বরযাত্রীর দল আসবার কথা ছিল।

কাজলের শোবার ঘরে মাথার ওপরে পাখা ঘুরছে। তারই নিচে বসে কাজল নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছিল সুধাকে। জরির ফিতে দিয়ে সুধার মাথায় বেণীটা জড়িয়ে দিয়েছিল। কুমকুমের টিপ পরিয়ে দিয়েছিল কপালে। মুখে পাউডার-স্নো লাগিয়ে দিয়েছিল।

কাজল বলেছিল—এবার তোকে চমৎকার দেখাচ্ছে ভাই—

সুধা চুপি চুপি বলেছিল—আমার বড় ভয় করছে কাজলদি—

—ও-সব কথা মোটে আর ভাবিসনি।

সুধার তবু ভয় যায়নি। যত ঘামছিল, তত থর থর করে কাঁপছিল। একটা অপ্রকাশ্য আতঙ্কে সমস্ত শরীরটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল। যদি জানতে পারে। যদি সে—

কাজল বলেছিল—তুই কিছু ভাবিসনি ভাই। সমস্ত দায়িত্ব আমার, আমার ঘাড়ে তুই সব দোষ চাপিয়ে দিবি। যদি কিছু বলে তো বলবি, কাজলদি সব করেছে—

—কিন্তু তো জানো কাজলদি, আমার কোন দোষ নেই, আমি তো সুখী হতেই চেয়েছিলুম। আমি তো সব অপমান নিজের মাথাতেই তুলে নিতে চেয়েছিলুম। তবু কেন সে এমন করলে?

কাজল সুধার চোখ মুছিয়ে দিয়েছিল নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে।

বলেছিল—ছিঃ, আজকের দিনে অমন কথা বলতে নেই রে, অমন কথা মনে আনা পাপ—

সুধা বলেছিল—কিন্তু কাজলদি, সত্যি বলো তো তুমি, আমার কোনও দোষ ছিল ?

কাজল বলেছিল—আবার ওই সব কথা বলছিস্ ? সরোজ যদি শোনে, কী ভাববে বল্ তো ?

সুধা বলেছিল—আমিও তো তাই ভাবি কাজলদি, সরোজ যদি জানতে পারে এ-সব, কী ভাববে সে ?

—খবরদার, যেন এ-সব কথা তাকে কখনো বলিসনি তুই।

—আমি তো বলবো না, কিন্তু যদি কখনো জানতে পারে ?

তারপর ঘরের মধ্যে অনেক লোকজন ঢুকে পড়েছিল, আর কিছু কথা হয়নি। আর কোনও কথা হবার সুযোগই হয়নি। তখন সরোজ এসে গেছে। চারদিকে বরযাত্রীর ভিড়। বরকে বসাবার জন্যে সুহাস বাগানের মধ্যে ভাল ব্যবস্থাই করেছিল। একটা বিরাট সিংহাসন। সিংহাসনের ওপর ভেলভেটের চাদর। পেছনে টবের ওপর কয়েকটা পাম্। সামনের ফুলদানিতে ফুলের ঝাড়, আর শুধু তাই-ই নয়—বরযাত্রীদের প্রত্যেকের জন্যে একটি করে বেলফুলের গোড়েমালা। গোলাপফুল আর গোলাপ জলের ছড়াছড়ি। চৌরঙ্গীর হোটেল থেকে খাবারের কনট্র্যাক্ট দিয়ে আনিয়েছিল মিষ্টি।

সুধা বলেছিল—আমার জন্যে এত খরচ করতে গেলে কেন কাজলদি ?

কাজল বলেছিল—ও-সব আমার জন্যে নয় ভাই, ও সুহাসের সখ।

সত্যিই, সুহাসই নিজের ঘাড়ে সমস্ত খরচটা নিয়েছিল। গার্লিক সাহেবের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছিল পনেরো দিনের। অনেকের বাড়িতে অনেক রকম উৎসবেই খেয়ে আসে সুহাস। এতদিনে এই উপলক্ষে সকলকে নিজের বাড়িতে ডেকে খাওয়ানো ভাল। সবাই জিজ্ঞেস করেছিল—উপলক্ষটা কীসের হঠাৎ ?

সুহাস বলেছিল—উপলক্ষটা একটা বিয়ে।

সবাই জিজ্ঞেস করেছিল—আপনার আবার কার বিয়ে মিস্টার মুখার্জি ? আপনার তো ছেলেমেয়ে কেউ নেই। ভাইবোনও নেই শুনেছি—

সুহাস বলেছিল—আমার স্ত্রীর এক বন্ধুর বিয়ে—

স্ত্রীর বন্ধুর বিয়ে। তা জিনিসটা এমন কিছু অস্বাভাবিকও নয়। আজকাল এ-রকম হয়েই থাকে। স্ত্রীর বন্ধুর আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, তাই সব বন্দোবস্তটা মিসেস মুখার্জিকেই করতে হচ্ছে।

কিন্তু আসল প্রশ্নটা তা-ও নয়। সরোজ আসলে সুহাসেরই ছোট বয়সের বন্ধু। সরোজ সান্যাল স্কুলে একসঙ্গে পড়েছে। সে-ও ছিল পি. সি. রায়ের ছাত্র। কবে মফঃস্বলে ডিউটি করতে গিয়ে দেখা হয়ে গিয়েছিল। সেখানেই বারো-তেরো বছর পরে দেখা। সুহাসকে দেখেই চিনতে পেরেছিল কিন্তু।

বলেছিল—তুমি ?

সুহাসও বলেছিল—তুমি ?

দুই বন্ধুতে বহুদিন পরে দেখা। তারপরে ফেরবার সময় কলকাতার বাড়িতে নেমন্তন্ন করে এসেছিল সুহাস। সেই সূত্র ধরে একদিন সরোজ কলকাতার বাড়িতে এসেছিল। এসে দু'জনে অনেক গল্প হয়েছিল ছোটবেলার। কোথাকার আদর্শ কেমন করে সব বদলে যায়, তারই কাহিনী দু'বন্ধুর আর শেষ হতে চায় না।

কাজল বলেছিল—আপনি বিয়ে করেননি কেন মিস্টার সান্যাল ?

সরোজ বলেছিল—হয়ে ওঠেনি আর কি !

কাজল বলেছিল—এইবার একটা বিয়ে করে ফেলুন—

সরোজ হাসতে হাসতে বলেছিল—বিয়ে করলেই তো হলো না মিসেস মুখার্জি, মেয়ে কোথায় ?

কাজল বলেছিল—মেয়ের অভাব ? বলছেন কী ? খুব ভাল মেয়ে আছে, বিয়ে করবেন ?

সরোজ বলেছিল—আপনি যদি রেকমেণ্ড করেন নিশ্চয়ই করবো—তারপর সবই সহজ হয়ে গিয়েছিল। সুধাকে এনে দেখিয়ে দিয়েছিল কাজল। ব্যাপারটা সুধা আগে শোনেনি। এসেছিল যথারীতি বেড়াতে। আর সেই থেকেই সূত্রপাত।

সুহাস বলেছিল—মিসেস মুখার্জির একেবারে বহুদিনের বন্ধু, একসঙ্গে একই স্কুলে চাকরি করতো—

কে জানে কেন, মিস্টার সান্যালের সেই প্রথম দিনেই পছন্দ হয়ে গেল।

কাজল বলেছিল—আমি দায়িত্ব নিচ্ছি আপনার মিস্টার সান্যাল, আমরা একসঙ্গে এক ঘরে এক ছাদের তলায় বহুদিন কাটিয়েছি, আমি বলছি, আপনারা সুখী হবেন—সুধা সুখী হলে আমিও সুখী হবো—

কোথায় কে ছিল অজ্ঞাতকুলশীল আচারিয়া, কোথায় তার সঙ্গে ইউ-কে, সিঙ্গাপুর, পেনাঙ আর বার্মা ঘুরে বেড়াবে। তা নয়, সরোজ সান্যালের সঙ্গে মফঃস্বলে মফঃস্বলে ঘুরে বেড়ানো। সরোজ মফঃস্বল থেকে এসেছিল বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে, কিন্তু ফেরবার সময় আর একলা নয়—একেবারে বউ নিয়ে ফিরে গেল। আর বদলির চাকরি যখন, তখন চিরকালই যে মফঃস্বলে থাকতে হবে তার কোনও মানে নেই। আবার হয়ত ঘটনাচক্রে সুহাসের মত কলকাতাতেও বদলি হয়ে চলে আসতে পারে। তখন আবার দুই বন্ধুতে ঘন ঘন দেখাও হবে, আবার দু'জনে ঘরের ভেতর পাশাপাশি বসে গল্প করতেও পারবে।

কাজলও তাই বলেছিল—তুই ভাবিসনি কিছু, দেখিব সব ঠিক হয়ে যাবে—জীবনে সবই সহ্য হয়ে যায় রে !

—কিন্তু কাজলদি, দেখো, কিছু যেন জানাজানি না হয়ে যায় !

কাজল সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল—খবরদার, যেন সরোজকে তুই কিছু বলিসনি এ-সম্বন্ধে—

সুধা বলেছিল—না কাজলদি, আমি কেন বলতে যাবো মিছিমিছি ?

—না ভালবেসে ফেললে তখন তো আর কারো মতির ঠিক থাকে না।

সুধার বিয়ের সময়েও রেবাদি, কনকদি, মলিনাদি এসেছিল। তারাও খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ি যাবার আগে কাজলের কাছে এসে বলেছিল—আসি ভাই তাহলে?

কাজল বলেছিল—তোমাদের পেট ভরে খাওয়া হয়েছে তো রেবাদি, আমি তো কিছুই দেখতে পারলাম না --

রেবাদি বলেছিল—তুমি যা করলে ভাই, এ কোনও বন্ধুর জন্যে কোনও বন্ধু করে না—

সত্যিই সবাই অবাক হয়ে গেছে। নইলে কী আর এমন সম্পর্ক। সামান্য ক'টা বছরের মাত্র আলাপ। এক ঘরে এক ছাদের তলায় একসঙ্গে কয়েকটা বছর মাত্র কাটিয়েছে। একসঙ্গে কলকাতার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে দু'জনের সুখ-দুঃখের আলোচনা করেছে। শো'কেসের সামনে দাঁড়িয়ে দু'জনেই শাড়ি আর ব্লাউজের দাম নিয়ে হা-হুতাশ করেছে। আবার মাইনে পাবার পর দু'জনেই সেই শাড়ি কিনে পরেছে, সেই ব্লাউজ কিনে গায়ে দিয়েছে। তার বিয়ের জন্যে এত টাকা খরচ করা সত্যিই বাহাদুরির কাজ। এত বন্ধু-প্রীতি ক'জনের আছে?

বিয়ের পর কলকাতা ছেড়ে চলে যাবার দিন সুধা আনন্দে একেবারে কেঁদে ফেলেছিল। কাঁদতে কাঁদতে একেবারে কাজলকে জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল—তুমি আমার জন্যে যা করলে কাজলদি, তা পৃথিবীতে কেউ কারোর জন্যে করে না—

কাজল সুধার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিল—বেনারসীটা তোর পছন্দ হয়েছে তো রে?

সুধা বলেছিল—তোমার সব মনে ছিল কাজলদি?

—মনে থাকবে না? একদিন এই শাড়ি কেনবার জন্যে তোর কত লোভ হয়েছিল মনে আছে? আমি সুহাসকে বলে তাই এই শাড়িই কিনে আনলাম—

যা-যা সুধা ভালবাসতো তাই-ই কাজল দিয়েছিল সুধার বিয়েতে। কাজলের নিজের বিয়ে যখন হয়েছিল তখন কারোরই টাকা ছিল না। না কাজলের না সুহাসের। তাই কোনও উৎসবই হয়নি বলতে গেলে। এমন করে লোক খাওয়ানো হয়নি, এমন করে বর সেজেও আসেনি সুহাস, এমন করে কনে সেজে বেনারসীও পরেনি কাজল। সুধার বিয়েতে কাজলেরই যেন নতুন করে বিয়ে হলো। নতুন করে বিয়ে করে স্বামীর সঙ্গে মফঃস্বলে চলে গেল।

কানাইয়ের মনে আছে সেইদিনের কথা। সুধা-মাসীমা তারপর থেকে আর আসতো না। কিন্তু সে-বাড়িতে তখন আরো অন্য লোকের আনাগোনা চলতে লাগলো। কত বন্ধু, বাবুর বন্ধু, মার বন্ধু আসতো। এলেই আবদুলকে চা করতে হতো, খাবার করতে হতো। আসলে কানাই-এর চা-ই মা বেশি পছন্দ করতো।

মা বলতো—এ চা কে করেছে রে কানাই? তুই, না আবদুল?

কানাই বলতো—আমি মা—

—বাঃ, তুই তো বেশ চা করতে শিখেছিস? এবার থেকে তুই-ই আমার চা করবি—

তারপর থেকে মা কেবল কানাই-এর হাতেই চা খেত। বলতো—তুই ভাত রুটি তরকারী করাটা শিখেনে, এবার থেকে তোর রান্নাই খাবো—

সত্যি, তখন থেকে আবদুল রাঁধতো বিলিতি রান্নাগুলো। আবদুল চপ করতে পারতো, কাটলেট করতে পারতো, কোর্মা কালিয়া করতে পারতো। বাইরে থেকে সাহেব-মেমরা এলে আবদুলই তাদের খাবার তৈরি করে খাওয়াতো। একসঙ্গে দশ-বারোজনের রান্না করে খাওয়াতে পারতো আবদুল। আবদুল জানতো হাজার রকম রান্না। এককালে আবদুলের বাবা ছিল কোন্ হোটেলের হেড কুক। তার বাবার কাছ থেকেই এসব শিখেছিল সে। কানাই জীবনে কখনও ভাত-ডাল ছাড়া রাঁধেনি কিছু। কিন্তু তবু দেখে দেখে হাত পুড়িয়ে পুড়িয়ে যে-সব রান্না শিখেছিল তারই তারিফ পেয়েছিল। এই শুক্তুনি, ঘণ্ট, ডালনা—এ-সব খেয়ে মা প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। বাবুকে বলতো—দেখো, কানাই-এর রান্না খেয়ে দেখো—

বাবু বলতো—সত্যিই তো, এবার থেকে কানাই-ই রাঁধুক—

তা রান্নাঘরের কাজ নিয়ে থাকলে তো কানাই-এর চলতো না। অত বড় বাড়ি, অত ঘর। বিবি তো কেবল দিনরাত পটের বিবি সেজে মা'র পাশে পাশে ঘুরতো। আর আবদুল? আবদুল তো রান্না ছাড়া জানতোই না কিছু। বাকী যা কিছু কাজ তো সব কানাইকেই করতে হতো! সেই অতগুলো ঘর, ঝাঁট দেয় কে? বাগানে না-হয় মালী আছে, কিন্তু সে কাজ করছে কিনা তা কে দেখে? সারা বাড়িটাতে এতগুলো লোক, তারা কে কেমন কাজ করছে তা-ও তো দেখা দরকার! কানাই ছাড়া সে-সব আর কে দেখবে?

তারপরে বাবুর কাজ কি কিছু কম? বাবু বাড়িতে থাকুক আর না-থাকুক, বাবুর কাজ তো করতেই হবে। বাবুর জামা-কাপড় কোটপ্যাণ্ট—তার হিসেব রাখাই তো একটা মস্ত কাজ। বাবু তো বাড়ি এসেই বলবে—কানাই এটা দে, কানাই ওটা দে। তখন যদি হাতের সামনে হাজির করতে না পারে তো তখন কে দায়ী হবে?

মা বলতো—বাবুর সব জিনিসপত্তোর ঠিক আছে তো কানাই?

কানাই বলতো—আমাকে আর তা বলতে হবে না মা, আমার কাজে খুঁত পাবেন না আপনি—

মা বলতো—দেখো কানাই, শেষে যেন আবার বকাবকি না শুনতে হয়—

মা আরো বলতো—বাবুর বন্দুক, রিভলবার, গুলির বাক্স? সব চাবিবন্ধ আছে তো?

—আজ্ঞে, সে চাবি আপনাকে তো আমি দিয়েছি মা, আপনি যে আমার হাত থেকে নিলেন আজ্ঞে—

ত্রুটি কানাই-এর কাছ থেকে পাবে না। কেউ যে বলবে কানাই-এর সব ভাল,

কিন্তু কাজে বড় গাফিলতি, সেটি হবে না। বাবু যেই বাড়ি থেকে বেরোবেন, কানাই আগে বন্দুক-রিভলবারের বাক্সটিতে চাবি বন্ধ করে মা'র হাতে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত। বাবুর ছাড়া জামাকাপড় সব ধোপার বাড়িতে দিয়ে তবে কানাই বসবে, তার আগে নয়। বাবু চাইতে-না-চাইতে হাতের কাছে জিনিস পেয়ে যাবে, তাকেই তো বলে চাকর।

মা বলে—হ্যাঁ রে কানাই, আমার কোনও চিঠি আছে?

সুধা-মাসীমার বিয়ে হয়ে চলে যাবার পর থেকেই চিঠির জন্যে বসে থাকতো মা। কোন চিঠি আসার সঙ্গে সঙ্গে কানাই দৌড়ে দিয়ে আসতো মা'কে। চিঠিটা পেয়েই মা উঠে বসতো?

কানাই জিজ্ঞেস করতো—কার চিঠি মা?

চিঠি পড়তে মা তখন ব্যস্ত। বলতো—তোর অত খবরে দরকার কী বলু তো? তুই কাজ করগে যা—

সুধার চিঠি পেলেই কাজল খুলে পড়তো মন দিয়ে।

সুধা লিখতো—

কাজলদি,

তোমার চিঠি পেয়ে যে কী খুশী হলুম, না লিখে জানাতে পারবো না। তুমি আমার জন্যে যা করেছ, তা নিজের মায়ের পেটের বোনও কখনও করে না। জীবনে যদি কোনও দিন কারো কাছে নিজের জীবন ফিরে পাওয়ার জন্যে কৃতজ্ঞ থাকতে হয় তো সে একলা তুমি, কাজলদি। আর কেউ নয়। তুমি শুনে বোধহয় সুখী হবে যে সরোজ শীঘ্র বদলি হয়ে কলকাতাতে যাচ্ছে—গেলে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে রোজ—ইতি—

এমনি একখানা চিঠি নয়—এক-একদিন দুটো চিঠি এসে হাজির হয়।

চিঠিগুলো পড়ে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিত কাজল। তারপর কাগজের টুকরোগুলো গুলী পাকিয়ে আবদুলকে দিত উনুনে পোড়াবার জন্যে।

আবদুল বলতো - এগুলো সবই উনুনে দেব মাইজী?

কাজল বলতো —হ্যাঁ, একটাও যেন বাইরে পড়ে না থাকে।

সুহাস এসে বলতো —কই, তোমার সেই নভেলটা কতদূর হলো? শেষ হয়ে গেছে?

কাজল লজ্জায় পড়ে বলতো—ও কিছু না, সময় কাটে না, তাই লিখতুম···

সুহাস তবু উৎসাহ দিত। বলতো—লেখো না, শেষকালে হয়ত লিখতে লিখতে লেখিকা হয়ে উঠতে পারো—

কাজল হাসতো। বলতো—লেখিকা হয়ে আমার লাভ কি! পুলিশের বউ হয়ে আজ আমার তার চেয়ে অনেক লাভ হয়েছে।

সুহাস হেসে উঠতো হো হো করে। বলতো—সত্যি বলছো লাভ হয়েছে? বলে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে আসতো। কিন্তু কাজল তাড়াতাড়ি ছাড়িয়ে দিত নিজেকে। বলতো—ছাড়ো, ছাড়ো কী যে করো, ওই বীব রয়েছে ওখানে—

শেষ পর্যন্ত সরোজই বদলি হয়ে এল। সুধাও এল সঙ্গে। কিন্তু কলকাতায় নয়, যেতে হবে করাচীতে।

সুহাস বললে—একেবারে সেই করাচীতে? অত দূরে?

কাজল চেয়ে চেয়ে দেখলে। বড় খুশী মনে হলো ওদের। আড়ালে সুধাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে—কি রে, তোর মনের মতো হয়েছে তো?

সুধা বললে—সত্যি কাজলদি, এর চেয়ে বেশী সুখ কাকে বলে আমি জানি না।

কাজল বললে—ওদের একদিন নেমতন্ন করলে কেমন হয় গো?

সুহাস বললে—তা নেমতন্ন করে খাইয়ে দাও না, আমারও তো সময় রয়েছে—

কাজল বললে—ওদের সঙ্গে আরো কয়েকজনকে বলো না—অনেকদিন তো কাউকেই খাওয়ানো হয়নি—

অনেকের বাড়িতেই পার্টিতে খেয়ে খেয়ে এসেছে দু'জনে। এবার এই সুযোগে আবার সকলকে শোধ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

তা সুহাসেরই উৎসাহটা যেন বেশী, সুহাসই এক এলাহি কাণ্ড করে বসলো। বাজারের সেরা সেরা জিনিস আনিয়ে নিলে নিজের পছন্দ মত। আবার যেন বিয়ে-বাড়ি হয়ে উঠলো। লিস্ট দেখে দেখে সবাইকে নেমতন্ন করে এল দু'জনে মিলে। সুহাসের নিজের বিয়েতে বলতে গেলে কিছুই হয়নি। সুধার বিয়েতে অবশ্য সবাই এসেছিল। কিন্তু গার্লিক সাহেব তখন কলকাতায় ছিল না। আসতে পারেনি।

গার্লিক সাহেব অবাক হয়ে গেল মুখার্জিকে দেখে। বললে—অকেশনটা কী?

কাজল বললে—কোনও অকেশন্ নয়, এমনি—

শুধু গার্লিক সাহেব নয়, মিসেস গার্লিককেও বললে কাজল। অপূর্ব স্বামী-স্ত্রী। খুব হাসি-খুশী মানুষ দু'জনেই।

গার্লিক সাহেব বললে—আমি ইণ্ডিয়ান ডিশ খাবো কিন্তু মিসেস মুখার্জি—

কাজল বললে—তাহলে আমি নিজে রান্না করবো মিস্টার গার্লিক—

সত্যি নিজে রান্না করলে কাজল সারাদিন ধরে। কানাই আর নিজে। আর অবদুল রান্না করেছিল বাকিগুলো। সুধা আর সরোজ সকাল-সকালই এসে পড়লো। সুধা একেবারে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো রান্নাঘরে।

—ওমা, তুমি নিজে রান্না করছো কাজলদি?

কাজল বললে—কানাই-এর হাতে সব ভার ছেড়ে দিতে সাহস হলো না ভাই—

—কিন্তু এত এলাহি কাণ্ড করতে গেলে কেন মিছিমিছি?

কাজল বললে—আমাকে বলে কি হবে, তুই ওকে বল—

সুহাসও দাঁড়িয়েছিল পেছনে। হাসতে লাগলো কথা শুনে। বললে—নুন খাইয়ে দিচ্ছি, নইলে সরোজ আমার গুণ গাইবে না—

সুধা বললে—আপনি তো জানেন না সুহাসবাবু, রোজ সকালে আপনাদের গুণ না গেয়ে জল গ্রহণ করি না আমরা—তা জানেন?

সুহাস বললে—ওই শোন কাজল, তোমার বন্ধু কী বলছেন শোন—

কাজল বললে—ওর কথা ছেড়ে দাও, ও আমার কোনও দোষই দেখতে পায় না—

সুধা বললে—আচ্ছা বলুন তো সুহাসবাবু, কোনও দোষ থাকলে তো দেখবো? কাজলদির দোষ যে বার করতে পারবে সে এখনও জন্মায়নি পৃথিবীতে—

কাজল হাসলো। সুহাসও হেসে উঠলো। কাজল বললে—সরোজের কাছে থেকে থেকে দেখছি সুধাও কথা শিখেছে খুব আজকাল—

সরোজও শেষ পর্যন্ত এসে পড়লো রান্নাঘরে। বললে—বাঃ মিসেস মুখার্জি, আপনি নিজেই হাতা-খুন্তি ধরেছেন?

কাজল বললে—না ধরে কি আর উপায় আছে ভাই, শেষকালে যদি তোমরা নিন্দে করো?

সরোজ বললে—নিন্দে তো করবোই, আপনারা আমাদের এত উপকার করবেন আর আমরা আপনার একটু নিন্দেও করতে পারবো না? এত অধম আমরা?

কাজল বললে—তা নিন্দে করুন, করাচীতে বসে বসে যত ইচ্ছে নিন্দে করুন, আমরা শুনতে যাচ্ছি না—

সুধা বললে—সত্যি কাজলদি, কত আশা করেছিলুম কলকাতায় থাকতে পারবো, তা না, কোথায় ঠেলে পাঠিয়ে দিলে সাত সমুদ্র তের নদীর পারে—

কাজল বললে—ভালই তো, তবু একটা বেড়াবার জায়গা হলো, নেমন্তন্ন করলেই চলে যাবো, তখন আমাকে নিজের হাতে রান্না করে খাইয়ে দিস—

—সত্যি তুমি যাবে কাজলদি? সত্যি বলছো, যাবে?

কাজল বললে—তা যাবো না কেন? কিন্তু আমাকে একলা নেমন্তন্ন করলে চলবে না, ওকেও নেমন্তন্ন করতে হবে, দু'জনে গিয়ে একসঙ্গে তোদের অন্ন ধ্বংস করে আসবো—

রাত্রে সবাই এসে হাজির হলো একে-একে। মিস্টার হাচিন্স, মিসেস হাচিন্স। সুহাসের অন্য দু'চারজন বন্ধু-বান্ধব। সস্ত্রীক। শেষকালে এল মিস্টার আর মিসেস গার্লিক।

মিঃ গার্লিক এসেই বললে—কই মিসেস মুখার্জি, আপনার ইণ্ডিয়ান ডিশ্ রেডি তো!

আর এসে হাজির হলো মিস্টার আচারিয়া। মিস্টার আচারিয়া আসতেই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠল সুধা। কিন্তু কাজল এক মুহূর্তেই সমস্ত অবস্থাটা সামলে নিয়েছে।

কাজল এগিয়ে গেল। হাসতে হাসতে সাদর অভ্যর্থনা করে বললে—আসুন, আসুন মিস্টার আচারিয়া—

মিস্টার আচারিয়াও অপ্রস্তুত হবার লোক নয়। বললে—আমার একটু দেরি হয়ে গেল মিসেস মুখার্জি।

সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে কাজলই। সুহাস চিনতো না। হ্যাণ্ড শেক্ করলে মিস্টার আচারিয়ার সঙ্গে। কাজল বললে—আমার বন্ধু মিস্টার আচারিয়া—

আচারিয়া নিজেই নিজের যোগ্যতার পরিচয়-সূত্রটা ধরিয়ে দিলে—আমি হচ্ছি ম্যাকলাউড কোম্পানীর ইণ্টারন্যাশন্যাল কমিশন্ এজেণ্ট

—আর ইনিই মিস্টার মুখার্জি—আজকের হোস্ট—

—খুব আনন্দ হলো আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে মিস্টার মুখার্জি।

শুধু মিস্টার মুখার্জি নয়, একে একে সকলের সঙ্গেই সকলের পরিচয় হয়ে গেল। সরোজের কাছে এসে কাজল বললে—ইনি মিস্টার সান্ন্যাল—করাচীতে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছেন কালকেই—

—আর উনি মিসেস সান্ন্যাল—

সুধা হাতটা বাড়িয়ে দিলে। বোধহয় থর থর করে কাঁপছিল সুধার হাতটা। মিস্টার আচারিয়া সুধার হাতটা নিলে। সেটাকে শক্ত করে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলে আচারিয়া। কাজল সুধার দিকে চেয়ে সাহস দিচ্ছিল। তবু হ্যাণ্ড শেক্ করবার পরেই যেন সুধার শরীরটা অবশ হয়ে এল ক্লান্তিতে।

আচারিয়া বললে—আপনি অসুস্থ নাকি মিসেস সানিয়াল ?

সুধা সে-কথার উত্তরই দিতে পারলে না মুখ ফুটে।

সরোজ জিজ্ঞেস করলে—কী হলো তোমার ? অমন করছো কেন তুমি ? কী রকম যেন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে ?

—কই, না তো! বলে সুধা রুমাল দিয়ে মুখটা মোছবার ভাণ করলে।

হয়ত সুধার দিকেই সকলের দৃষ্টি পড়তো, কিন্তু মিস্টার গার্লিক তখন জমিয়ে তুলেছে আসর। বিলেতের কোথায় কোন্ শহরে একবার কোন্ ইণ্ডিয়ান ডিশ খেয়েছিল, তারই বর্ণনা দিচ্ছিল। মিস্টার গার্লিক পুলিশের বড় কর্তা হলে কী হবে, অমায়িকতায় তার জুড়ি নেই।

মিস্টার হাচিন্স যোগ দিলে। যে-যে ছিল সবাই যোগ দিলে আলোচনায়। জমে উঠলো আসর এক মিনিটেই। আচারিয়াও গল্প জমাতে বেশ পটু। আচারিয়া পেনাঙ-এ গিয়ে কী খেয়েছিল তার বর্ণনা দিলে। খেতে খেতে হাসতে-হাসতে সরগরম হয়ে উঠলো সন্ধ্যেটা।

এক ফাঁকে সুধা উঠে গিয়ে পাশের ঘরে কাজলকে ধরেছে—কেন তুমি নেমন্তন্ন করলে কাজলদি, ওই হতভাগাটাকে ?

কাজল বললে—ওমা, আমি কেন নেমন্তন্ন করতে যাবো ? ও তো এমনিই এসেছে—

—তা ওকে ঢুকতে দিলে কেন ? তাড়িয়ে দিতে পারলে না ?

কাজল বললে—অত জোরে কথা বলিসনি, শুনতে পাবে কেউ—

—কিন্তু তুমি জানো না কাজলদি, আমার কী অবস্থা, আমি বোধহয় তখুনি অজ্ঞান হয়ে যেতাম—

কাজল বললে—ছি ছি, তুই চোখ মুছে ফেল—

বলে নিজেই নিজের রুমাল দিয়ে সুধার চোখ দুটো মুছিয়ে দিলে। বললে—যা, ও-ঘরে যা, সবাই বসে আছে, তুই এতক্ষণ এ-ঘরে থাকলে সন্দেহ করবে সবাই,

আর সরোজের কথাটাও ভাব দিকিনি একবার, ও যদি জানতে পারে, তাহলে কী সর্বনাশটা হবে বল্ দিকিনি ?

বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার কাজল সুধাকে পাঠিয়ে দিলে পাশের ঘরে।

গার্লিক সাহেব তখন একমনে গল্প বলে যাচ্ছে। সবাই তাই শুনতেই ব্যস্ত। কেউ আর লক্ষ্য করলে না কিছু।

তারপর যখন আরো রাত বাড়লো তখন একে একে চলে গেল সবাই। কাজলের হাতের ইণ্ডিয়ান ডিশ্ খেয়ে তারিফ করলে খুব মিস্টার গার্লিক। যাবার সময় বললে—এবারেই যেন শেষ না-হয় মিসেস মুখার্জি, আমি ভোজন-রসিক লোক, আমি আবার খেতে আসবো আপনার হাতের রান্না ইণ্ডিয়ান ডিশ্

কিন্তু মিস্টার গার্লিক তো জানতো না, কাজলের হাতের রান্না খাওয়ার সুযোগ তার জীবনে আর আসবে না। শুধু মিস্টার গার্লিক কেন, সুহাসও জানতো না। সুধাও জানতো না, সরোজও জানতো না। এমন কি কাজল নিজেও তা জানতো না। জানতো বোধহয় কেবল সুহাস আর কাজলের ভাগ্য-বিধাতা।

অনেক রাত্রে যখন সবাই চলে গেল, তখনও রইল মিস্টার সান্ন্যাল আর মিসেস সান্ন্যাল। আর রইল মিস্টার আচারিয়া। আচারিয়া উঠতেই চায় না, গল্প তার আর ফুরোয়ই না। ইউ-কে, সিঙ্গাপুর, পেনাঙ, জাভা আর বর্মার গল্প।

সরোজের খুব ভাল লাগলো মিস্টার আচারিয়াকে।

বললে—আপনি আসবেন মিস্টার আচারিয়া ; যে কদিন আছি, বেশ আনন্দ করা যাবে—

নিজের ঠিকানাও দিলে সরোজ। বললে— আমার ওখানেও একদিন আসুন—

আচারিয়া বললে— আমি নিশ্চয়ই যাবো মিস্টার সানিয়াল, আপনার বাড়িতে নিশ্চয়ই যাবো—

সরোজ বললে—আমি শিগ্গির চলে যাচ্ছি, করাচীতে, তার আগেই আসুন—

কাজল কথা ঘুরিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করলে। কিন্তু মনে হলো সরোজের যেন বড় ভাল লেগেছে আচারিয়াকে। আর সরোজ যত আসতে বলছে আচারিয়াকে, সুধা তত কাঠ হয়ে উঠছে আতঙ্কে।

শেষ পর্যন্ত কাজলই জোর করে সরোজ আর সুধাকে উঠিয়ে দিলে। বললে— যাও তোমাদের রাত হচ্ছে—

একেবারে সকলের শেষে গেল আচারিয়া। যেন যাবার ইচ্ছে ছিল না তার। যেন অনেক কথা বলবার ছিল তার মিসেস মুখার্জিকে। কিন্তু সুহাসের সামনে সব কথা বলা যেন তার ইচ্ছে নয়।

অন্ধকার ব্ল্যাক-আউটের মধ্যে আচারিয়ার চেহারাটা যখন মিলিয়ে গেল, যখন গেট বন্ধ করার শব্দ হলো, তখন যেন নিশ্চিন্ত হলো কাজল।

সুহাস জিজ্ঞেস করলে—ও আচারিয়া কে ? আগে তো দেখিনি ?

কাজল বললে—ও আমার পুরোন এক বন্ধু—বহুদিন আগের—

আর কিছু কথা হলো না সেদিন।

সে-সব দিনের কথা কানাই-এর মনে আছে। সুধা-দিদিমণিরা চলে গেল একদিন। যাবার দিন সান্ন্যাল সাহেব এসেছিল, সুধা-দিদিমণিও এসেছিল! আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কাজল জিজ্ঞেস করলে—কী রে, ও গিয়েছিল তোর বাড়িতে?

সুধা বললে—আসেনি, কিন্তু এলে কী সর্বনাশ হতো বলো দিকিনি কাজলদি?

—সরোজবাবু কিছু জানতে পারেনি তো?

সুধা বলেছিল— কী ভয়ে ভয়ে যে দিন কেটেছিল কী বলবো কাজলদি, কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচলুম এখন—

বাবু সেদিন বাড়ি ছিল না। ডিউটিতে বেরিয়ে গিয়েছিল। কানাই বিকেল বেলা ঘর পরিষ্কার করেছে। বাবুর পিস্তলের বাক্সে চাবি বন্ধ করে চাবিটা মা'র হাতে দিয়েছে। তারপর বাবুর ছাড়া জামা-কাপড়গুলো ধোপার বাড়ি দিয়ে এসেছে। টেবিল-চেয়ার আলমারি জানালা-দরজা ঝাড়া-মোছা করেছে। সুধা-দিদিমণিরা চলে যাবার পর বিবি তখন মা'র চুল বেঁধে দিয়েছে। চুল বাঁধার পর মা কলঘরে গেল। কলঘর থেকে বেরোলে বিবি পাটভাঙ্গা শাড়ি ব্লাউজ বার করে দেবে। মা সেইসব পরে চা খাবে টেবিলে বসে বসে। তখন হয়ত বাইরের বাগানে এসে একটু বেড়াবে। ফুল গাছের চারাগুলো কেমন গজাচ্ছে দেখবে। তারপর খানিকক্ষণ বেড়ানোর পর গাড়ি-বারান্দার তলায় টেবিলের সামনে বসবে। বিবি আলো জেলে দেবে। সেখানে বসে কাগজ-কলম নিয়ে কী সব লিখবে পাতার পর পাতা।

এমনি করেই সাধারণতঃ মা'র দিনগুলো কাটতো। তারপর সুধা-দিদিমণি চলে যাবার পর আর কেউ একটা আসতো না। কখনো-সখনো একজন-দু'জন এলে চা করতে হতো কানাইকে।

কিন্তু সেদিন সন্ধেবেলায়ই একজন ভদ্রলোক এসে হাজির।

মনে হলো যেন সেই লোকটাই। সেই লম্বা চেহারা। লম্বা-লম্বা কোট-প্যান্ট। এসেই একেবারে সোজা বাগানে ঢুকেছে।

কানাই এগিয়ে গেল। বললে—কাকে চাই?

ভদ্রলোক বললে—মিসেস মুখার্জিকে।

—কী নাম বলবো?

—বলো মিস্টার আচারিয়া।

তাড়াতাড়ি মাকে গিয়ে খবর দিতেই মা বললে - এখানে বাবুকে নিয়ে আয়—

মিস্টার আচারিয়া আসতেই মা বললে—আসুন মিস্টার আচারিয়া—

মিস্টার আচারিয়া বললে—আপনি আমায় দেখে অবাক হয়ে গেছেন তো?

—না না, অবাক হয়ে যাবো কেন? আসুন, বসুন এখানে। কী খবর বলুন—

তারপর মা কানাইকে চা করতে বলে আবার গল্প করতে আরম্ভ করেছে। যখন কানাই চা আর বিস্কুট এনে দিলে তখন দেখলে, বেশ জোরে জোরে কথা হচ্ছে দু'জনে। কানাই কাছে আসতেই গলার শব্দ একটু নামলো।

চা দিয়ে কানাই চলে গিয়েছিল বাইরে। বাইরে থেকেও দু'জনের অনেক

কথা হচ্ছিল, শুনতে পাচ্ছিল সে। কী-সব কথা, কিছুই বুঝতে পারেনি। মাঝে মাঝে হাসির শব্দও হচ্ছিল। মা আর আচারিয়া সাহেব কথা বলতে বলতে খুব হাসছিল। তারপর আবার একবার কানাইকে ডাকলে মা। কানাই যেতেই মা বললে—আর এক কাপ চা কর তো কানাই—

আবার চা করে দিয়ে এল ঘরে। আবার গল্প হতে লাগলো দু'জনে।

রাত সাতটা বাজলো। আটটা বাজলো। তখনও গল্প ফুরোয় না দু'জনের।

তারপর রাত ন'টার সময় মা ড্রাইভারকে গাড়ি বার করতে বললে। গাড়ি বেরোতে আচারিয়া সাহেব আর মা দু'জনে গিয়ে উঠলো তাতে। তারপর গাড়ি চলে যেতেই দারোয়ান গেট বন্ধ করে দিয়েছিল।

এমনি পর পর দু'তিনদিন চললো। বেরিয়ে যায় রাত আটটা-ন'টার সময়, আর আসে সেই দশটার সময়। কখনও কখনও রাত এগারোটা বেজে যায়।

ততক্ষণ না খেয়ে বসে থাকে কানাই। না খেয়ে বসে থাকে আবদুল, বিবি, সবাই। মা যখন ফিরে আসে তখন মা পান খাচ্ছে। একমুখ পান। এমনিতে মা পান খেত না। আচারিয়া সাহেবের সঙ্গে বেরুলেই পান খেত।

বাড়ি ফিরে এলেই বিবি বলতো—মা, টেবিল লাগাবো?

মা বললে—না রে, আমি খেয়ে এসেছি—তোরা এখনও খাস্‌নি?

মা আবার বললে—তোরা দেখলি আমার দেরি হচ্ছে, খেয়ে নিলেই পারতিস্—

তারপর বিবি মা'র জামা-কাপড় বদলে দিয়েছে, বিছানার বেডকভার তুলে দিয়েছে। মা শুয়ে পড়তেই ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

সেদিন সুহাস এসে গেল আবার হঠাৎ। তখন সন্ধ্যে সাতটা।

কানাই দৌড়ে গিয়ে খবরটা দিলে। বললে—মা, বাবু এসেছে—

সুহাস এসে ঘরে ঢুকলো। একেবারে সোজা মফস্বল থেকে। ঘরে এসে একটু অবাক হয়ে গেল। বললে—মিস্টার আচারিয়া, না?

আচারিয়া উঠে দাঁড়াল। সবিনয়ে নমস্কার করে বললে—নমস্কার মিস্টার মুখার্জি—

—কতক্ষণ এসেছেন?

—এই তো আপনি আসার আধ ঘণ্টা আগে।

কাজল বললে—তুমি তৈরি হয়ে নাও; তাড়াতাড়ি, একসঙ্গে চা খাবো।

তারপর কানাইকে ডেকে গরম জল দিতে বললে। শুধু গরম জল নয়, বাবু এলেই কানাই-এর অনেক কাজ থাকে। সুটকেস, বিছানা সব গোছাতে হয়। বাবুর সঙ্গে যে-পিস্তলটা থাকে তা গাড়ি থেকে নিয়ে আবার বাক্সে পুরে ফেলতে হয়। বাবুর ছাড়া জামা-কাপড়গুলো ড্রাই ক্লিনিং-এ দিয়ে আসবার জন্যে আলাদা করে রাখতে হয়। অনেক কাজ তখন কানাই-এর।

সুহাস তৈরি হয়ে এসে বসলো। বললে—এখন কোথায় আছেন মিস্টার আচারিয়া?

আচারিয়া বললে—মার্কেট বড় ভাল মিস্টার মুখার্জি; আমাদের তো জানেন ইন্টারন্যাশন্যাল বিজনেস. ফরেন মার্কেট তো প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়!

—তাহলে কলকাতাতেই এখন থাকতে হচ্ছে? বাইরে যাওয়া বন্ধ।

আচারিয়া বললে—অটোমেটিকেলি! আমাকে তো আর ছাড়তে পারছে না কোম্পানী, মাসে মাসে মাইনে গুণে যেতে হচ্ছে। আমার কিছু লোকসান নেই, কোম্পানীরই লস্—

চা এসে গেল। মিস্টার আচারিয়ার দিকে কাপ এগিয়ে দিলে কাজল। বললে—নিন মিস্টার আচারিয়া—

চা খেতে খেতে অনেক আজেবাজে গল্প করতে লাগলো আচারিয়া।—আগে ইউ-কে'তে কী দেখেছে, আবার এখন কী দেখছে। আমিই লণ্ডনের মেয়েদের লম্বা ফ্রক্ পরতে দেখেছি এককালে, আবার সেই ফ্রকই আস্তে আস্তে ছোট হতে দেখলুম। হাই-হিল্ থেকে লো-হিল্। বুট থেকে শ্লিপার। কত চেঞ্জ হচ্ছে ওয়ার্লডে। জিওগ্র্যাফি বদলে যাচ্ছে রাতারাতি। অত কথা কী, মানুষের মতই কত বদলে যেতে দেখলুম মিস্টার মুখার্জি। মানুষই কি কম চেঞ্জ হচ্ছে?

—অল্ রাইট্ মিস্টার মুখার্জি. আপনি অনেকদিন পরে বাড়িতে এলেন, একটু রেস্ট্ নিন—আমি উঠি তাহলে মিসেস মুখার্জি।

আচারিয়া উঠলো। তারপর আস্তে আস্তে বাগানের ঘোরা পথ দিয়ে গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল।

—কী গো, তোমার মুখ যে অত গম্ভীর-গম্ভীর?

কাজল হাসতে হাসতে পাশে সরে এল।

—কই, গম্ভীর নয় তো। হয়ত খুব টায়ার্ড, তাই—

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ। সুহাস খানিক পরে বললে—ও প্রায়ই আসে বুঝি?

কাজল বললে - না তো, সেই পার্টির দিন এসেছিল, আর আজকে এল।

সুহাস বললে—লোকটাকে আমার তত সুবিধের মনে হয় না—

কাজল বললে—আমারও ভাল লাগে না, কিন্তু বাড়িতে এলে তো আর তাড়িয়ে দিতে পারি না—

সুহাস শুধরে নেয়। বলে না না, তাড়াবার কথা বলছি না, যা মনে হলো তাই বলছি—

আশ্চর্য, তখনও জানতো না সুহাস, আচারিয়া তার জীবনে শনি হয়েই এসেছিল। সুহাসের শান্তির জীবনে এক অদৃশ্য রন্ধ্র দিয়ে আত্মপ্রবেশ করেছিল।

বাবু বোধহয় দিন দশেক ছিল কলকাতায়। আবার একদিন লট্-বহর নিয়ে সাঙ্গপাঙ্গ সমেত বেরিয়ে গেল। আবার কানাই বাবুর ছাড়া জামা-কাপড়গুলো কাচতে দিয়ে এল দোকানে। আবার পিস্তলের বাক্সে চাবি বন্ধ করে চাবিটা মা'র জিম্মায় দিয়ে এল। আবার ঘরদোর-বিছানা সাফ্ করে রেখে দিলে। বিবি রোজকার মত সেদিনও মার চুল বেঁধে দিলে। মা কলঘরে গা ধুতে ঢুকলো। তারপর কলঘর থেকে বেরিয়ে এলে পাট-ভাঙা শাড়ি-ব্লাউজ বার করে দিলে বিবি। মা সেজেগুজে বাগানে এল। একটু এদিক-ওদিক ঘুরে ঘুরে ফুলগাছের চারাগুলো দেখলে। তারপর কয়েকটা ফুল ছিঁড়ে নিয়ে মাথার খোঁপায় গুঁজলে। তারপর

গাড়ি বারান্দার তলাটায় এসে বসলো। আলো জেবলে দিলে কানাই। মা কাগজ-কলম নিয়ে কী যেন লিখতে লাগলো পাতার পর পাতা।

এর কিছুদিন পরেই আবার সেই কোট-প্যান্ট পরা ভদ্রলোক এল।—আচারিয়া সাহেব।

তখন আর নাম জিজ্ঞেস করতে হয় না। তখন রোজ রোজ এসে এসে চেনা লোক হয়ে গিয়েছে। মা আচারিয়া সাহেবকে নিয়ে ঘরের ভেতরে গিয়ে বসলো। কানাইকে ডাকলে চা দিয়ে যাবার জন্যে।

কানাই-এর মনে হলো দু'জনে যেন খুব জোরে জোরে কথা বলছে। খানিকক্ষণ পরে আবার হাসির শব্দও এল। কানাই চা দিতে আসতেই গলাটা যেন নিচু করলে আচারিয়া সাহেব। আচারিয়াকে দেখে সেদিন ভয় করতে লাগলো কানাই-এর। আচারিয়া সাহেব কি মদ খায় নাকি?

আর তারপরেই গাড়ি বার করতে বললে মা।

গাড়ি বেরোতেই দু'জনে বেরিয়ে গেল।

সেদিনও যখন ফিরে এল তখন অনেক রাত। রাত প্রায় এগারোটা। মা'র মুখে পান খাওয়ার দাগ।

—কী রে, তোরা এখনও খাসনি? আমি খেয়ে এসেছি আজ—আর খাবো না—

তারপর বিবি জামা-কাপড় এগিয়ে দিলে মাকে। মা বললে—হ্যাঁ রে, আমার কোনও চিঠি আসেনি?

রাত্রে আবার চিঠি আসবে কী! মা'র যেন খেয়ালই ছিল না।

বললে—ও, তা তো বটেই—

বলে মা শুয়ে পড়লো। কিন্তু ভোরবেলা উঠেই আবার বললে—আমার নামে কোনও চিঠি এলেই আমার কাছে নিয়ে আসবি। দেরি করিসনি—

বাবু পরের দিন এল। কানাই এসে গাড়ি থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে নিলে। বন্দুকটা নিয়ে বন্দুকের বাক্সে পুরে রেখে দিয়ে এল। ছাড়া জামা-কাপড়গুলো একপাশে জড়ো করে রাখলে। কাচতে দিতে হবে। তারপর চা করে নিয়ে এল। আবদুল নতুন করে আবার রান্না চড়ালে। গরম জল করে দিলে।

সুহাস ও কাজল চা খেতে লাগলো বসে বসে।

কথায় কথায় সুহাস জিজ্ঞেস করলে—সেই আচারিয়া আর এসেছিল নাকি?

—কোন্ আচারিয়া?

যেন ভুলেই গিয়েছিল কাজল—তারপরেই হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে এমনি ভাব দেখিয়ে বললে—ও, সেই আচারিয়ার কথা বলছো? না, সে আর আসেনি। সেই তুমি যেদিন এসেছিলে সেদিন এসেছিল, তারপর আর আসেনি—

তারপর রাত্রে খেয়ে-দেয়ে বাবু আর মা দু'জনে শুয়েছে। আবদুলও খেয়ে-দেয়ে ঘুমোতে গেছে নিজের ঘরে। বিবিও ঘুমিয়েছে। কানাই মাঝ-রাত্রে একবার উঠেছিল, তখনও দেখেছিল ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

তখনও দু'জনের কথা শোনা যাচ্ছে—

তারপর আর জানে না কানাই। কানাই আবার গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে নিজের ঘরে।

গার্লিক সাহেব সেদিন একটা স্পেশাল কাজ দিয়েছিল। কলকাতায় নয়, কলকাতা থেকে একটু দূরে চব্বিশ পরগণার শেষ প্রান্তে। একেবারে ডায়মণ্ড-হারবারের গঙ্গার ধারে। স্পেশ্যাল স্কোয়াডের দলবল নিয়ে হানা দিতে হয়েছিল সুহাসকে। যুদ্ধের সময়, সাধারণ মানুষও বসে নেই। কোথা থেকে দুটো পয়সা আসবে তারই ব্যবস্থা করেছিল। যেমন করে হোক, গভর্ণমেণ্টকে ঠকিয়ে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে লক্ষপতি হতে হবে।

কাজ দু'দিন আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল সুহাসের। দু'দিন আগেই কলকাতায় ফিরে গার্লিক সাহেবের বাড়িতে রিপোর্ট দিতে গিয়েছিল।

গার্লিক সাহেব ভারি খুশী। বললে—ওয়েল ডান্ মুখার্জি—ভেরি ওয়েল ডান্—

তারপর সাহেবের পীড়াপীড়িতেই একটা হোটেলে গিয়ে উঠতে হয়েছিল।

সুহাস বলেছিল - আমি বাড়ি যাই স্যার, মিসেস মুখার্জি একলা আছেন—

—তাহলে মিসেস মুখার্জিকেও গিয়ে নিয়ে এস—

সুহাস বলেছিল - তার দরকার নেই, তারও অনেক কাজ আছে সংসারে, বাড়িতে থাকতেই মিসেস মুখার্জি বেশি ভালবাসে—

গার্লিক সাহেব বলেছিল—তুমি খুব ভাল ওয়াইফ্ পেয়েছ মুখার্জি, সী মাস্ট্ বি এ ভেরি গুড্ হ্যাসিফ —তোমার ওয়াইফের হাতের ইণ্ডিয়ান ডিশ্ আমি এখনও ভুলতে পারিনি—

সারাদিনের পরিশ্রমের পর হোটেলে গিয়ে গার্লিক সাহেব একটু ড্রিঙ্ক করতে চেয়েছিল। ঠাণ্ডা বিয়ার কি সামান্য দু'এক পেগ হুইস্কি।

—তুমি কী নেবে মুখার্জি ? বিয়ার না হুইস্কি ?

এমনিতে এ-সব কিছুই খায় না সুহাস। এ-সব খাওয়া পছন্দও করে না।

—তাহলে বিয়ার খাও একটু, ঠাণ্ডা বিয়ার।

সাহেবের সঙ্গে বসে বসে অনেক কথা হচ্ছিল। দিল্লী থেকে কন্‌ফিডান্-সিয়াল চিঠি এসেছে। স্কোয়াড আরো বড় করা হবে। আমি তোমাকে এস-পি করে দেব মুখার্জি, ইন্ নো টাইম্। ন্যাশিনেলিস্ট্যাল এলিমেণ্টে দেশ ছেয়ে গেছে। সবাই ভেতরে ভেতরে প্রো-জাপানীজ্। সবাই চায় জাপান আসুক দেশে। বৃটিশ প্রেস্টিজ আপহোল্ড করবার জন্যেই আমরা চাকরি নিয়েছি। এখানে যে বাধা দিতে আসবে, তাকেই নির্মমভাবে র‍্যাকেট করতে হবে। নিজের ভাই হলেও তাকে শাস্তি দিতে হেজিটেট্ করলে চলবে না। অনেক কথা শোনাচ্ছিল মিস্টার গার্লিক, আর সারাদিনের পরিশ্রমের পর মন দিয়ে সব শুনছিল সুহাস। একদিন স্যার পি. সি. রায়ের ছাত্র হিসাবে দেশ-উদ্ধারের ব্রত নিয়েছিল সুহাস,

আর আজ চাকরির জন্যে সেই সুহাসকেই এইসব উপদেশবাণী হজম করতে হচ্ছিল।

—দরকার হলে তুমি তোমার নিজের আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যেতে পারবে মুখার্জি?

সুহাস বলেছিল—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনি কি বলতে চাইছেন?

সাহেব বললে—ধরো জাপানীরা এল এখানে, এসে কাণ্ট্রি অকুপাই করে নিলে, তখন আমরা কয়েকজন লিমিটেড্ লয়্যাল সিটিজেনই সমস্ত শক্তি দিয়ে তার প্রতিরোধ করবো, পারবে না?

কথাগুলি শুনছিল সুহাস মন দিয়ে। হঠাৎ নজরে পড়লো একটা অদ্ভুত জিনিস।

সুহাস বার দুই নিজের চোখ দুটো রুমাল দিয়ে মুছে নিলে। ঠিক দেখছে তো সে? ভুল দেখেনি তো!

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলে—কী ভাবছো? পারবে না?

কিন্তু সুহাস তখন অন্যমনস্ক! কাজলই যেন হোটেলের এক কোণে বসে বসে কার সঙ্গে গল্প করছে! ঠিক যেন কাজল। অনেকগুলো মানুষের মাথা পেরিয়ে অনেক দূরে ঠিক কাজলের মতই কে যেন একটা রঙিন শাড়ি পরে বসে বসে কার সঙ্গে কথা বলছে। আচারিয়া না? আচারিয়ার সঙ্গে কাজল এখানে এসেছে? সামনে যেন গ্লাস রয়েছে। কয়েকটা ডিশও আছে। কী যেন খাচ্ছে চামচ দিয়ে আর গল্প করছে মশগুল হয়ে! কিন্তু সত্যিই কি কাজল? আর সত্যিই কি লোকটা আচারিয়া?

সুহাসের সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

কেন কাজল এখানে এল? কেন আচারিয়ার সঙ্গে এই হোটেলে এসে খাচ্ছে! তবে কি প্রায়ই আসে? প্রায়ই এখানে এসে গল্প করে!

সুহাসের মনে হলো একটা সরীসৃপ যেন তার সর্বাঙ্গে কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অদ্ভুত এক অনুভূতি তার মনের চেতনায় সঞ্চারিত হয়ে গেল এক মুহূর্তে। সে কোথায় বসে আছে, সে কেন এসেছে এখানে তাও ভুলে গেল। মনে হলো কাজল কেন এল এখানে এমন করে? কই, সুহাসের সঙ্গে তো কোনওদিন আসতে চায় না এখানে, কতবার সুহাস বলেছে—চলো, আজকে বাইরে কোনও হোটেলে খেয়ে আসি—

কিন্তু কাজল প্রত্যেকবারই এড়িয়ে গেছে। বলেছে—না না, হোটেলে খেয়ে কী হবে? বাড়ির খাওয়া কি খারাপ?

তবে? তবে কেন কাজল এল?

গার্লিক তখনও জিজ্ঞেস করছে—পারবে না মুখার্জি, পারবে না?

সুহাস কোনও উত্তর দেবার আগেই আবার বলতে লাগলো—তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আছে মুখার্জি, আই রিলাই আপ্-অন্ ইউ, ইণ্ডিয়াকে হাত-ছাড়া করলে চলবে না মুখার্জি, হোল্ সাউথ-ইস্ট এশিয়ার ভাগ্য নির্ভর করছে এই ইণ্ডিয়ার ওপর। ইণ্ডিয়ার জিওগ্র্যাফিক্যাল পোজিশন্ বড় স্ট্রাটেজিক্—এ আমরা

হাত-ছাড়া করতে পারবো না—

সুহাস তখনও একদৃষ্টে চেয়ে দেখছিল কাজলের কাজলের দিকে। মনে হলো কাজল যেন বড় খুশী। কই, সুহাসের সঙ্গে তো কাজল এমন করে প্রাণ খুলে কখনও হাসে না! সুহাসের সঙ্গে বেরোবার সময় তো এমন করে কখনও সাজেও না কাজল!

হঠাৎ মিস্টার গার্লিকের যেন দৃষ্টি পড়লো এদিকে।

বললে—কী দেখছো মুখার্জি? আর ইউ টায়ার্ড? ইউ লুক ভেরি সিক্!
—তোমাকে যেন খুব অসুস্থ দেখাচ্ছে!

হঠাৎ যেন এতক্ষণে সংবিৎ ফিরে এল সুহাসের। মিস্টার গার্লিকের দিকে ফিরে বললে—কী বলছিলেন স্যার?

—তোমাকে কেমন অন্যমনস্ক দেখছি! ভেরি আন্‌মাইণ্ডফুল!

—কই, না!

সাহেব বললে—তোমার মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে তোমার যেন কেমন অস্বস্তি লাগছে—তুমি বাড়ি যেতে চাও?

সুহাস কী বলবে কিছু বুঝতে পারলে না।

—একটু ব্র্যাণ্ডি নেবে? বেশ সুস্থ হয়ে উঠবে! ইউ উইল ফীল ফ্রেশ্!

সুহাস দাঁড়িয়ে উঠলো এবার। সেই দিকে আবার চেয়ে দেখলে। কই, কোথায় গেল! কখন তারা নিঃশব্দে হোটেল থেকে চলে গেছে টেরই পায়নি সুহাস। কোথা দিয়ে গেল? কখন গেল!

—আমি আসি স্যার।

—অল্ রাইট! লেট্'স্ গো—

বলে মিস্টার গার্লিকও উঠলো। বললে—তোমার ফিরে যাওয়াই উচিত! মিসেস মুখার্জি বোধহয় লোন্‌লি ফীল করছে—তোমারও বোধহয় তার কাছে যাওয়া দরকার—আমি ওল্ড্ ম্যান্, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি, তোমাকে আর ডিটেন্ করবো না—

বলে সাহেব আবার পুরোন প্রসঙ্গের জের টেনে বলতে লাগলো—এ ওঅর আমাদের পক্ষে একটা ক্রুশিয়াল প্রব্‌লেম্ মুখার্জি, এ সম্বন্ধে আমি আরো আলোচনা করবো পরে—

কিন্তু তখন আর শোনবার মত মনের অবস্থা নয় সুহাসের।

সাহেব বললে—চলো, তোমাকে আমি লিফ্‌ট্ দিচ্ছি—

বাড়ির দরজার সামনে সুহাসকে নামিয়ে দিয়ে সাহেব চলে গেল গাড়ি চালিয়ে। সুহাস নিঃশ্বাস বন্ধ করে নিজের বাড়ির গেটের সামনে যেতেই দারোয়ানটা সেলাম করলে। এতক্ষণ দারোয়ানটা চুপচাপ বসে ঝিমোচ্ছিল। সাহেবকে দেখেই অ্যাটেন্‌শন্ হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে।

তারপর রাস্তাটা পেরোতে গিয়েই কানাই-এর সঙ্গে মুখোমুখি। কানাইও অবাক হয়ে গিয়েছিল। হাতের ব্যাগটা তাড়াতাড়ি নিয়ে দৌড়োচ্ছিল। অনেক

কাজ এখন তার। সাহেবের পুরোন ছাড়া জামা-কাপড় গোছাতে হবে। তারপর বন্দুকটা রেখে দিতে হবে বাক্সের ভেতরে। তারপর বাক্সের চাবিটা দিতে হবে মা'র কাছে।

সুহাস ডাকলে—কানাই, মা কোথায় ?

আজ্ঞে, মা তো এখ্খুনি এল—

—মা কখন বেরিয়েছিল ?

কানাই বললে—সেই সন্ধ্যেবেলা—

—কার সঙ্গে বেরিয়েছিল রে !

কানাই বললে—আচারিয়া সাহেবের সঙ্গে—

—আচারিয়া সাহেব কি রোজ আসে ?

কানাই বললে—আজ্ঞে, উনি তো রোজই প্রায় আসেন।

—রোজ এসে কী করেন ?

কানাই বললে--রোজ এসেই মাকে গাড়িতে করে নিয়ে যান—

আচ্ছা তুই যা।

ঘরের মধ্যে তখন কাজল ঠিক রোজকার মত কাগজ কলম নিয়ে লিখছে। সুহাসকে দেখেই অবাক হয়ে গেল। বললে—ওমা, তুমি যে !

সুহাস বললে—এই এখনি এলাম।

—কাজ শেষ হয়ে গেল বুঝি ?

—হ্যাঁ, দু'দিন আগেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাই চলে এলাম।

কাজল তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বললে—তোমার গরম জল করতে বলি। চা খাবে তো ?

—তুমি চা খেয়েছ ?

কাজল বললে—না একসঙ্গেই খাবো—

তারপর যথারীতি গরম জলের ব্যবস্থা করে দিলে আবদুল। কানাই চা করতে গেল। সুহাস তৈরি হয়ে এসে বসতেই কাজল বললে—তুমি ছিলে না, বড় একলা-একলা লাগছিল, তাই লিখছিলুম—

—কত দূর এগুলো তোমার উপন্যাস ?

কাজল বললে—প্রায় অর্ধেকের বেশি হয়ে গেছে—

—কবে শেষ হবে ?

কাজল বললে—ও সব থাক্, একলা-একলা থাকি তাই সময় কাটাবার জন্যে লিখি, নইলে লেখিকা হবার ইচ্ছে আমার নেই—

—দেখি না, কতদূর লিখলে ?

কাজল বললে—না না, ও সব তোমাকে দেখাবার মত নয়—

সুহাস হঠাৎ বললে—আমি যখন থাকি না, তখন মাঝে মাঝে বাইরে বেড়াতে বেরোও না কেন ?

—বা রে, আমার বুঝি সংসারের কোনও কাজ নেই ? আমার বাইরে বেরোলে চলে ?

সুহাস তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে লাগলো কাজলকে। এতদিনের চেনা কাজলকে যেন হঠাৎ তার বড় অচেনা মনে হলো। বললে—আজকে সারাদিন কী করলে ?

কাজল বললে—কী আর করবো, সারাদিন বাড়িতেই কাটালুম।

—কোথাও বেরোলে না কেন ?

কাজল বললে—কোথাও বেরোতে ভাল লাগে না—

সুহাস আবার জিজ্ঞেস করলে—কেউ আসেনি আজকে ?

তারপরেই কাজল একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে—হঠাৎ এত কথা জিজ্ঞেস করছোই বা কেন ?

—না, এমনি।

সুহাস আর কোনও কথা বললে না।

কাজল বললে—তোমাকে যেন আজকে কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে, শরীর খারাপ নাকি তোমার ?

সুহাস বললে—না—

—তাহলে খুব টায়ার্ড বুঝি ? দেখি, জ্বর এসেছে নাকি ?

বলে কাজল সুহাসের কপালে নিজের হাতটা ঠেকালে। বললে—না, গা তো গরম নয়—

তারপর আরো কাছে এসে বললে—তুমি বরং শুয়ে পড়, আমি তোমার মাথাটা টিপে দিই—

বলে সত্যি সত্যিই কাজল জোর করে সুহাসকে বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর নিজেই পাশে বসে সুহাসের মাথাটা টিপে দিতে লাগলো। সুহাস চোখ বুজে চুপ করে পড়ে রইল। কিন্তু মনে হলো যেন শরীরের সমস্ত কোষে তার আগুনের শিখা বিচ্ছুরিত হয়ে যাচ্ছে। কী শান্ত প্রশান্ত কাজলের মুখের চেহারা! মিথ্যে কথা বলতে তো তার এতটুকু দ্বিধা নেই। এতটুকু জড়তা নেই। তার মনে হলো তার এতদিনের সংসার করা, এতদিনের প্রীতি-আনন্দ, এতদিনের কর্ম, এত প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা সব যেন মিথ্যে, সব যেন অভিনয়। সব যেন ছলনা। সে এতদিন শুধু স্তোক-বাক্যে ভুলে এসেছে, এতদিন শুধু চাতুরীতে প্রতারিত হয়ে এসেছে। কেন সে এই সংসার করতে নেমেছে। তাহালে সেই-ই তো তার ভাল ছিল, সেই দোরে দোরে চাঁদা চেয়ে বেড়াতো আর সঙ্কট-ত্রাণ করে মফঃস্বলে মফঃস্বলে চষে বেড়াতো ! তাহলে কেন সে বিবেকের গলা টিপে এই ছার মিথ্যের ভিতের ওপর নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের আনন্দের সৌধ গড়ে তুলতে গেল। কী প্রয়োজন ছিল তার। সুহাস চার দিকে চেয়ে দেখলে। এই আসবাব-পত্র, এই সৌখীন বিলাস-সামগ্রী, এই চাকর-আয়া-খানসামা, এই চাকরি, এ-সব কিছুই তো কিছু নয়! কেন এমন করে প্রতারিত করলে তাকে কাজল। কী অপরাধ সে করেছে তার কাছে ?

কাজল বললে—একটু আরাম হচ্ছে ?

মনে হলো কাজল যেন তাকে ধরে দু'ঘা চাবুক মারলে। সুহাস কোনও উত্তর দিলে না। চোখ দুটো বুঁজিয়ে ফেললে যন্ত্রণায়। তার মনে হলো কাজলের হাতটা যেন কাঁটার মত তার কপালে বিঁধছে। তারপর বললে—হ্যাঁ, আরাম হচ্ছে—

তারপর রাত আরো বাড়লো। টেবিল তৈরি হলো। আবদুল খাবার দিলে। বিছানা করে দিলে বিবি। সুহাস নির্জীবের মত প্রাত্যহিক জীবনের রুটিনগুলো সব নিয়মমাফিক সারলে।

কাজল পাশে শুয়ে কানের কাছে মুখ এনে বললে—এখন একটু আরাম হচ্ছে ?

সুহাসের মনে হলো এক প্রচণ্ড আঘাত করে কাজলকে। সারা জীবনের মত বিশ্বাসঘাতকতার চরম দণ্ড দেয় চূড়ান্ত একটা আঘাত দিয়ে। কিন্তু তবু কেমন দ্বিধা হলো।

কাজল বললে—তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, তুমি ঘুমোও—

সুহাস কোনও আপত্তি করলে না। কাজল তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো। সুহাস চোখ-কান-মুখ বুজে সমস্ত অব্যক্ত যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করতে লাগলো। তারপর কখন কাজলই ঘুমিয়ে পড়েছে। কাজলের বিলম্বিত তালের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ তার কানে আসতে লাগলো। অলস অবশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে কাজল।

খানিক পরে সুহাস উঠলো। উঠে আস্তে আস্তে আলোটা জ্বালালে।

এবার স্পষ্ট দেখা গেল কাজলকে। বিছানার একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল সুহাস। ঘুমে অচৈতন্য কাজল। শাড়িটা সরে গেছে গা থেকে। ঠোঁটে একটা পাতলা হাসি আল্‌গা হয়ে ঝুলছে। যেন বলছে—আমাকে ধরতে পারবে না তুমি। আমাকে ধরা যায় না। আমি অধরা—

সুহাসও বললে—আমি তোমাকে বেঁচে থাকতে দেব না। তুমি আমার জীবন নষ্ট করেছ—

—কিন্তু কেমন ঠকিয়েছি তোমাকে! তুমি চিনতে পারোনি আমাকে। আমি জীবনে যা চেয়েছিলুম সব পেয়েছি—। আমি সব কুল বজায় রেখেছি, সকলকে খুশী করেছি, আমি সুখী হয়েছি—

ঘুমের ঘোরে কাজল যেন একবার নড়ে উঠলো। সুহাস চম্‌কে উঠে এক-পা সরে এসেছিল। কিন্তু কাজল আবার স্থির হলো। আবার ঘুমের কোলে এলিয়ে দিলে নিজেকে।

সুহাস আর সহ্য করতে পারলে না। কাজলের আঁচল থেকে চাবিটা খুলে নিয়ে নিঃশব্দে রিভলবারের বাক্সটা খুলে ফেললে। তারপর সন্তর্পণে রিভলবারটা বার করে এনে বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল। লোড্ করাই ছিল সেটা।

তারপর একদৃষ্টে কাজলকে দেখতে লাগলো।—তোমাকে আমি ভালবাসি কাজল। তুমি আমাকে এত বছর নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি দিয়েছ, এত বছর আনন্দ দিয়েছ, তার জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতাও করেছ। আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ। আমার ভালবাসার অপমান করেছ তুমি…

হঠাৎ কাজল যেন একটু নড়ে উঠলো। ঘুমের ঘোরে প্রথমে কিছু বুঝতে পারেনি। অস্পষ্ট ছায়ার মত কী যেন সামনে নড়ে উঠলো। বললে—কে?

সুহাস বাঘের মত টিপি টিপি পায়ে ততক্ষণে দূরে সরে গেছে।

—কে? আলো জ্বাললে কে?

সুহাস বললে—আমি—

—কী করছো, ওখানে?

সুহাস বললে—বড় জল তেষ্টা পেয়েছে, একটু জল খাচ্ছি—

কাজল বললে—তা আমাকে বললে না কেন? আমিই দিতে পারতুম—

সুহাস তাড়াতাড়ি বাক্সের মধ্যে রিভলবারটা রেখে চাবি বন্ধ করে আবার এসে পাশে শুলো। কাজল সুহাসের গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল। বললে—তুমি অত দূরে কেন, আরো কাছে সরে এসো না—

সুহাস বললে—থাক্, আমার বড় ঘুম পাচ্ছে—

হঠাৎ যেন কাজলের খেয়াল হলো। বললে—আমার চাবিটা কোথায় গেল? আমার আঁচলে বাঁধা ছিল যে—

হন্তদন্ত হয়ে উঠলো কাজল। উঠে আলো জ্বাললে। আলো জ্বেলে এদিক-ওদিক খুঁজতে লাগলো। বললে—দেখ তো, শোবার সময় তাড়াতাড়ি চাবিটা আঁচলে বোধহয় না-বেঁধেই ঘুমিয়ে পড়েছি—

তারপর অনেক খোঁজাখুঁজির পর টেবিলের ওপর চাবিটা আবার পাওয়া গেল। তাড়াতাড়ি আঁচলে সেটা বেঁধে নিয়ে আবার এসে বিছানায় শুলো। বললে—চাবিটা আঁচলে না বাঁধলে আমার ঘুমই আসে না, জানো—

সুহাস কোনও কথারই একটাও উত্তর দিলে না। চোখ বুজে নির্জীবের মত পড়ে রইল বিছানার এক পাশে। তারপর কাজল আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, আবার তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ একতালে বয়ে চলেছে। সব কানে এল সুহাসের। বাইরের পৃথিবীর, ভেতরের পৃথিবীর, অন্তরাত্মার পৃথিবীর সমস্ত শব্দ সমস্ত কোলাহল স্পষ্ট শুনতে পেলে সুহাস। তার চেতনায় যেন দানবের নৃত্য শুরু হয়েছে। তারপর সকাল হলো এক সময়ে। জানালা দিয়ে নীল আকাশ দেখা গেল। ভোর হলো। বিছানা ছেড়ে উঠলো সুহাস। উঠে কী করবে, কোথায় যাবে, কার কাছে গিয়ে সব বলবে ঠিক করতে পারলে না।

—ওমা, তোমার এত সকাল-সকাল ঘুম ভেঙে গেছে?

তাড়াতাড়ি কানাই চা দিয়ে গেল। সুহাস ততক্ষণে তৈরি হয়ে নিয়েছে।

তার ইউনিফর্ম পরেছে। কলঘর থেকে বেরিয়ে এসে কাজল সুহাসকে দেখে অবাক হয়ে গেল। বললে—তুমি আবার কোথাও বেরোবে নাকি?

সুহাস আপন মনেই বললে—হ্যাঁ।

কাজল জিজ্ঞেস করলে—কোথায়?

—সব কথা তোমাকে বলতে হবে নাকি?

কাজল চুপ করে গেল। কাল থেকেই যেন কেমন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে সুহাসকে। যথারীতি বেরিয়ে গেল সুহাস। যাবার আগে অন্য দিনের মত একবার ভাল করে কথাও বলে গেল না। সুহাসের মনে হলো যেন চিরকালের মত চলে যাচ্ছে, আর দেখা হবে না কারো সঙ্গে।

কিন্তু রাত্রেই ফিরলো সুহাস। তখন রাত বোধহয় ন'টা। কিন্তু না ফিরলেই বোধহয় ভাল হতো। চিরকালের মত সমস্ত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেত সে।

অথচ কোথায় যাবারও ছিল না সুহাসের। সে দিনটা ছুটি। ভোরবেলা বেরিয়েছে। শেয়ালদা স্টেশনের সামনে গাড়িটা ছেড়ে দিলে।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে—কবে আবার আসবেন হুজুর?

—ঠিক নেই।

কথাটা বলে সুহাস প্ল্যাটফরমের দিকেই গেল। কিন্তু কোথায়ই বা যাবে সে? কোনও নিরুদ্দেশ ঠিকানার গন্তব্যস্থলের হদিস ভেবেও আবিষ্কার করতে পারলে না সে। আবার ফিরে এল বাইরে। গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার তখন চলে গেছে। রাস্তায় ট্রাম-বাস গাড়ি চলেছে সার বেঁধে। এতদিন যেন এ-পৃথিবীটাকে দেখা হয়নি সুহাসের। সেদিন সেই মুহূর্তে যেন সব কিছু নতুন লাগলো তার চোখে। এত বৈচিত্র্য, এত মানুষ, এত কাজ চারিদিকে। ছেঁড়া জামা-কাপড় পরা ভিখিরি, সার্ট-পাঞ্জাবী পরা ডেলি প্যাসেঞ্জার, সকলের মুখে-চোখে ব্যস্ততা, সবাই ছুটছে, জীবিকার তাড়নায় ছুটছে পাগলের মত।

খানিকক্ষণ দাঁড়ালো গিয়ে ডালহৌসী স্কোয়ারে। অফিস-পাড়ার মানুষের চেহারা দেখে তার কেমন মনে হলো সেই একই দৃশ্য, সেই একই বৈচিত্র্য। কিছুই যেন ভাল লাগলো না। পৃথিবীতে কোথাও যেন আশ্রয় নেই সুহাসের। সুহাস নিরাশ্রয়ের মত ভেসে বেড়াতে লাগলো কলকাতার জন-সমুদ্রে।

একজন হঠাৎ চেনা-লোকের গলা শোনা গেল।

—এ কি স্যার, আপনি এখানে? ডিউটি বুঝি?

সুহাস সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে আবার ট্যাক্সি ধরলে একটা।

—কিধার সাব্?

সুহাস বললে—সিধা।

ট্যাক্সিটা সোজা চলতে লাগলো চৌরঙ্গী ধরে। আরো আরো দূরে, আরো বিচ্ছিন্ন হতে ইচ্ছে হলো। মনে হলো আকাশের ওই শেষ সীমানায়

কাছে গিয়ে পেঁছতে পারলে যেন ভাল হতো। একেবারে ডায়মণ্ডহারবারের সমুদ্রের ধারে গিয়ে থামলো ট্যাক্সিটা। ট্যাক্সি-ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে—আভি কিধার সাব্ ?

আর কোথায় যাবে এখন ? আর কোথায় গেলে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে ? সুহাস বললে—এখানে রাখো, আমি নামবো—

সুহাস গাড়ি থেকে নেমে একেবারে সোজা জলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল। পায়ের জুতোর ওপর জলের ঢেউ এসে লাগতে লাগলো। আস্তে আস্তে সূর্য অস্ত গেল জলের তলায়। তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সুহাস। ট্যাক্সিটা তখনও দাঁড়িয়েছিল। ড্রাইভারও অবাক হয়ে গিয়েছিল সাহেবের কাণ্ড দেখে। হঠাৎ পেছনে গলার শব্দ পেয়ে পেছন ফিরতেই ড্রাইভারটা বললে—হুজুর, লোটেঙ্গে নেহি।

—হ্যাঁ, চলো—

আবার ট্যাক্সিতে উঠলো সুহাস। আবার সেই নির্জন দীর্ঘ রাস্তা। অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। দু'পাশের জলা-জমি থেকে ব্যাঙ ডাকার শব্দ আসছে। বড় আরাম লাগলো এতক্ষণে। মনে হলো চারিদিকের এই অন্ধকারই যেন চেয়েছিল সে জীবনে। সংসার চায়নি, শান্তি চায়নি, অর্থ গৌরব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা, কিছুই যেন সে চায়নি সারাজীবন। যা সে পেয়েছে, তা যেন সে চায়নি কখনও। চেয়েছিল শুধু অন্ধকার। এই অন্ধকারের মধ্যেই যেন এই পৃথিবীর, এই মানুষের আদি রূপ আত্মগোপন করে আছে। এই অন্ধকারই যেন ভাল, এখান থেকে যেন আর যেতে ইচ্ছে করছে না। এ অন্ধকার যেন আর না দূর হয়, এ অন্ধকার যেন ভোর না হয়। এ অন্ধকার যেন চিরস্থায়ী হয় তার জীবনে।

কখন নিজেরই অজ্ঞাতে সুহাস আবার কলকাতা শহরের মধ্যে এসে পড়েছে তার জ্ঞান ছিল না।

ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলে আবার—কিধার সাব্ ?

এতক্ষণে যেন সংবিৎ ফিরে এলো সুহাসের। আবার সেই কলকাতা। আবার সেই কলকাতার জীবনের ধোঁয়া, কালি, গোলমাল, বিশ্বাসঘাতকতা। আবার সেই সংসার, সেই চাকরি, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা। আবার সেই প্রতিযোগিতা। সুহাসের সমস্ত মনটা যেন বিষাক্ত হয়ে উঠলো। কেন সে ফিরে এল কলকাতায় ? কাজল থাক্ না তার সংসার আর সম্পত্তি নিয়ে। সুহাস চলে যাবে অনেক দূরে, একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তার জীবন থেকে। সেই-ই তো ভাল।

কিন্তু আবার মনে হলো—না। একবার কাজলের মুখোমুখি হওয়া ভাল। একবার জিজ্ঞেস করা ভাল—কেন এমন হলো ? কার দোষে এমন ঘটলো ?

কিন্তু আশ্চর্য, বাড়ির সামনে আসতেই ঘটনার বিপর্যয়ে চম্‌কে উঠলো

সুহাস! এত লোক কেন তার বাড়ির সামনে? এত ভিড় কেন? এত লোক তার বাড়ির ভেতরে বাগানে ঢুকে পড়েছে। সেই ব্ল্যাক-আউটের রাতে শুধু মাথা দেখা গেল অসংখ্য! অসংখ্য লোক ভিড় করেছে তার বাগানের ভেতর। এক দিনের অনুপস্থিতির মধ্যে হঠাৎ এ কী বিপর্যয় ঘটে গেল?

সাহেবকে দেখেই ভিড় একটু সরে গেল। দারোয়ান অন্ধকারে অতটা চিনতে পারেনি। সুহাস জিজ্ঞেস করলে—ক্যা হুয়া? কী হয়েছে এখানে? এত লোক কেন?

দারোয়ান যা বললে তার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা গেল না। সুহাসের রক্তের সমুদ্রে তখন তুফান উঠেছে।

কানাই দৌড়ে এল বাবুকে দেখে। বললে—বাবু, খুন হয়ে গেছে একটা লোক—

—কে খুন হয়েছে?

কানাই বললে—আচারিয়া সাহেব!

—আচারিয়া সাহেব। আচারিয়া সাহেব কি আবার এসেছিল? কখন এসেছিল?

কানাই বললে—সন্ধ্যেবেলা এসেছিল, মা'র সঙ্গে গল্প করছিল হুজুর, আমি চা করে দিয়ে বাইরে আমার ঘরে গিয়ে একটু বসেছি, হঠাৎ দুম্ দুম্ করে বন্দুকের শব্দ হলো।

—তারপর?

—তারপর বন্দুকের শব্দ শুনেই আমি বাইরে বাগানে ছুটে এসেছি। আবদুল, বিবি, ওরাও ছুটে এসেছে।

অন্ধকারের মধ্যে নজরে পড়লো আচারিয়া সাহেব দৌড়তে দৌড়তে বাইরের ঘর থেকে বাগানে বেরিয়ে আসছে, আসতে আসতে আরো দু'একবার শব্দ এল বন্দুকের আর আচারিয়া সাহেব মাটিতে লুটিয়ে পড়লো—

সুহাস তাড়াতাড়ি ভিড় সরিয়ে কাছে গিয়ে দেখলে। আচারিয়া অজ্ঞান-অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে—। পিঠ দিয়ে গল্ গল্ করে রক্ত বেরোচ্ছে। রক্তে ভেসে গেছে জায়গাটা।

—কে খুন করলে, দেখেছিস তুই?

কানাই বললে—না হুজুর, কিছু দেখতে পাইনি, শুধু দেখলুম বাইরের ঘরের দরজার কাছটা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে খুব—

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

আমি এ-সব কথা কিছুই জানতাম না। সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের নামও কখনও শুনিনি। এ-সব অনেক দিন আগের ঘটনা। আমি তখন গল্প-উপন্যাস লিখতেও শুরু করিনি। কলকাতা শহরের খবরের কাগজে অন্যান্য অনেক রাহাজানি-ডাকাতি-খুন-জখমের কাহিনীর মধ্যে এ-রকম একটা সংবাদ বেরিয়ে-

ছিল কি না তাও আমার মনে থাকবার কথা নয়। আর চিঠি লিখেছিলেন সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায় কাটনী থেকে। কাটনীতে আমি জীবনে কখনও পদার্পণ করিনি। সি-পির ছোটখাটো একটা শহর কাটনী। বম্বে যাবার পথে স্টেশনটা অনেকবার দেখেছি—এই পর্যন্ত। সেই কাটনী থেকে চিঠি পেয়ে আমি প্রথমে গা করিনি। শেষকালে যখন তিনি আসা-যাওয়ার খরচ পাঠালেন তখন না-গিয়ে আর উপায় রইল না।

ট্রেন থেকে নেমে ভেবেছিলাম কেউ দেখা করতে আসবে। কিন্তু কেউই আমার জন্যে স্টেশনে আসেনি দেখে একটু রাগও হয়েছিল মনে মনে। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে দু'একজনকে জিজ্ঞেস করে শেষ পর্যন্ত যখন দরজায় গিয়ে কড়া নাড়লাম, তখন ভেতর থেকে কে একজন রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করলে—কে? কে তুমি?

শেষ পর্যন্ত যখন শুনলে আমি কলকাতা থেকে এসেছি তখন দরজা খুলে দিয়েছিল।

কানাই বললে—আপনার চিঠির জন্যে বাবু এ ক'মাস খুব ভেবেছেন—

বললাম—বাবু কোথায়?

—ভেতরে। কিন্তু তাঁর শরীর খুব খারাপ হুজুর। এখন আর উঠতে পারেন না বিছানা থেকে—

শেষ পর্যন্ত কানাই আমাকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছিয়ে দিলে সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছেন দেখলাম। আমাকে দেখে উঠে বসতে যাচ্ছিলেন আনন্দে। কানাই থামিয়ে দিলে। তিনি এককালে স্বাস্থ্যবান ছিলেন, তা চেহারা দেখেই বোঝা গেল।

বললেন—আপনি আসাতে যে কী আনন্দ পেয়েছি, তা আর কী বলবো। আপনার জন্যেই বোধহয় আমি এখনও বেঁচে আছি—

তারপর অনেক কথা হলো। ঘরের দেওয়ালে দেখলাম একটি মহিলার ছবি টাঙানো।

কানাই বললে—ওই মায়ের ছবি—

তখনও কিছুই জানি না, কেন আমাকে ডেকেছেন সুহাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। কে তিনি, আমার সঙ্গে কেন সম্পর্ক পাতাতে চাইছেন। খেতে বসে কানাইকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম—আমাকে কেন ডেকেছেন, তুমি জানো কিছু?

কানাই বলেছিল—না হুজুর—

—বাবু এখানে একলা থাকেন কেন? বাবুর কেউ নেই?

—কানাই বলেছিল—বাবু পুলিশের মস্ত চাকরি করতেন এককালে, তারপরে হঠাৎ একদিন চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এসেছেন। আমারও তো কেউ নেই, তাই আমিও চলে এলুম বাবুর সঙ্গে—

—তা বাবু তোমার পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিলেন কেন হঠাৎ?

কানাই বললে—তা জানিনে বাবু, বাবুর কী যে মতি হলো, বাবু একদিন

অফিসের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এখানে এসে উঠলেন, সেই থেকে আমিও রয়েছি, আর আমার এই কর্মভোগ চলছে—

—কেন, কর্মভোগ কেন ?

—কর্মভোগ নয় তো কী বাবু, বাবুর নিজেরও কোনও মতিস্থির নেই, আমাকে সময়-সময় পাগল করে ছাড়েন। নইলে দেখলেন তো বাবুর চেহারা। ইয়া চেহারা ছিল বাবুর, রাতারাতি চোখের ওপর যেন বুড়ো হয়ে গেলেন, মাথার চুলগুলো সব পেকে গেল, গায়ের চামড়া ঝুলে গেল, এখন দেখলে মনে হয় যেন সত্তর-আশী বছর বয়েস।

—কিন্তু কেন এমন হলো ?

প্রথম দিন-কয়েক কোনও কাজের কথাই হলো না। ডাক্তার আসে আর দেখে যায় সুহাসবাবুকে। আমিও দিন কতক বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলাম আশে-পাশের জায়গাগুলোতে। কখনও স্টেশনের প্ল্যাটফরমে গিয়ে ট্রেন আসা-যাওয়া দেখি, কখনও বাজারের ভেতরে গিয়ে নতুন দেশের লোকজন দেখি।

সেদিন সুহাসবাবু বললেন—আপনার সময় নষ্ট করে দিচ্ছি জানি, কিন্তু আমার স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে আমায় মার্জনা কববেন আশা করি—

বললাম—আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি হাতে অনেক সময় নিয়েই এসেছি—

সুহাসবাবু বললেন—অনেকদিন থেকেই আপনার আসার প্রতীক্ষা করছিলাম, কিন্তু কে আর আমার জন্যে নিজের কাজ-কর্ম ছেড়ে এখানে আসবে বলুন। আমি প্রতিদিন আপনার চিঠির অপেক্ষায় থাকতুম, শেষে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে গেল—

—কিন্তু স্বাস্থ্য ভাঙলোই বা কেন হঠাৎ ? আপনি তো পুলিশের চাকরি করতেন।

—কে বললে আপনাকে ?

বললাম—কানাই। কানাই আমাকে কিছু-কিছু বলেছে, আপনি নাকি হঠাৎ চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে এসেছেন।

সুহাসবাবু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন—কানাই আর কতটুকু জানে, আর কতটুকুই বা সে আপনাকে বোঝাতে পারবে। একজন মানুষ কি আর-একজন মানুষের সবটুকু বুঝতে পারে ? কোনও স্বামী কোনও স্ত্রীকে বুঝতে পারে না।

বলে তিনি চুপ করলেন হঠাৎ।

আমি বললাম—আমাকে কী জন্যে আপনি ডেকেছিলেন তা কিন্তু এখনও বলেননি আমাকে।

—তাহলে শুনুন, আপনি হয়ত শুনে আমার ওপর অসন্তুষ্টই হবেন। কিন্তু এ বলতে না পারলে আমিও শান্তি পাবো না। ওই দেখুন, দেওয়ালে আমার স্ত্রীর ছবি টাঙানো রয়েছে, আমার পরলোকগতা স্ত্রী—

দেখলাম। বললাম—কানাই আমাকে প্রথম দিনেই তা বলেছে—

—তাহলে অনেক কিছুই শুনেছেন দেখছি। জানি না আপনি কতটুকু শুনেছেন আর কতটুকু শোনেননি। কিন্তু এটা শুনেছেন কি না জানি না যে, আমি আমার স্ত্রীকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম। আমার স্ত্রী সাধারণ একজন স্কুল-মিস্ট্রেস ছিলেন।

—তা শুনেছি।

—এটা কি শুনেছেন যে আমার বাড়িতে আচারিরা বলে একজন ভদ্রলোক খুন হয়ে যায়?

—তাও শুনেছি!

সুহাসবাবু বললেন—কেন খুন হয় তা শুনেছেন কি?

বললাম—না—

সুহাসবাবু বললেন—আমিও তা জানতাম না। আমার সংসার, আমার প্রতিষ্ঠা, আমার প্রতিপত্তি, আমার সম্মান সমস্ত কিছু সেই খুনের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল—তাও শুনেছেন কি?

বললাম—না, তা শুনিনি—

—আমার স্ত্রী একটা উপন্যাস লিখতে শুরু করেছিল, কিন্তু তা আর শেষ হয়নি, তা-ও শুনেছেন কি?

বললাম—শুনেছি কানাই-এর কাছে যে, আপনার স্ত্রী মাঝে-মাঝে কাগজ-কলম নিয়ে কী সব লিখতেন —

—লিখতেন একটা উপন্যাস। সে উপন্যাস তিনি শেষ পর্যন্ত আর শেষ করে যেতে পারেননি। জানি না কী-রকম সে লেখা। আমি পুলিশের লোক, ছাত্রজীবনে স্যার পি. সি. রায়ের কাছে বিজ্ঞান শিখেছি, তাঁর সঙ্গে মিশে সঙ্কট-ত্রাণ সমিতির কাজ করেছি, সাহিত্য-টাহিত্যের কথা কখনও ভাবিনি; তিনি কি লিখেছেন, কেন লিখেছেন তাও বুঝতে পারি না—হয়ত বেঁচে থাকলে বইটা শেষ করে যেতে পারতেন। কিন্তু আমি চাই যে আপনি সেটা শেষ করে দিন—

—আমি?

—হ্যাঁ, আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না, আমি চলে যাবার আগে দেখে যেতে চাই যে বইটা ছাপা হয়ে বেরিয়েছে! আর···

কী যেন আরও বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু থেমে গেলেন।

বললাম—বইটা কোথায়?

—এই যে আমার কাছেই আছে।

বলে হাতে-লেখা একটা মোটা খাতা বিছানার তলা থেকে বার করলেন। বললেন—এটা সব সময়েই কাছে রাখি, কাছে রাখলে তবু খানিকটা আমার স্ত্রীর সান্নিধ্য পাই, মনে হয় কাজল আছে, কাজল বেঁচে আছে এখনও—

জিজ্ঞেস করলাম—কী নাম দিয়েছিলেন বইটার ?

সুহাসবাবু বললেন—রং বদলায়—।

তারপর একটু থেমে বললেন—কীসের রং তা জানি না। জীবনের না মনের, যৌবনের না বার্ধক্যের তাও জানি না। হয়ত সব জিনিসেরই রং বদলায়। আমরা দেখতে পাই না বাইরে থেকে, বাইরে থেকেই আমরা শুধু বিচার করি মানুষের।

তারপর একটু থেমে আবার বললেন—তা সে-সব কথা থাক্, আপনি বইটা পড়ুন আগে, যদি খারাপ হয়েও থাকে, তবু ছাপাবার মত করে দিন। আমি ছাপাবার সমস্ত খরচ দেব, আমার যা কিছু জমানো টাকা আছে সব দেব আপনাকে, আপনি শেষটা লিখে দিয়ে ছাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন—এখন বইটা নিয়ে গিয়ে আপনি আগে একটু পড়ে দেখুন—

তারপর আমাকে বললেন—আপনার এখানে কোনও কষ্ট হচ্ছে না তো ?

বিনয় করে বললাম—না, আপনি সে-জন্যে কিছু ভাববেন না।

সুহাসবাবু বললেন—কষ্ট একটু হবেই, তবু আপনি আমার অবস্থার কথা ভেবে একটু মানিয়ে নেবেন—যা কিছু দরকার কানাইকে বলবেন। ও একটু বোকা মানুষ, কিন্তু ও ছিল বলেই আমি এই অবস্থার মধ্যেও এখনও বেঁচে আছি—

আমি আর কথা না-বাড়িয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম।

নিজের ঘরে গিয়ে বইটা পড়তে লাগলাম। নিতান্ত কাঁচা হাতের লেখা। কিন্তু মনে হলো কোথায় যেন একটা সত্য সন্ধানের চেষ্টা রয়েছে। মেয়েলি হাতের গোটা-গোটা অক্ষর। মহিলাটির যেন নিজস্ব একটা ভাবনা ছিল। সংসার সম্বন্ধে, পৃথিবী সম্বন্ধে, স্বামী সম্বন্ধে, সন্তান সম্বন্ধে, বিবাহ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, সেই প্রত্যয়ের ব্যাখ্যার জন্যেই হয়ত গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন।

বিকেলবেলাই আবার ডেকে পাঠালেন। কানাই এসে ডাকলে। বললে—বাবু আপনাকে একবার ডেকেছেন—

সামনে যেতেই সুহাসবাবু বললেন—পড়লেন ?

বললাম—সবটা পড়া হয়নি। কিন্তু আমি যে বইটা শেষ করবো, তার আগে আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে আমার কতগুলো কথা জানা দরকার—

—কী কথা বলুন ?

বললাম—আপনার স্ত্রীর মনোবৃত্তিটাও আমার জানা দরকার, তাহলে আমার লিখতে সুবিধে হবে। যে-রাত্রে মিস্টার আচারিয়া খুন হন, সে-রাত্রে আপনি কি আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—কেন তিনি খুন করলেন আচারিয়াকে ?

—হ্যাঁ, জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু সে-সব কথাও কি আপনার জানা দরকার ?

আমি বললাম—তা না জানলে লেখার অসুবিধে হবে। লেখককে জানলে

তার লেখার বিচার সোজা হয়—

কথাটা শুনে সুহাসবাবু কিছুক্ষণ অসহায়ের মত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন—তবে তাই বলি। কিন্তু এক মিস্টার গার্লিক ছাড়া আর কাউকে আমি বলিনি সে-সব কথা—শুনুন—

সেদিনকার সেই ব্ল্যাক-আউটের রাত। সুহাস যেন পাগলের মত ছট্-ফট্ করে উঠেছিল। বাগানে অত ভিড়। আচারিয়া তখনও সেইখানে পড়ে আছে। আর সারা শরীর রক্তে ভেসে গেছে। সুহাস তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকলো নিজের ঘরে। তখনও বারুদের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। ঘবে ঢুকেই খিল্ লাগিয়ে দিলে দরজায়। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়েছিল কাজল। কাজলের মুখে-চোখে অস্বাভাবিক ভীতি। সুহাস একেবারে কাছে গিয়ে কাজলের দুটো হাত ধরে ফেললে। বললে—এ কী করলে তুমি ?

কাজল থর থর কবে কাঁপছিল তখনও।

সুহাস আবার জিজ্ঞেস করলে—কেন তুমি ওকে খুন করলে ? কী হবে এখন ?

কাজল শান্ত চোখে চাইলে সুহাসের দিকে শুধু। তারপর বললে—ও স্কাউণ্ড্রেলটা মরেছে ? মারতে পেরেছি ?

সুহাস বললে—মরেছে। কিন্তু কেন মারতে গেলে ওকে অমন করে ? এখনি যে পুলিশ আসবে। এখনি যে তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে। কী সর্বনাশ করলে তুমি বলো তো কাজল ? এখন আমি কী করি ?

কাজল কিছু উত্তর দিলে না।

সুহাস বললে—জবাব দাও কথার, পুলিশ যে তোমার কাছেই জবাবদিহি চাইবে ?

কাজল বললে—ওর মরাই উচিত, ও অনেকদিন ধরে আমাকে জ্বালাচ্ছিল, আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল, আমি আর পারিনি—

—কিন্তু সন্ধ্যেবেলাই তো তোমাকে দেখেছি চৌরঙ্গীর হোটেলে ওর সঙ্গে, তুমি হাসছো, কথা বলছো।

কাজল অবাক হয়ে চাইলে সুহাসের দিকে। সুহাস বললে—বলো, উত্তর দাও। শিগ্‌গির, এখনি পুলিশ আসবে—

কাজল অনেকক্ষণ পরে বললে—ও আমাকে ব্ল্যাক-মেইল করতে চেয়েছিল—

—কেন ? কী জন্যে তোমাকে ব্ল্যাক-মেইল করতে চেয়েছিল ? কী করেছিলে তুমি ? ওর সঙ্গে তোমার কীসের সম্পর্ক ? বলো, বলো…

কাজল বললে—ওকে আমি অনেক টাকা দিয়েছি এ ক'বছরে, ওকে আমি দশ হাজার টাকা দিয়েছি, তবু ওর লোভ মেটেনি।

—কীসের লোভ ?

—টাকার।

সুহাস জিজ্ঞেস করলে—কিন্তু তোমার কাছে টাকা চাইবার সাহস ওর হলো কী করে? কী করেছিলে তুমি? বলো?

তখন অত সময় নেই আর। কাজল আর পারলে না। কাঁদতে কাঁদতে সুহাসের বুকের ওপর ঢলে পড়লো।

আর দেরি করা চলে না। তাড়াতাড়ি কাজলকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সুহাস মিস্টার গার্লিককে টেলিফোন করলে।

—আমি মুখার্জি কথা বলছি স্যার। আপনি এখনি দয়া করে আমার বাড়িতে চলে আসুন। একটা ভীষণ য়্যাক্সিডেণ্ট হয়ে গেছে, কথা বলবার সময় নেই আর—

সে-রাত্রে সুহাসের মনে হয়েছিল তার যেন সর্বস্ব হারিয়ে গেছে। একটা অবধারিত বিপর্যয়ের মুহূর্তে যেন সুহাস তার সম্মান, প্রভাব, প্রতিপত্তি, সংসার, সব হারিয়ে ফেলেছে।

গার্লিক সাহেব এসে জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু মিসেস মুখার্জি কেন এ-কাজ করতে গেল? আচারিয়ার সঙ্গে মিসেস মুখার্জির কি অন্য কোনও সম্পর্ক ছিল?

—আপনিই মিসেস মুখার্জিকে জিজ্ঞেস করুন না স্যার?

কাজল তখনও কঠিন পাথরের মত গুম হয়ে মুখ বুঁজে শুয়েছিল।

গার্লিক সাহেব কাজলকে জিজ্ঞেস করেছিল—কেন এ-কাজ করতে গেলেন মিসেস মুখার্জি? কেন নিজের হাতে আইন তুলে নিতে গেলেন? আচারিয়া কি আপনাকে মলেস্ট্ করেছিল? অপমান করেছিল?

কাজল মুখ তোলেনি। কোনও কথাও বলেনি।

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করেছিল—একটা কিছু জবাব তো আপনাকে দিতেই হবে মিসেস মুখার্জি? আপনি কি নিজেকে ডিফেণ্ড করার জন্যে ওকে মেরেছিলেন?

কাজল বললে—ও একটা স্কাউণ্ড্রেল—

—কিন্তু কী করেছিল ও আপনার?

—ও ব্ল্যাক-মেইল করতে চেয়েছিল। আমি অনেক টাকা দিয়েছি ওকে। এ ক'বছরে আমি দশ হাজার টাকা দিয়েছি ওকে, তবু আরো টাকা চাইত, আরো ভয় দেখাতো।

—কীসের ভয়?

—আমার অসম্মানের ভয়! আমার সংসার নষ্ট করতে চেয়েছিল ও। আমার সুখ ওর সহ্য হচ্ছিল না, আমার এই স্বামী, আমার এই ঐশ্বর্য, কিছুই সহ্য করতে পারছিল না ও—

সাহেব আবার জিজ্ঞেস করলেন—কিন্তু আপনাকে ভয় দেখাতো ও কোন্ সাহসে? আপনার কোনও দুর্বলতা ছিল? আপনি কখনও কোনও অন্যায়

করেছিলেন? নিজের কোন গোপন কথা ওকে বলেছিলেন কখনও?

কাজল এ কথার কোনও উত্তর দেয়নি। হাজার প্রশ্ন করার পরও কোনও জবাব দেয়নি। মিস্টার গার্লিক বাইরে বেরিয়ে পাশের ঘরে সুহাসকে ডেকে এনে বলেছিল—তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কি আচারিয়ার আগেই পরিচয় ছিল মুখার্জি?

সুহাস বলেছিল—হ্যাঁ স্যার—

—তোমার সঙ্গে বিয়ের আগে থেকেই।

সুহাস বলেছিল—হ্যাঁ, তাই তো শুনেছি—

মিস্টার গার্লিক সব শুনে নিলে। আগে মিসেস মুখার্জি কোন্ গার্লস্ স্কুলের মিস্ট্রেস ছিল। কোথায় দেশ, কে সংসারে আছে, আত্মীয়-স্বজন কেউ আছে কিনা—ইত্যাদি ইত্যাদি সব শুনে গার্লিক সাহেব বললে—তাহলে এর মধ্যে কিছু গোলমাল আছে মুখার্জি—

—তাহলে কী হবে স্যার?

মিস্টার গার্লিক বলেছিল—আমার মনে হচ্ছে মিসেস মুখার্জি গিল্টি—

—কিন্তু তার তো কোনও প্রমাণ নেই!

—প্রমাণ না থাকলেও কোর্টে কেস উঠলেই প্রমাণ হয়ে যাবে। আমি বুঝতে পারছি না, কীভাবে তোমাকে হেল্প্ করবো।

বললাম—তারপর?

সব মানুষের জীবনেই এমন এক-একটা ঘটনা ঘটে, যখন সারা জীবনের বাঁধা রুটিনেরও হঠাৎ ব্যতিক্রম হয়। সব-কিছু ওলোট-পালট হয়ে যায় রাতারাতি। সামান্য একখানা বই কারো জীবনে নতুন পরিচ্ছেদ এনে দেয়। সুহাসের জীবনেও এই ঘটনা সেই রকম। মিস্টার গার্লিক ছিল, তাই শেষ পর্যন্ত সব চাপা পড়ে গেল। সে সেই যুদ্ধের সময়। যখন পুলিশের হাতে অপ্রতিহত ক্ষমতা। মিস্টার গার্লিক কাকে টেলিফোন করে দিলেন। কাজল ধরা পড়লো। দু'-একদিন লক-আপেও থাকতে হলো তাকে। অপরিসীম লজ্জা আর অনপনেয় কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে সে-ক'দিন মুখ লুকিয়ে বেড়িয়েছে সুহাস। কখনও সারাদিন ট্যাক্সি করে ঘুরে বেড়িয়েছে, কখনও অন্ধকারে রাস্তায় রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে বেড়িয়েছে। কানাই দেখতো, কাছে আসতো। বলতো—খাবার দেব বাবু?

সুহাস বলতো—না—

—এ-রকম করে না-খেয়ে থাকলে যে শরীর টিকবে না বাবু?

সুহাস চিৎকার করে উঠতো। বলতো না, তুই বেরো এখান থেকে—বেরিয়ে যা—

কতদিন যে খায়নি সুহাস, কতদিন যে রাত্রে ঘুমোয়নি, তার হিসেব কোথাও

লেখা নেই। কেউ জানতে পারেনি সে ইতিহাস। কাজলের কলঙ্ক যে সুহাসের নিজের জীবনেরই কলঙ্ক। সুহাস যেখানে যেত, মনে হতো সবাই যেন ওর দিকে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করছে—ওই যে, ওই লোকটা—

শেষ পর্যন্ত হয়ত পাগলই হয়ে যেত সুহাস। সারাদিনের মধ্যে বাড়ি আসবার সাহসটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছিল। বাড়িতে এলেই যেন দম আটকে মারা যাবে সে। বাড়ির আবহাওয়াতে যেন কাজলের সর্বনাশা বিশ্বাসঘাতকতায় বিষবাষ্প মেশান ছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমন কিছুই হলো না। খবরটা খবরের কাগজে ছাপা হতে পারলো না। মিস্টার গার্লিক একদিন ডাকলেন মুখার্জিকে। সুহাস গিয়ে হাজির হলো সাহেবের বাড়িতে। সুহাসের চেহারা দেখেই সাহেব বললেন—এ কী হয়েছে তোমার? এ রকম মন-মরা হয়ে গেলে কেন?

সুহাস চুপ করে বসে রইল সাহেবের সামনের চেয়ারে বোবার মত।

—লাইফে এইটুকু দুঃখ সইতে পারো না? জীবনের মানে কি এই? শুধু একটানা সুখ পাওয়া?

তারপর আরো বোঝাতে লাগলো সাহেব। বললে—তোমার স্ত্রী শিগ্গিরই ছাড়া পাবে। আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি।

—কিন্তু ও স্ত্রীকে নিয়ে আমি কি করবো স্যার?

সাহেব অনেক সান্ত্বনা দিলে। অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝালে। বললে—দেখ মুখার্জি, সব মানুষেরই একটা গোপন হিস্ট্রি থাকে, সে হিস্ট্রি সে কারোর কাছে প্রকাশ করতে পারে না। হাজব্যান্ড্ ওয়াইফের কাছে প্রকাশ করতে পারে না, ওয়াইফও হাজব্যান্ডের কাছে প্রকাশ করতে পারে না—ওটা ভুলে থাকাই ভাল—

—কিন্তু ভুলতে যে পারছি না স্যার।

সাহেব বললে—পারবে, পারবে, চেষ্টা করলেই ভুলতে পারবে। নিজের ছেলের মৃত্যু-শোক পর্যন্ত মা ভুলে যায়, আর তুমি পারবে না ভুলতে?

—কিন্তু ওই স্ত্রীর সঙ্গে এর পর একসঙ্গে বাস করবো কী করে? আমি যে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতুম আমার স্ত্রীকে—

সাহেব বললে—তুমি একলা কেন? সবাই প্রাণ দিয়েই ভালবাসে নিজের স্ত্রীকে—

—কিন্তু আমার এই আন্‌চেস্ট্ স্ত্রীকে নিয়ে আমি কী করে থাকবো এক বাড়িতে?

সাহেব হঠাৎ বললে—কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি, তোমাদের কোনও সন্তান হয়নি কেন মুখার্জি? কোনও ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

সুহাস বললে—না, সন্তান আমিই চাইনি স্যার। ভেবেছিলুম আমরা দু'জন, আমরা দু'জনেই যথেষ্ট—আমরা দু'জনেই আমাদের সংসারের পক্ষে যথেষ্ট—আর কারো দরকার হবে না—

—ভুল করেছিলে মুখার্জি। আমার মনে হয় তোমার স্ত্রীর কোথায় একটা অভাব ছিল, তা তুমি জানতে চেষ্টা করোনি।

সুহাস জিজ্ঞেস করেছিল—কিন্তু এখন আমায় কী করতে বলেন আপনি? আমি কি করতে পারি?

কিছু না। যেন কিছুই ঘটেনি। তোমার স্ত্রী দু'একদিন বাদেই ছাড়া পাবে। তুমি নিজে গিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে বাড়িতে। কোনও কথা জিজ্ঞেস করবে না। কেন খুন করেছিল, কী জন্যে খুন করেছিল কার কোন্ দোষে খুন করেছিল, কিছু জিজ্ঞেস করবে না। যেন কিছুই হয়নি, কিছুই ঘটেনি। ঠিক আগেকার মত সহজভাবে থাকবে। তবেই সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা ইণ্ডিয়ান, তোমরা হিন্দু, তোমরা জানো না তোমাদের ম্যারেড্-লাইফ আমাদের চেয়ে কত সুখী। আমরা মনে মনে তোমাদের হিংসে করি, তা জানো?

তারপর হঠাৎ সুহাসের পিঠ চাপড়ে দিলে।

বললে—বাক্ আপ্ বয়, নো ফিয়ার, লাইফ ইজ্ বিটার, বাট্ সুইট্ টু।

—মনে করো না জীবনটা শুধুই কষ্টের—জীবনে সুখও আছে, এটা ভুলে যেও না—

সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সুহাসের কেমন মনে হয়েছিল তার জীবনেও আবার সুখ আসবে। আবার সুখী হবে সে। আবার বেঁচে উঠবে, আবাব সংসার করবে, আবার ভালবাসবে!

তারপর একদিন ছাড়া পেলে কাজল। জেলখানার হাজত থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল বাইরে। বাইরের আলোর পৃথিবীতে। দূর থেকে সুহাস দেখছিল। কাজলের চেহারাটা যেন এই ক'দিনেই রোগা হয়ে গেছে। গাড়িটা নিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল দূরে। প্রথমে দেখা হলে কী কথা বলবে সেইটেই ভাবছিল। তারপর সামনের দিকে এগিয়ে গেল। হাতটা বাড়িয়ে দিলে। বললে—এসো—

কাজলের চোখ দিয়ে জল পড়ছিল।

সুহাস জিজ্ঞেস করলে—খুব কষ্ট হয়েছিল?

কাজল মুখ নীচু করে শুধু বললে—না—

তারপরে পাশাপাশি এক গাড়িতে বসে অনেকক্ষণ কাটলো। গাড়িটা এঁকে-বেঁকে অনেক রাস্তা পরিক্রমা করে এসে পেঁছিলো বাড়িতে। কানাই দৌড়ে এল। এসেই হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলো মা'র পায়ের কাছে বসে পড়ে। কাজল কিছু কথা বললে না। নিজেই কেঁদে ফেললে। আবদুল এসে দাঁড়াল। বিবিও এল। এসে প্রতিদিনকার মত বললে—মাইজী, চুল বেঁধে দিই তোমার—

বিবি চুল বেঁধে দিলে কাজলের। কাজল গা ধুতে গেল কলঘরে। কলঘর থেকে বেরিয়ে নতুন পাট-ভাঙা শাড়ি-ব্লাউজ পরলে। তারপর ঘরে এসে বসলো।

সেদিনের কথা সব মনে আছে সুহাসের। জীবনের স্মরণীয় দিন সেটা। তারপর থেকে একই বাড়িতে, একই ছাদের তলায় দু'জনে বাস করতে লাগলো

দিনের পর দিন, কিন্তু কারো সঙ্গে কারো কথা নেই। এ এক অদ্ভুত সংসার।

কাজল একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—কই, তুমি আর কথা বলো না তো?

সুহাস শুধু বলেছিল—এবার থেকে বলবো।

সেই এবার আর আসেনি সুহাসের জীবনে। ক্ষমা বড় জিনিস, মহৎ জিনিস। ক্ষমার তুল্য বড় ধর্ম নেই সংসারে। ও-সব বইতে পড়া আছে। ও-সব বইতে লেখা থাকাই ভাল। মানুষ ওতে মহৎ হবে। জগৎ ওতে সুখের জায়গা হবে। কিন্তু মিস্টার গার্লিক যা-ই বলুক, সুখ নেই পৃথিবীতে। সুখ যাকে বলি, সে তো দুঃখের রকম-ফের। উপদেশ দেওয়া ভাল, উপদেশ শোনাও ভাল। কিন্তু উপদেশ পালন করতে যারা পারে, তারা হয় মহাপুরুষ, নয় পশু। বাস্তব জীবনে উপদেশের কোনও দাম নেই। নইলে স্যার পি. সি. রায়ের অত উপদেশে কিছুটা অন্ততঃ কাজ হতো।

মিস্টার গার্লিক একদিন জিজ্ঞেস করেছিল—কবে চাকরিতে রিজিউম করবে?

সুহাস বলেছিল—আরো কিছুদিন বিশ্রাম চাই স্যার, এখনও মনটাকে ঠিক বশে আনতে পারিনি।

সত্যি, দিনের পর দিন কাটতো আর এক অস্বাভাবিক দম্পতি বাস করতো একটা ছাদের তলায় অস্বাভাবিক ভাবে। একই সঙ্গে খেত, একই বিছানায় শুতো, কিন্তু একজনের কাছ থেকে আর-একজন যেন শত যোজন দূরে চলে গিয়েছিল। চোখের সামনে থেকেও যেন চোখের আড়ালে থাকা। কোথায় যে সারাদিন কাটতো সুহাসের, কোথায় কোন্ নগণ্য বস্তির আশেপাশে, আবার কখনও শহরের জনারণ্যে। পা আর চলতে চাইত না। সকালবেলা পা-জোড়া চালিয়ে দিত সুহাস নিরুদ্দেশ যাত্রার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা কেমন করে আবার ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ফিরে আসতো নিজের বাড়িতে। সেই বাগান ছিল, সেই মালী ছিল, সেই দারোয়ান ছিল, সেই বিবি, আবদুল, কানাই, সবাই ছিল। তবু মনে হতো কিছুই যেন নেই সুহাসের। একেবারে যেন নিঃস্ব হয়ে গেছে সুহাস। তার মন যেন ফুটো হয়েছে, তার মনে যেন ফাট্ ধরেছে।

এই কানাই-এর জন্যেই তখন সুহাসের বেশি কষ্ট হতো। কানাই বলতো—বাবু, আপনি আজকেও খেলেন না?

আশ্চর্য, সারাদিন ঘুরে ঘুরে খিদেও পেত না সুহাসের। কতদিন যে খায়নি, কত রাত যে ঘুমোয়নি, তা কেউ জানতো না, কেউ দেখতোই না, কেউ ভাবতোই না।

শেষকালে সেই অবধারিত কাণ্ডটা ঘটলো।

বললাম—কোন্ কাণ্ড?

সুহাসবাবুর বেশি কথা বলতে শেষকালে কষ্ট হতো। খানিকক্ষণ কথা বলার পর একটু বিশ্রাম নিতেন। যে-ক'দিন ছিলাম কাটনীতে, সে-ক'দিন অনেক কাহিনী শুনেছি। সুহাসবাবুর কোনও সঙ্গীই ছিল না। একলা-একলাই এতদিন কাটিয়েছেন। আমি যেতে তবু একজনের সঙ্গে কথা বলে বাঁচলেন যেন। কিন্তু তখন তাঁর বাঁচার মেয়াদ বোধহয় শেষ হয়ে এসেছে।

খালি বলতেন—আপনি যে আমার কি উপকার করলেন, আপনি নিজেও তা জানেন না।

একদিন বলেছিলেন—একদিন আমি স্যারের কথা খেলাপ করেছি, স্যার আমাকে বড় ভালবাসতেন। জীবনে আমি তাঁকে আমার মুখ দেখাতে পারিনি। যেদিন তিনি মারা গেলেন, আমি শ্মশানে গেলাম তাঁকে দেখতে। মনে হলো তিনি যেন আমাকে বকছেন। আমাকে ভর্ৎসনা করছেন, বলছেন—এখন ভাল করে তোর ভুলের খেসারত দে—

তাই সারা জীবনে ভুলের খেসারতই দিয়ে গেলাম। সেই জন্যেই আপনাকে আমি ডেকেছি। আপনি কাজলের ওই বইটা শেষ করে আমাকে ভুলের খেসারত দেবার সুযোগ করে দিন দয়া করে।

জিজ্ঞেস করলাম—আপনার স্ত্রী কোথায়।

—ওই যে।

বলে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো ছবিটার দিকে দেখালেন। বললেন—ওই আমার স্ত্রী, ওই আমার ভুল।

—কেন? ভুল কেন বলছেন? আপনার অপরাধ কোথায়?

সুহাসবাবু বললেন—অপরাধটা আমারই। তবে সমস্ত ঘটনাটা শুনুন, আমি বলছি—

তারপর সুহাসবাবু একটু জল খেয়ে বলতে লাগলেন—এ-ঘটনার অনেক দিন পরে একদিন হঠাৎ আমার কী খেয়াল হলো। তখন বাগান নেই, বাগানের মালীও নেই, তখন আমার শরীরও খারাপ হয়ে গেছে। আমি পাগলের মত বাড়িতে বাস করছি। রাত অনেক হয়ে গেছে। কাজল তার বিছানায় ঘুমিয়েছে। আমি আর ঘুমোতে পারলাম না। আমি বিছানা ছেড়ে উঠলুম। উঠে একবার ভাবলুম, এ-বাড়িতে আর বেশি দিন থাকলে আমি ক্রমে আরো পাগলা হয়ে যাবো। আমি আস্তে আস্তে কাজলের আঁচল থেকে চাবির তাড়াটা নিলাম। নিয়ে বাক্স-দেরাজ-আলমারী সব খুললাম। হঠাৎ কাজলের একটা নিজের আলমারী খুলতেই কেমন অবাক হয়ে গেলাম। সেটা কখনও আমি খুলিনি আগে। তার নিজের জিনিসপত্রই থাকতো তাতে। আমি ও-সব কিছুই দেখতাম না কখনও। কোথায় কার কী জিনিস থাকতো, তা-ও দেখতাম না। কাজলই সমস্ত গুছিয়ে বার করে দিত আমাকে। দেখলাম—একটা সিল্কের রুমালে জড়ানো কী একটা রয়েছে তাতে। আগ্রহ হলো দেখতে। দেখলাম—এক তাড়া চিঠি। একটা নয়, দুটো নয়, একশো-দু'শো চিঠি। খুব যত্ন করে তারিখ

মিলিয়ে সাজিয়ে সাজিয়ে রাখা। চিঠিগুলো পড়তে গিয়ে মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। দেখি, কোনওটা লেখা লণ্ডন থেকে, কোনওটা সিঙ্গাপুর থেকে কোনওটা পেনাঙ থেকে, কোনওটা বর্মা থেকে।

সেই রাত্রেই একটার পর একটা সব চিঠি পড়ে গেলুম। প্রত্যেকটি কাজলের বিয়ের আগেকার চিঠি। লিখেছে আচারিয়া। পড়তে পড়তে চোখের সামনে সব ঝাপসা হয়ে গেল। এতদিন এ-কথা কিছুই জানতাম না আমি। এতদিন আমাকে এমন করে প্রতারণা করে এসেছে—

বিছানার কাছে এসে দেখলাম কাজল ঘুমে অচৈতন্য। তালে তালে নিঃশ্বাস পড়ছে। আমার রক্তের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো। আমি উন্মাদ হয়ে গেলাম সেই মুহূর্তে।

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর ?

—তারপর এক কাণ্ড হলো। আমি তখন বাড়িতে। তখনও চাকরিতে রিজিউম করিনি। একদিন সুধা এল। কাজলের বন্ধু সেই সুধা। করাচী থেকে কলকাতায় এসেছিল। সরোজ আসেনি ছুটি পায়নি বলে। সুধা কল-কাতায় এসেই ছুটে এসেছে একেবারে আমাদের বাড়িতে।

এসেই জিজ্ঞেস করলে—কাজলদি ? কাজলদি কোথায় ?

কানাই বলেছিল—মা তো নেই—

—তাহলে জামাইবাবু ? জামাইবাবু আছেন ?

আমার কাছে এসে আমার চেহারা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। বললে—এ কী চেহারা হয়েছে আপনার ? কাজলদি কোথায় ?

বললাম—কাজলদি নেই।

—নেই মানে ?

বললাম—নেই, মানে, নেই—

কী হয়েছিল, শেষকালে কোন্ ডাক্তার দেখছিল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞেস করলে। তারপর কাঁদতে লাগলো। তার কান্না দেখে আমার চোখ দিয়েও জল পড়তে লাগলো।

সুধা বললে—অনেক দিন আমি কাজলদির খবর নিতে পারিনি, দু-একখানা চিঠি লিখেছিলুম, তারও কোন জবাব পাইনি, তাই কলকাতায় পৌঁছেই দৌড়ে এসেছি।

তারপর চলে যাবার আগে বললে—একটা কথা ছিল—

বললাম—বলুন—

সুধা বললে—আমার নিজের অনেকগুলো চিঠি কাজলদির কাছে রেখে গিয়েছিলুম, সেগুলো কোথায় আছে জানালে নিয়ে যেতাম—

বললাম—কার চিঠি ?

সুধা বললে—আমারই চিঠি। বহু দিন আগে একজন আমাকে লিখেছিল, প্রায় একশো-দু'শো চিঠি। একটা সিল্কের রুমালে জড়ানো ছিল, কাজলদি তার নিজের আলমারীতে যত্ন করে রেখে দিয়েছিল সেগুলো—

আমায় মাথায় তখন রক্ত টগবগ করে ফুটছে—

আমি যেন ভুল শুনছি।

বললাম—কার চিঠি বললেন?

সুধা বললে—আমারই চিঠি, এক ভদ্রলোক আমাকেই লিখেছিলেন চিঠিগুলো বিয়ের আগে, সেগুলো আমি কাজলদির কাছে রেখে দিয়ে গিয়েছিলাম, যাতে কেউ দেখতে না পায়—আপনি একটু খুঁজে দেখুন না—

বললাম— তারপর?

সুহাসবাবু বলতে লাগলেন—তারপর আরো যা সব শুনলাম, তাতে আমার বাক্‌রোধ হয়ে এল। শুনলাম বিয়ের আগে আচারিয়া সুধার চরম সর্বনাশ করেছিল—

—চরম সর্বনাশ মানে।

সুহাসবাবু বললেন—বিয়ের আগেই সুধার এক সন্তান হয়েছিল, কুমারী জীবনের চরম লজ্জার অঘটন ঘটেছিল, সেই কলঙ্কের সুযোগ নিয়ে আচারিয়া দিনের পর দিন কাজলের কাছে এসে টাকা চাইত, কাজলকে ব্ল্যাক-মেইল করতে চাইত, শেষকালে কোনও উপায় না দেখেই কাজল এই চরম পথ বেছে নিয়েছিল—

এর পর আপনাকে আর আমি কিছু বলতে পারবো না। আমি যে এখনও বেঁচে আছি, এ বোধহয় আমারই পাপের ভোগ। তাই আপনাকে বার বার চিঠি লিখেছিলাম আসতে।

আর বেশি দিন বাঁচেননি সুহাসবাবু। বোধহয় আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই এতদিন টিকে ছিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম—আপনি নিজের স্ত্রীকে শেষ পর্যন্ত খুন করেছিলেন?

সুহাসবাবু বলেছিলেন—নিজের স্ত্রীকে নয়, আমি আসলে আমাকেই খুন করেছিলাম সেদিন—আমি আত্মহত্যাই করেছিলাম বলতে গেলে।

—কিন্তু কী করে তা সম্ভব হলো? কী করে খুন করলেন?

সুহাসবাবু বলেছিলেন—স্বদেশী যুগে যেভাবে পুলিশ টেররিষ্টদের জেলে পুরে আস্তে আস্তে কষ্ট না দিয়ে, তাদের বুঝতে না দিয়ে খুন করতো, আমিও তেমনিভাবে খুন করেছিলাম তাকে। সে ঠিক খুন নয়, সে একরকমের

আত্মহত্যা। আমি সত্যিই আর বেঁচে নেই। আমার অদৃশ্য আত্মা আপনার সঙ্গে কথা বলছে শুধু,—আমি মরেই গেছি—

শেষ জীবনে সুহাসবাবুর যা-কিছু সম্পত্তি ছিল সবই তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিকে। স্যার পি. সি. রায়ের নামে কোনও কিছু স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থার জন্যে। আসলে তার কী হয়েছে আমি খবর রাখি না। আমার কাছে এখনও সেই পাণ্ডুলিপিটা আছে। কাজল দেবীর লেখা অসমাপ্ত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি—রং বদলায়। সে আর আমার শেষ করা হয়নি। বোধহয় শেষ করার মত নয়ও তা।

নফর সংকীর্তন

(উপন্যাসটি ৭ পাতা থেকে শুরু হয়েছে)

পাড়ার ছেলে আমরা। আমাদের পাড়ার সব লোকই আমাদের মতন মধ্যবিত্ত। আগে এখানে এমন ছিল না শুনেছি। শুনেছি, তখন আশেপাশের এ-সব নাকি মাঠ ছিল। এখন বাড়ি হয়ে গেছে চারদিকে। আগে শুধু ওই একখানা বাড়িই ছিল এদিকে। চারদিকে অনেকখানি জমি নিয়ে বেশ খেলিয়ে ছড়িয়ে বাস করবার জন্যে কোন্ এক সংসার সেন নাকি এইখানে প্রথম বাড়ি করেন। তাঁরই বংশধর এরা। আগে মাত্র ওই একটা বাড়িতেই দুর্গাপুজো হতো। পুজোর সময় আমরা ঠাকুর দেখতে যেতাম এই বাড়িতে। বড়লোকের বাড়ি। বড়লোকের যে বাড়ি তা এখনও চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। সামনে মস্তবড় গেট। তখন বাড়ির গেটে দরোয়ান পাহারা দিত। বিকেলবেলা সেনবাবুদের কোঁচানো ধুতি, বাহারে পাঞ্জাবি প'রে মাথার চুলে তেড়ি বাগিয়ে গাড়ি চড়ে বেড়াতে যেতে দেখেছি। বাড়ির ভেতরে ঢুকতে ভয় লাগতো। প্রথম যখন আমরা এলাম তখনও জানতাম ওরা বড়লোক। ওদের সঙ্গে আমাদের অনেক তফাত। ওদের সমাজ আমাদের থেকে আলাদা। দরোয়ান ঝি চাকর সরকার মুহুরি কোনও কিছুরই অভাব নেই বাড়িতে। কিছু কিছু দেখতে পেতাম দুর্গাপুজোর সময়। পাথরের কাজ-করা দেয়াল। বাড়িতে সামনে বাগান মতন ছিল। হাঁস ছিল, ময়ূর ছিল, কাকাতুয়া পাখী ছিল। মানে, বড়লোকের বাড়িতে যা থাকতে হয় সবই ছিল।

তারপর ক্রমে ক্রমে সে-বাড়ির চেহারা যেন ম্লান হয়ে যেতে লাগলো। যত দিন যেতে লাগলো, দেখতাম বাড়িটা যেন আরো পুরনো হয়ে যাচ্ছে। দেয়ালে রং পড়ে না। ঘোড়া মরে গেলে আর ঘোড়া কেনা হয় না। চাকরবাকরদের কাপড় জামা ক্রমেই ময়লা হতে লাগলো। অথচ আশেপাশের অন্য বাড়িগুলো তখন ক্রমেই মাথা তুলে উঠছে। সে-সব রং-বেরং-এর বাড়ি, তাদের জানালায় পর্দা ঝোলে, ভেতরে রেডিও বাজে, নতুন মটরগাড়ি আসে গ্যারেজে।

ঠিক এইরকম সময়ে একটা কাণ্ড ঘটলো।

আগের দিনও দেখেছি সেন-বাড়ির বড়বাবু সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চড়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল। ভাঙা গেট্‌টা বন্ধ করে দিলে ওদের দরোয়ান ভূষণ সিং। তারপর রাত হয়েছে, সেন-বাড়ির ঘরে ঘরে আলোও জ্বলেছে, আবার মাঝ-রাত্তিরের পর সমস্ত বাড়িটা নিঝুমও হয়ে গেছে। যেমন অন্যদিন অন্ধকারে সমস্ত বাড়িটা হাঁ হাঁ করে, সেদিনও তেমনি নির্জীব নিষ্প্রাণ হয়ে সারা রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাড়িটা কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

কিন্তু সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সবাই অবাক হয়ে গেছে।

বাড়ির সামনে পুলিশ!

তিন-চারটে লাল-পাগড়ি-পরা পুলিশ, আর একজন দারোগাও আছে। পুলিশ দেখে সবাই জড়ো হলো বাড়ির সামনে।

—কি হয়েছে মশাই?

—হ্যাঁ মশাই, কী হয়েছে এখেনে?

একজন বললে—হ্যাঁ মশাই, নফ্‌রা বলে একটা লোক থাকে না এই বাড়িতে?

একজন বললে—নফ্‌রা না মশাই, নফর তার নাম,—

—ওই হলো! ওই একই কথা, যার নাম চাল-ভাজা তারই নাম মুড়ি। সেই বেটাই বোধহয় চুরি-টুরি কিছু করেছে—

—চুরি-টুরি নয়, ডাকাতি হবে, ডাকাতি না হলে এত পুলিশ আসে?

একজন বললে—না মশাই, শুনছি গলায় দড়ি দিয়েছে—

হঠাৎ দেখা গেল গুলমোহর আলি গাড়ি চালিয়ে বাড়ির দিকেই আসছে। সবাই সরে দাঁড়াল। গাড়ির মধ্যেই বড়বাবু আছে, জগত্তারণবাবু আছে।

আর গাড়ির মাথায়?

গাড়ির মাথায় গুলমোহর আলির পাশে পা ঝুলিয়ে বসে আছে নফর, দিব্যি কোঁচানো ধুতি পরেছে, বাহারে পাঞ্জাবি পরেছে, তেড়ি বাগিয়েছে—

আর·

'কিন্তু পুলিশ-দারোগার ব্যাপারটা পরে বলছি। আগে নফরের সংকীর্তন শুনুন।

এ-সংকীর্তনেরও একটা গৌরচন্দ্রিকা আছে।

সেনেদের বাড়ির সুবর্ণ সেন একদিন ভোর এগারোটার সময় নিজের বিছানার ওপর আড়ামোড়া ভেঙে চোখ মেললেন। চোখ মেলতেই খাস-বরদার পাঁচু এক হাতে বোতল আর এক হাতে সিগারেটের কৌটোটা এগিয়ে ধরতে গেল।

সুবর্ণবাবু হাই তুলতে তুলতে বললেন—হ্যাঁরে, নফর কোথায় থাকে রে? নফরকে আর দেখতেই পাই না,—সে কি মরে গেছে?

পাঁচু বললে—আজ্ঞে আমি এখুনি ডাকছি তাকে—

খাস-বরদার পাঁচু কাঁধের তোয়ালেটা গুছিয়ে নিয়ে দৌড়ুল। নফরের ডাক পড়েছে। চারটিখানি কথা নয়। বাইরে দিয়ে ঘোরানো সিঁড়ি। সিঁড়িটি সোজা নিচের বার-মহলে নেমে গেছে। খাস-বরদার ওই সিঁড়ি দিয়ে নামবে। ওটা অপবিত্র সিঁড়ি। নিষিদ্ধ জিনিসপত্র ওই সিঁড়ি দিয়ে আসবে যাবে। ভেতরের সরকারী সিঁড়ি গঙ্গাজল দিয়ে ধোয়ামোছা হয়। সে-সিঁড়ি দিয়ে মা-মণির পুজোর নৈবিদ্যি ওঠে, পুরুতমশাই ওঠেন বৌ-মণির ঠাকুর পুজোয়। আরো অনেক জিনিস যায়। নারায়ণশিলা যায়, ঠাকুরের প্রসাদ যায়। কিন্তু সুবর্ণবাবুর ফাউল-কারি, বোতলের ওষুধ, তার জন্যে বাইরের সিঁড়ি। এ-নিয়ম বোধহয় সেই সংসারবাবুর আমল থেকেই চলে আসছে। এতদিন পরে আর কেউ প্রশ্নও করে না, মাথাও ঘামায় না ও-সব নিয়ে।

পাঁচুর সঙ্গে ঠিক বার-বাড়ির মুখেই হরি জমাদারের দেখা।

—এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছো গো খাস-বরদার?

পাঁচুর তখন কথা বলবার সময় নেই। কাঁধের তোয়ালেটা সামলাতে সামলাতে বললে—এখন কথা বলবার সময় নেই গো, বড়বাবু নফরকে

ডেকেছে—

নফরের ডাক পড়েছে! হরি জমাদার ঝাঁটা নিয়ে বার-বাড়ির উঠোনের দিকে যাচ্ছিল। বললে—নফরের ডাক পড়েছে!

হরি-জমাদারের বউ-বেটা থাকে বাড়ির পেছন দিকের বাগানের কোণটায়। আস্তাবল-বাড়ি পেরিয়ে নোংরা আঁস্তাকুড় আর পচা ডোবাটার পাশে। হরি জমাদার ঘরে গিয়ে ফরসা ফতুয়াটা পরে নিলে।

বউ বললে—ফতুয়া গায়ে দিচ্ছ যে? কোথায় যাচ্ছ?

হরি জমাদারের কথা বলবার সময় নেই। শুধু বললে—নফরের ডাক পড়েছে, আমি চলি—

ফুলমণি বাসন মাজছিল কলতলায়। এক কাঁড়ি এঁটো বাসন। বার-বাড়ির বাসন মাজে ফুলমণি। ফাউল-কাটলেট আর মুরগীর ডিমের ছোঁয়া বাসন সব। ফুলমণি সেই বাসন নিয়ে বার-বাড়িতে রেখে দেবে। ও-বাসন ভেতরে ঢুকবে না। ফুলমণি ভেতরের বাড়ির সিন্ধুকে ছোঁবে না। সিন্ধু মা-মণির খাস-অন্দরের বাসন মাজে।

সিন্ধু বলে—ছুঁস্‌নে ছুঁস্‌নে, সরে যা—এই ছ্যাখ্, ছুঁয়ে দিবি নাকি লা?

ফুলমণি বলে—আমি কাচা কাপড় পরেচি গো, বাসনের পাট সারা করে কাচা কাপড় পরেচি, এই ছ্যাখো—

—রাখ্ তোর কাচা-কাপড়, তোর জাত-জন্ম কিছু আছে নাকি লা?

এ-বাড়ির, এই সংসার সেনের আদি বাড়ির ভেতরে-বাইরে অনেক স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য জীব আছে; তাদের জীবন-ইতিহাস কেউ জানে না। বাইরের বাসনই শুধু নয়, বাইরের মানুষও ভেতর যেতে পারে না। বার-বাড়ির দরজা থেকেই ফুলমণি ডাকে—ওলো, ও সিন্ধু, এক খাম্‌চা তেল দে তো হাতের তেলোয়—

সদর দরজার ওপারে যাবার তার অধিকারও নেই, এক্তিয়ারও নেই। এ-পারের ভিজে কাপড়ের জল ও-পারে ছিটোতে পাবে না। এ-দিকের মাছের কাঁটা ও-বাড়ির উঠোনে যদি কাকে নিয়ে ফেলে দেয় তো ও-বাড়ির উঠোন অশুদ্ধ হয়ে যায়। তখন ভারি ভারি জল আসে

কলসীতে। কলসী-কলসী জল ঢালা হয় উঠোনে। মা-মণি ওপরের বারান্দা থেকে তদারক করেন। বলেন—ও সিন্ধু, পৈঁঠেটা শুকনো রইলো যে, ওখেনটায় জল ঢেলে দে—

আজ কিন্তু ফুলমণি সিন্ধুকে দেখতে পেয়েই বললে—হ্যাঁ লা সিন্ধু, বড়বাবু নাকি নফরকে ডেকেছে?

—কে বললে? কোত্থেকে শুনলি?

সিন্ধুর মুখের চেহারাটা সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেছে।

ফুলমণি বললে—জমাদারের মুখে শুনলুম—

সিন্ধু বললে—জমাদারকে কে বললে?

কে বললে কেউ জানে না। কথাটা কোথা থেকে উঠলো, কে প্রথম শুনেছে, কেউ-ই জানে না। কিন্তু হৈ-হৈ পড়ে গেল বাড়িতে। মহলে-মহলে এক কান থেকে আর এক কানে ছড়ালো।

—হ্যাঁ গা, বড়বাবু নাকি আজ নফরকে ডেকেছে?

—কই, বড়বাবু তো এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি!

আস্তাবল-বাড়িতে গুলমোহর আলি চিৎপাত হয়ে শুয়েছিল। খাতির ছিল বড়বাবুর বাবার আমলে। বাহারও ছিল। কালো আর বাদামী দুটো ঘোড়া ছিল তখন। বাড়ি থেকে গাড়ি বেরোবার সময় পাড়ার লোক হাঁ করে চেয়ে দেখতো ঘোড়া-দুটোকে। আর গাড়ির মাথায় গুলমোহর আলি জরির জামা প'রে গাড়ি হাঁকাতো।

কেউ কেউ সেলাম করতো গুলমোহর আলিকে—সেলাম আলি সাহেব—সেলাম—

গুলমোহর আলির তখন দিনকাল ভালো। কর্তাবাবুকে দিয়ে কোনও কাজ করাতে হলে গুলমোহর আলিকে ধরলেই কাজ হতো। একবার একটা ভালো ময়না পাখী বেচতে আসে একজন বেদে। ওই গুলমোহর আলি তিনশো টাকা পাইয়ে দিয়েছিল তাকে। ময়নাটা কথা বলে না, বোল্ বলে না। গায়ের পালকগুলোও ভালো করে গজায়নি তখন।

কর্তাবাবু তখন গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন।

বেদেটা এসে বললে—হুজুর, ময়না-পাখী লেবেন ?

কর্তাবাবুর খাস-বরদার তখন পীরজাদা। পীরজাদা হাঁকিয়ে দিচ্ছিল বাজে লোক দেখে।

বেদেটা বললে—আজ্ঞে নীলগিরি পাহাড়ের ময়না, খুব সস্তায় ছেড়ে দেব—

কর্তাবাবুর কী খেয়াল হলো। অন্যবার অন্যলোক হলে হাঁকিয়ে দিতেন। কিন্তু মেজাজ বোধহয় ভালো ছিল। চেয়ে দেখলেন ময়নাটার দিকে একবার।

বললেন—কত দাম ? পাঁচ টাকা ?

দুর্লভবাবু তখন কর্তাবাবুর পেছনে ছিলেন। তিনিও কর্তাবাবুর সঙ্গে বাগানবাড়িতে যেতেন। তিনি বললেন—পাঁচ টাকা ? বলেন কি হুজুর, পাঁচ পয়সা দাম নয় ওর—ওর চোদ্দপুরুষ ময়না নয়—কালো-শালিখ পাখী নির্ঘাৎ—

কর্তাবাবু চটে গেলেন। বললেন—শালা ঠকাচ্ছিলি আমাকে বেরো—

বেদেটা বললে—না হুজুর, আসল জাত-ময়নার বাচ্চা, শালিখ নয়—

দুর্লভবাবু বললেন—ও আসল শালিখ, ওর চোদ্দপুরুষ শালিখ ময়না চেনাচ্ছে আমাকে ? আলবাৎ শালিখ—শালিখ না হলে কান কেটে ফেলবো হুজুর—

কর্তাবাবুর বাগানবাড়ি যাওয়া হয়ে গেল। কর্তাবাবু বললেন—ডাকো মুহুরিবাবুকে, মুহুরিবাবুর বাড়ি চাক্‌দায়, ও শালিখ চেনে—

মুহুরিবাবু খাজাঞ্চিখানায় কাজ করছিল। কানে কলম নিয়ে দৌড়ুতে দৌড়ুতে এসে হাজির।

কর্তাবাবু বললেন—তোমার তো চাক্‌দায় বাড়ি মুহুরিবাবু, তুমি পাখী চেনো ?

—আজ্ঞে চিনতাম আগে !

—ভাখো তো, এটা ময়না পাখী কিনা ?

মুহুরিবাবু চশমাটা কপালের ওপর তুলে ফেললে। কাছে মু

এনে দেখতে লাগলো। হিসেব-পত্তোরের খাতা দেখা তার কাজ। দাদায়পত্র দেখে পাকা খাতায় তোলা তার কাজ। তারপর সেই খাতা থেকে জমা-বকেয়া আলাদা আলাদা তুলে আলাদা হিসেব রাখতে হয়। এই কাজই চব্বিশ বছর একাদিক্রমে করছে। সেই লোককে হঠাৎ পাখী চিনতে হবে কর্তাবাবুর হুকুমে।

অনেক ভেবেচিন্তে বললে—আজ্ঞে চাক্‌দাতে এরকম পাখী দেখিনি, তবে শালিখই মনে হচ্ছে—

বেদেটা বললে—তা হলে মল্লিকবাবুদের বাড়িতেই দিই গে গিয়ে হুজুর—বাবুরা দেড়শো টাকা বলেছিল, দিইনি—

দুর্লভবাবু বললে—কোন্ মল্লিকবাবু? কোথাকার মল্লিকবাবু?

বেদেটা বললে—আজ্ঞে, গোয়ালটুলির মল্লিকবাবু।

গোয়ালটুলির মল্লিকবাবু! কথাটা কর্তাবাবুর কানে গিয়ে খট্ করে বিঁধলো। গোয়ালটুলির মল্লিকরা কি আমার চেয়েও পাখী ভালো চেনে নাকি?

বললেন—গোয়ালটুলির কোন্ মল্লিক হে দুর্লভ? কার কথা বলছে?

দুর্লভ বললে—হুজুর, আর কার কথা বলছে, আমাদের নুলো মল্লিকের কথা বলছে, নুলো মল্লিকের যে আজকাল পাখা গজিয়েছে—

গুলমোহর আলি এতক্ষণ গাড়ির মাথায় চুপ করে বসেছিল। এবার নেমে এল নিচেয়। বললে—হুজুর, এ আস্‌লি ময়না আছে হুজুর—

দুর্লভবাবু এবার যেন সরে এল সামনে। বললে—দেখি রে, ভালো করে দেখি তোর পাখীটা?

বেদেটা পাখী নিয়ে দুর্লভবাবুর চোখের সামনে তুলে ধরলে।

দুর্লভবাবু বললে—ও-ধারটা একবার দেখা তো—

এ-ধার ও-ধার সব ধারই দেখানো হলো। দুর্লভবাবু অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বললে—না হুজুর, এ ময়নাই মনে হচ্ছে—

কর্তাবাবু বললেন—ভালো করে দেখে বলো দুর্লভ, নুলো মল্লিকের কাছে হেরে যাবো নাকি শেষকালে?

মুহুরিবাবু তখনও দেখছিল মন দিয়ে; বললে—আমারই ভুল

হয়েছিল কর্তাবাবু, এ আসল ময়না—

—ঠিক বলছো তো।

দুর্লভবাবু বললে—হ্যাঁ হুজুর, আর কোনও সন্দেহ নেই, এ নির্ঘা ময়না, এ আর দেখতে হবে না।

কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—নুলো মল্লিক কত দর দিয়েছিল?

বেদেটা বললে—হুজুর, দেড়শো বলেছিল, আমি দিইনি—

ঠিক আছে, আমি তিনশো দেব, কিন্তু নুলো মল্লিককে গিয়ে বলে আসতে হবে, আমি তিনশো টাকায় ময়না কিনেছি—

দুর্লভবাবু বললে—হ্যাঁ, ওম্‌নি ছাড়া হবে না, নুলো মল্লিককে শুনিয়ে দিতে হবে হুজুর, বড্ড পাখা গজিয়েছে আজকাল—

শেষ পর্যন্ত তো সেই পাখী কেনা হলো। পাখীর খাঁচা কেনা হলো। সেই তিনশো টাকার পাখী দেখতে এলো এ-বাড়িতে আরো দশটা পাড়ার লোক। পাখী দেখে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল চারদিকে। কিন্তু ধরা পড়ে গেল একদিন। পাখীটা যে শালিখ তা জানতে কারো বাকি রইল না। একদিন পাখীকে চান করাতে গিয়ে পায়ের রং ধুয়ে মুছে একাকার। চোখের কোণের হলদে দাগ, গায়ের কালো রং সব রং-করা। সব ফাঁকি ধরা পড়লো।

কর্তাবাবুদের এরকম গল্প আরো আছে। এ-বংশের গল্প, এই সংসার সেনের বংশধরদের গল্প এক কথায় বললে সব বলা হয় না। ওয়ারেন হেস্টিংস কি তারও আগে যে-বংশের পত্তন তার উত্থানের যেমন একটা ইতিহাস আছে তেমনি আছে পতনের ইতিহাসও। গুলমোহর আলির এখন কাজ কমে গেছে। এখন বড়বাবু কর্তাবাবুর মতো রোজ বেরোয়ও না, রোজ বেরোবার মতো মেজাজও নেই, স্বাস্থ্যও নেই। সকাল থেকে ঘুমিয়ে বসে খেয়ে সময় কেটে যায় গুলমোহর আলির। হঠাৎ মাসের মধ্যে হয়ত একদিন বলা-নেই কওয়া-নেই গাড়ি বেরোবার হুকুম হয়। বড়বাবুর খাস-বরদার পাঁচু এসে খবর দিয়ে যায়—বড়বাবু বেরোবে আজ গুলমোহর—

তা সেই বাদামী ঘোড়াটা মরে গেল শেষ পর্যন্ত। কর্তাবাবুর বড়

পেয়ারের ঘোড়া ছিল সেটা। শেষকালে তার এলাইজও হলো না, তরিবৎও হলো না। আস্তাবলবাড়িতে দানা খেতে খেতে কাৎ হয়ে পড়লো। সেই থেকে গুলমোহরও যেন ভেঙে পড়েছে।

হঠাৎ সহিস আবদুল এসে বললে—চাচা, বড়বাবু নফরকে ডেকেছে—

নফরকে ডেকেছে! গুলমোহর শুয়েই ছিল, এবার উঠে বসলো। বললে—ডেকেছে নফরকে! ঠিক জানিস?

—হ্যাঁ চাচা, খাস-বরদার বললে যে!

গুলমোহর এবার সত্যিই উঠে দাঁড়ালো। নফরকে বড়বাবু ডেকেছে। এখন ঘোড়া তৈরি করতে হবে। জরির জামা বের করতে হবে। ঘোড়াকে ডলাই-মলাই করতে হবে। ঘোড়ার ল্যাজে আতর মাখাতে হবে, সাজ চড়াতে হবে। বেলঘরিয়া কি এখানে?

খাস-বরদার সিঁড়ির নিচে নামতেই মুহুরিবাবুর সঙ্গে দেখা। মুহুরিবাবু অনেক দিনের লোক। মুহুরিবাবু চাক্‌দ' থেকে এসে কাজের চেষ্টায় একদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘোরাঘুরি করেছিল। রাস্তার কলের জল খেয়েই কেটেছিল ক'টা দিন। তখন কর্তাবাবুই চেতলায় প্রথম ধানের কল করলেন। তাঁর দেখাদেখি গোয়ালটুলির মুলো মল্লিকের বাবা মাতাল মল্লিকও ধানের কল করতে গেল। কর্তাবাবুর ধানের কল থেকে দিনরাত চাল বেরোয়। সেই চাল চালান যায় এদেশে ওদেশে। জাভা, সুমাত্রা, ফিলিপাইন, মালয় আর চীনে। সব ভাত-খেগো দেশ।

কর্তাবাবু বলেছিলেন—গড়পড়তা মণ পিছু চার আনা রেখে সব ছেড়ে দাও—

ঐ চেতলার গঙ্গা থেকে হাজারমুণি নৌকো বোঝাই হয়ে সব চালান যেত চাল। ঘাটের ধারে বেগুনি-ফুলুরির দোকান বসে গেল সার-সার। কলের সামনে মওড়াদানীরা এসে সকালবেলা সেদ্ধ ধান সিমেণ্টের উঠোনে শুকোতে দেয়। বিরাট উঠোন। এ মুড়ো থেকে ও-মুড়ো দেখা যায় না। তারপর সন্ধ্যেবেলা আবার ধানগুলো জড়ো করে করে ঢাকা দিতে হয়। নইলে পায়রায় খেয়ে যাবে, হিম লাগবে।

তারপরে সেই শুকনো ধান কলে চড়াতে হয়। ঘড় ঘড় করে কল চলে। সেই কলের শব্দে গদি-বাড়িটা কাঁপতো সারাক্ষণ। কর্তাবাবু আসতেন। ঘণ্টাখানেক দেখতেন, তারপর চলে যেতেন। কিন্তু সেই ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কাজকর্ম কিছু দেখতে আর বাকি থাকতো না।

তা সেই কল মুহুরিবাবু হতেও দেখেছে আবার উঠতেও দেখেছে।

কর্তাবাবু সারাজীবন বাগানবাড়ি করে শেষজীবনটা বছর দেড়েক কাশীবাস করেছিলেন। ফিরে এসে আর বেশিদিন বাঁচেননি।

কালিদাসবাবু এখন খাজাঞ্চি। কল-বাড়ির খবর তিনি বিশেষ কিছু জানেন না। জানে মুহুরিবাবু। বলে—শেষ পর্যন্ত সেই শালিখ পাখীটার কী হলো শুনুন খাজাঞ্চিবাবু।

—আরে রাখো তোমার শালিখ পাখীর গল্প! এদিকে মরছি আমি হিসেবের জ্বালায়। তুমি তো খালি জমার হিসেব করেই খালাস, বকেয়া তো আমাকেই মিটোতে হবে—

তারপর খাতাটা সরিয়ে রেখে বলেন—হরিচরণ এক গ্লাস চা দে বাবা—

বাড়ির বাইরে রাস্তা। রাস্তাটা এখন গলির মতন। আগে এইটেই ছিল প্রধান রাস্তা। তখন লোকজন গাড়ি-ঘোড়া এই রাস্তা দিয়েই যেত। বড়বাবুর বিয়ের সময়ও এই রাস্তাটাই ছিল একমাত্র পথ। তা রাস্তা ছোট হলে কি হবে। একটা চায়ের দোকান আছে, একটা জামা-কাপড় ধোলাই-এর দোকান আছে। টপ্ করে বেরিয়ে গিয়ে এক মিনিটে চা আনা যায়। কালিদাসবাবু চা মুখে দিয়ে বলেন—এ কী চা করেছে রে হরিচরণ, চা খাচ্ছি না ছাই খাচ্ছি—

মুহুরিবাবু বলে—কর্তাবাবুর আমলে চা আমাদের কিনে খেতে হতো না খাজাঞ্চিবাবু—

কালিদাসবাবু থামিয়ে দেন। বলেন—তুমি থামো দিকিনি মুহুরিবাবু, কবে সোনা সস্তা ছিল তার গল্প থাক্, এখন বকেয়া-বাকী খতেনটা দাও তো—

তারপর বলেন—গেল মাসে বড়বাবুর কত টাকা হাওলাত, দেখ

তো হিসেবটা ?

মুহুরিবাবু হাওলাতের হিসেবটা দিয়ে সবে একটু কলে গিয়েছিল। ফেরবার পথেই খাস-বরদার পাঁচুর সঙ্গে দেখা। আর তারপরেই একেবারে হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়ে এসেছে।

—এদিকে সর্বনাশ হয়েছে খাজাঞ্চিবাবু!

—কি হলো ? হাওলাত খাতা থেকে মুখ তুলে কালিদাসবাবু তাকালেন।

—বড়বাবু নফরকে স্মরণ করেছেন।

আবার নফরকে স্মরণ করেছেন! কালিদাসবাবু যেন খবরটা পেয়ে মুষড়ে পড়লেন। মাসের আজকে চব্বিশ তারিখ, পাওনা-গণ্ডা কিছু এখনও মেলেনি, এরই মধ্যে নফরকে স্মরণ করে বসলেন!

ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে শেষদিকে বার-বাড়ির দরোয়ানদের থাকবার ঘর। কিছু কিছু পুরোনো বাতিল খাতা-পত্র তাকের মাথায় জমা করা আছে। সাত-আট-দশ পুরুষের জমা-বকেয়ার খাতা, কত জমিদারি, কত ধান-কল আর নানা কারবারের হিসেব-নিকেশের খাতা-পত্র এখানে ওখানে সিন্দুকের মাথায় পড়ে আছে। বছরের পর বছর ধরে ধুলো জমছে তার ওপর। দরোয়ানেরা সকালে ওঠে ঘুম থেকে দুপুর-বেলা ঘুমোয় আবার রাত্রে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ে। তারা জানতেও পারে না কতপুরুষ ধরে যে হিসেব-নিকেশ তাদের মাথার ওপর ধুলো জমে জমে এখন পচে খসে যাচ্ছে, সে হিসেব-নিকেশ অনেক কষ্টের আর অনেক যত্নের ধন ছিল একদিন। অনেক পুরুষের পাপের আর পরিশ্রান্তির সব ফসল সেগুলো। সে-ফসল একদিনে সঞ্চিত হয়নি। দিনে রাতে নিরলস বিলাস, বিভ্রম আর বিতৃষ্ণার সব সঞ্চয়। কেউ বুঝতে পারে না কেউ চিনতে পারে না তা! কেউ জানতেও পারে না সে-সব।

শুধু একজন জানে।

মা-মণি বলেন—বৌমা ?

বৌমা এ-বাড়ির বড়বাবুর বৌ, তাঁর যেন সব দেখা শোনা বোঝা

হয়ে গেছে। রাত যখন গভীর হয়, বড়রাস্তার ট্রামের বাসের শব্দ ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসে, তখনও ঘুম আসে না তাঁর। বলেন—সৌরভী, দেখে আয়তো জগত্তারণবাবু কি চলে গেছেন না আছেন?

জগত্তারণবাবু কর্তাবাবুর আমলের লোক। অ্যাটর্নীর অফিসে চাকরি করেন দিনের বেলা। কিন্তু বড়বাবু তাঁকে স্মরণ করেন প্রায়ই। গাড়ি পাঠিয়ে দেন। জগত্তারণবাবু জামা-কাপড় বদলে পাঞ্জাবিতে আতর মেখে এসে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসেন। আগে রোজই আসতেন। রোজ। গুলমোহর আলির একটা বাঁধা কাজই ছিল ওটা, সোজা গাড়ি যেত কম্বলিটোলায়। সেখানে যতক্ষণ না জগত্তারণবাবু জামা-কাপড়-সাজ-পোশাক প'রে তৈরি হতেন ততক্ষণ গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতো। তারপরে নিজের খেয়ালমতো টগ্‌বগ্‌ করতে করতে আসতেন।

এখন বড়বাবুর কাছেও আসেন।

এসেই বলেন—আজকে আর একজন কাৎ—বুঝলে হে বড়বাবু, আর এক মক্কেল কাৎ হলো।

বড়বাবু তাকিয়ায় হেলান দিলেন।

বললেন—আবার কোন্ মক্কেল কাৎ হলো মাস্টার?

রোজ হাইকোর্ট অঞ্চলে ঘোরা-ফেরা করেন। টাট্‌কা খবরটা তিনি পান। মক্কেল কাৎ হওয়ার খবরে ভারি খুশী হন জগত্তারণবাবু। যেদিন কোনও মক্কেল কাৎ হয় না সেদিন ভারি বিমর্ষ থাকেন। কিন্তু আবার কোনও মক্কেলের কাৎ হওয়ার খবর পেলেই শুনিয়ে যান। মোষের শিং-এর পাখীর ঠোঁট মার্কা হ্যাণ্ডেলওয়ালা পাকানো একটা ছড়ি হাতে। এসেই বলেন—মা-জননী কেমন আছেন বড়বাবু?

বড়বাবু বলেন—ভালো।

—যাক্, ভালো থাকলেই ভালো বড়বাবু, ওঁরা সব পুণ্যাত্মা লোক বড়বাবু, ওঁরা বেঁচে থাকলেও পৃথিবীটা তবু কিছু হালকা থাকে, নইলে পাপ যে-রকম বাড়ছে।—কিন্তু আজকের খবর শুনেছেন?

বড়বাবু বললেন—কী খবর?

—শোনেননি? আরে আজকে হাইকোর্ট পাড়ায় যে হৈ-চৈ পড়ে

গেছে, সেই মাতাল মল্লিকের নাতি, ন্নুলো মল্লিকের ছেলে কার্তিক মল্লিক কাৎ—

—কেন ?

জগত্তারণবাবু বলেন—হুণ্ডি কেটেছিল কাবলিয়ালার কাছে, এখন স্নুদে-আসলে সব ডিক্রি হয়ে গেল, আর মাথা তুলতে হবে না বাবাজীকে এবার—

একটা-না-একটা কাপ্তেন ঘ্রোজ ঘায়েল হয় কলকাতায়, আর জগত্তারণবাবু তার দীর্ঘ ফিরিস্তি দেন বড়বাবুর কাছে এসে। আগে রোজ আসতেন, এখন বড়বাবুর রক্তের তেজ কমে এসেছে, একটা-না-একটা অসুখে কাবু হয়ে থাকেন। এসেও তেমন জমে না। একলা আর কতক্ষণ জমিয়ে রাখেন।

যাবার সময় বলেন—কই বড়বাবু, অনেকদিন তো কিছু হয়নি, শেষে কি শুক্রাচার্য হয়ে যাবে নাকি ?

বড়বাবু তাকিয়া থেকে উঠে বলেন—না, কই, এতদিন তো মনে ছিল না মাস্টার, মনে করিয়ে দিতে হয় তো—

—হ্যাঁ, তাহলে কালকেই হয়ে যাক্—খুব দাঁওয়ে কিছু হুইস্কি পাওয়া যাচ্ছিল, ফস্কে গেল—

বাড়ি ফেরার আগে জগত্তারণবাবু বার-বাড়ির সামনে একবার এসে দাঁড়ান। উঠোনে বাক্সবাতিটা তখনও জ্বলছে টিমটিম করে। দরোয়ানদের সদরে ভূষণ সিং ছাতু খাচ্ছিল। জগত্তারণবাবু সামনে গিয়ে বললেন—এই যে ভূষণ, একবার যে বাবা ভেতরে খবর পাঠাতে হবে, মা জননীর পায়ের ধুলো নেব—

ভূষণ সিং সোজা মা-জননীর কাছে যেতে পারবে না, সে খবর দেবে পয়মন্তকে। পয়মন্ত বার-বাড়ির চাকর, সে খবর পাঠাবে ভেতর বাড়ির সিন্ধুকে। সিন্ধু মা-জননীকে বলবে—মাস্টারবাবু একবার পায়ের ধুলো নিতে এসেছেন মা-মণি।

তারপর জগত্তারণবাবু পয়মন্তর সঙ্গে গিয়ে অন্দরের সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াবেন। ওপর থেকে সিন্ধু ঘোমটা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেই

জগত্তারণবাবু ওপর দিকে চেয়ে বললেন—মা-জননী, আপনার ছেলে এসেছে, ক'দিন আসতে পারিনি, অপরাধ নেবেন না আমার—

সিন্ধু মা-মণির বকলমায় বলবে—খোকাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন মাস্টারবাবু—

—আজ্ঞে আমাকে আর বলতে হবে না মা-জননী, আমি তো তাই বোঝাতেই রোজ আসি, বলি তো যে ও-সব ছাইভস্ম খাওয়া কি ভালো? বুঝেছে, আগের থেকে অনেক বুঝেছে মা-জননী, দেখেন না আমি বুঝিয়ে-বুঝিয়ে কত ঠাণ্ডা করেছি—

সিন্ধু বলবে—আজকে কেমন আছে খোকা?

—আজকে তো মেজাজ ভালোই দেখলাম মা-জননী, গীতাখানা পড়ালাম আজ, চতুর্দশ অধ্যায়টা শেষ করে দিলাম, ও-সব বদ্ চিন্তাটিন্তা যাতে না আসে আর কি! তবে একটু সময় লাগবে, অনেক দিনের নেশা তো, সইয়ে সইয়ে ছাড়াবো, তা আমি যখন আছি আপনি তখন কিছু ভাববেন না—এখন আমার হাতযশ আর আপনার আশীর্বাদ—

সিন্ধু বলবে—আমার এক ছেলে, আপনিই ওর মাস্টার ছিলেন, আপনিই ভরসা আমার—

জগত্তারণবাবু বলবে—আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকুন মা-জননী, আপনার একটু পায়ের ধুলো পেলে আমি আর কাউকে ভয় করি না—একটু পায়ের ধুলো দিন মা-জননী, বাড়ি চলে যাই।

সিন্ধু একটা ছোট রূপোর বাটিতে খানিকটা পায়ের ধুলো নিয়ে এসে সামনে ধরে আর জগত্তারণবাবু সব ধুলোটুকু মাথায় ঠেকিয়ে বাটিটা একবার জিভে ঠেকান। তারপর সেই সেখানে দাঁড়িয়েই সিঁড়ির সিমেন্টের ওপর কপাল ঠেকিয়ে বাড়ি চলে যান।

এ-ঘটনা বহুদিনের, বহু বছরের। বহু বছর ধরেই জগত্তারণবাবুর এমন মা-জননীর পায়ের ধুলো-প্রাপ্তি ঘটে আসছে। পায়ের ধুলোর জোরেই জগত্তারণবাবুর নিজস্ব বাড়ি হয়েছে কম্বলিটোলায়, নিজস্ব মোটরগাড়ি হয়েছে। সেই গাড়ি করেই নিজের অফিসে যান।। কিন্তু বড়বাবুর কাছে আসতে হলেই বড়বাবুর গাড়ি নিয়ে যায় গুলমোহর।

আগের দিন রাত্রেও এসেছিলেন জগত্তারণবাবু। যথারীতি মক্কেল কাৎ হাওয়ার গল্পও করেছেন বড়বাবুর ঘরে বসে, তারপর যথারীতি মা-জননীর পায়ের ধুলো নিয়ে কপাল ঠেকিয়ে প্রণামও করে গেছেন। তখনও কেউ টের পায়নি যে পরদিন ভোরবেলাই নফরের ডাক পড়বে। নফর নিজেও কল্পনা করতে পারেনি।

খাস-বরদার পাঁচু বাড়-বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই একেবারে সামনা-সামনি ধাক্কা লাগছিল ভূষণ সিং-এর সঙ্গে। ভূষণ সিং বহুদিনের লোক। কর্তাবাবুর আমলে বন্দুক নিয়ে পাহারা দিত। সে বন্দুক এখন নেই, তাই সে তেজও নেই। মানুষটাও বুড়ো হয়ে গেছে। একতাল আটা নিয়ে যাচ্ছিল মাখতে। আর একটু হলেই ধাক্কা লেগে আটাও নষ্ট হতো, থালাও ভাঙতো। খাস-বরদার মুর্গী ছোঁয়, মছ্‌লি ছোঁয়—

—অন্ধা হ্যাঁয়, না কেয়া হ্যাঁয় ?

আর দু'একটা চড়া কথা বললেই হাতাহাতি বেধে যেত সেখানে। এমন বেধেছে অনেকবার। ভূষণ সিং-এর সে-তেজ নেই বটে, কিন্তু রাগটা আছে। রাগ করলে আর জ্ঞান থাকে না তার।

—থাম্ তুই, ভারি রাগ দেখাচ্ছে আমাকে !

কর্তাবাবু পর্যন্ত সে-আমলে ভূষণ সিংকে সামলে নিয়ে চলতেন। বলতেন—ওকে চটিয়ো না তোমরা হে, ও খাস মৈথিলী ব্রাহ্মণ, ওদের রাগটা একটু বেশি হয়। আর সদর গেট্-এ রাগী লোক থাকা ভালো—

—তুই রাগ করে তো আমার কচু করবি—ব'লে বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে দেখায় পাঁচু। হয়ত আটাসুদ্ধ পেতলের থালাটা পাঁচুর মুখে ছুঁড়েই মারতো ভূষণ সিং। ছুঁড়ে মারলে আর রক্ষে থাকতো না পাঁচুর। ওখানেই অজ্ঞান হয়ে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বেধে যেত। আর নফরকে ডাকতে যাওয়া হতো না !

—অন্ধা হ্যাঁয় না কেয়া হ্যাঁয় ?

—থাম্ তুই, এখন কথা বলবার সময় নেই আমার, বড়বাবু নফরকে ডেকেছে—নইলে দেখে নিতুম—

নফরকে ডেকেছে ! অমন যে রাগী মৈথিলী ব্রাহ্মণ ভূষণ সিং, সেও

যেন খবরটা শুনে কেমন থমকে দাঁড়াল।

রান্নাবাড়িতে সকাল থেকেই গোলমাল থাকে। গোলমাল সব সময়েই থাকে সেখানে। রান্নার কালি-ঝুল আর ধোঁয়ার মধ্যে যে-মানুষগুলোর জীবন এতদিন কেটেছে, তারা জানতে পারে না কখন কোন্ দিকে সূর্য উঠলো, কখন ডুবলো। বড়বাবুর খাবারের রকমারি চাই। খাজাঞ্চিমশাই বাজারের সরকারও বটে। বাজার-খরচটা তাঁর হাত দিয়ে হবে। কালিদাসবাবু বাজারে গেলেই বাজারের মেছুনি থেকে শুরু করে আলু-পটলওয়ালারা ডেকে ওঠে—এই যে বাবু, এদিকে আসুন—আজকে ধলেশ্বরীর লালচক্ষু রুই—

আলুওলা বলে—নৈনিতাল আলু ছিল বড়বাবু, আধমণ নিয়ে যান্—

সেই বাজার কিছু যাবে নিজের বাড়ি, কিছু আসবে এ-বাড়িতে। তারপর ভাঁড়ারের ঝি'রা সেই আনাজ তরকারি কুটতে বসবে। মা-মণির জন্যে বড়-বড় আলু কুটতে হবে। বৌ-মণির আলু-ছেঁচকি। আর বড়বাবুর কুচো-কুচো আলুভাজা। ডাল হোক না-হোক, ঝোল হোক না-হোক, ডালনা হোক না-হোক—আলুভাজা চাই-ই বড়বাবুর।

খেতে বসে বড়বাবু বলেন—আর চারটি আলুভাজা দিতে বল্ তো পেঁচো—

খাস-বরদার পাঁচু ছুটে যায় রান্নাবাড়িতে। রান্নাবাড়ি কি এখানে! বার-বাড়ির উঠোনে মস্ত একটা নিমগাছ। সেই নিমগাছ ঘুরে খিড়কী দিয়ে অন্দরের রান্নাঘরের দরজা। দৌড়তে দৌড়তে সেখানে গিয়ে পাঁচু দূর থেকে হাঁকায়।

বলে—ও শিশুর-মা, আলুভাজা চাইছে বড়বাবু, আলুভাজা দাও--

মঙ্গলা তখন উনুনে চচ্চড়ি চড়িয়েছে। নটে শাক, কুমড়ো আর আলুর খোসা দিয়ে মা-জননীর শখের তরকারি হচ্ছিল। ভাজা বড়ির গুঁড়োও দিতে হবে শেষে। সরষে বাটিয়ে রেখেছে শিশুর-মাকে দিয়ে। সকালবেলা ফরমাশ হয়েছে, সিন্ধু এসে রান্নাবাড়িতে ফরমাশ দিয়ে গেছে। এখন বেলা হতে চললো, চচ্চড়ি এখনও নামলো না।

মঙ্গলা বলে—হ্যাঁ শিশুর-মা, খাজাঞ্চিখানার লোক এখনও খেতে

এলো না ?

প্রথমে খাজাঞ্চিখানার লোক খাবে। তিনজন খায় রোয়াকে বসে। শিশুর-মা তাদের পরিবেশন করে। তারপর বার-বাড়ির মানুষ-জন যারা দু'একদিনের জন্য আসে বাড়িতে তারা খাবে। কল থেকে ম্যানেজারবাবু আসে বেলা বারোটার সময়। তাঁকে খেতে দিতে হবে। দফে দফে রান্না যেমন, তেমনি দফে দফে খাওয়া। মা-মণি, বৌ-মণি যা খাবে তা সিন্ধু এসে থালা সাজিয়ে নিয়ে যাবে দোতলায়। তারপর সকলের শেষে খাবে বড়বাবু।

—হ্যাঁরে, বড়বাবু কি চান করতে নেমেছে ?

খবর আসে বড়বাবু তেল মাখতে নেমেছে। দাড়ি কামানো, তেল মাখা, গা টেপা তাইতেই বেলা পড়ে যাবার ব্যাপার। মঙ্গলাকে ততক্ষণ বসে থাকতে হয়। বড়বাবু না খেলে মঙ্গলাও খেতে পারে না। ক্ষিদে অবশ্য পায় কি পায় না তা বোঝবার ফুরসুত থাকে না। শিশুর-মা যোগান দেয় আর মঙ্গলা রাঁধে।

—হ্যাঁরে, নফর আজ কই খেলে না তো !

শিশুর-মা বলে—পারিনে বাপু ডেকে ডেকে ভূত খাওয়াতে, যার গরজ হবে সে এসে খেয়ে যাক্ না !

—আহা ছাখ্ না, ছেলেটা না খেয়ে থাকবে গা !

এক এক দিন খেতেই আসে না, লোক পাঠিয়ে ডাকলে তার খোঁজ পাওয়া যায় না। এ-বাড়ির প্রত্যেকটি লোকের কাজ আছে। ওই খাজাঞ্চিবাবু থেকে শুরু করে চাক্‌দ'র মুহুরিবাবু, ভূষণ সিং, ফুলমণি, সিন্ধু, মা-মণি, বৌ-মণি, হরি-জমাদার, সকলে সকাল থেকে চরকির মতো ঘোরে। কাজটা যে কে কী করে তার হিসেব দেওয়া সহজ নয়, কিন্তু ব্যস্ত সবাই। সকাল থেকেই কেন, ভোর রাত থাকতে উনুনে আগুন পড়ে রান্নাবাড়িতে। তখনও কেউ ওঠেনি। মঙ্গলার তখন চান হয়ে গেছে উঠোনের কলতলায়। বিধবা মানুষ, জপ বলো আহ্নিক বলো সব সেই সময়ের মধ্যে করতে হয়। তার চেয়ে সে-সময়টাতে আলুভাজা, চচ্চড়ির কথা ভাবলে বেশি লাভ। সারা বাড়ির লোক

খাচ্ছে, কিন্তু রাঁধছে যে কে তার হিসেব কেউ রাখে না।

শিশুর-মা বাটনা বাটতে-বাটতে বলে—দিদি, অম্বুবাচী কবে গো?

কে জানে কার অম্বুবাচী। কবে অম্বুবাচী, করে সূর্যগ্রহণ, করে পূর্ণিমা, কবেই বা একাদশী কোনও খবর রাখবার সময় থাকে না রান্নাঘরের মধ্যে। চারটে উনুন। হাঁ-হাঁ করে জ্বলছে রাবণ-রাজার চিতার মতো। চিতা যেন আর নিভতে চায় না। কবে সংসার সেনের আমলে এই চিতা জ্বলতে শুরু হয়েছে, তার যেন আর ক্ষান্তি নেই। একটা উনুনে ভাত চাপিয়ে আর একটা উনুনে ডাল চাপাতে হয়। ততক্ষণে আর একটা উনুন হু-হু করে জ্বলছে। সেটাতেও ভাত চাপাতে হয়। এক মণ চালের ভাত চড়ে রোজ। এক হাঁড়ি ভাত নামলো তো আর এক হাঁড়ি চড়িয়ে দাও। দশ রকম চাল। চালের কম-বেশ আছে। বাইরের লোক খাবে মোটা লাল চাল। বৌ-মণি মা-মণি খাবে সরু আতপ চাল। বড়বাবু খাবে বাসমতী সেদ্ধ চাল। ডালও একরকম নয়। কেউ মুগ, কেউ মুসুর, কেউ বিউলি, কেউ খেসারি। রকমারি লোকের রকমারি খাওয়া।

খেতে বসে মুহুরিবাবু বলে—বড়ির ঘণ্ট আর-একটু শিশুর-মা!

মঙ্গলা বলে—বড়ির ঘণ্টটা এই রেখে দিলাম বাটি ঢাকা দিয়ে, নিস্‌নে যেন, নফর খাবে—

—মুহুরিবাবু চাইছে যে!

—তা চাইছে বলে কি আর কেউ খাবে না! আমার দুধ পুড়ে গেল, আমি তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে পারিনে বাপু—

রোজ সকাল থেকে নানান লোকের চাহিদা মেটাতে-মেটাতেই হিমসিম খেয়ে যায় মঙ্গলা আর শিশুর মা। এর মধ্যে ওপর থেকে ফরমাশ আসে—ডালে আজ নুন কম হয়েছে শিশুর-মা—

কেউ বলে—কালিয়াতে আজ এত লঙ্কা দিলে কেন গা?

সব খবর পৌঁছোয় না রান্নাবাড়িতে। ফ্যান গালতে-গালতে হাতটা পুড়ে যায় কতবার। শিশুর-মা বলে—ওমা, হাতে তোমার ফোস্কা কেন দিদি?

মঙ্গলা টেরও পায়নি। বলে—ওমা, তাই তো—

—একটু চুন আর নারকেল তেল দিয়ে দেব ?

চুন নারকেল-তেল দেবার সময় নেই সেন-বাড়ির রান্নাবাড়িতে। ভোরবেলা উঠে উনুনে রান্না চাপাবার পর সেই যে একটার পর একটা কাজের চাপ আসে, তারপর থেকে রাত বারোটা অবধি নিশ্বাস নেবার ফুরসুত থাকে না মঙ্গলার।

শিশুর-মা দু'একটা খবর এসে দিয়ে যায় বটে, বলে—শুনেছ দিদি, ভেতর-বাড়ির সিন্ধুর কাণ্ড ?

মঙ্গলা তখন ডালে ফোড়ন দিচ্ছে। বলে—কথা রাখ্ বাছা, তোর বাটনা হলো ? আমার এদিকে কয়লা পুড়ে গেল—

শিশুর-মা বলে—ঝি-গিরি করছি বলে তো জীবন বিকিয়ে দিইনি দিদি, ঘেন্না ধরে গেল মাগীর কাণ্ড দেখে—

তবু মঙ্গলা কোনও কথা কানে নেয় না।

বলে—মা-মণির অসুখ হয়েছিল, কেমন আছেরে জানিস্ ?

শিশুর-মা বলে—আজ তো বড় কবিরাজ এসেছিল, গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল দেউড়িতে—

মঙ্গলা বলে—একবার সময়ও পাইনা যে দেখা করে আসি—

—কদ্দিন কাজ হলো তোমার দিদি ?

কাজ কি আজকের। কত বছর হবে ? যেবার কর্তাবাবু কাশী গিয়েছিল তীর্থ করতে, সেইবারই প্রথম এ-বাড়িতে ঢোকে মঙ্গলা। ওই নিমগাছটা তখন ছোট ছিল। হাত দিয়ে ডাল ছোঁয়া যেত। কতদিন ওরই ডাল ভেঙে দাঁতন করেছে বাড়ির ঝিউড়িরা। ওইখানে তখন মাটি ছিল। মাটির কোণে ছুটো লাউগাছ ছিল। সেই লাউডগা উঠেছিল রান্নাবাড়ির ছাদে। লাউ হয়েছিল প্রথম-প্রথম। কিন্তু হনুমান এসে সব মুড়িয়ে খেয়ে গেল একদিন। শিশুর-মা তখনও আসেনি। আর নফর তখন ছোট। ফরসা ফুটফুটে চেহারা।

লোকে জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ রে, তোর মা কে ? বাবা কে ?

মুহুরিবাবু তখন খাজাঞ্চিখানায় কাজ করছে। বলতো—অ্যাই

ছোঁড়া, নাচতো দেখি, নাচ্—

কালিদাসবাবু সরকারি কাজ থেকে মুখ তুলে বলতেন—আবার ওকে ক্ষেপাচ্ছ কেন বলো দিকিন্।

কিন্তু নফর তখন নাচতে শুরু করে দিয়েছে। নাচ মানে তেমনি নাচ। ধেই ধেই করে নাচ।

—এইবার গান গা তো ?

কালিদাসবাবু বলতেন—আবার কাজের সময় গান করতে বলছো কেন বলো তো !

নফর তত্ক্ষণে নাচ থামিয়ে গান ধরে দিয়েছে—

আমি বৃন্দা-

বনে বনে বনে

বাঁশী বাজাবো—

আমি বৃন্দা—

—থাম বাপু, তোর গান থামা—তোর বাপ কে বে ? কাদের ছেলে তুই ?

—সরকার মশাই, ওর ডিগবাজি খাওয়া দেখবেন ? অ্যাই, ডিগবাজি খা তো ?

নফরকে বলতে হয়না বেশি। হুকুম তামিল করতে পারলেই খুশী। শেষকালে সামনে এসে হাত পাতে। বলে—একটা পয়সা দাওনা সরকারবাবু—

কালিদাসবাবু এক ধমক দেন। বলেন—দূর, দূর হ, পয়সা কেন রে, পয়সা কী হবে—

—ল্যাবেনচুষ খাবো।

—দূর হ, বেরো এখান থেকে, পরনে কানি নেই, ল্যাবেনচুষ খাবেন ! যা, বেরো এখান থেকে !

বের করে তাড়িয়ে দিত বটে সরকার-গমস্তারা। তখন ছোট। কেউ বলুক না কিছু, দিক না তাড়িয়ে, কিছু আসে যায় না তাতে নফরের। আবার গিয়ে দাঁড়াত দরোয়ানদের ঘরে। ভূষণ সিং তখন

ডন্-বঠকী দিচ্ছে আর হুম্ হুম্ শব্দ করছে। সেখানে গিয়েও দাঁড়াতো খানিকক্ষণ। তারপর বলতো—আমিও পারি ও-রকম, দেখবে? দেখবে তোমরা?

ন্যাংটো হয়ে সেই অবস্থাতেই লেগে যেত ডন্-বৈঠক করতে। হতো না ঠিক। তবু করতো। ফুলমণি দেখতে পেয়ে বলতো—হ্যাঁরে, তোর কাপড় কী হলো? ন্যাংটো হয়ে ঘুরছিস্ কেন?

কাপড় কি কোমরে থাকতো তখন নফরের! ধরে বেঁধে কেউ একটা ছেঁড়া কানি পরিয়ে দিলে তো তাই নিয়ে এ-পাড়া ও-পাড়া রাস্তায়-ঘাটে ঘুরে বেড়াতো। কর্তাবাবু যখন বেরোতেন, সঙ্গে জগত্তারণবাবু, দুলালহরিবাবুও যেতেন। নফর সামনে গিয়ে হাজির। কর্তাবাবু দেখলে বলতেন—হ্যাঁরে, এটাকে একটা কাপড় পরিয়ে দেয় না কেন কেউ?

জগত্তারণবাবু একবার দেখে বললেন—ছেলেটা কাদের কর্তাবাবু?

দুলালহরিবাবু বলতেন—ক'দিন থেকে দেখছি, কোত্থেকে এল?

—এই, তোর নাম কী রে?

—একটা পয়সা দাওনা।

—এইটুকু ছেলে আবার পয়সা চায় যে! পয়সা কী করবি?

—ল্যাবেন্‌চুষ খাবো, ওই মোড়ের দোকান থেকে।

তখন কর্তাবাবুর রমরমা অবস্থা। সংসার সেনের বংশের কুলতিলক। চেতলায় ধানের কল করেছেন। পোস্তায় সোরার কারবার, বেলেঘাটায় তেল-কল। সব কারবারই ভালো চলছে। হুড় হুড় করে টাকাও আসছে। টাকার যেন বৃষ্টি হয়। লাখ-লাখ টাকা জমা হয় খাজাঞ্চি-খানায়, খাতা লিখতে লিখতে হাত ব্যথা করে মুহুরিবাবুর। বকেয়ার খাতায় তেমন কালির আঁচড় পড়ে না, জমার খাতায় চারটা-পাঁচটা অঙ্কর ধাক্কা সামলানো দায় হয়ে ওঠে। রাত আটটা ন'টা বেজে যায় সরকার-মুহুরির সেই ঠেলা সামলাতে। কর্তাবাবুর মোসায়েবের দলও বাড়ে। বাবুরা বলেন—আজকে নৌকাবিলাস হোক কর্তাবাবু, অনেক-দিন নৌকাবিলাস হয়নি—

তা তা-ই হয়।

বাবুরা বলেন—অনেকদিন ভালো গান শুনিনি কর্তাবাবু, মোহর-বাঈ কলকাতায় এসেছে শুনেছি—

তা তা-ই হয়।

বাবুরা বলেন—মুলো মল্লিক একজোড়া সাদা ওয়েলার কিনেছে দেখলুম, বেশ দেখাচ্ছিল কিন্তু—

তা তা-ই হয়।

নৌকাবিলাস হয়, মোহরবাঈজীর গান হয়, সাদা ওয়েলার এক-জোড়া, তা-ও হয়। কোনও শখ অপূর্ণ থাকে না কর্তাবাবুর বাবুদের। কোথাও ভালো পাটনাই গাই-গরু এসেছে শুনলে, তাই-ই কেনা হয়।

কর্তাবাবুর শোবার ঘরে মা-মণি একদিন এলেন।

বললেন—গুরুদেব এসেছেন, জানো!

—কই জানি না তো! কেউ বলেনি তো আমাকে!

মা-মণি বলেন—গুরুদেব বলছিলেন চূড়ামণি-যোগে তীর্থভ্রমণে নাকি সব পাপ ক্ষয় হয়, যাবে!

—পাপ!

পাপ যে কোথায় তা তো জানা ছিল না কর্তাবাবুর। পাপ তো কিছু করেন না। কারোর কোনও ক্ষতি তো করেন না তিনি। কারো চোখের জল ফেলেন না। যে আশ্রিত হয়ে থাকে তাকে খেতে দেন। কেউ হলপ করে বলতে পারবে না সংসার সেনের বাড়িতে এসে অপমান পেয়ে ফিরে গেছে। দান-ধ্যানও আছে কর্তাবাবুর। পুরী থেকে পাণ্ডারা এলে দক্ষিণে নিয়ে হাসিমুখেই আবার চলে যায়। নিত্য দেবসেবা আছে বাড়িতে—সেখানেও ভোগ হয়, প্রসাদ বিলোনো হয়। পুজোর সময় যে-সে কাপড় পায়। পাত পেতে খেয়ে যায় সবাই। সরকারের খাতায় তার হিসেব আছে দস্তুরমতো। তারপর ওখানে দুর্ভিক্ষ, এখানে অজন্মা, সব চাঁদা দেন কর্তাবাবু। কাউকে ফেরান না তিনি। তবে আর পাপ কিসের?

মা-মণি বললেন—বলছো কি তুমি, পাপ নেই? বেঁচে থাকাই তো পাপ, কত পাপ-ই যে করেছি—

তা ঠিক হলো তীর্থবাসই করতে হবে। তীর্থবাস! গুরুদেব বোঝালেন—ব্রাহ্মণকে দান করলে এক জন্মের পাপ ক্ষয় হয়, কিন্তু সস্ত্রীক তীর্থবাস করলে জন্ম-জন্মান্তরের পাপ ক্ষয় হয়। আর সত্যিই তো, বেঁচে থেকেই তো আমরা অসংখ্য পাপ করছি। মনের অগোচরে কত হত্যা করছি, কত মিথ্যাচার করছি, কত অসদাচরণ করছি।

গুরুদেব সোয়া পাঁচশো টাকার প্রণামী আর কাপড়, বাসন, খড়ম ইত্যাদি নানা জিনিসপত্র নিয়ে উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। তিনি কাশীধামে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে রাখবেন। এদিকে তোড়জোড় হতে লাগলো।

জগত্তারণবাবু তখন অ্যাটর্নীশিপ পড়ছেন। বললেন— অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে কর্তাবাবু, সময় কাটতে চাইবে না—

কর্তাবাবু বললেন—তোমরাও চলো না—

দুলালহরিবাবু বললেন—আমরা চললে এদিকে সামলাবে কে?

বাগানবাড়িতে কর্তাবাবুর মেয়েমানুষের তখন খুব খাতির। পুতুলমালার মা আছে, পুতুলমালার ঝি আছে, পুতুলমালার চাকর, দরোয়ান সব আছে। কিন্তু তবু ভয় যায় না। মুলো মল্লিক নতুন বড়লোক। কোত্থেকে কী করে বসে, পুতুলমালার মাকে খুশী করে হয়ত হাত করে নেবে, তখন এ-কুল ও-কুল উভয়কুল যাবে। তার চেয়ে জগত্তারণবাবু থাক্। দুলালহরিবাবু থাক্। দু'বেলা দু'জন পালা করে পাহারা দেবে।

কর্তাবাবু বললেন—জগত্তারণ তুমি যেয়ো সন্ধ্যাবেলা, আর দুলালহরির তো কোনও কাজ নেই, ও যাবে'খন সকালবেলার দিকটা,—কড়া নজর রাখবে যেন বাইরের মাছিটি না মাড়ায় ওখানে—

কিন্তু সেই-যে কর্তাবাবু কাশী গেলেন, সেই যাওয়াতেই কপাল ভাঙলো মঙ্গলার।

মঙ্গলা তখনও এ-বাড়িতে আসেনি। এ-বাড়িতে কর্তাবাবু কাশীধামে যাবেন, তারই তোড়জোড় হচ্ছে। কে সঙ্গে যাবে, কে যাবে না। কী-কী যাবে, কখন যাবে, অনেক ঝঞ্ঝাট। দু'মাস ধরে তার বিলি-বন্দোবস্ত হলো। এ-সব অনেক দিন আগের কথা। তখন ভূষণ সিং-এর

বয়েস কম ছিল। কালিদাসবাবুর যৌবন ছিল, মুহুরিবাবুর তখনও চুল পাকেনি। জগত্তারণবাবু তখনও অ্যাটর্নীশিপ পাস করেননি। আর এখন তো ছুলালহরিবাবুই নেই। একদিন হঠাৎ কর্তাবাবুর বাগান-বাড়ির পুকুরে পাওয়া গেল ছুলালহরিবাবুর দেহখানা। ফুলে-ফেঁপে তখন ঢোল হয়ে গেছে। থানা-পুলিশ যা-হবার হলো। কর্তাবাবুর কাছে চিঠি গেল কাশীধামে। কিন্তু সে-চিঠির উত্তর আর এল না। মা-মণির তখন খুব অসুখ।

বাড়িতে খবর এসে গেছে কর্তাবাবু অস্থির হয়েছেন কলকাতায় আসবার জন্যে, কিন্তু মা-মণির জন্যে আসবার উপায় নেই। সঙ্গে সরকার গেছে, খাস-বরদার পীরজাদা দয়োয়ান গেছে, কুঞ্জবালা গেছে। আর গেছে মঙ্গলা।

মঙ্গলাকে কে যেন এনে দিয়েছিল এ-বাড়িতে। কর্তাবাবু কাশীধামে যাবেন তীর্থ করতে। তাই একটা লোক চাই রান্না-বান্না করতে। বামুনের মেয়ে হবে, খাটবে-খুটবে বেশি, মুখে কথাটি বলবে না।

মা-মণি আপাদমস্তক দেখলেন। বললেন—তুই কাজ করতে পারবি?

—কাজ না করলে খাবো কি মা, বিধবা মানুষকে কে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে।

—বলি রান্না-বান্নার কাজ করেছিস কখনও?

—করবার তো দরকার হয়নি মা, এখন থেকে করবো।

কত আর বয়েস তখন। তেরো কি চোদ্দ। ওই বয়েসেই কপাল পুড়েছে। রূপ নয় তো, আগুন বললেই যেন ভালো হয়।

মা-মণি বললেন—তোর দ্বারা হবে না বাপু আমার কাজ, এত রূপ, সব ছারখার করে দিবি, এই পাঁচটা টাকা নিয়ে বিদায় হও বাপু, অন্য জায়গায় ছাখো—

মঙ্গলা মা-মণির পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—মুখখানা আমার পুড়িয়ে তুমি কালো করে দাও মা, তা-ও আমি সইতে পারবো, কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা মা—

—তাই যদি এত জ্বালা তো গঙ্গায় ডুবতে পারো না বাছা?

গঙ্গায় তো জলের অভাব নেই!

—তাই-ই যদি পারবো তোমার পায়ে ধরছি কেন মা।

তখনকার ঝি ছিল কুঞ্জবালা। কুঞ্জ মারা গেছে পরে।

সে বলেছিল—কর্তাবাবুর সামনে বেরোসনি হারামজাদী, সামনে যদি বেরোস্ তো তোর শিরদাঁড়া আস্ত ভেঙে দেবো—

তা তাই-ই ঠিক হলো। কাজ করবে মুখ বুঁজে। দিনরাত কাজ করতে ব্যাজার হবে না, এমন লোকই দরকার। কুঞ্জবালা বললে—থাক্ মা, কর্তাবাবুর সামনে ওকে আড়াল করে রাখবো আমি—

কুঞ্জবালার সঙ্গে একদিন মঙ্গলা ফরসা থান কাপড় পরে ঘোমটা দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠলো। আগে যাবে ঝি-ঝিউড়িরা। চাকর-বাকররা। সরকার-গমস্তারা। তারা বাসা ঠিক করে সব বন্দোবস্ত করে রাখবে আগে-ভাগে। তারপর কর্তা-গিন্নী যাবেন। তাঁদের যেন কোনও অসুবিধে না হয়।

শিশুর-মা এক-একদিন কথা তোলে। বলে—তুমি তো কাশী গিয়েছিলে, না দিদি?

চারটে উনুনে হাঁ-হাঁ করে কয়লা পোড়ে। সব কথার জবাব দেবার সময় থাকে না মঙ্গলার। সব কথা কানে নিতে নেই। কানে নিতে গেলে ডালে নুন দিতে ভুলে যাবে, ভাতের ফ্যান গালতে হাত পুড়ে যাবে।

প্রথম খাজাঞ্চিখানার লোক খাবে। তিনজন খায় রোয়াকে বসে। শিশুর-মা তাদের পরিবেশন করবে বটে, কিন্তু যোগান দেবে তো মঙ্গলা। তারপর ধান-কলের লোক এসেছে দু'জন, তারা আজ এখানে খাবে। কল থেকে ম্যানেজারবাবু এসে বেলা বারোটায় ভাত চায়। মা-মণি, বৌ-মণির খাবার দিতে হবে পাঠিয়ে দুপুরবেলায়। দেরি হলে সিন্ধুর মুখ-ঝামটা দেখে কে! তারপর সবশেষে বেলা পুইয়ে গেলে খাবে কর্তাবাবু। তারপর যখন সকলের খেয়ে-দেয়ে কাজকর্ম সেরে চা-খাবার সময় হবে তখন ভাত নিয়ে বসবে মঙ্গলা।

—তুমি তো জীবনের কাজ শেষ করে দিয়েছ দিদি, কাশীবাস করেছ, বাবা বিশ্বনাথ দর্শন হয়ে গেছে, আমাদের পাপ আর কে

খণ্ডাবে বলো !

রোজ বিশ্বনাথ দর্শন করতে তো ?

মঙ্গলা এ-কথার উত্তর দেয় না। বলে—হ্যাঁ রে, নফর খেতে এলো না আজ ?

শিশুর-মা বলে—ওমা, নফর খাবে কি গো, নফর যে বড়বাবুর সঙ্গে বাগানবাড়িতে গেছে, সেখানে কালিয়া-কোপ্তা খাচ্ছে, জগত্তারণ-বাবু গেছে, নফর তোমার এই কুমড়োর ঘণ্ট খেতে আসছে !

মঙ্গলা লুকিয়ে রেখেছিল একথালা ভাত। দু'টুকরো পোনা মাছ। একটু কুমড়োর ঘণ্ট। গরম ভাত খাওয়া কপালে নেই। তবু বাসি কড়কড়ে ভাতটা উনুনের পাশে রেখে দিলে তবু একটু গরম থাকে। নফরকে যেদিন ডেকে ডেকে এনে বসায়, রোয়াকের ওপর উঁচু হয়ে বসে ভাতগুলো গোগ্রাসে খায়।

বলে—শিশুর-মা, ডালটা কে রেঁধেছে গো ?

শিশুর-মা বলে—আর কে রাঁধবে, বামুনদিদি—

নফর বলে—কী ডালই রেঁধেছে মাইরি, একেবারে ডুব দিয়ে সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করছে—

শিশুর-মা বলে—যা দিয়েছি ওই দিয়ে খেতে হয় খাও, নয়তো উঠে যাও বাপু—

—কী বললে ? নফর রুখিয়ে ওঠে একবার।

শিশুর-মা আবার বলে—খেতে হয় খাও, নয়তো চলে যাও, রান্না-বাড়িতে এসে চোখ রাঙাবে নাকি ?

নফর আরো রেগে ওঠে। বলে—ডেকে নিয়ে এসো তোমার বামুনদিকে, মাইনে ফাইনে যখন বন্ধ করে দেব বড়বাবুকে ব'লে তখন পায়ে ধরতে আসবে এই শর্মার—

শিশুর-মা কোমরে আঁচলটা জড়িয়ে তেড়ে আসে। বলে—বামুনদি, খ্যাংরাটা নিয়ে এসো তো, ঝেঁটিয়ে ছোঁড়ার মুখ ভেঙে দিই—

—কী-ই-ই, এত বড় কথা !

এটো হাতেই নফর দাঁড়িয়ে ওঠে। বলে—ভাত দিচ্ছে বলে

মাথা কিনে নিয়েছে নাকি? মাছ কোথায় শুনি? ইয়ারকি পেয়েছ তোমরা? এসো, এগিয়ে এসো, ঘুষি মেরে মাথা ফাটিয়ে দেব আজ, চেনো না আমাকে—

—তবে রে মিন্‌সের মরণ দশা হয়েছে—ব'লে শিশুর-মা খ্যাংরা-ঝ্যাঁটাটা নিজেই নিয়ে এসেছে। নফরও তার চুলের মুঠি ধরে এক টান দিয়েছে।

শিশুর-মা তখন হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠেছে—ওগো, মিন্‌সে আমাকে মেরে ফেললে গো—

সে চীৎকারে রান্নাবাড়িতে লোক জড়ো হয়ে গেছে। খাজাঞ্চিখানা থেকে দৌড়ে এসেছে মুহুরিবাবু, বার-বাড়ি থেকে দৌড়ে এসেছে ফুলমণি, আস্তাবল-বাড়ি থেকে লাফাতে লাফাতে এসে হাজির গুলমোহর আলি। সিন্ধু দোতলার বারান্দা থেকে ঝুঁকে পড়ে বলে—কী হলো রে শিশুর-মা?

নফর তখনও চীৎকার করছে—আমি মাগীকে খুন করে ফেলব আজ, খুন করেঙ্গা---জরুর খুন করেঙ্গা—

মুহুরিবাবু ভয় পেয়ে গেল। হরি-জমাদার দাঁড়িয়েছিল সামনে। বললে—যা তো হরি, ভূষণ সিং-কে ডেকে নিয়ে আয় তো—

সবাই যখন উত্তেজনায় চীৎকারে অস্থির, তখনও রান্নাবাড়ির ভেতরে মঙ্গলা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে। যেন কোনও দিকে খেয়াল নেই তার।

নফর চীৎকার করছে—আও হামারা সাথ লড়েগা, কোন্ লড়েগা হামারা সাথ, আও, আও,—তোমারা বামুনদিকে বোলাও—বোলাও বামুন-দিকো, মাছ চুরি করেগা, আবার ইয়ারকি—

ততক্ষণে ভূষণ সিং এসে গেছে। এসেই নফরের ঘাড়ে এক লাঠি। —এই উল্লু! নিকালো—

আর সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক মন্ত্রের মতো যেন কাজ হয়ে গেল। এক আঘাতেই নফর যেন কেঁচোর মতো হয়ে গেছে। একেবারে কেঁচোটি! আমতা-আমতা করছে তখন। বললে—এই ছাখো ভূষণ সিং, ভাত্‌মে মাছ দেতা নেই বামুনদি, বড়বাবুকো বোল্ দেও—উস্‌কো

নক্‌রী খতম্‌ কর্‌ দেও—

—আরে তুম্‌ তো ইধার আও পহেলে—

নফরের ঘাড় ধরে ভূষণ সিং বার-বাড়ির উঠোনে ছেড়ে দিলে। নফর অসহায়ের মতো চাইলে সকলের দিকে। বললে—আমারই দোষ দেখলে তুমি, আর আমাকে যে মাছ দেয় না খেতে—

ব'লে মুখের দিকে সহানুভূতির জন্যে আবার চেয়ে দেখলে।

কিন্তু সবাই হাসছে তখন কাণ্ড দেখে। মুহুরিবাবু বললে—মাছ কেন দেবে শুনি? কোন্‌ কম্মে তুমি আছো হে?

নফর বললে—কাজের কথা ছেড়ে দিন, তা বলে দুটো খেতে দেবে না, আমি কেউ নই?

গুলমোহর আলিও হাসতে লাগলো। বললে—নফর পাগলা হো গিয়া—

মুহুরিবাবু বললে—তুমি কে হে শুনি? কোন্‌ নবাবের দেওয়ান!

—ক্ষিদের সময় ঠাট্টা করবেন না, ঠাট্টা ভালো লাগছে না এখন—

—তা ভালো লাগবে কেন, বসে বসে খেতে ভালো লাগবে কেবল, কেমন?

নফর বলে—আমি বসে বসে খাই!

—বসে বসে খাও না তো, কী করো শুনি! সারাদিন তো পড়ে পড়ে ঘুমোও!

নফর বলে—তা কাজ দিন না আমাকে, কাজ না থাকলে কী করবো? ঘুমোব না তো আপনাদের দাড়িতে হাত বুলোব?

ব'লে যেন মহা রসিকতা করেছে এমনি ভাবে সকলের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো।

ভূষণ সিং তেড়ে আসে আবার। বলে—ফিন্‌ দিল্লাগি?

—মেরো না ভূষণ সিং, শালা সারাদিন খাওয়া হলো না, পেট চোঁ-চোঁ করছে—ইয়ারকি আর ভাল্লাগে না—

কিন্তু তারপরে যখন চুপটি করে ঘরের ভেতরে শুয়ে থাকে, তখন কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে টের পায় না। তেলাপোকা আর ছারপোকাতে

ভর্তি ঘরখানা। ঘুম ভেঙেই দেখে পাশে যেন একটা ভাতের থালা। এক থালা ভাত যেন কে রেখে গেছে তার পাশে। বলেওনি কেউ, ডাকেওনি। টপাস্ করে উঠে পড়েছে নফর। মাছও দিয়েছে একটা।

বাইরের দিকে চেয়ে চেঁচালে—এই, কে রে ওখানে?

কে যেন যাচ্ছিল উঠোন দিয়ে। তেমন খেয়াল করলে না। খেয়াল অবশ্য কেউ-ই করে না নফরকে।

—কে যায় রে, কে ওদিকে যায়?

ভাতটা কে দিয়ে গেল তার খোঁজ নেওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু দূর হোক গে! টপ্ টপ্ করে ভাতগুলো খেয়ে নিয়ে আবার শুয়ে পড়তো নফর। তারপর ঘুম আসতো, কিন্তু পেটে ক্ষিদে থাকলে ভালো ঘুম আসে না যেন। শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যখন মনে হতো কোথাও গেলে হয়, তখনই আবার মনে হতো কোথায়ই বা যাবে। কোথাও গিয়েই বা কি হবে। ধোপার কাছে একটা গেঞ্জি দিয়েছিল, সেটা আনতে গেলে পয়সা দিতে হবে। তার চেয়ে শুয়ে থাকাই ভালো। শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেওয়াই ভালো।

আগে ক্ষিদে পেলে, রাগ হলে ওম্‌নি হৈ-চৈ করতো। এখন আর সে-সব করে না। আদ্ধেক দিন খায় না। ঘুমিয়েই কেটে যায় বেশ। বার-বাড়ির উঠোনের এক কোণে নিমগাছটার পশ্চিম দিকে ছোট্ট একটা ঘর। গুরুদেব এলে ওইখানেই থাকেন। তা তাই-ই বা ক'দিন। বছরে একবার আসেন হয়ত। যে-ক'দিন থাকেন সে ক'দিন ঘর ধোয়া-মোছা হয়। ধুপ-ধুনো দেওয়া হয় ঘরে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সব। কিন্তু তিনি চলে গেলেই আবার তেলাপোকা আর উই-পোকার রাজত্ব। এ-ঘরের দিকে কেউ আর মাড়ায় না তখন। অন্ধকারে ধোঁয়ায় কালিঝুলের মধ্যে ওইখানেই পড়ে থাকে নফর। কেউ খোঁজ নেয় না, কেউ খবর নেয় না। শিশুর-মা মাঝে মাঝে আসে। বলে—এই নফর, খাবি নে? খেতে যাস্‌নি যে আজ?

—না, খাবো না, যা।

শিশুর-মা বলে—না খাবি তো বয়ে গেল ভারি, খাবি নে তো,

পেটে খিল দিয়ে পড়ে থাক্‌, মরগে যা—আমার কী ?

—আমি মরবো, তোর কী রে ? আমি মরবো এখানে, তোর কী শুনি ?

রান্নাবাড়িতে গিয়ে শিশুর-মা বলে—এলো না বাবু, এলো না তোমার নফর !

বামুনদি বলে—হ্যাঁ রে, তা বলে ছেলেটা না খেয়ে থাকবে ? আর একবার ডাক না গিয়ে !

—আমি বাপু ডাকতে পারবো নি, তোমার খুশী হয় নিজে ডাকো গিয়ে—

এক-একদিন খবরটা মা-মণির কাছেও যায়। বলে—হ্যাঁরে সিন্ধু, রান্নাবাড়িতে এত গোলমাল কিসের রে ?

সিন্ধু বলে—ওই নফর, নফর আবার হৈ-চৈ বাধিয়েছে—

পুজোর সময় সকলের কাপড়-জামা হয়। কাপড়-জামা শুধু কর্তা-গিন্নীদেরই নয়, সকলেরই হয়। বাড়ির কুকুর-বেড়ালটারও হয়। ও জগত্তারণবাবু, দুর্লভবাবু, দুলালহরিবাবুরও হয়। শুধু তাই নয়, জগত্তারণ বাবু, দুর্লভবাবু, দুলালহরিবাবুর ছেলে-মেয়েদেরও হয় সেই সঙ্গে সঙ্গে। জামা-জুতো-কাপড়, মোজা-গেঞ্জি সব। এ রেওয়াজ চলে আসছে সংসার সেনের আমল থেকে।

কিন্তু হঠাৎ নফরের যেন খেয়াল হয়েছে।

ছাখে ন'বৎ বসে গেছে দেউড়িতে। হরি-জমাদার লাল গেঞ্জি পরেছে। ভূষণ সিং কাপড় হলুদ দিয়ে ছুপিয়েছে। কী হলো ? পুজো এসে গেছে নাকি ?

খাজাঞ্চিখানায় গিয়ে বললে—খাজাঞ্চিবাবু, পুজো এসে গেল, আমার কাপড়-জামা কই ?

কালিদাসবাবু খাতা থেকে মুখ তুলে বললেন—তোর কাপড় ! কোথায় ছিলি তুই ?

—ও-সব শুনছিনে, আমার কাপড় দিন, গেঞ্জি, পাঞ্জাবি, জুতো মোজা—সব দিতে হবে।

—ওরে বাব্বা, এ যে চোখ রাঙায় আবার, দেব না, না দিলে কী করবি তুই শুনি ?

—দেবেন না মানে ? আলবাৎ দিতে হবে, নইলে বড়বাবুকে বলে চাকরি খতম করে দেব সক্কলের।

ব'লে লম্ফ-ঝম্ফ করতে লাগলো নফর।

মুহুরিবাবু দেখে শুনে এগিয়ে এল। বললে—কী বলছিস নফর তুই ? বলছিস কী ?

—আজ্ঞে, যা বলছি ঠিক বলছি, সক্কলের পুজোর কাপড় হয়, আমার হয় না কেন শুনতে চাই।

কালিদাসবাবু বললেন—হবে না তোর কাপড়, কী করবি তুই করগে—

—কেন হবে না শুনি ? আমি কি এ-বাড়ির কেউ নই ?

কোথায় যে এত জোর পায় নফর কে জানে। কিসের যে এত জোর তাও জানে না কেউ। এ-বাড়ির কেউ নয় সে, কোনও সূত্রে এ-বাড়ির সঙ্গে সে কোনওভাবে যুক্ত নয়। চাকর-ঝিদের মতো তার মাইনেও নেই, আবার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেও কেউ নয় সে। এ-বাড়ির কেউ জানে না, কী সূত্রে সে আছে এখানে, কিসের টানে, কাদের জোরে। তবু তার সব জিনিসে ভাগ চাই আর-সকলের সঙ্গে। ভাত খাবার সময় আর-সকলের মতো মাছ চাই, পুজোর সময় কাপড়-জামাও চাই আর-সকলের মতো।

মুহুরিবাবু বললে– কোথায় ছিলি তুই ? তোর তো দেখাই পাওয়া যায় না।

—খাতায় যখন নাম আছে আমার তখন চুরি করেছ তোমরা, নির্ঘাৎ চুরি করেছ।

—তবে রে, চোর বলা ?

ব'লে মুহুরিবাবু ঘুষি পাকিয়ে এগিয়ে যেতেই নফরও মুহুরিবাবুর ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে।

—শালারা চোর সব, আমার কাপড়-জামা চুরি করে আবার

আমারই ওপর তম্বি, বড়বাবুকে বলে সকলের চাকরি খেয়ে দেব না ? আমাকে দেবে না শালারা···

ঠিক সময়ে কালিদাসবাবু দেখতে পেয়েছেন তাই, নইলে মুহুরি-বাবুকে খেয়ে ফেলতো বোধহয় নফর।

কালিদাসবাবু চীৎকার করে উঠলেন—ভূষণ সিং—ভূষণ সিং—

ভূষণ সিং দৌড়ে এসেই নফরকে ধরে ফেলেছে।

নফর বললে—ছাড়ো আমাকে দরোয়ান, ছাড়ো মাইরি, ছাড়ো বলছি, আমি যাচ্ছি বড়বাবুর কাছে ! দেখাচ্ছি মজা—

ভূষণ সিং ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে নফরকে, নফর কিন্তু তাতেও দমলো না। গায়ের ধুলো ঝেড়ে নিয়ে দৌড়লো। সেই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে তর্ তর্ করে গিয়ে উঠলো একেবারে বড়বাবুর বার-বাড়ির ঘরে। বেশির ভাগ দিন ওখানেই থাকেন বড়বাবু। জগত্তারণবাবু বেশী রাতে গেলে বড়বাবু আর ভেতরে যেতে পারেন না। জগত্তারণবাবু যখন বড়বাবুর মাস্টারি করতেন, তখন থেকেই বড়বাবু ওই ঘরেই থাকেন।

নফর গিয়ে ডাকলো—বড়বাবু, বড়বাবু—আমি নফর—

এমন সময় অবশ্য ঘুম ভাঙে না। বড়বাবুর ঘুম ভাঙতে বড্ড দেরি হয়। খাস-বরদার পাঁচু বেলা দশটা থেকেই দাঁড়িয়ে থাকে বিছানার দিকে চেয়ে। ঘুম ভাঙলেই সিগারেটের টিনটা কিম্বা বোতলটা এগিয়ে দিতে হবে। কখনও-কখনও বড়বাবুর তেষ্টা পায়। খাস-বরদার তা-ও সব রেডি করে রাখে। আগের দিন অনেকক্ষণ জগত্তারণবাবু গল্প করে গেছেন। বহুদিন আগে কর্তাবাবুর আমলে সেই যে জগত্তারণবাবু একদিন মাস্টার হয়ে এলেন, তারপর লেখাপড়া বেশিদূর হলো না, জগত্তারণবাবু অ্যাটর্নী হলেন, কর্তাবাবুও একদিন মারা গেলেন, বড়-বাবুর বিয়ে হলো।

কর্তবাবু গাড়িতে যেতে যেতে মাঝে-মধ্যে কখনও কখনও জিজ্ঞেস করতেন—খোকার কেমন লেখাপড়া হচ্ছে জগত্তারণবাবু ?

জগত্তারণবাবু বলতেন—আজ্ঞে, বড়বাবুর ব্রেন্‌টা ভালো, আমার চেয়েও ভালো ব্রেন্, কিন্তু একটা দোষ, খাটতে চাইবে না মোটে—

কর্তাবাবু বলতেন—ও আমার স্বভাব পেয়েছে—

কাশীধামে যাবার আগে জগত্তারণবাবুর কোনও কাজ ছিল না। কর্তাবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতেন। কিন্তু ভিক্ষে করে সংসার চলে না। তারপর কাশী থেকে এসে যেবার দত্তক নিলেন, তার কয়েকবছর পরেই ছেলের লেখাপড়ার ভারটা দিলেন জগত্তারণবাবুর ওপর। পোষ্যপুত্র, বেশী বকা-ঝকা চলে না। সেই থেকেই জগত্তারণবাবু এসে পড়াবার সময় গল্প ফাঁদতেন।

—জানো বড়বাবু, আজকে এক মক্কেল কাৎ হলো।

ছোটবেলা থেকে বড়বাবুকে মক্কেল কাৎ হবার গল্প শুনিয়ে এসেছেন জগত্তারণবাবু। বড়বাবুর ধারণা হয়েছে মক্কেলরা কাৎ হবার জন্যেই জন্মায়। নুলো মল্লিকের ছেলে কার্তিক মল্লিকের থেকে শুরু করে কোনও মক্কেল আর কাৎ হতে বাকি রইল না কলকাতায়।

বড়বাবু বলেন—আমাদের ব্যাঁকা শীলের খবর কি গো মাস্টার?

জগত্তারণবাবু। বলেন—সে-ও এইবার কাৎ হবে বড়বাবু, আর দুটো দিন সবুর করো না, তারও পাখা উঠেছে, খবর পেইছি আমি—

—আর সেই ন্যাড়া মিত্তির, সেই যে খুব কাপ্তেনি করলে ক'দিন!

জগত্তারণবাবু বলেন—আরে, সে কবে কাৎ হয়েছে, উড়তে-না-উড়তে কাৎ হয়েছে, তোমাকে তো বলেছি সে-খবর! মনে নেই তোমার?

তারপর যাবার আগে চুপি চুপি বলেন—টেঁপির শরীরটা বড় খারাপ, খবর পাওনি তুমি?

বড়বাবু বলে—শরীর খারাপ? টেঁপির? কই, শুনিনি তো?

—বোধহয় লজ্জায় বলেনি!

—কেন, লজ্জা কিসের?

জগত্তারণবাবু বলেন—লজ্জা হবে না? কী বলো তুমি বড়বাবু, মেয়েমানুষের লজ্জা হয় বৈকি! তোমারই খাচ্ছে, তোমারই পরছে, তোমার খেয়ে-পরেই মানুষ, কথায় কথায় জ্বালাতন করতে লজ্জা হবে না! হাজার হোক মেয়েমানুষ তো?

বড়বাবু বললেন—তাহলে কী করতে হবে মাস্টার?

জগত্তারণবাবু বললেন—একবার যেতে হবে তোমায় বড়বাবু, শরীর খারাপ হোক আর যা-ই হোক, যাওয়া তোমার একবার উচিত—

বড়বাবু বললেন—স্টেটের অবস্থা তো তেমন ভালো নয় এখন—

—একবার শুধু যাবে আর আসবে ; স্টেটের ভালো-মন্দের সঙ্গে তার কী ? তুমি তো থাকছো না সেখানে—! আর অনেকদিন তো ও-সব হয়-টয়নি, শেষে কি শুক্রাচার্য হয়ে যাবে নাকি ?

বড়বাবু বললেন—তা হলে নফরকে ডাকতে হবে—

—হ্যাঁ, নফরকে দিয়ে আমার আপিসে খবর দিয়ো, আমি তৈরি হয়ে থাকবো'খন।

এরকম মাঝে মাঝে ঠিক নিয়ম করে টেঁপির শরীর খারাপ হয়। স্টেটের অবস্থা খারাপ বলে বড়বাবু একবার আপত্তিও করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরের দিন জগত্তারণবাবুর কথায় ভোরবেলাই নফরের ডাক পড়ে। কিন্তু যাবার সময় জগত্তারণবাবুর ভেতর-বাড়িতে গিয়ে মা-জননীর পায়ের ধুলোও নেন।

বলেন—কই, মা-জননী কোথায়, পায়ের ধুলো একটু নিতাম যে—

সেই ওপরে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকবেন মা-মণি। বাইরে ঘোমটা দিয়ে সিন্ধুই বকল্‌মায় কথা বলবে। খোকার কথা হবে।

সিন্ধু বলবে—আমার এক ছেলে, আপনিই এককালে ওর মাস্টার ছিলেন, আপনিই ভরসা আমার—

জগত্তারণবাবু বলবেন—গীতাখানা তো আজও পড়ালাম, চতুর্দশ অধ্যায়টা শেষ করে দিলাম, ও-সব বদ চিন্তা-টিন্তা যাতে না-আসে আর কি। তবে একটু সময় লাগবে, অনেক দিনের অভ্যেস তো।—আপনি কেমন আছেন মা-জননী ?

সিন্ধু বলবে—আমার আর থাকা—

জগত্তারণবাবু বলবেন—আপনারা পুণ্যাত্মা লোক, আপনারা সুস্থ থাকলে পৃথিবীটা তবু একটু সুস্থ থাকে, নইলে পাপ যে-রকম বাড়ছে—

তারপর সেই রুপোর বাটি থেকে পায়ের ধুলো নিয়ে জিভে চেটে মাথায় ঠেকাবেন। এমনি প্রায়ই। এমনি বহুদিন থেকেই চলছে।

খাস-বরদার পাঁচু এসব জানে। ঘুম ভাঙবার সময় তাই পাঁচু সিগারেটে টিন, দেশলাই, যাবতীয় জিনিস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কখন বড়বাবু উঠবে তার আশায়।

হঠাৎ বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ পেয়েই পাঁচু গিয়ে ঘোরানো সিঁড়ির দরজা খোলে—কে রে?

—বড়বাবু কোথায়? আমি নফর।

পাঁচু বলে—নফর তা এখন কী? বড়বাবু তো তোকে ডাকেনি!

নফর বললে—বড়বাবু ডাকেনি তো কী হয়েছে, আমার কাজ আছে বড়বাবুর কাছে।

—কী কাজ?

নফর বললে—ছ্যাখ্‌তো পাঁচু, এই ছ্যাখ্‌, আমাকে মেরে একেবারে তক্তা বানিয়ে দিয়েছে, রক্ত বেরোচ্ছে দেখছিস্‌? পুজোর কাপড় সব্বাই পেলে, বাড়ির ঝি-চাকর দাসী-বাঁদী কেউ বাদ গেল না, ওই বেটা হারামজাদা মুহুরিবাবু আমার কাপড়টা মেরে···

—কে রে? কে ওখানে?

গম্ভীর গলার আওয়াজ শোনা গেল ভেতর থেকে। পাঁচু লাফিয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকলো।

—কে চেঁচাচ্ছে রে ষাঁড়ের মতো? সক্কালবেলা দিলে ঘুমটা ভাঙিয়ে।

—আজ্ঞে, ও নফর।

—জুতো মেরে বের করে দে ওকে, বেটা ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে—

কালিদাসবাবু বলেন—কোথায় গেল রে নফরটা?

মুহুরিবাবু বলে—বড়বাবুর কাছে গেছলো, দিয়েছে বেটাকে টিট্‌ করে তাড়িয়ে, এখন জব্দ—

সত্যিই জব্দ হয়ে যায় নফর। আবার এসে আস্তে আস্তে ঢোকে নিজের ঘরটাতে! পাশেই গুরুদেবের খালি তক্তাপোশটা। তার তলায় নফরের বিছানাটা গোটানো থাকে। আবার সেইটে খুলে শুয়ে পড়ে! দূর হোক্‌ গে। না দিক কাপড়, না দিক জামা, না দিক মাছ—

ঘুমিয়ে পড়লে আর কিছু মনে থাকবার কথা নয়। এ-বাড়ির যেখানে যা-কিছু হোক, তাতে কিছু এসে যায় না নফরের, নফর ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই এই এতগুলো বছর যদি কাটিয়ে দিয়ে থাকে তো আরও ক'টা বছর কাটিয়ে দিতে পারবে—

আজ কিন্তু খাস-বরদার পাঁচুই দৌড়ে এসেছে। রোজকার মতো ঘুমিয়েই ছিল নফর।

—নফরবাবু, নফরবাবু!

নফর তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে। বললে—কি রে পাঁচু? বড়বাবু ডেকেছে নাকি?

—ডেকেছে।

—কী বললে?

—বড়বাবু ঘুম থেকে উঠতেই সিগারেটের টিনটা এগিয়ে নিয়ে সামনে ধরেছি, বড়বাবু আড়মোড়া ভাঙতে-ভাঙতে বললেন—হ্যাঁ রে, নফর কোথায়, নফরকে যে আর দেখতে পাইনে, নফর কি মরে গেছে নাকি!

এর বেশি আর বলতে হয় না। এর বেশি আর বলার দরকার হয় না।

কথাটা শুনে নফরের এক গাল হাসি বেরোল।

বললে—জয় মা কালী—ব'লে বিছানাটা গুটিয়ে রেখে নফর এক দৌড়ে খাজাঞ্চিখানায় গেল। কালিদাসবাবু তখন খাতা দেখছেন। মুহুরিবাবু হিসেবের খাতার মধ্যে ডুবে আছেন।

নফর সোজা গিয়ে বললে—এই যে খাজাঞ্চিবাবু, পাঁচটা টাকা ছাড়ুন তো, পাঁচটা টাকা—

কালিদাসবাবু ক্ষেপে গেলেন—আবার এসেছিস? সেদিন বড়বাবুর কাছে জুতো খেয়েও তোর জ্ঞান হলো না রে?

মুহুরিবাবু বললে—বেরো এখান থেকে,—বেরো বলছি হারামজাদা!

নফর বললে—বাজে কথা বোলো না বেশি, পাঁচটা টাকা ছাড়ুন, বড়বাবু ডেকেছে—সময় নেই আমার—

বড়বাবুর নাম শোনার পরই কালিদাসবাবুর মুখের চেহারাটা যেন বদলে গেল।

বললেন—বড়বাবু ডেকেছেন ?

তারপর একটু ভেবে বললেন—মাসের শেষে এই অসময়ে তোমায় ডাকলে ?

নফর বলে—দিন দিন, টাকা দিন মশাই, সময় নেই আমার, বড়বাবু আবার ক্ষেপে যাবে—

শুধু কালিদাসবাবুই নয়। সমস্ত বাড়িখানার চেহারাই যেন তারপর একেবারে বদলে যাবে। সারা বাড়িতে খবর রটে যাবে যে বড়বাবু নফরকে স্মরণ করেছেন। তারপর সেই টাকা নিয়ে নফর ধোপার বাড়ি যাবে। সেখান থেকে কাচা জামা-কাপড় এনে চুল ছাঁটবে। দাড়ি কামাবে। তখন আর চেনা যাবে না নফরকে। তখন আর নফর নয়, নফরবাবু। ভেতর-বাড়িতে মা-মণি পেস্তা-বাদাম বাটতে বলবে। পেস্তা-বাদাম বাটা হবে সকাল থেকে। মাছের মুড়ো আসবে। বাজার থেকে সেদিন নতুন করে বাজার আসবে। বৌ-মণি সেদিন নতুন করে স্নান করবে আবার। সাজবে গুজবে। বড়বাবুর দাড়ি কামাতে এসে অধর নাপিত সেদিন মোটা বকশিশ পাবে।

সিন্ধু যদি জিজ্ঞেস করে—আজকে আবার পেস্তা-বাদাম বাটছে কেন মা-মণি ?

মা-মণি বলবেন—আজ যে খোকা নফরকে ডেকেছে—

রান্নাবাড়িতে সেদিন হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে যাবে। হুলুস্থুল এমনিতেই সেখানে বেধে থাকে সব সময়। ভাত চড়াতে চড়াতে ডাল পুড়ে যায়, ডাল সাঁতলাতে গিয়ে ভাত গলে যায়। কিন্তু সেদিন আর ফুরসুৎ থাকবে না বামুনদির।

বলে—বাটনা কী হলো শিশুর-মা ?

শিশুর-মা'র সেদিন সদর-অন্দর করতে-করতে পা দুটো টনটন করে ওঠে। তারপর বড়বাবুর ফরমাশ আর হুকুমের ঠ্যালায় সারা বাড়ি চরকির মতো ঘুরতে থাকে। নফরের কী দাপট তখন ! ভূষণ সিং যে ভূষণ সিং সে-ও যেন কেমন সমীহ করে কথা বলবে নফরের সঙ্গে। নফরকে আর চেনাও যায় না তখন। চুল ছেঁটে ফরসা জামা-কাপড়

পরে নফর রান্নাবাড়িতে গিয়ে ভাত চাইবে। সেদিন আর মাছ নিয়ে ঝগড়া বাধবে না শিশুর-মা'র সঙ্গে।

শিশুর-মা'র যে অত তেজ, সেই শিশুর-মা-ই বার বার জিজ্ঞেস করবে—আর ছুটো ভাত দেব নাকি নফরবাবু!

—না না।

বলতে গেলে নফর সেদিন কিছুই খাবে না। ভাত খেয়ে পেট ভরিয়ে রাত্তিরের ক্ষিদেটা নষ্ট করবে না নফর।

নফর বলবে—এত মাছ দিলে কেন আজ আবার? আজ তো ও-বেলা মাংস খাবো।

এ-বাড়ির ইতিহাসে এরকম ঘটনা নতুনও নয়, আবার নিত্য-নৈমিত্তিক নয়। মাসের আর ক'টা দিন নফরের খোঁজ রাখবার প্রয়োজন মনে করে না কেউ, কিন্তু সেদিন নফরই সব। নফরই বড়বাবুর ডান হাত সেদিন। কথায় কথায় নানা কারণে বড়বাবু নফরকে ডাকবেন। খাস-বরদার পাঁচুকে সামনে পেয়েই ধমকাবেন।

বলবেন—নফর কোথায়? নফরকে ডাকতে বলেছিলুম না তোকে?

—হুজুর, ডেকেছিলুম তো, আপনি তো মাস্টারবাবুর কাছে পাঠালেন।

—পাঠালুম তো সারাদিনের মতো পাঠালুম? এলো কিনা দেখবি তো?

আবার দৌড়তে হয় বার-বাড়িতে। নফর এলো কিনা খোঁজ নিতে হয়। নফরের ঘরখানায় কেউ তখন নেই। বিছানাটা গুরুদেবের তক্তপোশের তলায় গুটোনো পড়ে আছে। কেউ নেই সেখানে। গুলমোহর আলি সেদিন আবার পোশাক পরে তৈরি হয়ে নেবে। আবদুল আবার অনেকদিন পরে গাড়ি জোড়ে। ঘোড়াটা আবার গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে পা ঠোকে। গুলমোহর আলি তখনও গাড়ির মাথায় ছিপটি নিয়ে বসে আছে। বড়বাবু এসে উঠলেই হাঁকিয়ে দেবে।

কিন্তু তখনও নফরের দেখা নেই।

খাস-বরদার পাঁচু একবার খাজাঞ্চিখানায় গিয়ে উঁকি মারে।

—কী রে? কাকে খুঁজছিস?

—নফরকে দেখেছেন হুজুর?

মুহুরিবাবু বলে—নফর তো পাঁচটা টাকা নিয়ে দৌড়ল ধোপার বাড়ি। তারপর তো দেখলাম বাবু সেজে ফিটফাট হয়ে বেরিয়ে গেল—

তারপর দরোয়ানদের ঘরে।

—ভূষণ সিং, নফর-বাবুকো দেখা?

রান্নাবাড়িতে গিয়েও খোঁজ নেয় পাঁচু।

—হ্যাঁ গো শশীর মা, নফর খেয়েছে আজ? বামুনদিকে জিজ্ঞেস করো তো?

নফর আজকে কাজে ফাঁকি দেবে না। আজকেই তার আসল কাজ। অ্যাটর্নীবাবুকে কম্বলিটোলা থেকে একেবারে নিয়ে এসেছে। জগত্তারণবাবু এসে গেলেন ঠিক সময়েই।

মা-মণির ঘরের সামনে গিয়ে বড়বাবু ডাকলেন—মা!

বড়বাবুর আঙুলে অনেকগুলো আঙটি ঝকঝক করে উঠলো। কোঁচানো ধুতির কোঁচাটা লুটোচ্ছিল! খাস-বরদার এসে তুলে ধরলে উঁচু করে। বড়বাবু হাতের ছড়িটায় ভর দিয়ে দাঁড়ালেন মা-মণির ঘরের সামনে।

সিন্ধুকে ডেকে খাস-বরদার বললে—ওরে মা-মণিকে ডেকে দে তো একবার—

মা-মণি বেরিয়ে আসতেই বড়বাবু পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

—মা, আসি তা হলে?

মা-মণি বললেন—আবার যাচ্ছো খোকা? এই সেদিন অসুখ থেকে উঠলে, এখনও শরীরটা সারেনি যে তোমার—

বড়বাবু বললেন—এই যাবো আর আসবো মা—

মা-মণি সিন্ধুকে জিজ্ঞেস করলেন—হ্যাঁরে, পেস্তার শরবতটা দিয়েছিলি খোকাকে?

বড়বাবু বললেন—খেয়েছি মা, সব খেয়েছি—

—শরবতে মিষ্টি হয়েছিল ?

এর পর বৌ-মণি। ঘোমটা দিয়ে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল দরজার আড়ালে। বড়বাবু ঘরে আসতেই বৌ-মণি বললে—এই শরীর খারাপ নিয়ে নাই-বা গেলে।

বড়বাবু বললেন—এই যাবো আর আসবো—

—এবার যেন আর তিন-চারদিন থেকো না, তোমার শরীরের অবস্থা তো ভালো নয় !

এর পর মা-মণি জগত্তারণবাবুকে ডেকে পাঠাবেন।

জগত্তারণবাবু সিঁড়ির নিচেয় এসে দাঁড়ালেই ওপর থেকে মা-মণির বকল্‌মায় সিন্ধু বলবে—দেখুন, আপনি রইলেন সঙ্গে, দেখবেন খোকা যেন অত্যাচার না করে বেশি—

জগত্তারণবাবু যথারীতি বলবেন—সে কি কথা, আমি থাকতে বড়বাবুর কিছু অত্যাচার হবে না, নেহাত বড়বাবু আবদার ধরেছে তাই—নইলে···

তারপর খাজাঞ্চিবাবুর কাছ থেকে টাকাকড়ি নিয়েবড়বাবু গাড়িতে উঠবেন। তারপর উঠবেন জগত্তারণবাবু, তারপর উঠবে নফর। গাড়ি ছেড়ে দেবে গুলমোহর আলি। আর ভূষণ সিং ঘড়বড় শব্দ করে গেট খুলে দেবে।

এমনি করেই প্রত্যেক মাসে একবার করে বড়বাবুর শরীর খারাপ হয়। প্রত্যেক মাসে একবার করে ভোরবেলা নফরের ডাক পড়ে। এমনি করেই প্রত্যেক মাসে একবার খাজাঞ্চিখানা থেকে কয়েক হাজার টাকা বেরিয়ে যায় নিঃশব্দে। তারপর তিন রাত্রি কাটবার পর আবার যখন ফিরে আসেন বড়বাবু—তখন পকেটের টাকা সব খরচ হয়ে গেছে। দেনাও হয়ে গেছে প্রচুর।

বড়বাবু এসেই সাষ্টাঙ্গে মা-মণির সামনে পড়ে যান।

বলেন - মা, তোমার অধম সন্তানকে ক্ষমা করো মা—

মা-মণি বলেন—ওঠো ওঠো বাবা, এ ক'দিনে কী চেহারা হয়েছে—

—না, উঠবো না, তুমি আগে বলো অধম সন্তানকে ক্ষমা করেছ—

মা-মণি এক ধমক দেন খাস-বরদার পাঁচুকে। বলেন—হাঁ করে দেখছিস কী, ধরে তোল্, ধরে তুলে নিয়ে যা ঘরে—

প্রত্যেকবারই জাগত্তারণবাবু আসেন। বলেন—মা, আসতে কি চায় বড়বাবু, কী যে আটা, অনেক বলে-কয়ে তবে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি—

আবার নফরের সেই দশা। আবার নফর গিয়ে ঢোকে তার কোটরে। সেই তক্তপোশটার তলা থেকে আবার গুটোনো বিছানাটা টেনে নিয়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। আবার কোথায় তলিয়ে যায় নফর। কেউ খবর রাখে না তার।

কিন্তু এবাব এক কাণ্ড ঘটলো।

বিকেল নাগাদ বড়বাবুর গাড়ি বেরিয়ে গেল। তারপরই সব ভোঁ-ভোঁ! কারো আর কোনও কাজে মন দেবার কথা নয়। সব এলিয়ে পড়ে। অন্দরে বাইরে যেন একটা আল্‌সে-আল্‌সে ভাব। হরি-জমাদার থেকে শুরু করে ফুলমণি, সিন্ধু, খাজাঞ্চিবাবু, মুহুরিবাবু, শিশুর-মা সবাই যেন একটু ঢিলে দেয়। আর কী, বড়বাবু তো বাড়ি নেই! নফরকে নিয়ে যখন বেরিয়েছেন বড়বাবু তখন তিন-চারদিনের ধাক্কা তো বটেই।

কিন্তু এবার এক কাণ্ড ঘটে গেল।

কাণ্ডটা ঘটলো বড় হঠাৎ।

রাত্রিবেলা বলা-কওয়া-নেই হঠাৎ গুরুপুত্র এসে হাজির। কাশীর গিরিগঙ্গাধর বাচস্পতির ছেলে মা-মণির গুরুপুত্তুর। ভূষণ গেটের পাশেই শুয়েছিল।

বললে—কৌন হ্যায়?

—আমি, আমি রে, দরজা খোল্!

গলা শুনেই ভূষণ সিং ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করে।

—হুজুর, বড়বাবু নেই, বড়বাবু বাহার গিয়া।

দরজা খুলে গেল। ভূষণ সিং খবর দিলে ভেতরে। পয়মন্ত খেয়ে-

দেয়ে শোবার বন্দোবস্ত করছিল। সে গিয়ে খবর দিলে সিন্ধুমণিকে। সিন্ধুই ডেকে দিলে মা-মণিকে। মা-মণি তখনও শোননি। বললেন— রান্নাবাড়িতে খবর দে, ঠাকুরমশাই এসেছেন—

ঠাকুরমশাই এমনিতে খবর না দিয়ে আসেন না। মা-মণি উঠে থানটা বদলে নিলেন। সিন্দুক থেকে পঞ্চাশটা টাকা বার করলেন। প্রণাম করে দক্ষিণা দিতে হবে। সিঁড়িতে আলো নিভে গিয়েছিল। আবার চারদিকে আলো জ্বলে উঠলো। মা-মণি সিন্ধুকে বললেন— ঠাকুরমশাইকে সঙ্গে করে নিয়ে আয় ওপরে।

জলচৌকি পাতা ছিল। তার ওপর রেশমের আসন। আসনের ওপর পদ্মাসন করে বসলেন গুরুপুত্র। মা-মণি প্রণাম করলেন গলবস্ত্র হয়ে। তারপর পায়ের কাছে দক্ষিণাটা রাখলেন। গুরুপুত্র বললেন— বড় বিব্রত হয়ে পড়েছি আমি—তাই অত দূর থেকে ছুটে এলাম আপনার কাছে—

—কী নিবেদন বলুন!

ঠাকুরমশাই বললেন—আমার বাবা দেহত্যাগ করেছেন সম্প্রতি—

মা-মণি স্তম্ভিত হলেন। বললেন—কবে? আমি তো খবর পাইনি।

—বড় শীঘ্র ঘটে গেল, তাই আর সংবাদ দিতে পারিনি আপনাকে। কিন্তু আমি নিজেই যখন আসবো তখন পত্রে সংবাদ দেবার দরকার মনে করিনি—

মা-মণি বললেন—এই বিপদের সময় আপনি নিজে কষ্ট করে কেন এলেন?

—সেই বলতেই এসেছি। আপনার মনে আছে, কর্তাবাবু কাশী গিয়েছিলেন আপনাকে নিয়ে, আপনার দারুণ অসুখ হয়েছিল সেখানে —প্রায় একবছর শয্যাশায়ী হয়েছিলেন আপনি?

সে অনেকদিন আগের কথা। ওই মঙ্গলাও গিয়েছিল। তখন সিন্ধুমণি ছিল না। কুঞ্জবালা গিয়েছিল সঙ্গে। দশাশ্বমেধ ঘাটের ওপর বাড়ি কেনা হয়েছিল। সাজানো হয়েছিল বাড়ি। সারাদিন গঙ্গার হাওয়া সেবন। আর সকাল-সন্ধ্যায় বিশ্বনাথ দর্শন। কিন্তু হঠাৎ

মা-মণি অসুখে পড়লেন। অসুখ মানে সে এক ভীষণ অসুখ। কর্তাবাবু মুশকিলে পড়লেন। বিদেশে কোথায় ডাক্তার, কোথায় কবিরাজ কিছুই জানা নেই। গুরুদেব কাশীবাসী। তিনিই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। কলকাতায় টেলিগ্রাম চলে গেল। খাজাঞ্চিবাবু টাকা নিয়ে নিজে চলে গেলেন।

সে একদিন গেছে বটে!

গুরুপুত্র বললেন—বাবার কাছে শুনেছি, আপনার তখন জ্ঞান ছিল না—

—আমি যে বেঁচে উঠেছিলাম, সে তো কেবল গুরুদেবেরই আশীর্বাদে—

গুরুপুত্র বললেন—মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে আমার বাবা সমস্ত ঘটনা আমায় বলে গেছেন, আপনি যে জীবন ফিরে পেয়েছেন সে বাবার আশীর্বাদে নয় মা, রাহু আপনার মারক গ্রহ, নেহাত বৃহস্পতির প্রভাবে সেদিন আপনার প্রাণহানি হয়নি, কিন্তু কেতু-মঙ্গলের প্রভাবে আপনার চরম ক্ষতি চরম সর্বনাশ ঘটে গেছে—। সেই কারণেই বাবা সেই সময়ে আপনাদের বিশ্বনাথের চরণে নিয়ে যেতে অত পীড়াপীড়ি করেছিলেন—

—সে তো আমি জানি।

—না, সব আপনি জানেন না, কর্তাবাবু সব আপনাকে জানান্‌নি, জানিয়েছিলেন বাবাকে, সেই কথা বলতেই আমি এসেছি আজ। কর্তাবাবু বলেছিলেন তাঁর মৃত্যুর বিশ বছর পরে আপনাকে জানাতে, আজ বিশ বছর পূর্ণ হয়েছে—

ঠাকুরমশাই সিন্ধুমণির দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—আগে আপনার দাসীকে চলে যেতে বলুন এখান থেকে—

রাত তখন এগারোটাও হতে পারে, বারোটাও হতে পারে। অন্যদিন এ-সময়ে সব চুপচাপ হয়ে যায়।

সিন্ধুমণি কথাটা শুনেই আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। মা-মণি না ঘুমোলে সিন্ধুও ঘুমোতে যেতে পারে না। সিঁড়ির পাশে খাঁচার টিয়াপাখীটা একবার পাখা-ঝাপ্‌টে উঠলো। বেচারীর চোখে আলো লেগে ঘুম

আসছে না। ভেতরে অনেকক্ষণ ধরে কী যেন কথা হতে লাগলো। সমস্ত বাড়ি নিঝুম। বড়বাবুও নেই। থাকলে একটু রাত হয়। তা সে খাস-বরদারের কাজ। ভেতর-বাড়িতে তা নিয়ে কেউ জেগে থাকে না।

শিশুর-মা দাওয়ার ওপরেই ঘুমোচ্ছিল। অঘোরে। রাত বোধহয় তখন অনেক হয়েছে। রান্নাবাড়ির চারটে উনুনই নিভে গিয়েছিল। একটায় তখন আগুন দেওয়া হয়েছে আবার নতুন করে।

—ও শিশুর-মা, শিশুর-মা!

সারাদিন খেটেখুটে মরণ-ঘুম ঘুমিয়েছে শিশুর-মা। কোনও সাড়া-শব্দ নেই। মেঝেতে আঁচলটা পেতে সেই যে পড়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে মড়ার মতো কাৎ হয়ে গেছে। উনুন-টুনুন সবই তো নিভে গিয়েছিল। গুরুপুত্রের আসার খবর পেয়ে আবার উনুনে কয়লা দিতে হয়েছে। শিশুর-মা আঁচ দিয়ে ডাকতে গিয়েছিল দু-দু'বার। ঠাকুরমশাই-এর জন্যে চাল হাঁড়িতে চড়িয়ে দিতে হবে, তারপর তিনি নিজে নাবিয়ে নেবেন। শিশুর-মা ফিরে এসে বললে—একটু দেরি হবে বামুনদি—

—ওরে, আর একবার যা না শিশুর-মা!

আবার গেছে। আবার সেই একই উত্তর। সিঁড়ির বাইরে বসে বসে সিন্ধু ঢুলছে। ভেতরে মা-মণির সঙ্গে কথা বলছেন তাঁর গুরুপুত্র।

একটা বেড়াল বুঝি এঁটো-কাঁটার লোভে টিপি-টিপি পায়ে রান্না-বাড়ির ভেতরে ঢুকছিল, মঙ্গলা তাড়িয়ে দিলে।

—বেরো, বেরো, দূর হ—

সিন্ধুমণি হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তে এল।

—বামুনদি, মা-মণি ডাকছেন তোমায়।

আমাকে! মঙ্গলা যেন কেমন আড়ষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল!

—আমাকে? কেন রে?

মঙ্গলাও অবাক হয়ে গেল। তার তো জীবনে কখনও ভেতর-বাড়িতে ডাক পড়েনি!

সেই-যে কতদিন আগে একদিন এ-বাড়িতে কাশীধামে যাবার সময় মা-মণির সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল অন্দরমহলে, সেই-ই প্রথম আর

সেই-ই শেষ। তারপরে কাশী থেকে এসে আর কখনও কারো মুখের দিকে চেয়ে দেখবার দরকার হয়নি। এই রান্নাঘরের মধ্যেই তার সূর্যোদয় হয়েছে, সূর্যাস্তও হয়েছে। বর্ষা গ্রীষ্ম শীত বসন্ত, ষড়ঋতুর সমস্ত পরিচয় নিঃশেষ হয়ে ফুরিয়ে গিয়েছে কবে তার ঠিক নেই। কারোরই ঠিক নেই, সবাই এসে ঠিক সময়ে ভাত পায়, ডাল পায়, ঝোল পায়—তারপর যথাসময়ে চলেও যায়। এর বেশি কোনদিন তার কথা কেউ জিজ্ঞেস করেনি। উত্তরও কেউ পায়নি।

আজকে এতদিন পরে তার উত্তর দেবার ডাক পড়ল বুঝি!

রান্নাবাড়ির বাইরে যেতে গিয়ে মঙ্গলার পা যেন বার বার বেধে যেতে লাগলো। অভ্যেস নেই এদিকে আসা। রাত্রে পথটা যেন আরো উঁচু-নিচু।

—আমাকে কেন ডাকছে রে সিন্ধু, জানিস্ কিছু তুই?

ভাগ্যের পথ বোধহয় এমনি কুটিল! মঙ্গলার ভাগ্য কবে কোন্ বিধাতাপুরুষ গড়েছিল কে জানে। কাশীধামে যাবার সময়ও ঠিক বুকটা দুরদুর করে কেঁপে উঠেছিল। সেদিনও রাত্রের একটা রেলে চড়ে যেতে হয়েছিল তাদের। আগের গাড়িতে মোট-লটবহরের সঙ্গে গিয়েছিল সরকার-মশাই আর মেয়েদের গাড়িতে কুঞ্জবালা আর মঙ্গলা। কুঞ্জবালা পান কিনে খেয়েছিল ইস্টিশান থেকে। মঙ্গলাকেও একটা দিতে চেয়েছিল।

—পান খাস না তুই মঙ্গলা?

মঙ্গলা বলেছিল—সোয়ামী যাবার পর আর পান খাইনে দিদি।

তার ওপর ইস্টিশানের পান! কত লোকের ছোঁয়ান্যাপা। কে কোন্ জাতের লোক কে জানে! সেই ট্রেন কাশী পৌঁছোতেই পাণ্ডার লোক এসে তুলে নিয়ে গিয়েছিল কর্তাবাবুর নতুন-কেনা বাড়িতে। কেমন ভয়-ভয় করতো মঙ্গলার! এ কোন্ দেশ, কত বড় গঙ্গা। কোথায় ছিল এক অজ পাড়াগাঁয়ের মানুষ, কেমন রেলগাড়ি চড়ে কত দূরে বাবা বিশ্বনাথের চরণে এসে এক দণ্ডে পৌঁছে গেল।

কুঞ্জবালা সেয়ানা ছিল খুব।

বলতো—লম্বা করে ঘোমটা দে মঙ্গলা, বেটা-ছেলে আসছে—

লম্বা ঘোমটাই ছিল মঙ্গলার। সেটা আরো লম্বা করে দিত। কর্তাবাবু আর মা-মণি যাবার পর সেই যে রান্নাঘরে ঢুকলো সে, আর বার হতে পারেনি সেখান থেকে। দিন-রাত রান্না করা আর দরকার না- থাকলে রান্নাঘরের সামনে বসে থাকা। কুঞ্জবালাই ছিল সব। কুঞ্জবালাই রান্নাঘরে এসে খাবার নিয়ে যেত, পরিবেশন করতো। কর্তাবাবুর যে কেমন চেহারা তা পর্যন্ত কোনওদিন দেখেনি মঙ্গলা, কানেই শুনতো কিছু কিছু। কর্তাবাবু যেতেন বেড়াতে, সঙ্গে যেতেন মা-মণি। কুঞ্জবালাও এক-একদিন সঙ্গে যেত!

কিন্তু একদিন হঠাৎ অসুখে পড়লো মা-মণি।

তারপর ডাক্তার-কবিরাজ ওষুধ-বিষুধ—কিছু আর বাকি রইল না। কলকাতার বাড়ি থেকে লোকজন গেল সব। দূর থেকে শুধু ওষুধের গন্ধ আর লোকজনের আসা-যাওয়ার শব্দ কানে আসতো। শেষকালে অসুখ বুঝি বিকারে দাঁড়ালো। তখন আজ-যায় কাল-যায় অবস্থা।

সেই সময়েই কাণ্ডটা ঘটলো।

ঠাকুরমশাই বললেন—কাণ্ডটা সেই সময়েই ঘটলো—

মা-মণি তখন দিনের পর দিন অজ্ঞান অচৈতন্য। ডাক্তার কবিরাজ আসছে—

কুঞ্জবালা একদিন এসে বললে—মা-মণি আর বাঁচবে না রে, কবিরাজ মশাই বলে গেছে—

মা-মণি মারা গেলে কী হবে! চাকরিটা চলে যাবে! রান্নাঘরের অন্ধকারে বসে কেবল সেই কথাটাই মনে হয়েছিল সেদিন। গঙ্গাও দেখা হতো না, বাবা বিশ্বনাথ দর্শনও হতো না। কেবল রান্না আর রান্না। কোথা দিয়ে দিন কাটতো রাত কাটতো বোঝা যেত না। রাত্রি-ভোর গরম জল করতে হতো কোনও কোনও দিন, গরম জলের সেঁক দিতে হতো মা-মণিকে। কুঞ্জবালা বলতো বুকে পিঠে ব্যথায় নাকি ছট্‌ফট করতো মা-মণি।

একদিন বোধহয় দুপুরবেলাই হবে।

—কে ওখানে ?

ভারি গলার আওয়াজে ভয় পেয়ে ঘোমটাটা আরো টেনে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল মঙ্গলা। দেখতে কিছুই পায়নি। কে কথাটা বললে, কার গলা তা-ও বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল ওঁরা চলে গেলেই আড়ালে চলে যাবে।

আর একজন বুঝি কাকে জিজ্ঞেস করলে—আমি তো চিনিনে, ও কে গো ?

থরথর করে কেঁপে উঠেছিল সমস্ত শরীরটা। তারপর মনে হয়েছিল যেন ভাবী দু'মণ একটা পাথর বুক থেকে আস্তে আস্তে নেমে গেল।

কুঞ্জবালা তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে এসে হাজির। বললে—হ্যাঁ লা, কী করেছিস, সর্বনাশ বাধিয়ে বসেছিস ?

—কেন ?

—কর্তাবাবুর সামনে পড়ে গিয়েছিলিস্ একেবারে ?

কর্তাবাবু ! কর্তাবাবুর গলা তবে ওই রকম। গলাটাই শুধু শুনেছে, আর কিছু চোখেও পড়েনি, কানেও যায়নি।

মনে হলো এখনি গিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে লাজ-লজ্জা সব যেন ডুবিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। এমন সর্বনাশেও মানুষ পড়ে ! কর্তাবাবুর দুপুর-বেলা ওদিকে যাওয়ার কথা তো নয়। সাধারণত খেয়ে-দেয়ে তিনি দুপুর-বেলা ঘুমোতেন একটু। সেই ঘুমের সময়টায় সমস্ত বাড়ি ঝিমঝিম করতো। গঙ্গার হাওয়া এসে মাঝে মাঝে ঝাপ্টা দিতো জানলা-দরজায়। তখন কুঞ্জবালাও কাছে থাকতো না, কেউ-ই কাছে থাকতো না। সমস্ত একতলাটা খাঁ-খাঁ করতো। একটা হিন্দুস্থানী সকালে বিকেলে বাসন-কোসন মেজে দিয়ে চলে যেত। তারপর সব অন্ধকার, সব ঝাপসা। একতলার সমস্ত আবহাওয়াটা একটা গুমোট গরমে যেন জড়োসড়ো হয়ে পড়ে থাকতো চারপাশে। ভিজে কাপড় টাঙানো থাকতো গলিটাতে। সেই ভিজে কাপড় এতটুকু নড়তো না। এতটুকু হেলতো-দুলতো না। একটা টিকটিকি সারারাত মাথার ওপর দেয়াল থেকে দেয়ালে চরে বেড়াতো, নড়ে বেড়াতো—আর মাঝে মাঝে চুপ

করে চেয়ে থাকতো নিচের দিকে। মঙ্গলার দিকে। সব কাজ শেষ করে মঙ্গলারও যেমন কোনও কাজ থাকতো না, টিকটিকিটারও বুঝি কাজ থাকতো না কিছু। দু'জনে দু'জনার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকতো। তারপর বিকেল হতো, কলে জল আসতো, রান্না চাপাতো উনুনে। কর্তাবাবু ওপরে থাকতেন। তাঁর জুতোর আওয়াজ, কাশির আওয়াজ পাওয়া যেত, তামাকের ধোঁয়ার গন্ধও নাকে এসে লাগতো। কিন্তু আর চোখে কখনও পড়েননি তিনি।

বিকেলবেলা বেলফুলওলা আসতো। এসে হাঁকতো দরজার বাইরে —বেল-ফুলওয়ালা —

হাঁক শুনে পীরজাদাই গিয়ে কর্তাবাবুর জন্যে ফুলের বরাদ্দ নিয়ে আসতো। ফুলের বরাদ্দও যেমন ছিল, রাবড়ির বরাদ্দও তেমনি ছিল। আর ছিল সিদ্ধির বরাদ্দ। সিদ্ধি-বরফওয়ালা রোজ আসতো রাত দশটার সময়। সে-ও দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে হাঁকতো—বরোফ্—

আর তারপর ছিল গান। গানের কথা বোঝা যেত না। হিন্দুস্থানী মাগীরা কি যে গান গাইত, কোথায় বসে যে গাইত, তা-ও জানতো না মঙ্গলা। সুর করে দল বেঁধে গান তাদের। সেই সকালবেলাই তাদের গান শুরু হতো। কুঞ্জবালা বলতো—আটা পিষতে পিষতে ওরা গান গায়—

আর ছিল গঙ্গার দিকে যাত্রীর ভিড়। সকালে বিকেলে পেছনের গলি দিয়ে কত লোক যে যেত! ভোরবেলাই আরম্ভ হতো। তখন রাত বেশ। রাত থাকতে-থাকতে গান গেয়ে-গেয়ে চলতো সব—অনেক লোকের পায়ের শব্দ শোনা যেত ভেতর থেকে। আর মাঝে মাঝে হাঁকতো—জয় বাবা বিশ্বনাথ—জয় বাবা বিশ্বনাথ!

একদিন কুঞ্জবালাকে জিজ্ঞেস করেছিল—এতদিন কাশীতে এলুম, একদিন বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করতে পারবো না দিদি?

কুঞ্জবালা বলেছিল—কাশী তো পালিয়ে যাচ্ছে না তোর--যাবো একদিন তোকে নিয়ে—

প্রথম প্রথম কর্তাবাবু বেশ কাটাচ্ছিলেন। রোজ রোজ নৌকোয় বেড়াজেন।

কর্তাবাবু বলেছিলেন—কাশীতে এলাম, কাশীর সানাই শুনলাম না—

সানাই-এর ব্যবস্থা হয়েছিল দু-একবার। তা সানাই কী রকম বেজেছিল তা টের পায়নি মঙ্গলা। শুধু খাবার-টাবার তৈরি করে দিতে হয়েছিল মঙ্গলাকে।

কুঞ্জবালা বলেছিল—নৌকোর ওপর সানাই বাজবে, সে আর কী শুনবি তুই?

কোথা থেকে সেদিন কত কে এল গেল তা জানা যায়নি। কর্তাবাবু আর মা-মণি। মা-মণিও গিয়েছিল। কুঞ্জবালা সারাদিন ধরে পান সেজে সেজে ডিবে ভর্তি করেছিল। সাত সের ময়দার লুচি ভেজেছিল একলা মঙ্গলা। লুচি আর আলুভাজা। সঙ্গে রাবড়ি আছে, মালাই আছে। আরো কী কী সব মিষ্টি খাবার দোকান থেকে ফরমাশ দিয়ে এনেছিল। সবাই যখন ফিরে এসেছিল তখন রাত অনেক। একলা বাড়িতে থাকতে ভয় করেছিল খুব।

শিশুর-মা তাই মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতো—তা একবছর ছিলে কাশীতে বামুনদি, আর বাবা বিশ্বনাথের চরণ-দর্শন হলো না—?

ওদিকে লাউঘণ্ট রান্না হচ্ছে একটা উনুনে, এদিকে একটাতে ডাল আর একটাতে বড়বাবুর মাছের ঝাল।

—বড়বাবু আর দুটো আলুভাজা চাইছেন বামুনদি—

চাল-কলের ম্যানেজারবাবু আজ খাবে না শিশুর-মা, পেটের অসুখ হয়েছে।

—কী গো, ভাত হয়েছে? সকাল-সকাল খাবে আজকে বৌ-মণি!

একটা তাল সামলাতে সামলাতে আরো দশটা তাল এসে ঘাড়ে চেপে বসে। একটা উনুন সামলাতে গিয়ে আর একটা উনুনের রান্না পুড়ে যায়।

শিশুর-মা'র এক-একটা ফরমাশ ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক এক রকম!

—কালকে বড্ড ঝাল হয়েছিল ডালে, আজকে লঙ্কা দিওনা বামুনদি।

ভেতর-বাড়ি থেকে আবার হঠাৎ তখুনি ফরমাশ হয়—ডালে ঝাল

ঝাল হয়নি কেন গো, বামুনদি কি লঙ্কা দিতে ভুলে গেছে ?

—ভাতে এত কাঁকর কেন থাকে গো ?

—কে তরকারি কুটেছে শুনি আজ, আলুর খোসা ছাড়ায়নি !

আজ কুড়ি বছর আগের সে-সব দিনের কথা ভাবতে যেন কেমন লাগে ! সেই নৌকোয় চড়ে বেড়াতে গেল বাবুরা। কর্তাবাবু গেলেন, মা-মণি গেলেন। সানাই-ওয়ালারা গেল। মা-মণি গাড়িতে গিয়ে নৌকোয় উঠলেন। মস্তবড় দোতলা-ঘর-ওয়ালা নৌকো। কুঞ্জবালা সঙ্গে ছিল। কুঞ্জবালার সঙ্গে পানের ডিবে ছিল। মা-মণি পান খেতে লাগলেন। নৌকো ছাড়া হলো। সেই মাঝগঙ্গায় নৌকো ভাসতে ভাসতে চললো —সানাই শুরু হয়েছে নৌকোর মাথায়। কর্তাবাবু নৌকোর মাথায় বসে তামাক খেতে খেতে সানাই শুনছেন। নৌকোও ভেসে চলেছে। একটার পর একটা রাগ বাজানো হচ্ছে। বেহাগটা একবার শুনলেন, পুরিয়া দু'বার, কিন্তু দরবারী কানাড়াটা বার বার—

কর্তাবাবু বললেন—বাজাও বাজাও—ফিন্ বাজাও—

হুজুরের ভাল লেগেছে। সঙ্গে লুচি আছে, রাবড়ি আছে, মিষ্টি খাবার আছে। সবাই খেলে, খেয়ে-দেয়ে আবার বাজনা চলতে লাগলো। মা-মণি অত বাজনা-টাজনা সুর-ফুর বোঝেন না।

বললেন—বেশ বাজাচ্ছে না রে কুঞ্জবালা—

কুঞ্জবালা বললে—খুব ভালো লাগছে মা-মণি আমার—

মা-মণি বললেন—তিনশো টাকা নগদ নিয়েছে, ভালো বাজাবে না ? কর্তাবাবু যাচাই করে নিয়েছে যে—

রাত বোধহয় তখন ন'টা। বেশ ছিল। কর্তাবাবুও বেশ খোস-মেজাজে বাজনা শুনছিলেন—হঠাৎ মেঘ করে এলো দক্ষিণ দিকে। দেখতে দেখতে মেঘ ছড়িয়ে পড়লো আকাশে। দু'ফোঁটা জল পড়লো কর্তাবাবুর গায়ে। তখন হুঁশ হলো। চমকে উঠলেন তিনি। উঠে পড়লেন। সানাইও থামলো। ছাতি-টাতি কিছু নেই। বললেন—ঘাটে ভিড়োও নৌকো—

নৌকো ঘাটের দিকে ভিড়তে লাগলো। কিন্তু তখন মুষলধারে

বৃষ্টি নেমেছে।

অসময়ের বৃষ্টি, কিন্তু তা বলে একটুতে থামলো না। একেবারে তুমুল জোরে নামলো। নৌকো তখন দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে অনেক দূরে চলে গেছে। ছাত ফুটো ছিল নৌকোর। ফুটো দিয়ে জল পড়তে লাগলো। মা-মণি ভয় পেয়ে গেলেন। নৌকো না উল্টে যায়। শেষ পর্যন্ত নৌকো অবশ্য উল্টোয়নি। কিন্তু সে-বৃষ্টি আর থামলো না সে রাতে। সমস্ত জামা-কাপড় ভিজে অবস্থায় কর্তাবাবু আর মা-মণি যখন বাড়ি এলেন তখন অনেক রাত।

সদর দরজায় কড়াকড় কড়া নড়ে উঠলো।

কর্তাবাবু বললেন—ভেতরে কে আছে রে?

সরকারবাবু বললে—মঙ্গলা—

—মঙ্গলা কে?

—হুজুর, আমাদের রান্নার কাজের লোক!

দরজাটা খুলে দিয়েই মঙ্গলা আড়ালে সরে গিয়েছিল। কুঞ্জবালা তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে হারিকেন নিয়ে এসে সামনে ধরলো।

কিন্তু মা-মণির শরীরে তখনই কাঁপন ধরেছে। সেই অত রাত্রে আবার জল গরম হয়, তেল গরম হয়। পায়ে গরম তেল সেঁক দিয়ে মা-মণি শুয়ে পড়লেন। কিন্তু পরদিন জ্বর এলো। প্রবল জ্বর। জ্বরের ঝোঁকে মা-মণি প্রলাপ বকতে শুরু করলেন।

গুরুদেব সকালবেলাই এলেন। বললেন—ডাক্তার আছে এখানে, কিন্তু কবিরাজ ডাকাই ভালো, আমি ভালো কবিরাজ পাঠিয়ে দেব—

কুড়ি বছর আগের ঘটনা। তখনও ওই দত্তক গ্রহণ হয়নি। মা-মণির সব মনে আছে। মনে আছে তিনি মাসের পর মাস শুয়ে থাকতেন সেই বিদেশে। সান্নিপাতিক ব্যাধি। নড়াচড়া নিষেধ। খালি কলকাতা থেকে লোক যায় আর আসে। কর্তাবাবু কাশী ছেড়ে নড়তে পারেন না।

গুরুপুত্র বললেন—আপনি তখন সেই রোগশয্যায়, সেই অবস্থাতেই ওই ঘটনাটা ঘটলো—

—কোন্ ঘটনা ?

গুরুপুত্র বললেন—বলছি,—এ-সব কথা বাবা মৃত্যুর আগে সব আমাকে বলে গেছেন—

নেহাত দৈব। দৈব-দুর্ঘটনা বলা যায়। প্রথম প্রথম কর্তাবাবু মা-মণির বিছানা ছেড়ে উঠতেন না। শেষে রোগ পুরোনো হলো। কিন্তু দিনের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই অচৈতন্য অবস্থায় কাটতো। ক্রমে ক্রমে কর্তাবাবু আবার নিজের বসবার ঘরে এসে বসতে শুরু করলেন। ওপর থেকে সামনের গঙ্গা দেখা যায়। সেই গঙ্গার ওপর নৌকোগুলো ভেসে যায় দক্ষিণ দিকে। মাঝে মাঝে গুণ টানতে টানতে যায় রামনগরের কোল ঘেঁষে। তারপর কলকাতার চিঠি দু'একটা পড়তে লাগলেন। এতদিন হাত দেননি কোনও কাজে। এবার কথাবার্তা বলতে লাগলেন, খাওয়া-দাওয়ায় রুচি এল। একদিন বললেন—পীরজাদা, আজকে একটু সিদ্ধি বাটতে বল ওদের—

বহুদিন ও-সব চলেনি। কলকাতা ছাড়ার পর বরাবর মা-মণিই সামলে-সামলে নিয়ে চলেছেন। এখন যেন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগলো।

একদিন বললেন—সিদ্ধিটা বড় পাতলা করে ফেলে কেন—রাবড়ি কম দিয়ে একট মসলা বেশি দিতে পারে না—

বেশি মসলাই দেওয়া হলো। মা-মণি তখনও অচৈতন্য।

বাবা বিশ্বনাথের মাথায় তখন গুণে গুণে বিল্বপত্র চড়ানো হচ্ছে। প্রথমে কম-কম। পাণ্ডাঠাকুর রোজ এসে প্রণামী নিয়ে যায়। তারপর একশো আটে উঠলো। তারপরে দু'শো ষোল। হোম চললো চব্বিশ প্রহর ধরে। বারোজন পাণ্ডাঠাকুর হোমের তদারক করতে লাগলো। ব্রাহ্মণ-ভোজন হলো তিনশো আটচল্লিশজনের।

কর্তাবাবু বললেন—এবার সিদ্ধিতে নির্ঘাৎ ভেজাল মেশাচ্ছে কেউ, সে 'তার' নেই কেন রে ?

রান্নায় ভুল ধরেন। বলেন—কালিয়াতে গরম-মসলা দেয়নি কেন রে ? কে রেঁধেছে ?

কুঞ্জবালা খাওয়ার পাশে আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। বললে—একটু

কম দিয়েছে হয়তো।

কর্তাবাবু খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লেন। বললেন—এ রান্না খাওয়া যায় না—

হাত ধুতে ধুতে বললেন—রান্না করে কে আজকাল ?

—মঙ্গলা।

কর্তাবাবুর বরাবরের অভ্যেস খাওয়ার পরে একটু শুয়ে ঘুমোনো। পান চিবুতে চিবুতে তামাক খেতে খেতে একটু ঘুমোতেন। তখন পাখা ঘুরবে মাথার ওপর। কাশীর বাড়িতে তখন ইলেকট্রিক হয়নি। পাখা হাতে নিয়ে কর্তাবাবুর খাস-বরদার পীরজাদা পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া করতো। তারপর ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে তামাক চাই। তখন কবিরাজ মশাই এলে ভেতরে আসতেন।

কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কেমন দেখলেন ?

কবিরাজ বললেন—সান্নিপাতিক ব্যাধি, একটু সময় নেবে, সমস্ত বুকটায় কফ বাসা বেঁধেছে—

একদিন দুপুরবেলা ঘুম থেকে কর্তাবাবু উঠলেন। বললেন—আগে শরবতটা দে—

তামাকও তৈরি ছিল, শরবতও তৈরি ছিল। খাস-বরদার শরবত দিলে।

শরবত খেয়ে বললেন—তুই এখন যা—

খাস-বরদার চলে গেল। খাস-বরদার এমন ছুটি কোনদিন পায় না। কিছু কাজ না থাকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কর্তাবাবু নিচে নামলেন। খাস-বরদারও পেছন পেছন এলো। আড়ালে আড়ালে পেছনে আসতে লাগলো। মাঝ-দুপুর, বাইরে খাঁ খাঁ করছে রোদ। সারা কাশী শহরটা বুঝি ঝিমোচ্ছে। গঙ্গার জলে রোদ লেগে পিছলে যাচ্ছে বার বার। কিন্তু ভেতরটা ঠাণ্ডা। মোটা মোটা দেয়াল। স্যাঁতসেঁতে। সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। ভ্যাপসা ভাব।

মা-মণিকে বেদানার রস খাইয়ে পাইয়ে পাশে কুঞ্জবালাও একটু ঝিমিয়ে পড়েছে তখন।

কলঘরের ভেতরে ঢুকে মাথাটায় বেশ ভালো করে জল দিলেন। ঠাণ্ডা হলো মাথাটা। কেন যে এরকম হলো কে জানে। ঠাণ্ডা জল চাইলে পীরজাদা এনে দিত হাতের কাছে। সিদ্ধিটায় বোধহয় বেশি মশলা দেওয়া হয়েছিল। উঠে কলতলা থেকে বেরিয়ে আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখলেন রান্নাঘরের সামনে ঠাণ্ডা মেঝের ওপর আঁচলটা বিছিয়ে কে যেন শুয়ে আছে। শুয়ে আছে তো শুয়েই থাক্। অন্যদিন হলে এমন ঘটনা দেখেও দেখতেন না। পুতুলমালার কথা মনে পড়লো। কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়লো পায়ের গোছটা। ছ'পায়ের ফরসা সুপুষ্ট গোছ। নেশাটা বোধহয় একটু মাত্রা ছাড়িয়েছিল।

অভ্যাসমতো বলে ফেললেন—কে ?

পীরজাদা সামনে এগিয়ে এল। বললে—হুজুর, ধরবো আপনাকে ?

কর্তাবাবু ধম্‌কে উঠলেন। বললেন—ও কে ?

থতমত খেয়ে পীরজাদা বললে—হুজুর, মঙ্গলা।

সেই চেঁচামেচিতেই ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গেছে মঙ্গলার। তাড়াতাড়ি কাপড়টা গুছিয়ে নিতে গিয়ে এখানকার কাপড় ওখানে সরে গেল, ওখানকার কাপড় এখানে সরে এল। সে এক লজ্জাকর ব্যাপার। কাপড় ঠিক করে উঠে রান্নাঘরের ভেতর ঢুকে দুইহাতে বুকটা চেপে ধরলো। বুকটা তখন ধড়াস ধড়াস করছে।

এসব অনেক বছর আগেকার কথা। তারপর অনেক জল গড়িয়ে গেছে। অনেক সময়ের দাগ কালের নিয়মে মুছে গেছে, আবার অনেক দাগ নতুন করেও লেগেছে সময়ের বুকে। সব মনে নেই, সব মনে ছিলও না। প্রায় একটা বছর যেন ঘূর্ণি-ঝড়ের মতো সমস্ত ওলোট-পালোট করে দিয়েছিল। গিয়েছিলেন এক মাসের জন্যে, কিন্তু হয়ে গেল এক বছর। এক বছর পরে ফিরে এলো সবাই। এসে দত্তক নেওয়া হলো। সেই দত্তক পুত্রের বিয়েও দেওয়া হলো। কিন্তু মঙ্গলা সেই যে এসেছিল কাশী থেকে আর যায়নি। কুঞ্জবালা একদিন মারা গেল। কুঞ্জবালার বুড়ি-মা-ই রাঁধতো। মেয়ে মারা যাবার পর

বুড়ী আর থাকলো না। মঙ্গলা রান্নাঘরে ঢুকলো সেই থেকে।

যে দেখলে সে-ই বললে—এ কী গো, কী চেহারা হয়েছে তোর মঙ্গলা ?

জগত্তারণবাবু বললেন—কেমন কাটালেন কর্তাবাবু।

দুলালহরিবাবু বললেন—আপনি চলে গিয়েছিলেন, একেবারে অনাথ হয়ে গিয়েছিলুম আমরা কর্তাবাবু—

কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—নুলো মল্লিক আর গণ্ডগোল বাঁধায়নি তো ?

জগত্তারণবাবু আর দুলালহরিবাবু দুজনে পালা করে পাহারা দিয়েছিল পুতুলমালার বাড়িতে। পুরুষ মাছিটি পর্যন্ত ঢুকতে পেত না।

জগত্তারণবাবু জিজ্ঞেস করলেন—খাওয়া-দাওয়ার তেমন অসুবিধে হয়নি তো সেখানে ?

দুলালহরিবাবু জিজ্ঞেস করলেন—রান্নার তো নতুন লোক নিয়ে গিয়েছিলেন —

কর্তাবাবু বললেন—হ্যাঁ—

খাস-বরদারকে জগত্তারণবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কি রে, কর্তাবাবু কী করতো রে সেখানে ? কী করে কাটাতো তোর কর্তাবাবু ?

পীরজাদা বললে—আজ্ঞে, সিদ্ধির শরবত খেতেন খুব—পেস্তা বাদাম দিয়ে তৈরি করে দিতুম—

—খুব খেতেন, না ? রোজ ক' গেলাস ?

—কোনও কোনও দিন তিন-চার গেলাসও হতো ?

—তাহলে তুইও বেটা তো খুব খেয়েছিস !

পীরজাদা জিভ কাটলো—না হুজুর, কী যে বলেন আপনারা !

জগত্তারণবাবু জিজ্ঞেস করলে—শুধুই সিদ্ধি ? আর ইয়ে টিয়ে—

খাস-বরদার বুঝতে পারলে ইঙ্গিতটা। তবু বললে—ইয়ে-টিয়ে মানে ?

দুলালহরিবাবু বললে—তুই বেটা জাঁহাবাজ আছিস ! কর্তাবাবু সেই মানুষ কিনা, একটা বছর একেবারে নিরম্বু কাটিয়েছে বলতে চাস্ ?

গিন্নি তো অসুখে পড়ে—

খাস-বরদারও তেমনি ছিল কর্তাবাবুর। কোনও কথা তার মুখ দিয়ে বার করা যেত না। ঘুষের পয়সা নিত। কিন্তু ভেতরের কথা কিছু বলতো না। একটু একটু বলতো শুধু।

একদিন মহা বিপদ। মা-মণির সেদিন শ্বাস ওঠবার অবস্থা। বাড়িময় অস্থিরতা। কর্তাবাবুর দিবানিদ্রা হলো না। তিনি ঘরেব মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। বার দুই শরবত খেলেন। তাতেও তেষ্টা গেল না। বললেন—আরো এক গেলাস বানা—

ডাক্তার চৌধুরী দেখছিলেন তখন। কবিরাজী ছেড়ে অ্যালোপ্যাথি হচ্ছে তখন। বাড়ি তখন হাসপাতাল হয়ে গেছে। ওষুধে ডাক্তারে দিনরাত সরগরম। হঠাৎ অসুখটার বাড়াবাড়িতে ডাক্তাররাও ভয় পেয়ে গেলেন। সামান্য বৃষ্টিতে ভিজে এই এত কাণ্ড হবে ভাবতে পারা যায়নি। তখন সন্ধ্যে হয়েছে। ডাক্তার চৌধুরী বললেন—এখন ভালো বুঝছি না, রোগী দুর্বল হয়ে পড়েছেন, রক্ত দিতে হবে -

—কার রক্ত?

ডাক্তার চৌধুরী বললেন—বেশ সুস্থ কোনও লোকের রক্ত চাই—

আব কে আছে? কার রক্ত হলে চলবে? সেই অল্প সময়ের মধ্যে কাকেই বা আর যোগাড় করা যায়, স্বজাতি শুধু হলেই চলবে না। কর্তাবাবু বললেন—কিন্তু আমার গুরুদেবের অনুমতি নিতে হবে এ-সম্বন্ধে—

গুরুদেব এলেন। বললেন—আমার যজমানদের মধ্যে কারো সন্ধান করতে হবে—

কর্তাবাবু বললেন—আমার স্ত্রী ধর্মশীলা, ডাক্তারবাবু, যার-তার রক্তে তাঁর রক্ত অপবিত্র হতে পারে—

গুরুদেব বললেন—আমি এখনি সব ব্যবস্থা করে আসছি—

ডাক্তার চৌধুরী বললে—কিন্তু যা কিছু সব আজ রাত্রেই করে ফেলতে হবে, রোগীর অবস্থা বিশেষ খারাপ—

গুরুদেব বাইরে বেরিয়েছেন। ঘরের বাইরে, অন্ধকারে তেলের

আলোটা টিমটিম করে জ্বলছিল মাথার ওপর। সেই আলোতে পথ দেখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতেই একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চেহারাটা অন্ধকারে অস্পষ্ট। ময়লা একটা শাড়ি পরে রান্নাঘর থেকে ভাঁড়ার ঘরে যাচ্ছিল। হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ালেন।

বললেন—কে তুমি ?

কুঞ্জবালা কাছেই গরম জল নিয়ে ওপরে যাচ্ছিল। সে বললে—ও মঙ্গলা—

গুরুদেব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর যেদিক দিয়ে এসেছিলেন সেই সিঁড়ির দিকেই উঠে গেলেন আবার। তারপর কর্তাবাবুকে গিয়ে কানে কানে বললেন—একজনকে পেয়েছি, ডাক্তার-বাবুকে একবার দেখাতে হবে --

কর্তাবাবু বললেন—কে ?

ডাক্তার চৌধুরী সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ি গেলেন ! শুধু রক্ত দেওয়া নয়। সেই রাত্রে অনেক ক্রিয়াকর্ম অনেক অনুষ্ঠান ঘটে গেল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। মা-মণি তখন বিছানায় অজ্ঞান অচৈতন্য। অনেক আর্তনাদ, অনেক আশঙ্কা, অনেক অশান্তির সমাধি ঘটে গেল সেই রাত্রেই, সেই কাশীর পুরোনো বাড়িটার চার দেয়ালের মধ্যে। কেউ জানতে পারলো না মা-মণির জীবনদানের জন্যে কার রক্তের কী সংমিশ্রণ ঘটে গেল।

মা-মণি বললেন -- তারপর ?

সমস্ত বাড়িটার মধ্যে এখন নিথর নিস্তব্ধতা। খোকাও নেই, সে গেছে বাইরে। জগত্তারণবাবু সঙ্গে গেছে, নফরও সঙ্গে আছে। সে থাকলে অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘরে আলো জ্বলে। খাস-বরদার পাঁচুও জেগে থাকে। এ-মহলে ও-মহলের কোনও শব্দ কানে আসার কথা নয়। তবু মা-মণির ঘুম আসে রাত্রে। রাত্রে শিয়রের জানলাটা খুলে দিলে খোকার ঘরটায় আলো জ্বলছে দেখা যায়। তারপর জগত্তারণবাবু এক সময়ে চলে যায়, খাস-বরদার পাঁচু দরজা বন্ধ করে

দেয়, আর তারপরে একসময়ে আলোও নিভে যায় খোকার ঘরের।

সকালবেলা বৌ-মণির ঘরের সামনে গিয়ে ডাকেন—বৌমা ?

বৌ-মণি এসে দাঁড়ায়। বলে—আমায় ডাকছিলেন মা !

—কাল খোকা ঘরে এসেছিল ?

এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে বৌ-মণির লজ্জা হয়। বলে—উনি তো আসেন নি—

মা-মণি বলেন—কিন্তু ঘরের আলো তো সকাল-সকাল নিভে গিয়েছিল ?

খাস-বরদার পাঁচুকে ডাকেন। জিজ্ঞেস করেন—কাল খোকা ঘুমোতে আসেনি কেন ভেতরে ?

পাঁচু বলে—আমি বলেছিলুম বড়বাবুকে ভেতরে আসতে।

মা-মণি বলেন—তা তুই কেন ভেতরে নিয়ে এলি না ডেকে ?

পাঁচু বললে—বড়বাবু শুয়ে পড়লেন ফরাসের ওপর, তাই মশারি খাটিয়ে দিলুম আমি ওখানেই—

মা-মণি বললেন—আজ ভেতরে ডেকে আনবি, বুঝলি ? না হলে তুই আছিস্ কী করতে ?

তারপর বৌ-মণিকে বলেন—বৌমা, তুমি একটু শক্ত হতে পারো না।

বৌ-মণি মাথা নিচু করে থাকেন। শাশুড়ীর সামনে কোনও কথা বলতে পারেন না মাথা তুলে।

বৌ-মণির সমস্ত রূপ সমস্ত গুণ যেন এ-বাড়িতে এসে দিন দিন জৌলুসহীন হয়ে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম ভেবেছিলেন রূপসী বউ, বাইরের নেশা দু'দিনেই কেটে যাবে। হোক বংশের নেশা। তবু তো খোকার সঙ্গে এ-বংশের রক্তের সম্পর্ক নেই। কোন্ গ্রামের কোন্ এক অখ্যাত বংশের ছেলে। মা-মণি কাশী থেকে ফিরেই খোঁজ নিতে আরম্ভ করেছিলেন। বেশ ভালো সৎ বংশ হলেই চলবে। এ-বংশের রক্তের দোষ যার শরীরের ত্রিসীমানায় নেই। কর্তাবাবু তখন আবার জগত্তারণ-বাবুর সঙ্গে বাড়িতে যেতে শুরু করেছেন।

একদিন রাত্রেই সোজাসুজি কথাটা পাড়লেন মা-মণি।

বললেন—তোমাকে দেখতে হবে একবার—

কর্তাবাবু বললেন—আমি আর দেখে কী করবো ?

মা-মণিবললেন—সৎ বংশ, বাপ-মা সৎ-চরিত্র—কোনও খুঁত নেই—

কর্তাবাবু বললেন—আর কিছুদিন সবুর করো না, এত তাড়াহুড়ো কেন ? আমি তো মরছি না এখুনি ?

মা-মণি বললেন—আমি তো মরতে পারি ?

কর্তাবাবু বললেন—মরার কথা উঠছে কেন এখন ?

—বাঁচা-মরার কথা কে বলতে পারে ? আমি তো মরতে বসে-ছিলুম সেদিন !

কর্তাবাবু বললেন—বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় যখন বেঁচেছ তখন আর কেন ও-কথা তুলছো ?

মা-মণি বললেন—তবু তোমায় দেখতেই হবে আমি মনস্থির করে ফেলেছি—

কর্তাবাবু বললেন—কোথায় সে ?

মা-মণি বললেন—এখানেই রেখেছি, তোমাকে দেখাবো বলে—

কর্তাবাবু কী যেন ভাবলেন—আর কিছুদিন থাক্ না, আমিই না-হয় দেখেশুনে একটা যা-হোক কিছু স্থির করবো !

সকালবেলা মা-মণি ছেলেটিকে আনালেন। ছোট ফুটফুটে ছেলে। বাপ নেই। অবস্থা খারাপ। বিধবা মায়ের তিনটি সন্তান। মা-মণি তাঁদের আনিয়েছেন নিজের পৈতৃক গ্রাম থেকে। দূরের একটা সম্পর্কও আছে। তিনটি সন্তান নিয়েই এসেছে মা। পুরোহিতমশাই দেখেছেন। জন্ম-পত্রিকা করে পরীক্ষাও করেছেন তিনি। কোনও আপত্তি নেই কারো। কিন্তু কর্তাবাবু যেন কেমন মন-মরা। সেদিন আর বাগানবাড়ি গেলেন না। জগত্তারণবাবু দুলালহরিবাবু সবাই এসে নিচের বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ বসে রইলেন।

পয়মন্তকে একবার ডেকে জিজ্ঞেস করলেন জগত্তারণবাবু—হ্যাঁরে, কর্তাবাবুর কী হলো, শরীর খারাপ ?

পয়মন্ত বললে—কর্তাবাবু মা-মণির ঘরে।

—মা-মণির ঘরে এতক্ষণ কেন রে বাবা ? কিসের এত পরামর্শ ?

ভেতরের ঝি-দাসী মহলেও যেন অনেক ফিস্‌ফাস্‌ চলতে লাগলো। সে-সব অনেকদিন আগেকার কথা। তখন ওই জগত্তারণবাবুও জানতে পারেননি কিছু। ওই দুলালহরিবাবুও জানতে পারেননি কিছু। অবশ্য দুলালহরিবাবু আর বেশিদিন বাঁচেননি। একদিন পুতুলমালার বাড়ির সামনেব পুকুরে তাঁর মৃতদেহও ভেসে উঠেছিল। কিন্তু সে অন্য গল্প। আসলে কেউ কিছু জানতে পারেনি। কারা ছেলেপুলে নিয়ে ক'দিন ধরে বাড়িতে রয়েছে। তাদের জন্যে আপ্যায়ন-আয়োজনও প্রচর। সবাই সজাগ। তাদের জন্যে মিষ্টি আসছে। ছোট ছেলেটির জন্যে জামা আসছে, কাপড় আসছে।

কিন্তু বেলা যখন দেড় প্রহর, হঠাৎ কাশী থেকে লোক এল। ভূষণ সিং দরজায় দাঁড়িয়েছিল। ময়লা কাপড়, সারা রাত ট্রেনে চড়ে এসেছে। সঙ্গে একটা ছোট ছেলেও—

জগত্তারণবাবু বৈঠকখানায় বসেছিলেন। দুলালহরিবাবুও বসে-ছিলেন হা-পিত্যেশ করে। ভেতর থেকে কোনও খবর আসছে না। কর্তাবাবুর তখন সময় নেই নিচে নামবার। মা-মণির সঙ্গে তখন কথা-বার্তা হচ্ছে ঘরের ভেতর। সকাল থেকে খাওয়া নেই দাওয়া নেই। দু'জনেই ব্যস্ত।

রান্নাবাড়িতে শিশুর-মা খাবার নিয়ে বসে আছে।

—হ্যাঁগা বামুনদি, আজ কর্তাবাবু যে এখনও খাবার চায়নি ?

মঙ্গলা নিজের মনেই রাঁধছিল।

শিশুব-মা আবার বললে—কর্তাবাবুতে আর মা-মণিতে কী যে কথা হচ্ছে ঘরের ভেতর, আজ খাওয়া-দাওয়া নেই নাকি কারো—

জগত্তারণবাবু বললেন—ভাগিয়ে দাও, ভাগিয়ে দাও ওকে ভূষণ—

দুলালহরিবাবুও বললেন—কোত্থেকে এসেছে ও ?

জগত্তারণবাবু বললেন—কোত্থেকে এসেছে মরতে কে জানে—শুনেছে এখানে মধু আছে তাই এসেছে—

ভূষণ সিং বলেছে—না না, এখানে কিছু হবে না—ভাগো হিঁয়াসে—

নফরের সে-সব কথা মনে নেই। তখন সে ছোট। দেড়-বছর দু-বছরের ছোট্ট ছেলেটা। এখান থেকে হাঁটতে-হাঁটতে গঙ্গার ধারে যাত্রীদের বিশ্রাম করবার ঘরে বসেছিল অনেকক্ষণ। বেলা গড়িয়ে গেল। তখনও কোথায় যাবে ঠিক নেই, লোকটা ল্যাবেনচুষ কিনে দিয়েছিল এক পয়সার। চেটে চেটে জিভ লাল করে ফেলেছে। তারপর খিদের জ্বালায় কখন ঘুমিয়েও পড়েছে।

কর্তাবাবু একবার দু'বার লোক পাঠিয়েছেন বাইরে। পয়মন্তকে বললেন—দেখে আয়তো, কাশী থেকে কেউ এসেছে কিনা—সঙ্গে একটা ছোট্ট ছেলে আছে দেখিস্—

পয়মন্ত ফিরে এসে বলেছিল—কই, কেউ তো আসেনি আজ্ঞে—

আরো দু'একবার পাঠিয়েছিলেন দেখতে। বেলা দুটো পর্যন্ত দেখা হলো, কেউ এল না।

তারপর অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো। কুল-পুরোহিত অনুষ্ঠান-ক্রিয়া আরম্ভ করলেন। হোম হলো যজ্ঞ হলো। সামান্য করে শুধু আরম্ভটা হয়ে গেল। মা-মণি আর কর্তাবাবু গরদের জোড় পরে দত্তক সন্তান গ্রহণ করলেন। ছোট্ট ফুটফুটে চেহারার ছেলে। মাথা নেড়া করা হয়েছে। মা-মণি তাকে নিজের কোলে তুলে নিজের হাতে খাওয়ালেন অনুষ্ঠানের শেষে।

সবশেষে কর্তাবাবু কাজকর্ম সেরে বাইরে এসেছেন।

জগত্তারণবাবু দুলালহরিবাবু এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন।

বললেন—ভালোই হলো কর্তাবাবু, সন্তান না হলে কি গৃহ মানায়! ভালোই করেছেন—

সন্তানের নতুন নাম রাখা হলো স্নবর্ণনারায়ণ। কুলপদবী সেন। স্নবর্ণনারায়ণ সেন।

জগত্তারণবাবু বললেন—এবার একদিন পঙ্‌ক্তি-ভোজন হয়ে যাক্ কর্তাবাবু, সেন-বংশের বংশধর হলো, ইতরজন কেন বাদ পড়ে যায়—

ঠিক হলো পরে একদিন অনুষ্ঠান হবে। সেদিন আত্মীয়-স্বজন অভ্যাগত সকলকে নিমন্ত্রণ করা হবে। সেদিনই সবাই নতুন সন্তানের

মুখ দেখবে, আশীর্বাদ করবে।

কিন্তু হঠাৎ সন্ধ্যের দিকে কর্তাবাবু বাইরে আসতেই কে যেন এগিয়ে এল সামনে। ভেবেছিলেন ভিখিরীদের কেউ হবে। কিন্তু লোকটা তাঁর পায়ের ধুলো নিলে।

কর্তাবাবু চেয়ে দেখলেন। বললেন—কে?

—আমি কাশী থেকে এসেছি হুজুর।

কর্তাবাবু কথাটা শুনেই যেন ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন —এনেছ?

লোকটা বললে—এই দেখুন হুজুর—এই যে—নফব—

হাত ধরে ছেলেটাকে সামনে এনে দাঁড় করালো।

—কী নাম রেখেছ এর?

—আজ্ঞে নফর বলে ডাকি আমরা।

নফর!

কর্তাবাবু বললেন—তা এত দেরি হলো কেন আসতে?

—আজ্ঞে এসেছিলাম সকালবেলা, তখন আপনি ব্যস্ত ছিলেন। তাই একটু ঘুরে এলাম।

নফর তখন কর্তাবাবুব কোটের বোতাম নিয়ে খেলা করছে। কর্তাবাবু ছেলেটাব গাল টিপে দিলেন। বললেন—চালাক হয়েছে খুব—না?

—আজ্ঞে, খুব চালাক, ওর জ্বালায় সবাই অস্থির, বড় হলে খুব বুদ্ধি হবে ওব দেখবেন—

কর্তাবাবু বললেন—আচ্ছা তুমি যাও—

বলে খাজাঞ্চিখানায় গিয়ে সরকারবাবুর কাছ থেকে পাঁচশো টাকা নিলেন। নিয়ে লোকটাকে দিলেন। বললেন—এই সব শোধ হয়ে গেল—

সরকারবাবু বললেন—কার নামে টাকাটা জমা করবো হুজুর?

কর্তাবাবু বললেন—কাশীতে যে-ঠিকানায় মনি অর্ডার করে টাকা পাঠানো হতো, সেই দুর্গা-মন্দিরের নামে খরচ লিখে দিয়ো—

সরকার-মশাই টাকা পাঠিয়ে আসছেন বরাবর মন্দিরের ঠিকানায়।

কর্তাবাবুর খরচে দুর্গা-মন্দিরের সংস্কার হচ্ছে। সেই খরচাতেই আরো পাঁচশো টাকা যোগ হয়ে গেল।

কর্তাবাবু বললেন—আসছে মাস থেকে আর পাঠাতে হবে না টাকা, এই শেষ কিস্তি শোধ হয়ে গেল সব।

এর পর আর বেশিদিন বাঁচেননি কর্তাবাবু। তখন নতুন সন্তান এসেছে বাড়িতে, তাব তদারকেই ব্যস্ত সবাই। মা-মণি বলতেন—দেখিস, খোকার ঠাণ্ডা লাগে না যেন?

হঠাৎ হয়তো কেঁদে উঠেছে খোকা। মা-মণি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

—হ্যাঁরে সিন্ধু, খোকা কাঁদছে কেন?

সিন্ধুমণি এসে বলে—নফরটা মেরেছে ওকে—

—নফর? নফর কে?

সিন্ধুমণি বলে—আজ্ঞে, ওই-যে একটা ছোঁড়া জুটেছে কোত্থেকে, বার-বাড়িতে থাকে আর খেলা করে খোকাবাবুর সঙ্গে?

—তা তোরা আছিস কী করতে? দেখতে পারিস না, যে-সে এসে মারামারি করে!

আর ঠিক সেই থেকেই কর্তাবাবুর শরীরটা ভেঙে গেল যেন। এখানে ওখানে যেতেন। গাড়িতে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বাগানবাড়িতেও যেতেন। কিন্তু কিছুতেই শান্তি পেতেন না। সিদ্ধিটা শুরু হয়েছিল কাশী থেকে, সেটা ওখানেও এসে চলেছে। ক্রমে আরো বেড়েছে।

মা-মণি বলতেন—খোকার জন্যে লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করছো না, মুখ্যু হয়ে থাকবে নাকি!

কর্তাবাবু বলতেন—এই বয়েস থেকেই লেখাপড়া?

—এখন থেকে না করলে যে কিছুই শিখবে না, একটা ভালো মাস্টার রাখো না—

মাস্টার! বললেন—জগত্তারণবাবু পড়াতে পারে, বি-এ পাস—

তারপর একটু থেমে বললেন—তাহলে ওরা দু'জনেই একসঙ্গে পড়ুক—

—দু'জন আবার কোথায় পেলে? দু'জন কে?

—খোকা আর নফর।

মা-মণি বললেন—আমার ছেলের সঙ্গে নফর পড়বে, কোথাকার কে ঠিক নেই, তার লেখাপড়া নিয়ে যত মাথা-ব্যথা—ও কে ?

কর্তাবাবু সে-কথা এড়িয়ে যেতেন। বলতেন—ঘাড়ে এসে পড়েছে, যদি মানুষ হতে পারে তো হোক না—

সেই ছোটবেলা থেকেই বড় বায়না করতো নফর ? হৈ-চৈ বাধিয়ে চীৎকাব করে একেবারে বাড়ি মাৎ করে ফেলতো। বলতো—ওর জুতো হয়েছে, আমার কই ?

খাজাঞ্চিবাবু বলতেন—ওর যা হবে তোরও তাই হবে নাকি ! তুই কে রে !

নফর রেগে যেত। বলতো—আমি কেউ না ?

কর্তাবাবুর কানে যেত সে গোলমাল।

বলতেন—তা ওকেই বা জুতো কিনে দেয় না কেন ?

উঠতে পারতেন না শেষের দিকে। কিন্তু কানে আসতো। খাজাঞ্চি-বাবুকে ডাকতেন কাছে। বলতেন—ও যা চায়, ওকে দিয়ো তুমি, জানলে—

—আজ্ঞে হুজুর, খোকাবাবুর সঙ্গে সমানে সমানে সব চাইবে।

আজ গাড়ি, কাল খেলনা, পরশু জামা-কাপড়। মা-মণির হুকুমে নতুন নতুন জিনিস আসে বাজার থেকে। খোকাবাবুর জন্যে কোনও জিনিস আর আসতে বাকি থাকে না। নফর দেখতে পেলে কেড়ে নেয়। সিন্ধু বলে—এই ছোঁড়া, বেরো এখান থেকে—বেরো—দূর হ—

নফরও তেমনি। বলে—বেরোব কেন ?

—বেরোবি না তো, থাকবি এখানে ? এখন খোকাবাবু খাবে !

—আমার খুশী আমি থাকবো। তোর কী ! আমিও খাবো, আমার বুঝি ক্ষিদে পায় না ?

সিন্ধুমণি গালে হাত দেয়।

—ওমা, শোনো ছোঁড়ার কথা ! তোর ক্ষিদে পায় তো তুই রান্না-বাড়িতে যা না—

নফর বলতো—তাহলে খোকন এখেনে খাবে কেন ?

– ও হলো বাড়ির ছেলে, তুই কে রে ছোঁড়া ?

নফর রেগে গেল। বললে—তুই ছোঁড়া বলছিস কেন রে মাগী আমাকে ?

বলে এক চিমটি কেটে পালিয়ে যেত নফর।

কিন্তু কর্তাবাবু মারা যাবার পরই যেন জেদ বেড়ে গেল নফরের। কথায় কথায় রেগে যায়। কথায় কথায় ক্ষেপে ওঠে! ও ইস্কুলে যায়, নফরও ইস্কুলে যাবে। বড়বাবুকে জগত্তারণবাবু পড়ায়, নফরও পড়বে। খোকাবাবু তখন ছোট। সেই বয়েসেই একদিন ঝগড়া বাধলো। তুমুল ঝগড়া। লাট্টু নিয়ে। নফর খোকাবাবুর লাট্টু চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে। খোকাবাবু গিয়ে লাট্টু চাইতেই নফর এক ঘুষি মেরেছে।

কান্নায় বাড়ি ফাটিয়ে ফেলেছে খোকাবাবু।

—কী হলো রে, কী হলো ?

বাড়িসুদ্ধ লোক দৌড়ে এসেছে নফরের ঘরে। রক্ত বেরোচ্ছে তখন খোকাবাবুর নাক দিয়ে।

—কে মেরেছে রে ? কে মেরেছে ওকে ?

নফর বললে—আমি।

—তুই! এত বড় আস্পর্ধা তোর—খোকাবাবুকে মারিস ?

ব'লে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিয়েছে কেউ নফরের গালে। তারপর আদর করে কোলে তুলে নিয়ে গিয়েছে খোকাবাবুকে। কিন্তু নফর তবু কাঁদেনি চড় খেয়ে। গুম হয়ে বসে থেকেছে কিছুক্ষণ। তারপর সোজা গিয়েছে রান্নাবাড়িতে। চোটপাট করেছে। বলেছে—ভাত দাও আমাকে শিশুর-মা—আমার ক্ষিদে পেয়েছে—

তার সমস্ত আঘাত যেন সে ভাত খেয়ে ভুলে যেতে চাইত।

শিশুর-মা-ও হেঁকে দিত—বোরো এখেন থেকে, সকালবেলা ভাত কিসের রে ? পরে আসিস্—

তারপর কবে একদিন বিয়ে হয়ে গিয়েছে বড়বাবুর। কবে নতুন বউ এসেছে। বয়েস বেড়েছে, শরীরও বড়বাবুর ভারী হয়েছে। জগত্তারণবাবু

রোজ এসেছে বড়বাবুর সঙ্গে গল্প করতে—নিঃশব্দে নির্বিবাদে সব কখন ঘটে গেছে কারোর তা মনে নেই। নফরেরও মনে নেই। একতলার অন্ধকার ঘরখানার মধ্যে শুয়ে শুয়ে কখন ফুটো দিয়ে তার সব অধিকারের অনিবার্যতাটুকু নিঃশেষ হয়ে গেছে তা নিয়েও আর নফর মাথা ঘামায় না। এখন ওই বড়বাবু একটু ডাকলেই তৃপ্তি, কুকুরের মতো ল্যাজ নাড়তে নাড়তে গিয়ে আবার পুরোনো দিনের কিছু অংশ ফিরে পায়—

কেউ আর জিজ্ঞেস করে না—ও কে গো ?

এখন আর রান্নাবাড়িতে গিয়ে ঝগড়া করে না।

বলে না—মাছ দাওনি কেন ? আমি এ-বাড়ির কেউ নই ?

নফর এখন ভাত খেয়ে চুপি চুপি আবার নিজের ঘরের ঘুপ্‌চির ভেতরে এসে শুয়ে পড়ে। কোথায় বড়বাবুর কী জামা-কাপড় হলো, কী খেলে, কিছুই খেয়াল রাখে না। টিকটিকিটা শুধু মাথার ওপর লাল চোখ দিয়ে তার দিকে মাঝে মাঝে হাঁ করে চেয়ে থাকে, আর নিচে নফর ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয়—

এ-সব ইতিহাস পুরোনো। বর্তমান সেন-বংশের বাঁধা ইতিহাসের পাতা খুঁজলে এমন অনেক অধ্যায় পাওয়া যাবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে থেকে শুরু করে এই বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত অনেক গ্লানি, অনেক কলঙ্ক অদৃশ্য ফলকে লেখা হয়ে আছে। সে আর কেউ জানতে পারবে না। জানা উচিতও নয়, কাম্যও নয়।

শ্যাওলা-ধরা বাড়িটার সামনে থেকে তেমন কিছু বোঝা যাবে না। যখন এ পাড়ায় আর কোনও বাড়ি ছিল না, এ-সব তখনকার কাহিনী। এখন এ-পাড়ায় সামনে পেছনে অনেক বাড়ি হয়ে গেছে। আশেপাশে আগে মাঠ ছিল, বন-জঙ্গল ছিল। তখন এ-বাড়ির আভিজাত্য ছিল। দশজন সমীহ করতো, ভয় করতো, ভক্তিও করতো হয়ত।

এখন এ-বাড়ি ও-বাড়ি সকাল-সন্ধ্যেয় রেডিও বাজে। মটর আসে, বেরিয়ে যায়। ভাড়াটেও এসেছে কত। ঘুড়ি উড়তে উড়তে এ-বাড়িতে ঢুকে পড়লে ছেলেরা নির্ভয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে। দরোয়ান বিশেষ কিছু

আর বলে না এখন। সবাই জানে বড়লোকের বাড়ি এটা, কিন্তু জানে না এর ভেতরে কতগুলো লোক থাকে, কী তারা করে, কী করে তারা জীবন কাটায়, কী জন্যে তারা বেঁচে আছে—

কিন্তু আজ পাড়ার লোক সব ভেঙে পড়লো এ-বাড়ির সামনে—

এতদিন এ-বাড়ির দিকে কেউ বিশেষ নজর দিত না। বিরাট বাড়ি। সামনের দিকের জানালা দরজা সব সময় প্রায় বন্ধই থাকতো। বাড়ির সামনের গাড়ি-বারান্দার ওপর নিম-গাছটা ঝাঁকড়া মাথা নিয়ে অনেক ঝড় অনেক বাদল এতকাল ধরে সয়ে এসেছে নির্বিবাদে। দেয়ালের শ্যাওলাতে অনেক লতাপাতা জ'ন্মে ঝোপ জঙ্গল হয়ে গেছে। লোকে জানতো ভেতরে যারা বাস করে তারা বনেদী ঘরের লোক—কেউ তাদের কখনও দেখতে পাবে না। চন্দ্র-সূর্যও তাদের দেখতে চেষ্টা করলে হার মানবে।

কিন্তু আজ আর কিছু অজানা থাকবে না। আজ বোধহয় সব জানাজানি হয়ে যাবে। সামনের চায়ের দোকানের ছোঁড়ারাও দৌড়ে এসেছে, ধোপাপাড়া থেকেও দু'একজন দৌড়ে এল। একটা খালি রিক্সা যাচ্ছিল সামনে দিয়ে—রিক্সাওয়ালাটাও থমকে দাঁড়ালো।

বললে—কেয়া হুয়া বাবু?

আর, বাড়ির ভেতরের যারা তাদের মধ্যেও যেন আজ সব ওলোট-পালোট হয়ে গেছে। বড়বাবুর ঘর খালি। খাস-বরদার পাঁচু বড়বাবুর সঙ্গে গাড়ির মাথায় চড়ে চলে গেছে। সেদিক থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। ফুলমণি রাত থাকতে উঠে বার-বাড়ির বাসন মেজেছে। পয়মন্ত সিঁড়ির দরজা খুলে দিয়েছে। সিন্ধুমণি বারান্দায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল। কলতলায় বাসনের আওয়াজে তার ঘুম ভেঙে গেছে। ধড়মড় করে উঠে মা-মণির ঘরের দিকে গিয়ে দেখলে—মা-মণি তখনও ওঠেনি। অন্যদিন সিন্ধুমণি ভেতর-বাড়িতে সকলের আগে ওঠে—কুঞ্জবালা বড় দেরি করে উঠতো। বড় ঘুম-কাতুরে মানুষ ছিল সে। মা-মণির কাছে শুনেছে।

কাশীতে যেবার কুঞ্জবালা গিয়েছিল, দিনরাত ঘুমোত।

একদিন কর্তাবাবুর পায়ে ধাক্কা লেগে গিয়েছিল। তারপর থেকে কুঞ্জবালা মা-মণির ঘরের মেঝেতে শুতো। যখন অসুখ হলো মা-মণির, দিনরাত সেবা করতে হতো, তখন দিনেও জাগতে হতো রাত্রেও জাগতে হতো। একদিন কুঞ্জবালা বলেছিল—কলকাতায় গিয়ে পেট ভরে ঘুমোব—

তা কুঞ্জবালার সেই ঘুমের জন্যই বোধহয় ওই সর্বনাশ ঘটে গিয়েছিল।

সিন্ধুবালা জিজ্ঞেস করেছিল—কিসের সর্বনাশ দিদি ?

—সে তোর শুনে কাজ নেই লা।

—কেন, শুনলে কী হবে দিদি ?

তখন অনেক রাত। কর্তাবাবু সিদ্ধি চড়িয়েছেন দুপুরবেলা। সেই শরবতের নেশাতেই ঝিম্ হয়ে ছিলেন সমস্ত দুপুর, সমস্ত বিকেল। খাস-বরদারও তখন একটু জিরোচ্ছিল। বিকেলের দিকে মা-মণি একটু ভালোই ছিলেন, কিন্তু মাঝরাত্রে হঠাৎ মা-মণি কেমন করতে লাগলেন। মুখ-চোখের ভাব দেখে ভালো মনে হলো না। কুঞ্জবালা গিয়ে খাস-বরদাকে ডাকলে—শুনছিস্—অ্যাই—

কর্তাবাবুর খাস-বরদার উঠলো অনেক ডাকাডাকিতে।

কুঞ্জবালা বললে—কর্তাবাবুকে ডাক, মা-মণি কেমন করছে—

খাস-বরদার বললে—কর্তাবাবু যে ঘুমোচ্ছে, ডাকবো কী করে ?

কুঞ্জবালার রাগ হয়ে গিয়েছিল।

—তুই ডাক না মুখপোড়া! বল্, মা-মণি কেমন করছে—

এদিকে মা-মণি কেমন করছে, চোখের মণি যেন উল্টে যাবার যোগাড়, আর পাশের ঘরে কর্তাবাবুরও পাত্তা নেই। ঘরে বিছানা ঠিক পাতা আছে, কিন্তু বিছানায় মানুষ নেই। খাস-বরদার এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলো। নেশার ঘোরে কোথাও কর্তাবাবু চলে গেল নাকি! গঙ্গার দিক বরাবর দরজাটা বন্ধ ছিল—সেটা বন্ধই রয়েছে—। বারান্দার এ-কোণ ও-কোণ দেখা হলো। কোথাও নেই—কোথায় গেলেন কর্তাবাবু ?

সে-সব দিনের কথা যারা জানতো, যারা হাজির ছিল তারাই জানে।

ডাক্তার চৌধুরী বললেন—কিন্তু দেরি করলে চলবে না, যা করবার শিগ্‌গির করতে হবে—

ডাক্তার চৌধুরী ভালো করে মঙ্গলাকে দেখলেন।

মন্ত্রপড়া ছাগলের মতো থরথর করে কাঁপছিল তখন মঙ্গলা। সারা গায়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। পাশেই খাটের ওপর মা-মণির দেহ নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। ডাক্তার চৌধুরী খানিকটা রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন। কী তিনি দেখলেন তিনিই জানেন।

গুরুদেব কর্তাবাবুকে আড়ালে ডাকলেন—

বললেন—এক বংশের রক্তের সঙ্গে আর এক বংশের রক্তের মিশ্রণে শাস্ত্রীয় বাধা-বিরোধ আছে, তা আগে দূর করতে হবে—

কর্তাবাবু জিজ্ঞেস করলেন—কী করে দূর হবে?

গুরুদেব বললেন—উপায় আছে—যদি আপনার আপত্তি না থাকে—

—কী উপায়? আমার কোনো কিছুতেই আপত্তি নেই—

সে-রাত্রে যে কী হলো! ভাগ্যের সেই অমোঘ নির্দেশের মধ্যে ভাগ্য-দেবতার বোধহয় কোনও গভীর উদ্দেশ্য ছিল। সেদিন কর্তাবাবুও বোধহয় কল্পনা করতে পারেননি তাঁর সেই কৃতকর্মের ফলাফল একদিন এত ভারী হয়ে আর এতদিন পরে তা এতবড় বিপর্যয় ঘটিয়ে দেবে।

সমস্ত রাতটা মা-মণির কেমন করে কেটেছে ভগবানই জানেন।

গুরুপুত্র বেশীক্ষণ রইলেন না।

ট্রেন আসার কথা ছিল সন্ধ্যেবেলা। সেই ট্রেন এলো রাত দশ-টায়। তারপর ভোরবেলাই আবার রওনা দিতে হবে। বললেন—আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না, আমাকে ভোরবেলাই রওনা দিতে হবে—আগামী সোমবার অর্ধোদয়-যোগে আমাকে কাশীধামে উপস্থিত থাকতেই হবে—বাবার ক্রিয়াকর্ম সব বাকি রয়েছে—

মা-মণি পায়ের কাছে কেঁদে পড়লেন।

বললেন—তারপর ?

তারপর সেই রাত্রেই কর্তাবাবু নতুন ধুতি পরে তৈরি হয়ে নিলেন। মঙ্গলাও বেনারসী শাড়ি পরলে, ঘোমটা দিলে। বাড়ি থেকে দূরে আর-একটা বাড়িতে অনুষ্ঠানের আয়োজন তখন সম্পূর্ণ হয়েছে। মঙ্গলাকেও নিয়ে যাওয়া হলো। রাত তখন অনেক।

পুরোহিত মন্ত্র পড়লেন—

ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম,

যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।

কর্তাবাবু উচ্চারণ করলেন—

প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভির-

স্থীনি মাংসৈর্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্।

প্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে মাংসে মাংসে এবং চর্মে চর্মে এক হয়ে যাক্।

গোত্রান্তর আগেই হয়েছে। তারপর বিবাহ। বিধবা-বিবাহ। কাশীধাম দেবতার ধাম। শাস্ত্রীয় বিধান মেনে মা-জননীর পুনর্জীবন লাভের জন্যে বিবাহ। এ চলে। এতে অন্যায় নেই, এতে দেবতার নিষেধ নেই, সম্মতিই আছে বরং। গুরুদেবের সমর্থনও আছে।

কর্তাবাবু বললেন—কিন্তু কেউ যেন এ খবর জানতে না পারে—

একরাত্রের ব্যাপার। লোকচোখের অগোচরেই সব সমাধা হয়ে গেল। কেউ-ই জানতে পারলো না। মঙ্গলা যথারীতি ফিরে এল অনুষ্ঠানের শেষে। আবার বেনারসী শাড়ি ছেড়ে ফেললে। আবার মঙ্গল-চন্দন মুছে ফেললে।

ডাক্তার চৌধুরী ছুঁচ ফুটিয়ে দিলেন শরীরে। ঘোমটার আড়ালে মঙ্গলা একটু কেঁপে উঠেছিল বুঝি ভয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সেইখানেই।

—তারপর ?

শুধু কি একদিন! শুধু কি দু'দিন! কতবার রক্ত নেওয়া হলো।

তখনও মা-জননীর আরোগ্য হয়নি। কর্তাবাবু কিন্তু রাত্রে কোথায় বেরিয়ে যান, যখন অনেক রাত। গভীর রাত্রে কর্তাবাবুর জন্যে পাল্কী আসে। আবার ভোরের দিকে ফিরে আসেন। তখন ডাক্তার আসে। মা-মণির অসুখের খবর নেন। তারপর দুপুরবেলা তাঁর গভীর নিদ্রা। বেলা চারটের সময় সে-ঘুম ভাঙে—তখন তাঁর জন্যে শরবত তামাক সব তৈরি রাখে খাস-বরদার—

কিন্তু দিনের বেলা কাজ করতে বেশ ঢুলুনি আসতো মঙ্গলার।

কুঞ্জবালা জিজ্ঞেস করতো—কী হয়েছে রে তোর, বসে বসে ঢুলছিস্ কেন!

মঙ্গলা সেদিন পা জড়িয়ে ধরলো। বললে—আমার সর্বনাশ হয়েছে, আমি আর বাঁচবো না—

—কেন, কী হলো?

পরের দিন থেকে মঙ্গলাকে কোথায় নিয়ে গেলেন কর্তাবাবু। দুর্গামন্দিরের ভোগ রাঁধতে হবে, সেখানেই মঙ্গলা থাকবে কিছুদিন। বাড়িতে রাঁধবার জন্যে অন্য লোক এল। কাশীর হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। রান্না ভালো, কিন্তু ঝাল-মশলার বেশি হাত।

তা তাই নিয়েই চালাতে হলো। দুর্গামন্দিরের ভোগ রাঁধতে গেল মঙ্গলা। কুঞ্জবালা তা-ই জানে। তা-ই জানলো সবাই। তখনও মা-মণির অসুখ ভালো হয়নি। আস্তে আস্তে গায়ে একটু বল পেলেন। তখন প্রায় বছর দেড়েক কেটে গেছে।

জিজ্ঞেস করলেন—কুঞ্জ?

কুঞ্জ তাড়াতাড়ি মা-মণির মুখের কাছে মুখ নামিয়ে জিজ্ঞেস করলে—কী মা-মণি?

—কর্তাবাবু কোথায়?

কুঞ্জবালা বললে—ডাকবো? কর্তাবাবু তামাক খাচ্ছেন—

—একটু জল দে—

কুঞ্জবালা জিজ্ঞেস করলে—এখন কেমন আছো মা?

মা-মণি মাথা নাড়লেন। ভালো না।

একদিন মা-মণি বললেন—আর ওষুধ খেতে পারি না—

ওষুধ খেয়ে খেয়ে তখন অরুচি ধরে গেছে তাঁর। চেহারা শীর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম-প্রথম লোক চিনতে পারতেন না। কর্তাবাবু পাশে এসে দাঁড়ালেও কী-সব প্রলাপ বকতেন। মাথায় ঘোমটা দেবার প্রয়োজন মনে করতেন না। যে মা-মণি প্রত্যেকদিন কর্তাবাবুর পাদোদক না খেয়ে জলগ্রহণ করতেন না, সেই তাঁরই কত মতিভ্রম হতে লাগলো। মুখের কাছে ওষুধ নিয়ে গেলে দাঁত বন্ধ করে থাকতেন, গায়ে জোর থাকলে ওষুধ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। সমস্ত বাড়িতে তখন লোকজন ভরে গেছে। কলকাতা থেকে আরও চাকর-ঝি এসে গেছে। বরফ আসছে, কলকাতা থেকে ট্রেনে করে ডাব আসছে! কাশীধামে সব ওষুধ পাওয়া যায় না। কলকাতা থেকে আনতে হয়। ডাক্তার চৌধুরী আসতেন, তাঁর সঙ্গে আসতেন ডাক্তার সান্যাল। কর্তাবাবুর হুকুম ছিল রোজ এসে তাঁরা দেখে যাবেন।

শেষে একদিন ভাত খাবার অনুমতি দিলেন ডাক্তারবাবু।

বললেন—বেশ পাতলা ঝোল—সিঙ্গি-মাছের ঝোল, আর সরু পুরোনো সেদ্ধ-চালের ভাত—

প্রথম দিন ভাত মুখে দিয়ে কিন্তু রুচি হলো না।

বললেন—মঙ্গলা এ কী রেঁধেছে?

কুঞ্জবালা বললে—মঙ্গলা নয় মা, একটা হিন্দুস্থানী বামুন রেঁধেছে

—কেন? মঙ্গলা কোথায় গেল?

কুঞ্জবালা বললে—মঙ্গলা নেই তো মা!

—কোথায় গেল সে!

কুঞ্জবালা বললে—দুর্গাবাড়িতে ভোগ রাঁধে সে আজকাল—

—কেন? সেখানে কেন গেল?

—কর্তাবাবু বলেছেন!

মা-মণি বললেন—কর্তাবাবু কোথায়? ডাক্‌তো—

কর্তাবাবু আসতেই মা-মণি মাথায় ঘোমটা তোলবার চেষ্টা করলেন।

বললেন—মঙ্গলাকে দুর্গাবাড়ির ভোগ রাঁধতে পাঠিয়েছ তুমি।

কর্তাবাবু বললেন—কেন, তোমাকে কে বললে ? রান্না কি ভালো হয় না ?

—আজকে খেতে পারলাম না।

কর্তাবাবু কী যেন ভাবলেন।

মা-মণি বললেন—তুমি ওকে নিয়ে এসো, ওকে আমি নিজে বলে বলে রান্না শিখিয়েছি—ও-ই এখেনে রাঁধবে।

কর্তাবাবু বললেন—আজকে কেমন আছো ?

মা-মণি বললেন—ও কথা থাক্—বরং তুমি কেমন আছো বলো !

কর্তাবাবু বললেন—তোমার শরীর খারাপ, আমি কি করে ভালো থাকবো ?

মা-মণি বললেন—কাশীতে আমিই তোমাকে আনলুম, আমাব জন্যেই তোমার এই কষ্ট—

কর্তাবাবু বললেন—কষ্ট যে সার্থক হয়েছে এইটেই সান্ত্বনা—

মা-মণির চোখ যেন ছলছল করে উঠলো।

বললেন—একটা দিন কি একটা মাস হয় তা-ও না-হয় সহ্য হয়, একবছর ধরে শুয়ে শুয়ে আর পারি না—

—এতদিন সহ্য করেছ আর কিছুদিন সহ্য করো !

মা-মণি বললেন—মরে গেলেই ভালো হতো—

কর্তাবাবু বললেন—ও-কথা কেন বলছো ?

—তোমার পায়ে মাথা রেখে মরবো, সিঁথির সিঁদুর নিয়ে যেতে পারবো, কাশীধামে মরবো, এমন সৌভাগ্য কি আমার হবে ?

কর্তাবাবুর কথা বাড়ির সকলেরই মনে আছে। বাগানবাড়ি যেতেন বটে, জগত্তারণবাবু দুলালহরিবাবু তারাও যেত, ফুর্তি হতো, মাইফেলও হতো, তবু যেন কর্তাবাবু কোথায় যেন ছিলেন সত্যিকারের সংসারী মানুষ ! বাগানবাড়ি গিয়েও কখনও বাড়ির কথা ভুলে যাননি ! সংসার করেছেন, ধর্ম করেছেন, আবার মদও খেয়েছেন, বাগানবাড়িও রেখেছেন, এজন্যে মা-মণির কোনও ভয় ছিল না কোনওদিন, সন্দেহও ছিল না।

মা-মণি বলতেন—এমন স্বামী ক'জন পেয়েছে আমার মতো? অনেক তপস্যা করলে এমন মানুষ মেলে বৌমা—

প্রতিদিন সকালবেলায় যখন কর্তাবাবু বাড়ি থাকতেন, কর্তাবাবুর পাদোদক না পান করে জলস্পর্শ করেননি তিনি।

বৌ-মণিকে বলতেন—তোমার শ্বশুরকে তুমি বেশিদিন দেখতে পাওনি বৌমা,—দেখলে বুঝতে পারতে কী মানুষ ছিলেন তিনি—দেবতুল্য মানুষ, অমন হয় না।

বৌ-মণি কিছু বলতেন না। চুপ করে শুনতেন শুধু শাশুড়ীর কথা।

মা মণি বলতেন—এতদিন এসেছ, এখনো খোকাকে তুমি বশ করতে পারলে না, আর আমি?

একটু থেমে বলতেন—আমাকে না-জানিয়ে তিনি কিছু করতেন না—বাগানবাড়ি যাবার আগেও আমাকে বলে যেতেন, এমনি মানুষ ছিলেন তিনি—মদ খেতেন তিনি, ছোটবেলার অভ্যেস, কিন্তু আমি বললে তা-ও বোধহয় ছাড়তে পারতেন—

কর্তাবাবু ভোরবেলা ঘুম থেকে দেরি করে উঠতেন। শেষের দিকে তিনি আর রাত্রে অন্দরে আসতেন না। নাচঘরেই রাত্রের শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম-প্রথম বিয়ে হবার প্রথমদিকে, একসঙ্গে এক বিছানাতেই শুতেন দু'জনে। সকালে উঠে মা-মণি রোজ কর্তাবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকাতেন! তারপর বাইরে যেতেন।

একদিন দেখে ফেলেছিলেন। বললেন—পায়ের ধুলো নিচ্ছ যে হঠাৎ? কী হলো?

মা-মণি বলেছিলেন—আমি তো রোজই নিই—

—কেন নাও? আর নিয়ো না।

মা-মণি বলেছিলেন—তুমি আপত্তি কোরো না, হিন্দু স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা—

কর্তাবাবু বলেছিলেন—আমি তা বলে দেবতা নই!

মা-মণি বলেছিলেন—ও কথা বোলো না, আমার কাছে তুমি

দেবতাই—

কর্তাবাবু বলেছিলেন—কিন্তু আমার যে অনেক বদ রোগ আছে, রাত্রে মাঝে মাঝে বাইরে কাটাই, মদ খাই, তা জানো তো!

মা-মণি বলতেন—তা যা ইচ্ছে তোমার করো, তুমি আমার—

বড় গর্ব করেই সেদিন মা-মণি কথাগুলো বলেছিলেন। ভেবেছিলেন, সংসারের যেখানে আর যা কিছু ফাঁক থাকুক, ফাঁকি থাকুক, তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে কোথাও কোনও গ্রন্থি থাকবে না—

তাই সেদিন যখন কর্তাবাবু বললেন মঙ্গলা দুর্গাবাড়িতে ভোগ রাঁধতে গেছে, তিনি বিশ্বাসই করেছিলেন।

কিন্তু মঙ্গলা তখন আর এক আঘাতে জর্জর হয়ে রয়েছে। আর এক নিভৃত ঘরে শয্যাগ্রস্ত। সে-কথা কেউ জানে না।

কর্তাবাবু জানিয়ে দিয়েছেন—এ বিয়েও যেমন সাময়িক, এ সন্তানও তেমনি সাময়িক প্রয়োজনে—

কর্তাবাবুই টাকা দিয়েছেন, সেবা-শুশ্রূষা করবার লোক রেখেছেন, বাড়ি ভাড়া করবার খরচ দিয়েছেন। সুতরাং আবার সব মুছে ফেলতে হয়েছে। শরীরের ক্লান্তি, পেটের সন্তান, সিঁথির সিঁদুর, সব। টাকাও দিতে চেয়েছিলেন। যেখানে খুশী চলে যাও, তোমার সন্তান থাক্ তোমার কাছে, কারো কাছে কোনো পরিচয় প্রকাশ হতে পারবে না। পারলে, শাস্তি হবে সে-কথাটা আর খুলে প্রকাশ করা হয়নি।

কিন্তু সেদিন কর্তাবাবুর প্রস্তাবে মঙ্গলা 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলেনি। শুধু মাথা নিচু করে থেকেছে।

মঙ্গলা আবার যেদিন এল বাড়িতে, কুঞ্জবালা চেহারা দেখে অবাক।

বললে—ওমা, কী চেহারা, ঠাকুরের ভোগ রেঁধে রেঁধে তোর চেহারার কী দশা হয়েছে রে মঙ্গলা—

মা-মণির ঘরে গিয়ে পায়ের ধুলোও নিয়ে এল।

মা-মণি বললেন—আমার বাড়ির ভোগ কে রাঁধে তার ঠিক নেই, তুই কিনা গেছিস্ দুর্গাবাড়িতে—

তারপর আস্তে আস্তে সেরে উঠলেন মা-মণি। পথ্য গ্রহণ করলেন,

উঠে চলে-ফিরে বেড়াতে পারলেন। শেষকালে একদিন কাশীর পাট উঠলো।

কর্তাবাবু শেষের দিকে কেমন একটু কাতর হয়ে পড়েছিলেন।

কী যেন বলতে চাইতেন। কী যেন বলতে পারতেন না। কাশীবাসের পর থেকেই কেমন যেন অন্যরকম। বাগানবাড়িতে যাবার আগ্রহ তেমন ছিল না। বন্ধু-বান্ধব আসতো, জগত্তারণবাবু আসতো, অনেকক্ষণ খবর দেবার পর তবে তিনি নিচে নামতেন।

গাড়িতে ওঠবার মুখে এক-একদিন দেখতেন ছেঁড়া নোংরা জামা পরে নফর এসেছে কাছে। বলেছে—একটা পয়সা দাওনা কর্তাবাবু—

জগত্তারণবাবু তাড়িয়ে দিত। বলতো—যা যা, বেরো এখান থেকে, পয়সা কী করবি রে?

—ল্যাবেনচুষ খাবো।

কর্তাবাবুর মুখখানা যেন কালো হয়ে আসতো!

ডাকতেন—পরমন্ত—

পরমন্ত কাছে এলেই বলতেন—এই একে খেতে দেয় না কেন বল্‌তো—একে কেউ খেতে দেয় না কেন?

—আজ্ঞে খায় তো ও।

—তাহলে ল্যাবেনচুষ খাবে বলছে কেন! আবার খেতে দিতে বল একে—রান্নাবাড়িতে বলে দিবি একে যেন পেট ভরে খেতে দেয় —আর ছ্যাখ্ খাজাঞ্চিবাবুকে একবার ডাক্‌তো—

নফর ততক্ষণে কর্তাবাবুর পাঞ্জাবিতে ময়লা হাত লাগিয়ে কালো করে দিয়েছে।

খাজাঞ্চিবাবু খাতা ফেলে দৌড়তে দৌড়তে এলেন।

কর্তাবাবু বললেন—এ ছেঁড়া-জামা পরে থাকে কেন? দেখতে পাও না?

কালিদাসবাবু বললেন—আজ্ঞে, বড় ইতর ছোঁড়াটা, নতুন জামা দিতে-না-দিতে···

—তুমি থামো!

হুঙ্কার দিয়ে উঠতেন কর্তাবাবু।

বলতেন—খোকাবাবুর যখন জামা-কাপড় হবে, তখন এরও হবে, দেখবে যেন ন্যাংটা হয়ে আমার সামনে না আসে—

কর্তাবাবু চলে গেলে সবাই বলাবলি করতো—ছোঁড়াটা কে?

মুহুরিবাবু বলতো—ছোঁড়াটা খুব বশ করেছে তো কর্তাবাবুকে

কর্তাবাবু খেয়ে-দেয়ে নাচঘরে শুয়ে তামাক খাচ্ছেন দুপুরবেলা, খাস-বরদারও বোধহয় সেই সময়টা রান্নাবাড়িতে খেতে গেছে, হঠাৎ কোথা থেকে এক-পা ধুলো নিয়ে একেবারে কর্তাবাবুর ঘাড়ে চড়ে বসেছে—

—আরে, ছাড়্ ছাড়্—

নফরের তখন অন্য মূর্তি। গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে কেড়ে নিয়েছে। বলে—দেব না—

কর্তাবাবু বিব্রত হয়ে উঠেছেন।

—ওরে, কে আছিস, দ্যাখ্, ধর্ একে—

—তাহলে একটা পয়সা দাও—

—পয়সা কি করবি তুই?

—ক্ষিদে পেয়েছে।

—তোকে কেউ খেতে দেয় না বুঝি?

নফর পিঠে উঠে অত্যাচার শুরু করেছে তখন। মাথায় হাত দিয়ে চুল টানছে। এমন করে কর্তাবাবুর কাছে ঘেঁষতে কারো সাহস নেই। খোকাবাবু পর্যন্ত দূরে দূরে থাকে। কেমন লেখাপড়া হচ্ছে, শরীর কেমন আছে সব খবরই নেন, কিন্তু সে-ও এমনি করে কর্তাবাবুর পিঠে উঠতে সাহস করে না—

চুপি চুপি জিজ্ঞেস করেন—হ্যাঁরে, ভাত খেয়েছিস?

নফর বুকের খুব কাছাকাছি শুয়ে বুকের চুলগুলো টানছে তখন।

বললে—হ্যাঁ—

—পেট ভরেছে?

—না।

কর্তাবাবু হেসে ওঠেন। মিথ্যেকথা বলছে বুঝতে পারেন। মিথ্যেকথা বললেই আদর পাওয়া যাবে বুঝতে পেরেছে।

জগত্তারণবাবুকে জিজ্ঞেস করেন—খোকার কেমন পড়াশুনো হচ্ছে জগত্তারণবাবু?

—আজ্ঞে ব্রেন্ আছে খোকাবাবুর, যা বলি টপাটপ বুঝে ফেলে।

—আর ও?

—কে?

যেন বুঝতেপারে না জগত্তারণবাবু। বললেন—কার কথা বলছেন?

—ওই আমাদের নফর?

জগত্তারণবাবু মুখ বেঁকায়।

—আজ্ঞে, ও ছোঁড়ার কিছ্ছু হবে না, মোটে মাথা নেই, কেবল খেলার দিকে ঝোঁক, ওর লেখাপড়া শিখে কিছ্ছু হবে না, ওটা গণ্ডমুখ্যু হয়ে কাটাবে দেখবেন।

—গণ্ডমূর্খ হবে?

কর্তাবাবুর মুখটা যেন বিমর্ষ হয়ে এল। যেন বড় কষ্ট পেলেন কথাটা শুনে। মুখ কালো করে বললেন- পড়ে না মোটে?

জগত্তারণবাবু বললে—পড়বে কি আজ্ঞে, মাথাতেই ওর ঢোকে না কিছু, মাথায় গোবর পোরা আর কি!

কর্তাবাবু বললেন—একটু ভালো করে চেষ্টা করে দ্যাখো না—হয়ত হতেও পারে, সকলের কি আর সমান মাথা হয়?

জগত্তারণবাবু বললে—বৃথা চেষ্টা আপনার, তবে আপনি যখন বলছেন, দেখবো চেষ্টা করে—

খোকাবাবু আর নফর দু'জনকেই ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হলো। খোকাবাবু গাড়ি করে ইস্কুলে যেত। গুলমোহর আলি গাড়ি নিয়ে হাজির থাকতো। মা-মণি নিজে তদারক করে খোকাবাবুকে খাইয়ে-দাইয়ে ইস্কুলে পাঠিয়ে দিতেন। চাকর-বাকররা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো সে-সময়টা। একটু যদি দেরি হয় তো মা-মণির বকুনির অন্ত থাকে না।

—দেখছিস খোকন এখন ইস্কুলে যাবে, তোরা কোথায় থাকিস সব?

খোকাবাবু ইস্কুলে গিয়ে যেন সমস্ত বাড়ির লোকের মাথা কিনে নেবে।

নফর দেখতে পেয়েছে। দৌড়ে সে-ও গাড়িতে উঠতে যায়। একেবারে পা-দানিতে উঠে দাঁড়িয়েছে।

— আমিও গাড়ি করে ইস্কুলে যাব—

—ওরে থাম থাম !

গুলমোহর আলি আর একটু হ'লে গাড়ি চালিয়ে দিত। নেহাত থামিয়ে ফেলেছে ঠিক সময়ে। আবদুল্ল পেছন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লো।

—উতরো, উতরো তুম্।

নফর বললে—না, নামবো না—আমিও গাড়ি চড়বো।

গুলমোহর আলি শাসাতে লাগলো—বাবুকে বোলাও, জল্‌দি—

কিছুতেই কিছু হলো না। জোর করে নফরকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি গড়গড় করে গড়িয়ে চলে গেল গেট্ দিয়ে। নফর রাগ করে ইস্কুলেই গেল না। সমস্তক্ষণ মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলো। তারপর কাঁদতে কাঁদতে একসময় কখন ঘুমিয়েও পড়লো।

এ-সব ছোটবেলাকার ঘটনা। তারপর কর্তাবাবু মারা গেছেন। মারা যাবার আগে ক'মাস আর নিচেও নামতে পারেননি। নফর ওপরে উঠতে গেছে। পয়মন্ত খেঁকিয়ে উঠেছে—যা যা, বেরো এখেন থেকে—

কর্তাবাবুর তখন অসুখ বেশ। ঘরে কেউ নেই। পয়মন্তকে ডেকে বললেন – নিচে কে কাঁদছে রে ?

—কই আজ্ঞে, কেউ তো কাঁদছে না—

—আমি যে শুনতে পেলুম। দেখে আয় দিকিনি ?

পয়মন্ত বাইরে গেল। বাইরে থেকে উঁকি মেরে নিচেয় দেখলে। একবার বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। তিন মহল বাড়ির রন্ধ্রে রন্ধ্রে কত লোক বাসা বেঁধেছে। কত মানুষ পুরুষানুক্রমে অন্ন-সংস্থানের চেষ্টায় এ-বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে যুগ যুগ ধরে। কেউ ঠকেছে, কেউ ঠকিয়ে গেছে। কেউ মরেছে, কেউ মেরেছে। তুব এ-বাড়ির ইট, কাঠ, গাছপালা, শ্যাওলার মতো এ-বাড়ির সঙ্গে তারা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে

থেকেছে—তাদের সকলের কোলাহল, সকলের চীৎকার, সকলের কান্না আর হাসির শব্দ যদি ধরে রাখা যেত তো এর ইতিহাস শুনে আজকের লোক চমকে উঠতো, শিউরে উঠতো। কিন্তু কোথায় সব তলিয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে। সে আর দেখা যাবে না, সে আর বুঝি শোনা যাবে না।

পয়মন্ত বলে—না হুজুর, কেউ তো কাঁদছে না—

—ওই রান্নাবাড়ির দিকে একটু কান পেতে শোন্ তো ?

রান্নাবাড়ির দিকেও কান পেতে শুনেছে। কিন্তু সব চুপচাপ সেখানে। শিশুর-মা সেখানে শুধু তরকারি কোটে, বাটনা বাটে আর একটা-দুটো কথা বলে মঙ্গলার সঙ্গে। মঙ্গলা তার উত্তরই দেয় না।

—হ্যাঁ দিদি, তোমার তো ভাগ্যি ভালো, তবু বাবা বিশ্বনাথের চরণ দর্শন করেছ। আমাদের যে কী কপাল !

মঙ্গলা চুপ করে রান্না করে যায় চারটে উনুনে একসঙ্গে। ভাত ডাল ঝোল ফোটে টগ্ বগ্ করে। জল গরম হলে কেমন একটা সোঁ সোঁ শব্দ হয়। হাঁড়ির ভেতর মাংস রান্না হলে কেমন একটা গুম্ গুম্ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। আর মাঝে মাঝে বাইরের রোয়াকে শিশুর-মার শিল-নোড়া ঘষার শব্দ। একটানা। কাশীর গঙ্গার জলের সোঁ-সোঁ শব্দের মতো এ সর্বক্ষণ লেগেই আছে।

—ও বামুনদি, ওই ছাখো সেই ছোঁড়াটা খেতে এসেছে, আবার জ্বালাবে আজ !

নফর চীৎকার করে খেতে বসবার আগেই,—আজ যদি মাছ না দাও তো কর্তাবাবুর কাছে লাগাবো গিয়ে—

—দেব না তোকে মাছ, কী করতে পারিস দেখি আমি !

শিশুর-মা কোমরে কাপড় জড়িয়ে মারমুখো হয়ে আসে।

নফর বলে—মারবে নাকি তুমি ?

—হ্যাঁ মারবো,—ছোঁড়ার মুখে আগুন, শুনলে বামুনদি ছোঁড়ার কথা, আবার মেয়েছেলের গায়ে হাত দিতে আসে—

নফর বলে—আমি তোমার গায়ে হাত দিতে আসিনি, তুমি থামো—

ব'লে ডাকে—বামুনদি—

মঙ্গলার বুকের ভেতরটা ধকধক করে ওঠে।

—কানে কথা যায় না বুঝি কারো?

একেবারে রান্নাঘরের দরজার কাছে এগিয়ে আসে নফর।

তারপর মঙ্গলার মুখের দিকে তাকিয়ে কী একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়। বলে—তোমার চোখে কী হলো গো বামুনদি? জল পড়ছে কেন গা?

মঙ্গলা ততক্ষণে জলটা মুছে নিয়েছে।

নফর বলে—কাঁচা তেলে ফোড়ন দিয়েছিলে তুমি? দেখি দেখি, চোখটা দেখি—

শিশুর-মা'র আর সহ্য হলো না। বললে—বেরো, ছোঁয়া-লেপা কাপড় নিয়ে রান্নাবাড়ি থেকে বেরো বলছি—নইলে ডাকবো ভূষণ দরোয়ানকে সেদিনের মতো, বেরো বলছি—

হাতে একটা লোহার বেড়ি নিয়ে তেড়ে এসেছে।

কি জানি ভূষণের নামে শুনেই বোধহয় ভয় পেলে নফর। রান্নাবাড়ি থেকে সুড়সুড় করে বেরিয়ে এল। তারপর বললে—ছুত্তোর তোর ভাতের নিকুচি করেছে, ভাত দিবিনে তো বয়ে গেল, দেখি ভাত না খেয়ে থাকতে পারি কিনা—

শিশুর-মা'ও পেছপাও হয়। বলে—তাই ছাখ্ তুই—আমিও দেখি, এবার খেতে এলে খ্যাংরা-পেটা করবো এও বলে দিলুম—

কিন্তু আর কেউ না বুঝুক, কর্তাবাবু বুঝতে পারতেন।

বলতেন—ওই রান্নাবাড়ির দিকে একটু কান পেতে শোন্ তো?

পয়মন্ত এসে বলে—কই, রান্নাবাড়িতে তো সবাই চুপ, ওখেনে তো কিছু গোলমাল নেই?

—গোলমাল নেই?

শেষের দিকে মা-মণি কাছে এলেই যেন একটা কী কথা বলতে চাইতেন। কী যেন বলতে চাইতেন, কী যেন বলতে সাহস পেতেন না।

মা-মণি বলতেন—কিছু বলবে তুমি?

কর্তাবাবু বলতেন—খোকা কোথায়?

—সে তো নিজের ঘরে রয়েছে, ডাকবো তাকে ?

—না, তুমি বোসো একটু।

মা-মণি অনেকক্ষণ বসে রইলেন পাশে। মাথায় হাত দিয়ে টিপতে লাগলেন।

বললেন—কই, কী বলবে বলছিলে যে ?

কর্তাবাবু বললেন—জমা-খরচের খাতা কে দেখছে আজকাল ?

মা-মণি বললেন—খোকাকে আমি দেখতে বলেছি, মাঝে মাঝে খাজাঞ্চিখানায় বসে ছ্যাখে—

—হলুদপুকুরের বন্ধকী সম্পত্তির মকদ্দমাটার কী হলো ?

মা-মণি বললেন—ও-সব দেখবার লোক রেখেছ তুমি, তারাই দেখছে, তুমি আর ও-সব নিয়ে ভেবো না—

—ওরা কি পারবে ?

—না পারলে না পারবে, তা বলে তোমাকে আর ভাবতে হবে না ও-সব।

কর্তাবাবু থেমে গেলেন। খানিক পরে বললেন—কাশী থেকে গুরুদেবকে একবার ডাকতে হবে—

—কেন ?

কর্তাবাবু বললেন—অনেকদিন আগে কাশী গিয়েছিলাম, তোমার অসুখ হয়েছিল খুব—খুব অসুখ—

মা-মণি বললেন—মনে আছে—

কর্তাবাবু বলতে লাগলেন—মনে তো থাকবেই, মনে তো থাকবেই, আমারও মনে আছে, মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারছি না, কেবল মনে পড়ছে—

—সে-কথা না-ই বা মনে করলে। আমি যে সেবার ভালো হয়েছি সে কেবল বিশ্বনাথের দয়ায়—

কর্তাবাবু আপত্তি করতে লাগলেন—না গো না, বিশ্বনাথের দয়ায় নয়, বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় নয়, সবই ভবিতব্য,—

সেদিন মা-মণি খাস-বরদারকে জিজ্ঞেস করলেন—কর্তাবাবু কেমন

আছেন রে ?

খাস-বরদার বললে—বাবু চিঠি লিখছিলেন মা—

মা-মণি ঘরে ঢুকলেন। বললেন—এই শরীরে আবার চিঠি লিখছিলে! কোথায় এমন চিঠি লেখবার দরকার হলো এখুনি ?

কর্তাবাবু বললেন—কাশীতে—

—কাশীতে কার কাছে ?

কর্তাবাবু বললেন—গুরুদেবের কাছে—

এর পর আর বেশিদিন বাঁচেননি কর্তাবাবু। এর পর থেকে মা-মণিই সংসারের সব চাবিকাঠি হাতে নিয়েছিলেন। খাজাঞ্চিখানার হিসেব রোজকার মতো তিনি বুঝে নিতেন। জগত্তারণবাবু অ্যাটর্নী হয়েছেন। মামলা-মকদ্দমার ব্যাপারটা তিনিই এসে বুঝে-শুনে নিয়ে যেতেন। পড়াশোনা হলো না খোকনের। কিছু উপায় নেই। কিন্তু খরচটা বেঁধেছেন মা-মণি। খাজাঞ্চিখানার খাতা থেকে অনেক বাজে-খরচের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।

পুরোহিত-বাড়িতে মাসকাবারি বন্দোবস্ত ছিল একখানা ধুতি, একটা শাড়ি, আধমণ ডাল, একখানা সিধে, আর গামছা।

গুরুদেবের নামে বাৎসরিক প্রণামী বাবদ বরাদ্দ ছিল নগদ পাঁচশো টাকা, পাঁচখানা ধুতি, গুরুমায়ের জন্যে তিনটে শাড়ি, এককৌটা সিঁদুর, তিনমণ চাল, আর দুখানা গামছা।

তারপর দান-খয়রাতেরও বরাদ্দ ছিল নানা জায়গায়। হলুদপুকুরের জ্ঞাতিদের পুজোর সময় কাপড়, চাদর আর টাকা। এমনি কত অসংখ্য! সংসার সেনের যখন সময় ছিল, তখনকার রেওয়াজ সব। বংশের উন্নতি হয়েছে, ভোগ বেড়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে দান-খয়রাতের ফর্দও সব বড় হয়েছে ক্রমে ক্রমে। তখন ধানকল ছিল, তেলকল ছিল বেলেঘাটায়, খড়ের আমদানি-রপ্তানি ছিল, তেজারতী মহাজনী ছিল। যখন ছিল তখন ছিল। এখন নেই, এখন সব কমাতে-হবে। ভগবান দিন দেন তো আবার হবে। আবার বড় হবে ফর্দ।

মা-মণি নিজে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনেছেন আর কালিদাসবাবু পড়ে গেছেন।

মা-মণি বলেছেন—পাঁচখানার বদলে দুখানা ধুতি করে দিন—আর নগদ টাকা একশো—ওতেই চালাতে হবে—

তারপর বললেন—বড়বাবুর হাতখরচ গেল মাসে কত লিখেছেন?

—আজ্ঞে, চব্বিশহাজার সাতশো তেষট্টি টাকা ন' আনা।

খোকনের আর সে স্বভাব নেই। অনেক শুধরেছে এখন। আগের চেয়ে অনেক শুধরেছে। আগে মাসেব মধ্যে চারদিন পাঁচদিন বেরোত। এখন একদিন। কোনও কোনও মাসে বড়জোর দু'দিন। কিন্তু যাবার সময় মাস্টার জগত্তারণবাবু সঙ্গে থাকে। যাবার আগে মা-মণির পায়ের ধুলো নিয়ে যায় এখনো। বৌমার সঙ্গে দেখা করে যায়। মা-মণি পেস্তা-বাদামের শরবত তৈরি করে দেন। মাছের মুড়ো দেন পাতে। বাড়ির ঘি।

খোকন এসে প্রণাম করে পায়ে।

বলে—মা, অনুমতি করো, আসি তাহলে?

গিলে-দেওয়া পাঞ্জাবি পরে কোঁচানো শান্তিপুরে ধুতি পরে এসে বারান্দার ওপরে পম্পশু জোড়া খুলে রেখে মা-মণির মহলে আসে। নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকায় খোকন।

মা-মণি বলেন—এই শরীর খারাপ নিয়ে আবার কেন যাচ্ছ বাবা!

বড়বাবু বলেন—শরীরটা কেমন ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ করছে বড়ো—

মা-মণি বলেন—তাহলে একবার ডাক্তারবাবুকে ডাকতে পাঠালে হতো—

বড়বাবু বললেন—ও ডাক্তার-ফাক্তারের কম্ম নয়, মা—ও মিছিমিছি টাকা নষ্ট, মুখ নষ্ট—

মা-মণি তখন সাবধান করে দেবেন—কিন্তু বেশি অত্যাচার যেন না হয় দেখো বাবা, শরীরটা আগে—

ভক্তি করে পায়ের ধুলো নিয়ে বড়বাবু তখন চলে যাবেন বৌ-মণির ঘরে।

বৌ-মণি এতক্ষণ সমস্ত শুনেছে। সকাল থেকেই শুনে আসছে। সকাল থেকেই আয়োজন করেছে, সকাল থেকেই সেজেছে গুজেছে। আলমারি থেকে ভালো শাড়িটা বের করে পরেছে। কানের হাতের নাকের গয়নাগুলো বার করে পরেছে। সব সাজ-গোজ এই পাঁচ মিনিটের জন্যে।

বড়বাবু ঘরে ঢুকতেই বৌ-মণি এগিয়ে এসেছে।

বড়বাবু বলেছে—আমি চললুম, জানলে—

—আবার আজকে কেন?

—যাই একটু ঘুরে আসি।

—না গেলেই নয়? তোমার শরীরটা খারাপ, এই ভাঙা শরীর নিয়ে আবার কেন যাচ্ছো?

বড়বাবু বললেন—শরীরটা বড় ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ করছে আজ—যাই, কেমন?

তারপর গুলমোহর আলি গাড়ি জুতেছে। আবদুল দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থেকেছে। আর নফর? যে নফরের সারা মাসে পাত্তাই পাওয়া যায় না, যে-নফরের দাম এ-বাড়িতে কানাকড়িও নেই কারো কাছে, সেই নফরেরই আবার অন্য মূর্তি তখন। ভেতরে লাল সিল্কের গেঞ্জি, টাটকা-টাটকা চুল ছেঁটেছে, পাতলা পাঞ্জাবির পকেটে পয়সা ঝন্‌ঝন্‌ করছে—

চীৎকার করে ডাকে—গুলমোহর, গাড়ি লে আও—

কত কাজ তার! অ্যাটর্নী-অফিস থেকে জগত্তারণবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে সে-ই। একা সমস্ত ঝক্কি নিয়েছে। শুধু কি জগত্তারণবাবু! বড়বাবুর তদ্বির-তদারক তাকেই করতে হবে। বড়বাবুর ধুতির কোঁচা যদি মাটিতে লুটিয়ে কাদা লাগে তো নফরকেই তা তুলে ধরতে হবে। বড়বাবুর তোয়াজ করাই এখন কাজ নফরের। বড়বাবুর ঘুম পেলে নফর-ই তাকিয়াটা এগিয়ে দেয়। বড়বাবুর সিগারেট তেষ্টা পেলে দেশলাই দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে দেয়।

বাড়ির সামনে হৈ-চৈ বাধিয়ে তোলে নফর—অ্যাই, হট্‌ যাও সব, হট্‌ যাও—এখন মেই হোগা—বড়বাবু বেরোচ্ছে এখন—

খাজাঞ্চি কালিদাসবাবু, মুহুরিবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে ছাখে আর মনে মনে গজরায়।

চুপি চুপি বলে—নফর বেটার দেমাক ছাখো—বেটা যেন আজ লাট না বেলাট—

কিন্তু নফরের মুখের ওপর কারো কথা বলবার সাহস থাকে না সেদিন। কারো সাহস হয় না নফরের ব্যাপার দেখে হাসে মুখের ওপর। বড়বাবুও সেদিন কথায় কথায় নফর আর নফর।

সেদিন সকাল থেকেই বড়বাবু ডাকাডাকি করে—হ্যাঁ রে, নফর কোথায়?

নফরও গিয়ে একেবারে পায়েব ধুলো নিয়ে জিভে ঠেকিয়ে দেয়।

বলে—আমাকে স্মরণ করেছেন বড়বাবু!

বড়বাবুর কথা বলতে যেন কষ্ট হয়। বলেন—কোথায় থাকিস তুই, জগত্তারণবাবুকে একবার খবর দিতে হবে যে—

—আজ্ঞে, এক্ষুনি খবর দিচ্ছি বড়বাবু।

বলেই ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে তর্‌তর্‌ করে নেমে আসে। তখন যদি কেউ সামনে পড়লো তো মার-মার কাণ্ড বেধে যাবে।

—দেখতে পাস্‌না উল্লুক কোথাকার, কানা নাকি! চল্‌ বড়বাবুর কাছে চল্‌—শিগ্‌গির চল্‌—

হাতে বোধহয় মাথা কাটতে পাবে তখন নফর। তারপর যখন বড়বাবু মা-মণিকে প্রণাম সেরে বৌ-মণির সঙ্গে দেখা করা সেরে নিচে নামবে, জগত্তারণবাবু দাঁড়িয়ে থাকেন, তিনি এগিয়ে যাবেন। বড়বাবু আস্তে আস্তে গাড়িতে উঠলে জগত্তারণবাবু পেছন পেছন উঠবেন। আবদুল দরজা বন্ধ করে দেবে।

নফর গাড়ির মধ্যে একবার উঁকি মেরে বলবে—তা হলে গাড়ি ছেড়ে দেব স্যার?

বড়বাবু বলবেন—ছাড়্‌, ছাড়তে এত দেরি কেন তোদের?

আর কথা নেই। ভূষণ সিং গেট্‌ খুলে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। নফর তড়াক করে ওপরে গুলমোহর আলির পাশে বসে বলবে—চালাও—

বড়বাবুর বাগানবাড়ি বেলঘরিয়ায়। জগত্তারণবাবুকে অনেকবার বলেছিলেন মা-মণি—আপনি তো এ-বাড়ির সব জানেন, আইনের কাগজপাত্তার সবই তো আপনি দেখেছেন, এস্টেটের আর সে-আয় নেই, এখন একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলবেন—

জগত্তারণবাবু বলতেন—আমি তো বলি মা-জননী, একটু একটু শুধরেছে আজকাল—এখন মাসে একবার করে যান, এর পর দেখবেন একেবারে বন্ধ করে দেবে—

মা-মণি বলেন—আর শরীরটাও তো আগের মত নেই কিনা খোকার—

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি, এখন এক গেলাস খেলেই টলতে থাকেন।

মা-মণি বলেন—যা ভালো বোঝেন আপনি করবেন, আপনি ওর মাস্টার ছিলেন—আপনিই ওর গুরুর মতন—আপনার ওপরেই ভরসা—

ছেলে চলে যাবার পর মা-মণি ডাকেন—বৌমা—

বৌ-মণি এসে দাঁড়ান।

মা-মণি বলেন—খোকা দেখা করে গেল তোমার সঙ্গে?

বৌ-মণি বলেন—হ্যাঁ—

—কবে আসবে কিছু বলে গেল?

বৌ-মণি বলেন—তাড়াতাড়িই আসবেন বললেন—

প্রত্যেকবারেই তাড়াতাড়ি করে আসার কথা দেন বড়বাবু। তবু প্রতিবারই দেরি হয়। তিন দিন তিন রাতের আগে কখনও ফিরতে পারেন না। বেলঘরিয়া গিয়ে বড়বাবু পৌঁছুবার আগেই খবর পৌঁছে যায়। নফর গাড়ি থেকে নেমেই বড়বাবুকে ধরে নামিয়ে দেয়। ধুতির কোঁচাটা নিজের হাতে তুলে দেয়। তারপর বলে—আপনি নেমে আসুন স্যার, নেমে আসুন আগে—

বড়বাবু বলেন—বোতলগুলো রইল—

নফর বলে—আপনি কিছু ভাববেন না স্যার, নফর আছে—

তারপর বাড়ির চাকর-বাকর দৌড়ে আসে। এসে বড়বাবুর পায়ের ধুলো ঠেকায় মাথায়।

বলেন—তোরা আছিস কেমন সব রে ?

সবাই বলে—আজ্ঞে আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি—

জগত্তারণবাবু একপাশে নফরকে ডেকে বলে—নফর তবলচিকে খবর দিয়েছিস তো, এখনও এসে পৌঁছুল না—

নফর বলে—সব ঠিক আছে অ্যাটর্নীবাবু, আপনি ভাববেন না, নফর ভোলে না কিছু—

—আর মালা ? ফুলের মালা ?

নফর বলে—ফুলওলা গাড়ি করে ফুল নিয়ে দিয়ে যাবে, সাত টাকা বায়না দিয়ে এসেছি—

হাঁপাতে হাঁপাতে বড়বাবু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠেন। নফর আগে আগে গিয়ে ফরাসের ওপর চাদরটা ঠিকঠাক করে ঝেড়ে দেয় হাত দিয়ে। তারপর তাকিয়া গোলগাল করে দিয়ে বলে—বসুন স্যার আয়েস করে—

তারপর ডাকে—অ্যাই, রাধারমণ না শ্যামরমণ—কী নাম তোর ?

চাকরটা থতমত খেয়ে বলে—গোকুল—

—ওই হলো, হাওয়া কর্‌না বেটা, দেখছিস্ বড়বাবু ঘামছেন—

বড়বাবু বললেন—এক গেলাস জল—

নফর লাফিয়ে উঠলো।

—অ্যাই, কে আছিস্ ষষ্টি—ষষ্টিচরণ না গুষ্টিচরণ কী নাম যেন বেটার—

গোকুল বললে—আমি যাচ্ছি—

নফর বললে—তুই না, এই যে ষষ্টিচরণ, বেশ ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে বরফ দিয়ে জল আনবি এক গেলাস,—

তারপর নিচু হয়ে বড়বাবুর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে বললে—সোডা ঢালবো স্যার ?

বড়বাবু যেন বিরক্ত হলেন। বললেন—হবে, হবে, অত তাড়া

কিসের, একটু ফাঁক ছাড়তে দে রে বাবা—

নফর হাতের ধুলো-টুলো ঝেড়ে নিয়ে বললে – 'আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার,—

জগত্তারণবাবু বললে—নফর, তবলচি এলো কিনা ছাখ্ তো তুই আগে—

বড়বাবু বললেন—আবার তবলচি কেন মাস্টার?

জগত্তারণবাবু বললে—একটু গান-টান হবে না? অনেকদিন গান-টান শুনিনি কিনা, ভালো বাজায় আর কি, লহরাতে খুব নাম আছে লোকটার—

বড়বাবু বললেন—একটু জিরোতে এসেছিলাম এখানে, তা-ও তুমি দেবে না দেখছি মাস্টার—

—তা তুমি যদি না চাও বড়বাবু তো থাক্ না, এই তবলচি এলে তাকে চলে যেতে বলবি নফর—

বড়বাবু বললেন—এই তোমার বড় দোষ মাস্টার, তুমি অমনি রাগ করলে—বাজাতে এসেছে তো চলে যাবে কেন আবার। তামাক দিতে বল্ নফর—

নফর বললে—এই ষষ্টিচরণ, বেটা জল দিয়ে চলে যাচ্ছিস্—তামাক দে—ততক্ষণ সিগ্রেট খান স্যার—ব'লে সিগারেটের কেস্‌টা খুলে বাড়িয়ে দিলে সামনে।

হঠাৎ পাশের দরজার পরদা নড়ে উঠলো।

নফর কানের কাছে মুখ এনে বললে—ওই মা আসছেন বড়বাবু—

তসরের কাপড়ে আগাগোড়া মুড়ে গিন্নীবান্নি মানুষটি ভেতরে এলেন।

জগত্তারণবাবু একটু নড়ে জায়গা করে দিলে। বললে—আসুন মা, এই দেখুন কাকে ধরে নিয়ে এসেছি—

বড়বাবু বললেন—না না, আমি তো ক'দিন থেকেই ভাবছি আসবো, জুৎ করতে পারছিলাম না তাই—

বড়বাবু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন।

মহিলাটি বললেন—থাক্ থাক্ বেঁচে থাকো বাবা, আমিও ক'দিন

থেকে ভাবছিলাম ছেলে আসে না কেন, আর—টেঁপিরও তো শরীরটা ভালো নেই কিনা—

নফর মুকিয়ে ছিল। বললে—কেন, বউদিমণির আবার কি হলো মা ?

—দাঁত কনকন করছে কাল থেকে, কিছু মুখে দিতে পারে না—পানের নেশা আছে তো, পান না মুখে দিলে আবার একদণ্ড থাকতে পারে না আমার টেঁপি—

নফর বললে—এখন কেমন আছেন বউদিমণি ?

মহিলাটি বললেন—আজকে ছুটো পান খেয়েছে, হামানদিস্তেতে ছিঁচে দিলুম। বলি, ভাত না হলেও চলবে কিন্তু পান না হলে তো তোর চলবে না—তা সে-কথা থাক্—তোমার মা-মণি কেমন আছেন বাবা ?

বড়বাবু বললেন - ভালো—

—আহা, ভালো থাকলেই ভালো বাবা, তুমি মা-মণিকে দেখো বাবা, সংসারে মায়ের তুল্য আর কেউ নেই বাবা জানলে—আর আমার বৌমা কেমন আছে ?

বড়বাবু বললেন—ভালো, আপনি কেমন আছেন ?

—আমার আর থাকাথাকি বাবা, টেঁপিকে আর তোমাকে রেখে যেতে পারলেই হয় বাবা। টেঁপিকে তাই বলি, ছেলের আমার কোনও ঝঞ্ঝাট নেই, তোর কপালেই আমার অমন ছেলে জুটেছে—। তা তোমার শরীর ভালো আছে তো ? কী খাবে বাবা আজ রাত্তিরে ?

বড়বাবু বললেন—আপনি নিজের হাতে রান্না করে যা দেবেন তাই খাবো মা, আমার খাওয়ার জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না—

মহিলাটি বললেন—আজ মুরগীর চপ্ করেছি বাবা,—আর সরু পেশোয়ারী চালের পোলোয়া—

নফর বললে—তোফা তোফা,—

বড়বাবু বললেন—থাম্ তুই নফর, আপনার এই শরীর নিয়ে আবার এত খাটতে গেলেন কেন মা ?

—খাটুনি কেন বলছো বাবা, ছেলের জন্যে কি মায়ের কষ্ট হয় বাবা? আহা, টেঁপিও সকাল থেকে খুব খাটছে আমার পেছনে—

বড়বাবু বললেন—শরীর নষ্ট করে রান্না-বান্না করার কী দরকার ছিল—

—না, তা হোক, ছেলে খাবে আর ঠুঁটো হাতে বসে থাকবো আমি, তা কি হয়, টেঁপি বললে মুরগীর চপ্ তুমি খেতে ভালোবাসো, তাই···আচ্ছা বোসো বাবা, আমি টেঁপিকে ডেকে দিচ্ছি—

টেঁপি আসুক। সংসার সেনের আমল থেকে এ-বংশে কত টেঁপি কত পুতুলমালা কতবার এসেছে কতবার গেছে তার হিসাব খাজাঞ্চি-খানার নথিপত্র দেখলে হয়ত মিলবে। হয়ত আরো অনেক কিছুই মিলবে সেখানে। এ-বংশের আয়-ব্যয়ের হিসেবের সঙ্গে সেই অন্যায় আর অপব্যয়ের একটা ফিরিস্তিও মিলবে। দীর্ঘদিন ধরে একটা ধারা চলে আসতে আসতে ক্ষীণ হয়ে এলেও, তার জের শিরা-উপশিরার মধ্যে আজও চলেছে। মুরগীর চপ্, ফুলের মালা, তবলচি, টেঁপির দাঁতের ব্যথা,—কিছুই কোনদিন বাদ পড়েনি এখানে, এখনও পড়লো না। এর পর টেঁপিও আসবে। আর শুধু টেঁপি নয়, জুয়েলার্স মনসুখলাল কোম্পানির শেঠজীও আসবে। হীরে, পান্না, চুনী, জহরত, জড়োয়া গয়নার নমুনাও বার করবে। সেবারের টাকাটা এবারে শোধ হবে। এবারের জড়োয়ার নেক্‌লেস্‌টার দাম পরের বারে মিটলেই চলে যাবে। বড়বাবু তো নতুন অচেনা আদমী নয়। চেনা ঘর। হাজার হাজার লাখ লাখ জড়োয়া পড়ে থাক্ না—। তাগাদা করবে না জুয়েলার্স মনসুখলাল অ্যাণ্ড কোম্পানি। আর তারপরেই খাজাঞ্চি-খানার খাতায় বড়বাবুর নামে এই দিনের মোট খরচা লেখা হবে—চব্বিশ হাজার সাতশো তেষট্টি টাকা ন'আনা—

রাত তখন অনেক। মা-মণির বারান্দার জানালা থেকে যতদূর দেখা যায় সব জায়গায় অন্ধকার। সব বাড়ির আলো নিভে গেছে এখন। বৌ-মণির ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ। বাইরে সিন্ধুমণি অপেক্ষা করতে করতে বুঝি কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

গুরুপুত্র অনেকক্ষণ চলে গেছেন। কাশীর পণ্ডিত গিরিগঙ্গাধর বাচস্পতির ছেলে। অনেক টোল, অনেক বংশের গুরুদেব তিনি।

গুরুপুত্র যাবার আগে বলেছিলেন—এই চিঠিটা বাবা আমাকে দিয়েছেন, কর্তাবাবু কুড়ি বছর আগে এ-চিঠিটা বাবার কাছে লিখে-ছিলেন—

তখনও চিঠিটা পড়ে আছে। কর্তাবাবুর হাতের লেখা চিঠি। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে চিঠি লিখেছিলেন বটে। কিন্তু সে চিঠি যে কাশীতে বাচস্পতি মহাশয়কে লিখেছিলেন তা এতদিন পরে জানা গেল।

মা-মণি বার বার চিঠিটা নিয়ে দেখতে লাগলেন।

কখনও লেখাপড়া শেখেননি তিনি। লিখতে পড়তে কেউ শেখায়ওনি। কবে একদিন পাঁচবছর বয়সে এ-বাড়ির বউ হয়ে এলেন। সে তো অনেক কাল আগেকার কথা। ভুলেই গেছেন সব। এতবড় বাড়ি, এত টাকা এদের। সব তাঁর অধিকারে।

কর্তাবাবু বলতেন—এই তো নিয়ম—

মা-মণি বলতেন—নিয়ম কি আর বদলায় না?

—কে বদলাবে?

মা-মণি বলতেন—কেন, তুমি বাড়ির কর্তা, তুমিই বদলাবে?

কর্তাবাবু বলতেন—বদলে লাভ কী, এ-বাড়িতে একটু নিয়ম মেনে চলাই ভালো।

মা-মণি বলতেন—তা বলে বসে বসে সব মাইনে খাবে?

কর্তাবাবু বলতেন—কিন্তু ছাড়িয়ে দিলেই বা যাবে কোথায় ওরা? ও কাজ করছে এ-বাড়িতে, ওর বাবা কাজ করেছে, ওর ঠাকুর্দা করেছে, ওর ঠাকুর্দার বাবা কাজ করেছে, আবার ওর ছেলে হলেও কাজ করবে এ-বাড়িতে—ওদের জন্মই হয়েছে আমাদের সেবা করবার জন্যে—তুমি ও-সব নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না—

তিরিশ সের দুধ হতো গরুর। সব কি খেত কেউ! ফেলা-ছড়া ক'রে-ক'রেও ফুরোত না সব। মা-মণি হুকুম দিলেন—ঘি হবে বাকী দুধে, রান্নাবাড়িতেও লোক রয়েছে, কিছুই অভাব নেই যখন তখন নষ্ট হবে কেন?

শুধু কি দুধ! সেই ছোটবেলা থেকে যখন বুঝতে শিখলেন, দেখলেন এখানে অন্যায় করলে সইবে না, অত্যাচার করলেও সহ্য হবে না। অনিয়মও সইবে না। কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো আস্তে আস্তে মা-মণির অনেক কিছুই সহ্য হয়ে এলো। শুধু সহ্য হলো না মিছে-কথা।

বলতেন—মিছে-কথা বললে আমি সহ্য করবো না কিছুতেই—

প্রথম প্রথম খোকন বড় হওয়ার পর হঠাৎ এক-একদিন কোথায় থাকতো, সারাদিন সারারাত বাড়ি আসতো না। দু'দিন পরে হয়ত আবার বাড়ি এলো।

মা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় ছিলে এতদিন ?

খোকন বলতো—আটকে পড়েছিলুম মা, আসতে পারিনি—

—কোথায় আটকে পড়েছিলে ?

এর কোনও উত্তর নেই।

মা-মণি আবার বললেন—বলো ?

কিছুতেই উত্তর দেয় না।

—বলো !

খোকন বললে—বন্ধুর বাড়ি।

—কোন্ বন্ধুর বাড়ি ?

আর বলতে পারে না।

মা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—সঙ্গে কে কে ছিল ?

খোকন বলেছিল—মাস্টার।

—জগত্তারণবাবু ? আর কে ?

খোকন বললে—নফর।

জগত্তারণবাবুকে ডেকে পাঠানো হলো। জগত্তারণবাবু এসে বললেন—মিছে-কথা আপনার কাছে বলবো না মা-জননী, আমরা গিয়েছিলাম পানবাগানে—

মা-মণি বললেন—আচ্ছা আপনি যান—

তারপর ডাক পড়লো নফরের। নফরকে অকথ্য কুকথ্য বলে ধমকালেন খুব। তারপর হুকুম হলো নিমগাছে বেঁধে নফরকে পঁচিশ ঘা জুতো মারা হবে। সে কী দিন একটা! নফরই খোকাবাবুকে খারাপ করে দিচ্ছে। যেখানে-সেখানে নিয়ে যায়। বদ ছেলে কোথাকার! বাড়িসুদ্ধ হৈ-চৈ পড়ে গেল। সকাল থেকে আর কোনও কথা নেই কারো মুখে। এক কথা কেবল—নফরকে নিমগাছে বেঁধে পঁচিশ ঘা জুতো মারা হবে।

লোহার-নাল বাঁধানো জুতো। নিমগাছের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হয়েছে নফরকে।

ভূষণ সিং জুতো দিয়ে মারছে আর দর-দর করে রক্ত পড়ছে গা থেকে। আর নফর চীৎকার করছে—আর করবো না গো, আর করবো না—ছেড়ে দাও—

গুণে গুণে পঁচিশ ঘা। যখন পঁচিশ ঘা শেষ হলো, তখন নফর প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছে। লাক-লাইন দড়িটা খুলতেই ঝপ্‌ করে খসে পড়লো মাটিতে!

মা-মণি সন্ধ্যেবেলা ডেকে পাঠালেন জগত্তারণবাবুকে।

জগত্তারণবাবু এলেন।

ওপর থেকে মা-মণি বললেন—সংসার সেনের বংশের ছেলে পান-বাগানে রাত কাটাবে এটা বড় লজ্জার কথা মাস্টারমশাই,—

জগত্তারণবাবুও স্বীকার করলেন—আজ্ঞে, লজ্জার কথাই তো মা-জননী—

মা-মণি বললেন—তা আপনি এতদিন কর্তাবাবুর সঙ্গে ছিলেন, আপনার এই জ্ঞানটা হলো না? বাজারে কি আর ভালো জায়গা নেই? কর্তাবাবুর বেলঘরিয়ার বাগানবাড়িটা তো পড়ে রয়েছে, সেখানে যেতে পারেন না?

জগত্তারণবাবু বললেন—আজ্ঞে, আমি তো নিমিত্ত মাত্র—

মা-মণি বললেন—না, আপনি একটা ভালো-গোছের মেয়ে দেখুন, তাকেই রাখুন বাগানে, আমি খরচা যা লাগে দেব।

জগত্তারণবাবু সেদিন পায়ের ধুলো নিয়ে চলে গেলেন।

তা সেইদিনই টেঁপিকে খুঁজে বার করলেন জগত্তারণবাবু। রামবাগানের একটা ঘরে মা'র সঙ্গে ছিল। বড় দুরবস্থা। তাকেই জগত্তারণবাবু এনে দেখিয়ে গেলেন মা-জননীকে। মেয়েটি বেশ মোটা-সোটা। মাজা-ঘষা রং। মেয়েটি মা-মণিকে প্রণাম করতে গেল।

মা-মণি দু'পা পেছিয়ে গেলেন। বললেন—ছুঁয়োনা বাছা—থাক্—

গড়ন-পেটন দেখলেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা ভাবে পরীক্ষা করলেন। কোনও খুঁত নেই।

মা-মণি জিজ্ঞেস করলেন—তোমার নাম কী?

মেয়েটি বললে—টেঁপি—

মা-মণি টেঁপির মাকে বললেন—তোমার মেয়ে বেশ বাছা, এখন তোমার মেয়ের বরাত—যাও তোমরা—

তারপর হুকুম হলো—বেলঘরিয়ার বাগানের বাড়িটা মেরামত করতে হবে। খাট বিছানা পালঙ সবই আছে। কিন্তু কর্তাবাবুর চলে যাবার পর কেউ আর ব্যবহার করেনি ওগুলো। তোষক বালিশ গদি সবই পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। আলমারির কাচ ভেঙে গিয়েছিল। সব আবার সারানো হলো। তারপর শুভদিন দেখে টেঁপি আর টেঁপির মা এসে উঠলো।

এরপর যথাসময়ে বিয়ে হলো, বৌ-মণি এল। কতদিন কেটে গেল। একলা হাল ধরে চলেছিলেন মা-মণি। একলা এই সমস্ত পরিবারের জীবনযাত্রার মাথায় বসে তিনি কলকাঠি নেড়ে এসেছেন এতদিন, কেউ আপত্তি করেনি। যে নিয়ম ভেঙেছে তিনি তাকে শাস্তি দিয়েছেন।

কিন্তু আজ বুঝি তাঁরই শাস্তির পালা!

মা-মণি কর্তাবাবুর হাতের লেখা চিঠিখানা আবার দেখলেন। ছোট ছোট কালির আঁচড়। কিছু বোঝা যায় না। কুড়ি বছর আগে কর্তাবাবু লিখেছিলেন তাঁর কুল-গুরুদেব গিরিগঙ্গাধর বাচস্পতিকে।

গুরুপুত্র বললেন—কর্তাবাবু বলেছিলেন এ-সম্পত্তির যতখানি সুবর্ণর প্রাপ্য, ততখানিই প্রাপ্য নফরের। বাবা বললেন—ও-ও তো বিবাহিত স্ত্রীর সন্তান—ওর সমান অধিকার আছে!

—কিন্তু আমি যে দত্তক গ্রহণ করেছি!

—কিন্তু এই নফরকেই দত্তক গ্রহণ করবেন তিনি, এ-কথা তিনি বাবাকে বলেছিলেন। কিন্তু দত্তক-গ্রহণের দিন কাশীর লোককে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেয়নি আপনার দরোয়ান!

মা-মণি বললেন—কিন্তু তা হলে সে পাপ কার? তার জন্যে আমার খোকন কেন ভুগবে?

গুরুপুত্র বললেন—কাশীতে যে-সত্য তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, সে-সত্য আব বদলানো যায় না, আমার বাবা তাই বললেন।

মা-মণি বললেন—কিন্তু যিনি কথা দিয়েছিলেন তিনি তো এখন আর নেই?

—কিন্তু আপনি তাঁর ধর্মপত্নী, আপনি তো আছেন? তাঁর পুণ্যফল কিংবা কর্মফল সব তো আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে।

মা-মণি কেঁদে পড়েছিলেন তখন।

সত্যিই কী নিয়ে বাঁচবেন তিনি! এই বংশের বিধবা হয়ে এরই সমাধি তিনি রচনা করে যাবেন! অনেক অপব্যয় হয়েছে অবশ্য, আজো হচ্ছে, হয়ত আরো হবে, কিন্তু তাঁর যেন মনে হলো এতদিন পরে তিনি হেরে গেলেন। কর্তাবাবু থাকলে তাঁর তেমন ভাবনা ছিল না। কিন্তু আজ যেন তাঁর পায়ের তলার মাটি আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। এ বাড়িতে খোকনেরও যতখানি অধিকার, নফরেরও ঠিক ততখানি। সে কেমন করে হয়। আর মঙ্গলা! মনে করতে চেষ্টা করলেন তিনি। সেই মঙ্গলা! কাশী যাবার আগে বার বার সন্দেহ হয়েছিল তাঁর। তার চেহারা দেখেই সন্দেহ হয়েছিল।

মনে পড়লো, তিনি সেইজন্যেই সেদিন বারণ করে দিয়েছিলেন—কর্তাবাবুর সামনে আসতে—

—কিন্তু আর কারো রক্ত পাওয়া গেল না?

—আপনার সঙ্গে সকলের রক্ত তো মিশবে না। তাই বাবা লক্ষণ মিলিয়ে তাকেই বেছে নিয়েছিলেন।

—কিন্তু বিয়ে হবার কী দরকার ছিল?

—আপনাদের বংশের পবিত্রতা রক্ষার জন্যে।

মা-মণি বললেন—কত লোকের রক্ত কত লোককে দেওয়া হচ্ছে, তাতে তো কেউ আপত্তি করে না?

—তা করে না, কিন্তু বাবা কেমন করে তা অগ্রাহ্য করবেন? তাঁর শিষ্যের জীবন-সংশয় যেমন একদিকে, অন্যদিকে ধর্মরক্ষা!

একবার সিঁড়ির কাছে গিয়ে ডাকলেন—সিন্ধু—

সিন্ধুমণি সেই ছোট জায়গাতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ভোরবেলাই গুরুপুত্র চলে যাবেন। আর দেখা হবে না। কর্তার চিঠিখানা আবার মুঠোর মধ্যে থেকে বার করলেন। স্বামীর শেষ হাতের লেখা। মাথায় ঠেকালেন একবার। তুমি এ কী করলে? আমাকে বলোনি কেন? তোমার সমস্ত কৃতকর্মফল আমি হাসিমুখে মাথায় তুলে নিতাম। কিন্তু কেন তুমি অবিশ্বাস করলে? কেন তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারলে না? আমার সংসার, আমার সন্তান, আমার শ্বশুর স্বামীর জন্মভূমিকে আমি কেমন করে দু'ভাগ করে ভোগ করবো? তুমি যেখানেই থাকো, এর জবাব দাও তুমি! এর উত্তর দাও! তুমি ভেবেছ তুমি তো মুক্তি পাবে! তুমি মুক্তি পেয়েছ, কিন্তু

আমাকে কী বাঁধনে বেঁধে রেখে গেলে ? আমি কেমন করে মুক্তি পাবো ? এ সমস্ত যে আমার ? তুমি তোমার সত্য রেখেছ, তোমার কথা রেখেছ ? কিন্তু আজ কুড়ি বছব পরে আমার কাঁধে এ কোন্ বোঝা চাপিয়ে দিলে ? তীর্থের সত্য যদি মিথ্যে হয় তো সে-পাপ তুমি যেখানেই থাকো তোমাকেও স্পর্শ করবে আমাকেও কববে। তুমি আমি কি আলাদা ?

কর্তাবাবু চিঠি লিখেছিলেন গুরুদেবকে—সে-চিঠি গুরুপুত্র পড়ে শুনিয়েছেন—

পরম ধ্যানেন বন্দিত শ্রীশ্রীগিরিগঙ্গাধর বাচস্পতি

মহাশয় শ্রীচরণাম্বুজেষু—

শত সহস্র প্রণামা নিবেদঞ্চাদৌ মহাশয়ের শ্রীচরণ ধ্যান সদা সর্বদা প্রার্থনা করিতেছি।···

এমনি করেই আরম্ভ করেছেন কর্তাবাবু। মৃত্যুর ক'দিন আগের চিঠি। শেষ জীবনে বড় অস্থির হতেন তিনি মনে আছে। সেই অবস্থায় কাউকেই কোনও কথা বলতে পারেননি সাহস করে। নিজের ধর্মপত্নী, নিজের ঔরসজাত সন্তান থাকতে তিনি দত্তক গ্রহণ করেছেন। তাঁর নিজের সন্তান তাঁরই বাড়িতে চাকরের মতো জীবন যাপন করে। তাঁরই ধর্মপত্নী তাঁরই বাড়িতে দাসীর কাজ করে। এ তিনি প্রকাশ করতে পারেন না। আপনি গুরুদেব, স্ত্রীর জীবনরক্ষার জন্যে আপনার আদেশেই তা করেছি। কিন্তু আপনি আমায় জানিয়ে দিন, তাদের গ্রহণ না কবে আমি মহাপাতক হয়েছি কিনা! পরজন্মে আমি মুক্তি পাবো কিনা! কিন্তু কেমন করে আমি গ্রহণ করবো তাদের! আমার সংসার, আমার বংশ এ-সমস্ত বিবেচনা করে আমি কেমন করে ওদের গ্রহণ করি। আমি লোকলজ্জা, সংস্কার এইসবের ভয়ে সন্তানকে মা'র কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। মা জানেনা তার সন্তান তার কাছেই আছে। আজ জীবনের শেষ সন্ধিক্ষণে পৌঁছে আমি আপনার কাছে এই পত্র দিলাম। আমার শেষ ইচ্ছা আমার সম্পত্তি স্থাবর অস্থাবর সমস্ত দুই সন্তানের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। আমার চোখে দু'জনেই সমান। আমার কাছে আমার দুই স্ত্রী-ই আমার ধর্মপত্নী। আপনার আদেশে আমি যখন আর একজনকে গ্রহণ করেছি, তাকে আমার ধর্মপত্নীর মর্যাদা দেওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু আমি তা করিনি। এখন

আপনাকেই আমি সব ভার দিয়ে গেলাম। আপনার অদৃষ্ট-গণনায় আমার প্রথম স্ত্রীর জীবৎকাল আর মাত্র কুড়ি বৎসর। কুড়ি বৎসর পরে আপনি আমার এই ইচ্ছা এই আদেশ প্রকাশ করবেন। অন্যথায় পরলোকেও আমার আত্মা অশান্তিময় হয়ে বিরাজ করবে—

দীর্ঘ চিঠি !

গুরুপুত্র নিচের ঘরে গিয়ে শুয়েছেন। তাঁর পিতারও মৃত্যু হয়েছে। নির্ধারিত সময়েই এ-সংবাদ তিনি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর জীবৎকাল তো পূর্ণ হয়ে এলো। কর্তাবাবুর মৃত্যুর পর মাত্র কুড়ি বছর। কিন্তু কুড়ি বছরের পরও যে তিনি বেঁচে আছেন। গুরুর অদৃষ্ট-গণনা কি তবে মিথ্যে !

আর একবার সিন্ধুমণির কাছে গেলেন। নিঝুম নিস্তব্ধ বাড়ি। একটি বেড়াল বুঝি নিঃশব্দে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাচ্ছিল। এত রাত্রে কোনওদিন মা-মণি জেগে থাকেননি।

আবার ডাকলেন—সিন্ধু, ও সিন্ধু—

সিন্ধু ধড়মড় করে উঠে বসলো। বললে—মা—

—মঙ্গলাকে একবার ডাকতে পারিস ?

সিন্ধু বললে—মঙ্গলাকে ? এত রাত্রে ? রান্না করতে হবে ?

—না, তুই একবার শুধু ডেকে নিয়ে আয় তাকে।

মঙ্গলা এসেছিল অনেক রাত্রে। মা-মণি বলেছিলেন—সিন্ধু, তুই শুগে যা—তোকে আর জেগে থাকতে হবে না—

মঙ্গলা শুধু এইটুকু জানে যে, মা-মণির চেহারা দেখে যেন চম্‌কে উঠেছিল সে। মা-মণিকে অবশ্য বেশিবার দেখেনি মঙ্গলা। তবু সেই রাত্রে যেন সত্যিই চম্‌কে উঠলো চেহারা দেখে।

মা-মণি বলেছিলেন—বোস্—

কখনও তো মা-মণির সামনে বসবার কথা নয়। বসায় নিয়মই নেই এ-বাড়িতে। এ সবাই জানে। তবু মঙ্গলা বসলো। বসে মুখ নিচু করে রইল। ঘুমোতে-ঘুমোতে উঠে এসেছে, উঠে মা-মণি ডেকেছে শুনে আরো অবাক্ হয়েছে। কিছু রান্না করতে হবে। গুরুপুত্র এসেছিলেন। তিনি খাননি। রান্নার সব যোগাড় করে রেখেও তিনি খেলেন না। খবরটা পেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল আবার। শিশুর-মা-ও পাশে ঘুমোচ্ছিল। কিন্তু ডাকতেই মনে হলো কে যেন

স্বপ্নের মধ্যে ডাকছে তাকে। স্বপ্নই দেখছে যেন সে।

—কাশীতে গিয়েছিলি আমার সঙ্গে, তোর মনে আছে?

—মনে আছে মা-মণি!

—আমার খুব অসুখ হয়েছিল তা তোর মনে আছে?

—তাও মনে আছে মা-মণি!

—আমার অসুখের সময় কর্তাবাবুকে দেখেছিলি তুই?

মঙ্গলা যেন চম্‌কে উঠলো একটু। মা-মণির মুখের ওপর মুখ তুলেই তক্ষুনি আবার নামিয়ে নিলে।

—কথা বলছিস্ না যে?

মঙ্গলা আস্তে আস্তে মুখ নিচু করে বললে—সে অনেক দিন আগেকার কথা, মা-মণি।

মা-মণি যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বললেন—তুই আমারই বাড়িতে বসে আমারই খেয়ে পরে আমারই সর্বনাশ করেছিস?

মঙ্গলা কেঁদে ফেললে, দু'চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এলো।

মা-মণি বলতে লাগলেন—আমার কত সাধের সংসার তুই জানিস্? সেই সংসারে তুই আগুন লাগিয়ে দিলি? আমি এখন কী করবো!

মঙ্গলার হাত-পা যেন সব আড়ষ্ট হয়ে এল। এতদিন পরে এই কথা বলবার জন্যে এত রাত্রে তাকে ডাকালেন মা-মণি?

—আমার স্বামী, ছেলে, ছেলের বউ—তোর জন্যে সবাইকে জলাঞ্জলি দিতে হবে? তুই আমার এমন সর্বনাশ করতে পারলি?

—মা-মণি, আমি যে···

—থাম্ তুই, দুধ-কলা দিয়ে আমি কালসাপ পুষেছিলাম কিনা, তাই এমন করে আমার সব নষ্ট করে দিলি! আমি এখন কী করবো! আমার যে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে—

মঙ্গলা মা-মণির পায়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়লো।

বললে—মা-মণি, বিশ্বাস করুন, আমার কোনও দোষ নেই, আমি পেটের দায়ে আপনার বাড়িতে কাজ করতে এসেছিলাম—

মা-মণি বললেন—তোকে আমি বলেছিলাম না যে কর্তাবাবুর চোখের সামনে না-পড়তে?

—আমি তো বরাবরই চোখের আড়ালে থাকতাম, মা।

—তবে কেন এমন সর্বনাশ ঘটালি ?

—আমার মরণ-দশা হয়েছিল, মা-মণি ! আমাকে আপনি তাড়িয়ে দিন মা এ-বাড়ি থেকে, আমি মরে বাঁচি, আমার আর বাঁচার সাধ নেই !

মা-মণি একটু যেন কী ভাবলেন। বললেন—তোর ছেলেকে তুই দেখেছিস্ ?

মঙ্গলা হঠাৎ চোখে আঁচল দিলে। শেষকালে আর চাপতে পারলো না। চিরকালের চাপা মানুষ মঙ্গলা। নিজের সমস্ত জীবনের দুঃখ কষ্ট. শোক সব যেন হঠাৎ ফেটে বেরোলো তার সেই মুহূর্তে।

মা-মণি চীৎকার করে উঠলেন। বেরো হতভাগী, বেরো—বেরো এখান থেকে—পারিস তো গলায় দড়ি দিগে যা—বেরো আমার সামনে থেকে—

অন্ধকার বাড়ি। তার খোঁদলে খোঁদলে যেন মৃত আত্মহারা হঠাৎ সজীব হয়ে উঠলো। মাঝরাতের নাটকে এখানেই বুঝি যবনিকা পড়বে। তার আগে শুধু একটু একমুহূর্তের ছেদ। মঙ্গলা টলতে টলতে সিঁড়ি দিয়ে নামলো, তারপর একবার এদিক ওদিক দেখে নিলে। ভয় করতে লাগলো তার। সিঁড়ির ওপর টিয়াপাখীটা একবার পাখা-ঝাপ্টানি দিলে। বেড়ালটা তার পায়ের কাছ দিয়ে কোন্ দিকে পালিয়ে গিয়ে বাঁচলো যেন।

আর তারপর···

ভোর তখনও হয়নি। বেশ রাত আছে। জগত্তারণবাবু খুব খেয়েছিলেন সেদিন। মুরগীর চপ্ হয়েছিল। শুধু মুরগীর চপ্ই নয়। টেঁপির মা আগে চাটের দোকানের খাবার রাঁধতো। তার হাতের কাঁকড়ার দাড়া দিয়ে পেঁয়াজ-রসুনের তরকারি যারা খেয়েছে, সে-পাড়ায় তারা এখনও আপসোস করে। বলে—আহা, টেঁপির মা'র রান্নার মতো রান্না আর খেলুম না—

তখন টেঁপির মার অবস্থা খারাপ ছিল। তারপর জগত্তারণবাবুর দয়ায় এখন টেঁপির বরাত ফিরেছে। বেলঘরিয়ার বাগানবাড়িতে উঠে এসেছে। টেঁপির মা'র হীরের নাকছাবি হয়েছে, টেঁপির জড়োয়া গয়না হয়েছে। এখন অনেক সুখ।

সেই শেষরাত্রেই কে যেন বাইরে চীৎকার করে উঠলো।

—বড়বাবু, বড়বাবু!

তখন নফরও অচৈতন্য। গান-বাজনা হয়েছিল অনেক রাত পর্যন্ত। অনেক দিন পরে ভালো খেয়েছে। পেট ভরে খেয়েছে। মুরগীর চপ্ চেয়ে-চেয়ে নিয়ে খেয়েছে। জগত্তারণবাবু পাশে বসে খাচ্ছিল।

বললে—খাও হে নফর—খাও, পেট ভরে খাও, লজ্জা কোরোনা—

নফর বলে—আজ্ঞে লজ্জা আমার নেই, লজ্জা থাকলে আমার এই দশা—

বড়বাবু বললেন—মুরগীটা বেশ ভালো, মাস্টার—

জগত্তারণবাবু বললে—রান্নাটা বড়বাবু বড্ড ভালো এর—হোটেলে রাঁধতো আগে—

গুলমোহর আলি, আবদুল ওরাও খেয়েছে পেট ভরে। শুধু মুরগী নয়। টেঁপির মা বললে—আজ রান্নাটা বেশ জুৎ করতে পারিনি, আদা-বাটা বেশি হয়ে গেস্‌লো—

নফর বললে—পোলাওটাও খুব ভালো হয়েছে, মা—

খাওয়াচ্ছিল টেঁপির মা—বললে—ভালো হবে কী করে বাছা, খাঁটি ঘি কি পাওয়া যায়, নেহাত ছেলে খাবে তাই মাখন গালিয়ে নিয়েছিলাম—

—আঃ—জগত্তারণবাবু একটা আরামের ঢেকুর তুললে।

বললে—খাওয়াটা বেশ হলো বড়বাবু, কর্তাবাবুর সঙ্গে কতদিন বেলঘরিয়াতে খেয়ে গিয়েছি—

খাওয়া হয়েছে। খাওয়ার আগে আবার গান হয়েছে। টেঁপি ঠুংরিটা গায় ভালো। 'হামসে না বোল রাজা' ব'লে যখন কোমল নিখাদে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সে কি মজা! আর নিখাদ ব'লে নিখাদ! ওই নিখাদটার দাম-ই লাখ টাকা।

বড়বাবু বললেন—তোমার গলা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব এবার—

নফর শুনছিল। বললে—আহা, বউদিমণির গান শুনলেই পেট ভরে যায়—

গানের মধ্যে মনসুখলাল জুয়েলার্স কোম্পানির দালালও এসেছে। নিখাদের দাম সেখানেই উঠে গেছে বোধহয়। টেঁপির মুখেও হাসি বেরিয়েছিল নেকলেস্‌টা দেখে।

তারপর যত রাত বেড়েছে, তত মজা বেড়েছে। বড়বাবু যত বলেছে

—এই শেষ, আর নয়—তত বোতল এসেছে আর খালি হয়ে গেছে। নফরও টেনেছে লুকিয়ে লুকিয়ে। ভালো জিনিস। এ খেতে পাওয়ার ভাগ্য চাই।

খেতে খেতে সব যখন ফরসা, তখন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। বড়বাবু কাত হয়ে শুয়েছিল বিছানার ওপর। টেঁপির মা এসে টেঁপিকে ডেকে নিয়ে গেছে। বলেছে—আয়, ঘরের ভেতরে আয় মা,—আরাম করে শুবি আয়—

টেঁপি টেঁপির-মার সঙ্গে আলাদা ঘরেই শুয়েছিল। টেঁপির মা'রও বেশ নেশা হয়েছিল একটু।

হঠাৎ বাইরে চীৎকার হতেই টেঁপির মা'র নেশা কেটে গেল যেন।

বললে—ষষ্টিচরণ, ছাখ্ তো রে কে ডাকছে—

বাইরে তখনও কে দরজার কড়া নাড়ছে আর চীৎকার করছে—বড়বাবু, ও বড়বাবু—

তা সেদিন খুব ভোরেই ঠাকুরমশাই উঠেছিলেন। কলতলায় গিয়ে মুখ-হাত পা ধুয়ে জপ-আহ্নিক করে নিলেন। তাঁকে সকালবেলাই যেতে হবে।

পয়মন্তকে ডাকলেন—ওরে শুনছিস, মা-মণিকে একবার খবর দে, আমি যাচ্ছি—

সমস্ত বাড়ি তখন প্রায় নিঝুম। তিনি নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলেন।

হঠাৎ পয়মন্ত দৌড়তে দৌড়তে এল।

—কী হয়েছে রে?

ভেতর থেকে হঠাৎ সিন্ধুমণির আর্ত কান্নার শব্দ শোনা গেল।

—কী হয়েছে রে?

—সব্বনাশ হয়ে গেছে ঠাকুরমশাই!

এ-সব গল্প আমরা বড় হয়ে শুনেছি। আসল ব্যাপার জানতে পেরেছি পরে। কিন্তু তখন কিছুই জানতাম না আমরা।

আমরা তখন ছোট, পাড়ার সবাই বাড়িটার সামনে জড়ো হয়েছে সেদিন। লাল পাগড়ি-পরা পুলিশ এসেছে ক'টা, আর একজন দারোগা।

এ পাড়ার মধ্যে এ-বাড়িতে আগে কখনও পুলিশ আসতে দেখিনি। তবু এ বাড়ির সম্বন্ধে কৌতূহল আমাদের বরাবর।

—কী হয়েছে মশাই ?

রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে লোকেরা পুলিশ দেখে থেমে যায়। বলে —কী হয়েছে মশাই এখানে ? এত পুলিশ কেন ?

—বাড়িতে কে গলায় দড়ি দিয়েছে শুনছি !

—কে ,গলায় দড়ি দিয়েছে ?

—কে জানে মশাই, কে ? বড়লোকের বাড়ির ব্যাপার, এ-বাড়ির খবর কে জানবে ?

আস্তে আস্তে আরো ভিড় বেড়ে গেল। রোদও বাড়ছে। পাশের বাড়ির ভদ্রলোকদের ততক্ষণ আপিস যাবার সময় হয়েছে। কয়েকজন চলেও গেল।

তারপরেই হঠাৎ গাড়ি চালিয়ে এল গুলমোহর আলি।

—হট্ যাও, হট্ যাও—

বড়বাবুর গাড়ি এসেছে। ভেতরে বড়বাবু বসেছিলেন। জগত্তারণ-বাবুও বসেছিল। নফর গাড়ির মাথায়। গাড়িটা থামতেই নফর তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজাটা খুলে বললে—আসুন স্যার—নেমে আসুন—

তারপর দারোগাবাবু বড়বাবুর সঙ্গেই ভেতরে ঢুকে গেলেন। কৌতূহল যেন আরো বাড়লো সকলের। আমরা আরো সামনে এগিয়ে গেলাম।

আজ এতদিন পরে এই সংকীর্তন যে গাইছি, তারও একটা কারণ আছে বৈকি।

এবার পুজোর সময় কাশীতে গিয়েছিলাম।

দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে আছি। হঠাৎ দেখি নফর ! সেই ছেঁড়া গেঞ্জি, ময়লা কাপড়।

আমিই প্রথমে ডাকলাম।

—নফর !

নফর আমার ডাক শুনেই এগিয়ে এল। বললে—দাদা, আপনি এখেনে !

বললাম—তুমি এখানে কবে এলে বলো আগে।

নফর বললে—আপনি বুঝি বাড়ি বদলেছেন [illegible] আপনাকে—আর

পাড়ায় দেখতে পাইনা তাই।

বললাম—তুমি এখানে কার সঙ্গে এসেছ?

নফর বললে—জগত্তারণবাবুর সঙ্গে। বড়বাবু মারা গেছেন শুনেছেন বোধহয়?

অবাক হলাম। বললাম—না, কবে মারা গেছেন—?

নফর অনেক গল্প বলে গেল। শেষজীবনটা বড়বাবুর স্বাস্থ্য নাকি খারাপ হয়ে গিয়েছিল। গলায় কিছু ঢুকতো না আর।

খানিক পরে নফর বললে—বড়বাবুর বাড়ি-টাড়ি সব সম্পত্তি-টম্পত্তি জগত্তারণবাবু কিনে নিয়েছেন তা জানেন তো?

বললাম—সেকি! সেই অ্যাটর্নী জগত্তারণবাবু?

জগত্তারণবাবু যে শেষ পর্যন্ত সব গ্রাস করবে তা অবশ্য তখনই বুঝতে পারতাম। তবু কেমন যেন দুঃখ হলো। মা-মণি নিজেকে বলি দিয়ে সংসার সেনের বংশের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন। সুবর্ণনারায়ণ সেনের ভবিষ্যৎ-ও নিরাপদ করতে চেয়েছিলেন! কিন্তু শনি যে কোন্ দিক দিয়ে কখন রন্ধ্রে প্রবেশ করবে তা যদি তিনি জানতেন!

মনে আছে পুলিশ জিজ্ঞেস করেছিল সিন্ধুমণিকে—তোমার সঙ্গে শেষ কখন কথা হয়েছিল মা-মণির?

সিন্ধুমণি উত্তর দিয়েছিল—হুজুর, মঙ্গলাকে ডেকে দিতে বলে তিনি আমায় শুতে বললেন—আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম নিজের বিছানায়, তারপর আর কিছু জানি না, সকালবেলা উঠে দেখি এই কাণ্ড—

বৌ-মণি সারারাত ভালোই ঘুমিয়েছিলেন। কিছুই টের পাননি। বড়বাবু বেলঘরিয়ায় চলে যাবার পর আর মা-মণিকে দেখেননি।

একে একে সবাইকেই প্রশ্ন করেছিল পুলিশ।

মঙ্গলাকে জিজ্ঞেস করেছিল—তুমি কতদিন এ-বাড়িতে কাজ করছো?

—মনে নেই কত বছর, ছোটবেলা থেকে। বিধবা হবার পর থেকেই।

—শেষ যখন তোমার সঙ্গে মা-মণির কথা হয়, তখন তিনি কী বলেছিলেন?

মঙ্গলা কী যেন ভেবেছিল খানিকক্ষণ। বলেছিল—তিনি আমার ওপর রাগ করেছিলেন—

—কেন? তোমার রান্না ভালো হয়নি বলে?

—না, তিনি বলেছিলেন আমি তাঁর ক্ষেতি করেছি।

—কী ক্ষতি ?

মঙ্গলা বলেছিল—তা জানি না।

—সংসারে আপনার বলতে তোমার কে আছে ?

—এক ছেলে আছে।

—কোথায় সে ?

মঙ্গলা বলেছিল—তা জানি না—

এর পর বড়বাবু জগত্তারণবাবু সকলেরই জবানবন্দী নিয়েছিল পুলিশ। শেষে ডাক পড়েছিল নফরের।

পুলিশ জিজ্ঞেস করেছিল—সংসারে তোমার আপনার বলতে কেউ আছে ?

—আজ্ঞে না, হুজুর।

—তোমার মা-বাবা ?

—না হুজুর, আমি কাউকেই দেখিনি। তারা কোথায় তাও জানি না।

—এ বাড়িতে তোমার কাজ কী ?

—আজ্ঞে হুজুর, মোসায়েবী। বড়বাবুর মোসায়েব আমি। হুজুর স্মরণ করলেই আমি সঙ্গে যাই।

—কোথায় যাও ?

—আজ্ঞে বেলঘরিয়ায়।

শেষ ডাক পড়েছিল ঠাকুরমশাই-এর! তাঁরও সেদিন যাওয়া হয়নি শেষ পর্যন্ত।

পুলিশ জিজ্ঞেস করেছিল—শেষ যখন আপনার সঙ্গে মা-মণির কথা হয় তখন কত রাত ?

ঠাকুরমশাই বলেছিলেন—রাত বোধহয় দ্বিতীয় প্রহর—

—তিনি কী-কী কথা বলেছিলেন আপনাকে ?

—অনেক কথাই বলেছিলেন।

পুলিশ আবার জিজ্ঞেস করেছিল—তাঁর কি খুব মন-খারাপ ছিল ?

—হ্যাঁ।

—আপনি এতদিন পরে হঠাৎ কাল রাত্রেই বা এসেছিলেন কেন ?

—আমার বাবার মৃত্যু-সংবাদ দিতে। আমার বাবা ছিলেন তাঁর গুরুদেব, গুরুদেবকে তিনি খুব ভক্তি করতেন।

পুলিশ জিজ্ঞেস করলে—শুনে কি তিনি মুষড়ে পড়লেন ?

—ভীষণ মুষড়ে পড়লেন। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন, তারপর অনেক রাত হয়েছে দেখে আমিও বাইরে চলে এলাম—

—তারপর ?

ঠাকুরমশাই বললেন—তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি নিজের ঘরে শুয়ে পড়েছি—আর কিছুই জানি না, এখন ভোরবেলা শুনি এই কাণ্ড!

পুলিশ আরো সব কত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল, এখন আর সে-সব কথা মনে নেই।

হঠাৎ নফর বললে—যাই দাদা, জগত্তারণবাবুর জন্যে এদিকে রাবড়ি কিনতে এসেছিলাম, তিনি আবার ঘুম থেকে উঠে রাবড়ি না খেলে গালাগালি দিতে আরম্ভ করবেন—

হাসি এলো। বললাম—কিন্তু তোমার আর কোনো বদল হলো না নফর, তুমি সেই একরকমই রয়ে গেলে—

—আর দাদা!

নফরও হাসতে লাগলো।

বললে—আর দাদা, আমি তো আর ওঁদের মতো বড়লোকের ছেলে নই—

ব'লে নফর চলে গেল।

হঠাৎ খেয়াল হলো—মঙ্গলার কথাটা তো জিজ্ঞেস করা হলো না নফরকে। মঙ্গলা কি তাহলে এখন জগত্তারণবাবুর বাড়ির রাঁধুনি! কে জানে!

কিন্তু আমার কানে যেন তখনও নফরের শেষ কথাটাই কেবল বাজছে—আমি তো আর ওঁদের মতো বড়লোকের ছেলে নই—আমি তো আর ওঁদের মতো বড়লোকের ছেলে নই···